প্রে...

করিয়াছেন। কিম্বদন্তী সকলে...

পরিমাণে সত্য নিহিত আছে তদ্বিষয়ে কাহারও

সুতরাং আশা করা যায় সান্যাল মহাশয়ের যত্ন ও

ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকগণের উপকারে আসিবে।

সান্যাল মহাশয় যখন এই গ্রন্থের কিয়দংশ প্রচার করেন, তখন তাঁহার দৈবদুর্বিপাক বশতঃ দারজিলিং মেলের মারামারি মোকদ্দমা হইতেছিল, এবং তদ্ব্যতীত শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন সম্পূর্ণ মনোযোগ করিতে পারেন নাই, এবং এই সকল কারণ জন্য অনেক ভ্রমপূর্ণ হইয়াছিল। এক্ষণে এই নূতন সংস্করণে সেই সকল ভ্রান্তি নিরাকৃত করিবার জন্য যথাসাধ্য প্রয়াস পাইয়াছি। উপক্রমণিকায় প্রজাপতিসূত্র প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে প্রাচীন আর্য্য সমাজের ইতিহাস সঙ্কলিত হইয়াছে। ইহা একটী সম্পূর্ণ মৌলিক বিষয়। আনন্দ ভট্ট প্রণীত "বল্লাল চরিত" নামক সংস্কৃত গ্রন্থে ও "বিশ্বকোষ" সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় সেন রাজগণকে "ব্রহ্ম ক্ষত্রিয়" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু এ বিষয়ে অনেকের মত ভিন্নরূপ থাকায় এবং উক্ত মত তত্দূর প্রামাণিক বলিয়া বোধ না হওয়ায় আমরা সাধারণ মতানুযায়ী

...শোধিত, পরিমার্জ্জিত ও
...হ, এবং অনেক স্থলে আমরা উভয়ে যথা-
...ত অংশ সঙ্গত করিতে ও নূতন তথ্য সংগ্রহে প্রয়াস
...াছি। পাদটিকায় বিভিন্ন ঐতিহাসিকের মতও সন্নিবেশীত
করিয়াছি। কয়েক স্থলে শ্রদ্ধাস্পদ সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত
কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট বিশেষ সাহায্য
পাইয়াছি। তজ্জন্য আমরা তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, সামাজিক ইতিহাস লেখা
অতীব দুরূহ কার্য্য। যদিও সত্য নির্ণয়ে যথাসাধ্য যত্ন ও
পরিশ্রম করা হইয়াছে, তথাপি এ প্রকার গ্রন্থ যে নির্ভুল হইবে
তাহা কোন মতেই সম্ভব হইতে পারে না। সান্যাল মহা-
শয়ের যত্নে এই গ্রন্থের প্রায় সমুদায় উপাদান সংগৃহীত হইয়াছে।
ইহার দোষ ও ত্রুটি সম্বন্ধে আমিই দায়ী। ইহার প্রশংসার ভাগ
তাঁহার। ভরসা করি, সুধীসমাজ কৃপাকটাক্ষপাতে পত্রদ্বারা
প্রমাদপ্রদর্শনপূর্ব্বক অজ্ঞানতা দূর করিলে কৃতার্থ হইব। ইতি—

১৫ই কার্ত্তিক, ১৩১৭।
নবাব্দী ওস্তাগরের লেন,
কলিকাতা।

শ্রীফকিরচন্দ্র দত্ত।

দুর্গাচন্দ্রের সংক্ষিপ্ত জীবনী

মানবদেহ নশ্বর। জগতে কিছুই চিরস্থায়ী নহে। কিন্তু যতদিন জগত থাকিবে ততদিন গুণের আদর থাকিবে, কারণ গুণই চিরস্থায়ী,—প্রতিভাই চির-আদরণীয় ও পূজনীয়।

এই জগতে অনেকেই নানা সুযোগাদির সংঘটনে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। যাঁহারা সহজেই খ্যাতি লাভ করেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই কয়েকদিবসের নিমিত্ত নির্ম্মল আকাশে অপরিচিত উল্কার ন্যায় দীপ্তি পাইয়া আবার বিস্মৃতির ঘোর অন্ধকারে নিমগ্ন হন। কিন্তু যাঁহাদের খ্যাতি চিরস্থায়ী, তাঁহারা ধ্রুবতারার মত নিশ্চল হইয়া চিরকাল দীপ্তি প্রাপ্ত হন। উল্কার ন্যায় তাঁহারা সর্ব্বাগ্রেই সাধারণের চিত্তাকর্ষণ না করিয়া ক্রমে ক্রমে,ধীরে ধীরে সকলের নয়নপথে পতিত হন, এবং ক্রমে ক্রমে লোকে তাঁহাদের ভিতরের গুণাবলী সমস্তই বুঝিতে পারে।

শ্রীযুক্ত দুর্গাচন্দ্র সান্যালের নাম কিছুকাল পূর্ব্বে বঙ্গবাসীর নিকট অজ্ঞাত ছিল। বিগত ১৩১৪ সালের আশ্বিন মাসে দারজিলিং ট্রেনে মারামারির মাম-লায় দুর্গাচন্দ্রের নাম অনেকেই জানিল। দুর্গাচন্দ্রের অদৃষ্টচক্রও পরিবর্ত্তিত হইয়া তাঁহাকে এক নূতন ক্ষেত্রে আনীত করিল। দুর্গাচন্দ্রের জেল তাঁহার দুর্ভাগ্য হইতে পারে কিন্তু সমগ্র বঙ্গদেশের সৌভাগ্যসূচক। অদৃষ্টের অলক্ষ্যগতি বোঝা সাধারণ মনুষ্যের সাধ্যাতীত। দুর্গাচন্দ্র ওকালতী করিতেন, জেল হওয়াতে ওকালতী ব্যবসা পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহাকে সাহিত্যসেবী হইতে হইয়াছে। তিনি নানাদেশ পরিভ্রমণ করিয়া বঙ্গদেশের সামাজিক অবস্থার যে ইতিহাস প্রকটিত করিয়াছেন তাহা বঙ্গবাসীর চিরগৌরবের বস্তু। যদি দুর্গাচন্দ্র এই হতভাগ্য বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ না করিয়া য়ুরোপে জন্মগ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে এই

বৃদ্ধ বয়সে চারিটী উদরান্নের জন্য তাঁহাকে লালায়িত হইতে হইত না।—বরং তিনি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইতেন। অবশ্য অনেকে তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন, কিন্তু তাহা তাঁহার গুণের ও কার্য্যের তুলনায় অকিঞ্চিৎ। যাহা হউক, তবু যে বঙ্গবাসী গুণের আদর শিখিতেছে, ইহাই যথেষ্ট।

৯৪৪ শকাব্দে বঙ্গাধিপতি আদিশূর কর্ত্তৃক ভৃগুবংশীয় কান্যকুব্জবাসী ধরাধর মুনি বাঙ্গালা দেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রপৌত্র অনিরুদ্ধ বেদান্তাচার্য্য বল্লালসেনের গুরু ছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র লক্ষ্মীধর ও ভীমদেব বারেন্দ্র কুলীন। লক্ষ্মীধর সঙ্গামিনী গ্রামে বাস করিয়াছিলেন। জন সাধারণে সঙ্গামিনী গ্রামকে সংক্ষেপে সানি বা সাণ্ডি বলিত। এজন্য লক্ষ্মীধরের বংশধরেরা সান্যাল বা সাণ্ডাল গোষ্ঠী নামে খ্যাত। আর ভীমদেব কালিয়া গ্রামে বাস করায় তদ্বংশীয়েরা কালিয়াই গোষ্ঠী নামে পরিচিত। অনিরুদ্ধের ভ্রাতা দামোদর আচার্য্য রাঢ়দেশে ব্রহ্মত্র পাইয়া তথায় গিয়া বাস করিয়াছিলেন। দামোদরের পুত্রেরা রাঢ়ীয় কুলীন ব্রাহ্মণ। তাঁহাদের বংশধরেরা ঘোষাল ও কাঞ্জিলাল উপাধি বিশিষ্ট।

লক্ষ্মীধরের সপ্তম পর্য্যায়ে শিখিবাহন (শিখাই) সান্যাল নবাব সম্সুদ্দীনের স্বাধীনতা লাভের সাহায্য করিয়া চাকলে ভাতুড়িয়া জাগীর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং খাঁ সাহেব উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি বা তদ্বংশীয়েরা সেই যাবনিক উপাধি ধারণ করেন নাই। শিখাইর তিন পুত্র মধ্যে জ্যেষ্ঠ বলাই চাকলে ভাতুড়িয়ার রাজা হইয়া সাঁতোড়ে বাস করিয়াছিলেন। বলাইএর সহোদর ভ্রাতা প্রিয়দেব (পিয়াই) গৌড় বাদশাহের ফৌজদার ছিলেন। তৎপুত্র রাজা কংসরাম নাবালক সম্রাট্ ময়জুদ্দীনের (সেকেন্দর সাহ) অভিভাবকরূপে সমস্ত বাঙ্গালা ও বেহার শাসন করিয়াছিলেন। শিখাইর মধ্যম পুত্র কানাই যিনি বলাইএর বৈমাত্র ভ্রাতা ছিলেন, মুসলমান প্রদত্ত কোন সম্পত্তি গ্রহণ করেন নাই অথবা কোন চাকরী করেন নাই। কানাইএর সন্তানেরাই কুলপতি বা কুলমর্য্যাদার রাজা বলিয়া ব্রাহ্মণ সমাজে সম্মানিত হইতেন।

কানাই হইতে ষষ্ঠ পুরুষে গোপাল সান্যাল। গোপালের তিন পুত্র; প্রথম, রামদেব; দ্বিতীয়, কৃষ্ণদেব; তৃতীয়, প্রাণকৃষ্ণ ছিলেন। দুর্গাচন্দ্রেরা রামদেবের সন্তান। বলিহারের রাজারা কৃষ্ণদেবের সন্তান আর জেলা রঙ্গপুরে ভিতর বন্দের

রায়চৌধুরীরা প্রাণকৃষ্ণের সন্তান। রামদেবের পুত্র রঘুদেব হরিপুরের রামদেব চৌধুরীর কন্যা অন্নপূর্ণা দেবীকে বিবাহ করিয়া কাপকুলীন হইয়াছিলেন এবং গুণাইগাছা গ্রামে এক তালুক পাইয়া তথায় বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র বলরাম সান্যাল তাহিরপুরের রাজার দেওয়ান হইয়াছিলেন। তৎপুত্র জগজ্জীবন সান্যালও তাহিরপুরের রাজার পেস্কারী কর্ম্ম করিতেন। তৎপুত্র কালীচন্দ্র সান্যাল প্রথমে তাহিরপুরের রাজ সরকারে জমানবিস ছিলেন পরে পেস্কারী কর্ম্ম পাইয়া অল্প বয়সেই অবরত হইয়াছিলেন। দুর্গাচন্দ্রের পিতা রামচন্দ্র সান্যালই কালী-চন্দ্রের একমাত্র সন্তান। অতি অল্প বয়সেই তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। পিতৃবিয়োগ কালে রামচন্দ্রের বয়স ২৮ দিন মাত্র হইয়াছিল। জ্ঞাতিগণ দেখিলেন রামচন্দ্র অপোগণ্ড শিশু এবং তাঁহার মাতার বয়সও পনর বৎসর মাত্র, সুতরাং তাঁহারা সুযোগ পাইয়া রামচন্দ্রের সম্পত্তি সকল আত্ম-সাৎ করিতে লাগিলেন এবং নানাবিধ উপদ্রব আরম্ভ করিলেন। উপদ্রবের মাত্রা এত অধিক হইল যে, রামচন্দ্রের মাতামহ সেই সংবাদ জানিয়া নিজে কন্যা ও দৌহিত্রকে নিজবাটিতে লইয়া গেলেন।

জেলা ঢাকা, থানা মানিকগঞ্জের অধীন থল্লীগ্রাম নিবাসী পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য রামচন্দ্রের মাতামহ ছিলেন। তিনি যাজন ও গুরুগিরি ব্যবসা করিতেন। তিনি একজন অতি মান্য গণ্য পণ্ডিত এবং পরম ধার্ম্মিক বলিয়া সকলের পূজ্য ছিলেন। তাঁহার জোত ও ব্রহ্মত্র প্রচুর ছিল। তিনি দৌহিত্রকে নিজ ব্যব-সায়ের ভাবী উত্তরাধিকারী করিতে মনস্থ করিয়া সংস্কৃত পড়াইতে লাগিলেন। রামচন্দ্র টোলে সংস্কৃত পড়িতেন এবং গোপনে পারসী পড়িতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার পিতা, পিতামহ এবং প্রপিতামহ পারসী জানিতেন। কিন্তু তাঁহার মাতামহ গোঁড়া হিন্দু ছিলেন। তিনি দৌহিত্রের যাবনিক ভাষা পাঠ টের পাইয়া তাঁহাকে এরূপ প্রহার করিয়াছিলেন যে, রামচন্দ্র তিন দিন শয্যাগত ছিলেন। তাহার পর পঞ্চানন নাতীকে সঙ্গে লইয়া গঙ্গাস্নান, মস্তক মুণ্ডন ও স্বর্ণোৎসর্গ দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত করাইয়াছিলেন।

রামচন্দ্র পিতার ও মাতামহের উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। উপার্জ্জন না করিলেও তাঁহার মধ্যবিত্তরূপে সংসার চলিতে পারিত। তিনি সন ১২৩১ সালে জেলা পাবনা, থানা মথুরার অধীন বাকসাটিয়া গ্রামে রামনিধি চৌধুরীর কন্যা

হরসুন্দরী দেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। নদী ভঙ্গে তাঁহার মাতামহ সম্পত্তি নিঃশেষ হইল। নানাবিধ শত্রুর চক্রান্তে তিনি পৈত্রিক সম্পত্তি হইতেও বেদখল হইয়া দরিদ্র অবস্থায় পড়িয়াছিলেন। তিনি থল্লীর নিকটবর্ত্তী ধানকোড়া গ্রামের জমীদারদের চাকরীতে প্রবৃত্ত হইয়া ধানকোড়া গ্রামে সপরিবারে বাস করিতেন। সেই স্থানে সন ১২৫৪ সালের ২৭শে জ্যৈষ্ঠ সূর্য্যোদয়ের সময় দুর্গাচন্দ্র ভূমিষ্ঠ হন।

দুর্গাচন্দ্রের দেড় বৎসর বয়সের সময় তাঁহার পিতামহীর অভাব হইয়াছিল। তখন তাঁহার জননী সংসারে একাকিনী হইলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জয়চন্দ্র সান্যাল তাঁহার অপেক্ষা কেবল তের মাসের বড়। তাঁহাদের দুই জনকে প্রতি-পালন করা জননীর অসাধ্য হইল। দুর্গাচন্দ্রের জননীর জ্যেষ্ঠা ভগিনী শিবসুন্দরী দেবী অবীরা বিধবা হইয়া পিত্রালয়ে বাস করিতেন। দুর্গাচন্দ্রের প্রতিপালনের ভার তিনি লইলেন। তজ্জন্য দুর্গাচন্দ্র বাল্যাবধি মাতুলালয়ে থাকিতেন। মাসী-মাকে 'বড় মা' বলিতেন। তিনিও দুর্গাচন্দ্রকে এত স্নেহ করিতেন যে কোন জননী নিজ সন্তানকে তদপেক্ষা অধিক স্নেহ করিতে পারে বলিয়া বোধ হয় না। তাঁহার জ্ঞান হইবার পূর্ব্বেই বাকসাটিয়া গ্রাম নদী নিমগ্ন হওয়ায় তাঁহার মাতুল পাইকশা গ্রামে বাড়ী করিয়াছিলেন। সেই গ্রামের সংলগ্ন ভারাঙ্গা গ্রামের বিদ্যালয় হইতে তিনি ১৮৬২ খৃঃ অব্দের শেষে বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তি পাইয়াছিলেন, এবং ১৮৬৫ খৃঃ অব্দে মাইনর ছাত্রবৃত্তি পাইয়াছিলেন। ১৮৬৮খৃঃ অব্দে রঙ্গপুর গবর্ণমেণ্ট স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১০৲ টাকা বৃত্তি পাইয়া কলিকাতা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্ত্তি হইয়া হিন্দু হোষ্টেলে থাকিতেন। সেই সময়ে স্কুল কলেজের ছাত্রদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে ইংরেজী পড়িলেই হিন্দুধর্ম্ম বিরোধী হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। হিন্দু হোষ্টেলে যে সকল ছাত্র থাকিত তাহারা একান্ত কদাচারী ছিল। ইংরেজের হোটেল হইতে মুসলমান হকারগণ নানাপ্রকার মাংস লইয়া আসিত। হিন্দু হোষ্টেলের ছাত্রগণ তাহাই খাইত। সেখানে দুর্গাচরণের সন্ধ্যা বন্দনাদি করিবার সুযোগ ছিল না। তিনি ছাদের উপর গিয়া অতি সংগোপনে কয়েকবার গায়ত্রী জপ করিতেন। একমাস মধ্যে অন্যান্য ছাত্রেরা তাহা জানিতে পারিয়া তাঁহার উপর ঘোর উৎপীড়ন আরম্ভ করিল। একদিন দশবারজন ছাত্র যোট করিয়া একটা ভাজা গোজিহ্বা তাঁহার মুখে দিতে চেষ্টা করিল। সেইদিন তিনি যদুনাথ বসু এবং কালীমোহন

ন্দ্যোপাধ্যায় নামক দুইটি ছাত্রকে প্রচণ্ড আঘাতে রক্তপাত করিয়াছিলেন এবং নিজেও বহু আঘাত পাইয়াছিলেন। কার্ত্তিকচন্দ্র মিত্র যিনি পরে রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ ছাত্রবৃত্তি পান তিনিও সেই সময়ে হিন্দু হোষ্টেলে ছিলেন। তিনি মধ্যে পড়িয়া না ছাড়াইলে নিশ্চয়ই খুনাখুনি হইত। সেইদিন হইতে দুর্গাচন্দ্র হিন্দু হোষ্টেল ছাড়িলেন। শীতকালে যখন গড়ের মাঠ জরিপ করিতে হইত তখনও সহাধ্যায়ীরা ঐরূপ দৌরাত্ম্য করায় তিনি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ত্যাগ করিয়া জেনারেল আসেমব্লী কলেজ * হইতে ১৮৭০ সালে এফ্-এ পরীক্ষা দিয়াছিলেন কিন্তু ইংরেজী সাহিত্যে ফেল হইয়াছিলেন। তিনি পীড়িত অবস্থাতে এফ্-এ পরীক্ষা দিয়াছিলেন। তাহার পর স্বাস্থ্য বর্দ্ধন জন্য পাটনা গিয়া কেবল কমিটিতে আইনের বক্তৃতা শুনিতেন। সুতরাং সেই অবধি ইংরেজী পড়া শেষ হইল। পাটনা হইতে কাশীতে গিয়া আইনের বক্তৃতা শুনিতেন। পারসী ও সংস্কৃত পূর্ব্বে কিছু পড়িয়াছিলেন। কাশীতে থাকা কালে আরও কিছু শিখিলেন।

বাল্যকাল হইতেই দুর্গাচন্দ্র অতি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। যাহা একবার ধরিতেন, তাহা শেষ না করিয়া কোন ক্রমেই ছাড়িতেন না। এখনও তাঁহার এ স্বভাব পরিবর্ত্তিত হয় নাই। হাজার ব্যাঘাত হউক, যাহা করিবার জন্য সঙ্কল্প করেন তাহা সম্পূর্ণ করিতে কিছুতেই বিচলিত হন না।

দুর্গাচন্দ্র ১৮৭৪ খৃঃ অব্দে কমিটিতে ওকালতী পরীক্ষায় নিম্নশ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়া জলপাইগুড়ীতে ওকালতী আরম্ভ করিয়াছিলেন। ইং ১৮৭৫ সালে পাইকশা গ্রাম নদীসাৎ হওয়ায় তাঁহার পিতা বক্তারপুর গ্রামে বাড়ী করিয়াছিলেন। সেই বৎসর নিয়ম হইল যে এফ্-এ পাস না হইলে কেহ জজ আদালতের ওকালতী পরীক্ষা দিতে পারিবে না। আবার জলপাইগুড়ীতে তাঁহার শরীর সুস্থ থাকিত না। তজ্জন্য তিনি এলাহাবাদ হাইকোর্টের ওকালতী পরীক্ষা দিয়া জজ কোর্টে পাস হইয়া ইংরেজী ১৮৭৮ হইতে ১৮৮৪ সাল পর্য্যন্ত কানপুর জেলায় ওকালতী করিয়াছিলেন। এই স্থানে ১৮৮০ খৃঃ অব্দে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয় সেই সময়ে তাঁহার উর্দ্দু ও পারসী বলা অভ্যস্ত হইয়াছিল। সেই সময়েই তিনি "মহামোগল কাব্য" লিখিয়াছিলেন। ইং ১৮৮৪ সালের শেষে কলিকাতায় আসিয়া প্রেসিডেন্সি

* এক্ষণে এই কলেজের নাম স্কটিস্ চার্চ কলেজ হইয়াছে।

মেজিষ্ট্রেটের কোর্টে ওকালতী করিতেন এবং মহামোগল কাব্যের প্রথম ত্রি পর্ব্ব মুদ্রিত করিয়াছিলেন এবং ভাষাবিজ্ঞান নামক ব্যাকরণেরও কতকদূর মুদ্রিত করিয়াছিলেন। এক্ষণে "ভাষাবিজ্ঞান" সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে। এরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর মৌলিক গবেষণাপূর্ণ ব্যাকরণ এপর্য্যন্ত কোন ভাষায় প্রকাশিত হয় নাই। ইং ১৮৮৫ সালে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র গিরিশচন্দ্র সান্যালের উপনয়ন দিবার জন্য জলপাইগুড়ী গিয়া পুনরায় তথায় ওকালতী করিতে লাগিলেন। তদবধি পুস্তক মুদ্রিত করা স্থগিত থাকিল।

জলপাইগুড়ীতে ১৮৮৫ হইতে ১৮৯৩ সাল পর্য্যন্ত ছিলেন। কিন্তু এখানে তাঁহার শরীর সর্ব্বদাই পীড়িত থাকিত। তজ্জন্য পুনরায় ঐস্থান ত্যাগ করিতে মনস্থ করিলেন। মৈমনসিংহ জেলার মহকুমা টাঙ্গাইলে প্রায় দেড় বৎসর ছিলেন কিন্তু সুবিধা বোধ না হওয়ায় রাজসাহী জেলার নওগাঁও মহকুমায় প্রায় সাড়ে তিন বৎসর ওকালতী করিয়াছিলেন। এখানে অনেক বিষয়ে সুবিধাও হইয়াছিল। কিন্তু জলপাইগুড়ীস্থিত সম্পত্তি তাঁহার অনুপস্থিতে বিশৃঙ্খল হওয়ায় পুনরায় জলপাইগুড়ীতে যাইতে হইল। জলপাইগুড়ীর এই বাসায় তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র ও কন্যা এবং বহুসংখ্যক পুত্র কন্যা নষ্ট হওয়ায় তিনি রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকট পৃথক বাসা করিলেন। এই বাসায় আসা অবধি স্বাস্থ্য ভাল হইল কিন্তু উপার্জ্জন একবারে কমিয়া গেল।

দুর্গাচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্রের ও জ্যেষ্ঠা কন্যার মৃত্যু অবধি সর্ব্বদা মন উদাস থাকিত এবং জলপাইগুড়ী ত্যাগ করিতে সর্ব্বদা ইচ্ছা করিতেন। ইং ১৯০৭ সালে সেই বিষয়ে দুইটি সুবিধা হইল। পূর্ব্বে জলপাইগুড়ী রঙ্গপুরের জজের অধীন ছিল, ইং ১৯০৬ সাল হইতে দিনাজপুরের জজের অধীন হইল। দিনাজপুর ও জলপাইগুড়ীতে একই সবজজ বহুদিন পূর্ব্বাবধি ছিল। তজ্জন্য অনেক কাজের জন্য জলপাইগুড়ীর মোকদ্দমায় কোন তদ্বির প্রয়োজন হইলে জলপাইগুড়ীর উকীল মুক্তারদের অনেক সময়ে দিনাজপুর যাইতে হইত। তিনি সেই সকল কার্য্যের ভার লইয়া দিনাজপুর থাকিতে মনস্থ করিলেন। আর দিনাজপুরস্থ কুটুম্বেরাও তাঁহার সহায়তা করিতে স্বীকার করিলেন। এই সমুদায় কারণে দিনাজপুর গিয়া ইং ১৯০৭ সালে সেইখানে ওকালতি আরম্ভ করিলেন। আশা থাকিল যে দিনাজপুরে কিছু সুবিধা হইলে জলপাইগুড়ীর বাসা

ভাড়া দিয়া কিম্বা বিক্রয় করিয়া দিনাজপুরে বাসা করিবেন। প্রতি বৎসরই বৈশাখ মাস হইতে ভাদ্রমাস পর্য্যন্ত মোকদ্দমা কম হইয়া থাকে সুতরাং তিমি দিনাজপুর গিয়া বড় সুবিধা পাইলেন না। কিন্তু যেরূপ চলিল তাহাতে পূজার ছুটির পর সুবিধা হইবে বলিয়া আশা হইল।

তাঁহার মামাতো ভগিনীর স্বামী যাদবচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বি এল, রঙ্গপুরে জজ আদালতে ওকালতী করিতেন এবং তথায় সপরিবারে বাস করিতেন। সন ১৩১৪ সালের ভাদ্র মাসে হঠাৎ তাঁহার মৃত্যু হইল। দুর্গাচন্দ্রের মামাতো ভ্রাতা পত্র দ্বারা তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন যে তিনি শীঘ্র রঙ্গপুর গিয়া ভগিনীর দেনা পাওনা এবং সমস্ত কার্য্যের ও সম্পত্তির বন্দোবস্ত করিয়া তাহার দেশে যাইবার সুবিধা করিয়া দিবেন। সেই অনুরোধ বশতঃ তিনি ১৩১৪ সালের ৫ই আশ্বিন তারিখে রিটার্ণ টিকিট করিয়া দিনাজপুর হইতে রঙ্গপুর চলিলেন। রেলগাড়ীতে দুই জন রেলের সাহেব তাঁহাকে অকারণ আক্রমণ করায় তিনি আত্মরক্ষার চেষ্টা করিয়াছিলেন, এই অপরাধে তাঁহার চারি বৎসর সপরিশ্রম কয়েদ থাকিবার হুকুম হইল। ১৯০৮, ৬ই আগষ্ট।

ভাললোক মন্দলোক সকল দেশের সকল জাতি মধ্যে চিরকালই আছে। যে ইংরেজ জাতি এখন পৃথিবী মধ্যে সর্ব্বপ্রধান তাহার মধ্যে সৎলোকের অভাব কদাচ সম্ভব নহে। দুর্গাচন্দ্রের প্রতি যে নিতান্ত অবিচার হইয়াছে তাহার জন্য বড় বড় ইংরেজী পত্রিকায় অনেক অনুযোগ হইল। দেশীয় আপামর সমস্ত লোকেই অবিচারের জন্য দোষারোপ করিল। একজন সদাশয় ইংরেজ দুর্গাচন্দ্রের পরিবারগণের সাহায্যার্থ ৫০০৲ টাকা দিতে স্বীকৃত হইলেন। যদিও তাঁহার নিকট কোন টাকা লওয়া হয় নাই কিন্তু তাঁহার উদারতা জন্য দেশস্থ সমস্ত লোকেই তাঁহাকে ধন্যবাদ করিয়াছিল। দুর্গাচন্দ্রের মুক্তির জন্য গবর্ণমেণ্টে দরখাস্ত হইল তাহাতে যেমন দেশীয় বড় বড় লোকেরা দস্তখত করিয়াছিলেন তেমনি বহুসংখ্যক ইংরেজও দস্তখত করিয়াছিলেন। সেই দরখাস্ত মত গবর্ণমেণ্ট দুর্গাচন্দ্রকে ইং ১৯০৯ সালের ৮ই মার্চ দুইটি সর্ত্তের অধীনে খালাস দিলেন। তিনি মুক্ত হইয়া দিনাজপুরের জজের নিকট ওকালতী পাট্টা প্রার্থনা করিয়াছিলেন কিন্তু জজ তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন। দুর্গাচন্দ্রের পূর্ব্বাবধি সাহিত্যসেবায় মনোযোগ ছিল। নানাবিধ প্রয়োজনীয়

বিষয়ে সংবাদ সংগ্রহ করিতেন, পুস্তক লিখিতেন এবং সংবাদপত্র সমূহে প্রবন্ধ পাঠাইতেন। এখন অন্য কর্ম্ম না থাকায় সাহিত্য সেবায় সম্পূর্ণ মনোনিবেশ করিয়াছেন। কিন্তু সাহিত্যসেবীগণ সর্ব্বত্রই দরিদ্র। ইংলণ্ড ফ্রান্স প্রভৃতি ধনশালী দেশেও জাতীয় গৌরবের উজ্জ্বলরত্ন স্বরূপ বিদ্বান লোকেরা জীবমানে দারিদ্রহেতু বহুকষ্ট ভোগ করিয়াছেন। সুতরাং আমাদের এই দরিদ্রদেশে যে দুর্গাচন্দ্রের দারিদ্র জনিত দুর্দ্দশা ভোগ করিতে হইবে তাহা বলা বাহুল্য।

বিজ্ঞাপন।

যেমন ভূমিতে বীজ বপন করিলে অঙ্কুরিত হইয়া বৃক্ষ উৎপাদন করে, আবার সেই বৃক্ষ হইতে বহুসংখ্যক ফল ও বীজ উৎপন্ন হয় তদ্রূপ মনুষ্যের ঐহিক কর্ম্ম সমস্ত কর্ম্মবীজ, এবং পৃথিবী কর্ম্মক্ষেত্র। দেশে কোন লোক যেরূপ কার্য্য করিয়া ধনী অথবা যশস্বী হয়, পরবর্ত্তী বংশধরেরা সেই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতে থাকে; অতএব তাহাতেই জাতীয় চরিত্র গঠিত হয়। এই জন্যই ইতিহাসে জাতীয় অবস্থা ও জীবনচরিতের বারংবার পুনরাবৃত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের দেশে ইতিহাস ও জীবনচরিতের আদর ছিল না; সুতরাং লিখিত হয় নাই। অতএব তাহার পুনরাবৃত্তি নিরূপণ করা সুকঠিন।

এখন ইতিহাসের আবশ্যকতা লোকে বুঝিয়াছে। রাজপুতনার এবং ভারতবর্ষের নানা স্থানের অসম্পূর্ণ ইতিহাসও বিলক্ষণ সমাদৃত হইতেছে; তথাপি বাঙ্গালাদেশের ইতিহাস সংগ্রহে যথোচিত চেষ্টা হয় নাই। বাঙ্গালার ইতিহাস নামে যে সকল ইংরেজী গ্রন্থ বিদ্যালয়সমূহে পঠিত হয়, তাহা নিতান্ত অসম্পূর্ণ। তাহাতে হিন্দুরাজত্বের কোন বৃত্তান্তই নাই এবং মুসলমানরাজত্বের সময় বাঙ্গালী হিন্দুদের কিরূপ অবস্থা, আচার, ব্যবহার ও দেশের শাসনপ্রণালীই বা কিরূপ ছিল, তাহার কোনও বিবরণ নাই। অতএব তাদৃশ ইতিহাস পাঠে আভ্যন্তরিক অবস্থা কিছুই জানা যায় না। প্রাচীন ভারতবর্ষের প্রকৃত ইতিহাস না থাকিলেও প্রাচীন আচার ব্যবহার সম্বন্ধে যে সমস্ত গ্রন্থাদি আছে, তদ্দ্বারা সামাজিক অবস্থা মোটামুটি জানা যায়। আধুনিক অবস্থা সম্বন্ধে অনেক গ্রন্থাদি হইতেছে। কিন্তু মুসলমানরাজত্বের মধ্যবর্ত্তী কালের রীতিমত ইতিহাস না থাকায়, প্রচীন অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়া কিরূপে বর্ত্তমান অবস্থায় পরিণত হইল, তাহা জানা যায় না। এই সকল অভাব দূরীকরণ জন্য আমি অষ্টাদশ বৎসর পরিশ্রম করিয়া নানাবিষয়ক বিবরণী সংগ্রহ করত এই গ্রন্থ প্রকাশ করিলাম। প্রচলিত ইংরেজী ও পারসী ইতিহাস, পুরাতন জমিদারদিগের সনদ, বংশানুক্রমিক কিংবদন্তী, শেখ শুভোদয়া নামক গ্রন্থ, রাঢ়ী ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদের কুলশাস্ত্র, বল্লালচরিত এবং ভট্টকবিতা, এই সমস্ত মিলাইয়া যথাসাধ্য সত্য নির্ণয়পূর্ব্বক এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়াছি। যেখানে একই ঘটনা সম্বন্ধে মতান্তর আছে, তন্মধ্যে যেটি সত্য বোধ হইল, আমি কেবল তাহাই গ্রহণ করিয়াছি। যেখানে সত্যাসত্য ঠিক করিতে পারিলাম না, সেখানে কোন তর্ক না করিয়া বিভিন্ন মতগুলি সমস্তই গ্রহণ করিয়াছি। যে সকল স্থানে প্রকৃত বৃত্তান্ত সহ কাল্পনিক বৃত্তান্ত মিশ্রিত দেখিয়াছি, সেখানে কেবল প্রকৃত ঘটনাই

গ্রহণ করিয়াছি। কিন্তু যেখানে প্রকৃত ও কাল্পনিক অংশ পৃথক্ করিতে পারি নাই, সেখানে কোন পরিবর্ত্তন না করিয়া, যেমন পাইয়াছি ঠিক তাহাই গ্রহণ করিয়াছি। ইতিহাস সংগ্রহ প্রথম উদ্যমেই নির্দ্দোষ হওয়া অসম্ভব। অতএব স্থানে স্থানে অসম্পূর্ণ এবং কাল্পনিক বৃত্তান্ত মিশ্রিত থাকিল। আশা করি ভবিষ্যতে ক্রমে ক্রমে ঐ সকল সংশোধন করিবার চেষ্টা পাইব।

সার ওয়াল্টর রেলী নামক একজন শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ইংরেজ বহুসংখ্যক গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া সমস্ত পৃথিবীর ইতিহাস লিখিতেছিলেন। ইতিমধ্যে তিনি নিজ বাড়ীর নিকট একটী গোলযোগ শুনিলেন। রেলী সাহেব নিজে তথায় গেলেন না; কিছুকাল পরে গোলযোগ থামিলে ঘটনাস্থান হইতে লোক ফিরিতে লাগিল। তিনি তখন একে একে তিন জন লোকের নিকট সেই ঘটনার বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন; কিন্তু প্রত্যেকের কথিত বৃত্তান্তই কিছু কিছু বিভিন্ন হইল। তখন তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন যে, 'সত্য কথার কদাচ অনৈক্য হইতে পারে না। এই তিন ব্যক্তির কথায় যখন সামঞ্জস্য নাই, তখন অবশ্যই ইহাতে মিথ্যা মিশ্রিত আছে। যখন এত নিকটবর্ত্তী স্থানের ঘটনাসম্বন্ধীয় বৃত্তান্ত মিথ্যা-মিশ্রিত, তখন আমার সংগৃহীত গ্রন্থাদিতে যে অধিকতর মিথ্যা মিশ্রিত থাকিবে, তাহা নিশ্চিত। এবংবিধ মিথ্যা কথা সত্য বলিয়া জনসমাজে উপস্থিত করা অনুচিত।' এজন্য তিনি ইতিহাস লিখিতে ক্ষান্ত হইলেন। প্রকৃত পক্ষে পৃথিবীতে সম্পূর্ণ সত্য ইতিহাস একখানিও নাই। সর্ব্বত্রই বিজয়ীরা পরাজিতের উপর নানারূপ মিথ্যা দোষারোপ করিয়া নিজ দোষ গোপন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। গ্রন্থকারগণ ভয়, লোভ বা পক্ষপাতের বশীভূত হইয়া ঠিক সত্য কথা লিখিতে পারেন নাই। ভ্রম বশতও প্রচুর মিথ্যা কথা, কিংবদন্তীতে, সনদে এবং গ্রন্থসমূহে প্রবেশ করিয়াছে। এজন্য চেষ্টা করিয়া ঠিক সত্য ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করা যাইতে পারে না। এই জন্য পৃথিবীর সকল দেশের সকল ইতিহাসই অলীকতা দোষে কলঙ্কিত। মৎকৃত এই ইতিহাস সম্বন্ধে আমি এইমাত্র বলিতে পারি যে, ইহাতে সম্পূর্ণ অমূলক বৃত্তান্ত নাই; অধিকন্তু ইহাতে সাময়িক আচার ব্যবহার রীতিপদ্ধতি সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইল, তাহা সম্পূর্ণ সত্য। সেই জন্য এই গ্রন্থের নাম "বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস" রাখিলাম। ইতি—

১লা চৈত্র,
১৩১৩ সাল।

শ্রীদুর্গাচন্দ্র সান্যাল।

উপক্রমণিকা।

আর্য্যসমাজের প্রাচীন ইতিহাস।—আদিম আর্য্যসমাজ এবং সামাজিক আচার ব্যবহার।

আর্য্য সমাজ বাঙ্গালা দেশে সৃষ্ট হয় নাই। ব্রহ্মাবর্ত্ত আর্য্য সমাজের আদিম উৎপত্তিস্থান। সেই খানে আর্য্যজাতি আদিম অসভ্য মূর্খাবস্থা হইতে সভ্যাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল। ভগবান্ মনু কহিয়াছেন যে ব্রহ্মাবর্ত্তের প্রচলিত আচার ব্যবহারই সদাচার। তাহাই অনুসরণ করা সকল লোকের কর্ত্তব্য। পরবর্ত্তী কাল অর্থাৎ ত্রেতাযুগে কোশল দেশ ব্রহ্মাবর্ত্ত অপেক্ষা সমুন্নত হইয়াছিল। অযোধ্যা প্রদেশের নাম কোশল। তাহাতে সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয়দের রাজত্ব ছিল। আর প্রয়াগ প্রদেশের নাম দক্ষিণ কোশল। তাহাতে চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়েরা রাজত্ব করিতেন। ত্রেতাযুগে এই কোশল দেশ ঐশ্বর্য্যে, পরাক্রমে, বিদ্যাতে এবং বুদ্ধিতে ব্রহ্মাবর্ত্ত হইতে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করায় এই স্থানের আচারই সদাচারের আদর্শ হইয়াছিল। বৌদ্ধ প্রাবল্য বিলোপের পর কান্যকুব্জ আর্য্যবিদ্যায় ও সদাচারের প্রধান স্থান হয়। সেই বিদ্যা ও সদাচার শ্রোত্রিয়গণ কর্ত্তৃক বাঙ্গালা দেশে আনীত হইয়া, দেশ ও কালের প্রয়োজন অনুসারে নানা প্রকার পরিবর্ত্তন সঙ্গত হইয়া বর্ত্তমান বাঙ্গালা দেশে বিদ্যমান আছে।

আদিম মনুষ্যগণ পশুবৎ অসভ্যাবস্থা হইতে কিরূপে উন্নত হইয়াছিল তাহা জানিতে সকলেরই কৌতূহল হয় এবং তদ্দ্বারা অনেক বিষয়ে জ্ঞান লাভ হইতে পারে। সেই সভ্যতা লাভের ইতিহাস কেবল মাত্র ভারতবর্ষে এবং চীনদেশে পাওয়া যাইতে পারে। চীনে দুই লক্ষ আঠার হাজার বৎসরের ধারাবাহিক ইতিহাস আছে। ভারতবর্ষে তদ্রূপ ধারাবাহিক ইতিহাস নাই। কিন্তু বেদ, স্মৃতি, পুরাণ এবং প্রজাপতি সূত্র হইতে সভ্যতার ইতিহাস কতক সংগ্রহ করা যাইতে পারে। হিন্দুশাস্ত্রোক্ত ঘটনাসমূহের সময় নিরূপণের কোন সুবিধা নাই, এমন কি কোন্ ঘটনা বা আচার নিয়ম আগে হইয়াছিল কোন্‌টি তাহার পরে হইয়াছিল তাহাও অনেক স্থানে ঠিক করা যায় না। তথাপি আর্য্য সভ্যতার ইতিহাস অতীব প্রয়োজনীয়। কেননা আর্য্য জাতিই মানব জাতির

বিদ্যা ও সভ্যতার সৃষ্টিকর্ত্তা। সেই আর্য্য সন্তানগণ কতকগুলি গিয়া চীন ও পারস্য দেশ অধিকার করিয়া তথায় স্বজাতীয় সভ্যতা ও বিদ্যা প্রচার করিয়াছিল। ভারতবর্ষ, চীন এবং পারস্য দেশ হইতে আর্য্য সভ্যতা নানা কারণে দিগ্দেশে প্রচারিত হইয়া মানব জাতির উন্নতির প্রথম সোপান হইয়াছে। তাহার পর কোন দেশের লোক কোন কোন বিষয়ে আর্য্য জাতি অপেক্ষাও সমধিক উন্নতি লাভ করিয়াছে বটে কিন্তু মূলতঃ কোন জাতি আর্য্য সভ্যতার প্রভা ব্যতীত সভ্যতা লাভে সমর্থ হয় নাই। আর্য্যদিগের সৌর বৎসর গণনা, সূর্য্যের গতিপথ নির্ণয়, দ্বাদশ রাশিচক্র, সপ্ত বার এবং দশমিক অঙ্ক স্থাপন প্রণালী, আগ্নেয়াস্ত্র প্রয়োগ প্রণালী, প্রস্তর বা কাষ্ঠফলকে অক্ষর খুদিয়া কাগজ ছাপা করিবার রীতি যে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে প্রাগ্দেশ (পূর্ব্বোপদ্বীপে), চীনে, কিম্পুরুষবর্ষে (তিব্বতে) এবং লঙ্কায় প্রচারিত হইয়াছিল তাহা ঐ সকল দেশের ইতিহাসে প্রকাশ আছে। হিন্দুদিগের সৌরবৎসর, দ্বাদশ মাস, সপ্তবার, এবং দ্বাদশ রাশিচক্র গ্রীকজাতি দ্বারা * পারস্য ও মিসরে প্রচার হয়। রোমের সম্রাট্ জুলিয়াস সিজার মিসর দেশ হইতে তাহা শিখিয়া সমস্ত রোম সাম্রাজ্যে প্রচলিত করিয়াছিলেন। কিন্তু তখনও গ্রীক বা রোমানেরা জ্যোতিষ শাস্ত্র জানিত না। সুতরাং রাশিচক্র দ্বারা মাস গণনা করিতে পারিত না। এই জন্য সিজার প্রত্যেক মাসের পরিমাণার্থ দিন নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। তাহাতে কিছু কিছু ভুল হইত। আধুনিক য়ুরোপীয়েরা জ্যোতিষ গণনা শিখিলে তাহারা বুঝিতে পারিল যে সিজরের নিয়মানুসারে গণনা করায় বিগত চৌদ্দশত তিরাশী বৎসরে প্রায় ১১ দিন অধিক হইয়া গিয়াছে। তজ্জন্য পোপ গ্রেগারি খৃঃ ১৫৮২ সালের ১০ দিন ত্যাগ করিয়া বৎসর গণনা সংশোধন

* ইহা জানা আবশ্যক যে চারিশত বৎসর পূর্ব্বে আফ্গানিস্তান ও তুরস্ক কোন পৃথক দেশ ছিল না। আফ্গানিস্তানের কতক অংশ ভারতবর্ষের এবং অপরাংশ পারস্য দেশের অংশ ছিল। খৃঃ ১৫৩২ সালে দিল্লীর সম্রাট হুমায়ুন তাঁহার ভ্রাতা মির্জা কামরানকে সিন্ধু নদের পশ্চিম তীরবর্ত্তী নিজ সাম্রাজ্যাংশ ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। তদবধি ঐ স্থানের নাম আফ্গানিস্তান হইয়াছে। আর খৃঃ ১৪১৯ সালে তুর্ক জাতি পারস্য দেশের পশ্চিমাংশ অধিকার করায় সেই অংশের নাম তুর্কী বা তুরস্ক হইয়াছে। তৎপূর্ব্বে ভারতের পশ্চিম ভূমধ্য সাগর পর্য্যন্ত সমস্ত পারস্য রাজ্যও পারস্য দেশভুক্ত ছিল।

করিয়াছিলেন। সিজারের পূর্ব্বে য়ুরোপে এক পূর্ণিমা হইতে অন্য পূর্ণিমা প র্য্যন্ত চান্দ্র মাস গণনা হইত। সিজার সেই বৎসরের মধ্যস্থল জুলাই এবং আগষ্ট নামে দুইমাস বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। তজ্জন্য য়ুরোপের শেষ মাসগুলির নামের অর্থ ব্যত্যয় হইয়াছে। যথা, সেপ্টেম্বর অর্থ সপ্তম মাস এখন তাহা নবম মাস হয়। ঐরূপ অক্টোবর, নবেম্বর ও ডিসেম্বর অর্থ অষ্টম, নবম ও দশম, দশম, একাদশতম ও দ্বাদশতম মাস হয়। মুসলমানেরাও রোমানদের দেখা দেখি ২ মাস বৃদ্ধি করিয়াছিল। পূর্ব্বে যখন দশ মাসে বৎসর হইত তখন মুসলমানদের দুইটি মাসের নাম রবি ও জমাদি ছিল। পরে দুই মাস বৃদ্ধি করার জন্য তাহারা উক্ত নামে দুই দুই মাস গণনার নিয়ম করিল। যেমন জমাদিয়ল আউয়ল (অর্থাৎ প্রথম জমাদি), জমাদি অস্‌সানি (দ্বিতীয় জমাদি মাস), রবিয়ল্‌ আউয়ল (প্রথম রবি মাস) এবং রবি অস্‌সানি (দ্বিতীয় রবি মাস)। এইরূপে দ্বাদশ মাস পূরণ হইল বটে, কিন্তু মুসলমানেরা এখনও চান্দ্র মাস গণনা করে। তজ্জন্য প্রতি বৎসর প্রায় সাড়ে নয় দিন সৌর বৎসর অপেক্ষা কম হয়। প্রতি তিন বৎসরে এক মাস কম হয়। চান্দ্র বৎসর গণনা সহজ এজন্য হিন্দুদের মধ্যেও প্রথমে চান্দ্র বৎসর গণনা করিবার রীতি ছিল। এখনও সংবৎ গণনা চান্দ্রবৎসর অনুসারে হয়। কিন্তু প্রত্যেক তিন বৎসরান্তে ১৩ মাসে বৎসর গণনা করিয়া সৌরবৎসর সহ মিল রাখিতে হয়। সেই অতিরিক্ত মাসকে মলমাস বলে এবং তদ্দ্বারা সৌর বৎসর সহ মিল করাকে সাবন মিতি বলে।

মুসলমান ধর্ম্মের প্রথম উন্নতি সময়ে আল কেরাটী নামক মুসলমান পণ্ডিত হিন্দুদের নিকট হইতে দশ গুণোত্তর অঙ্ক স্থাপন প্রণালী, আদি গণিত, বীজ-গণিত, বীণা বাজান শিক্ষা করিয়া তাহাই মুসলমান রাজ্যসমূহে প্রচার করিয়া-ছিলেন। তিনি আদি গণিতের নাম হিন্দ্‌সা ময়যানা, বীজ গণিতের নাম হিন্দ্‌সা আল যাব্‌রা, এবং বীণার নাম সেতার রাখিয়াছিলেন। তাহাই য়ুরোপে প্রচারিত হইয়াছে।

ভারতবর্ষ হইতে রাক্ষস জাতি অতি প্রাচীন কালেই বিতাড়িত হইয়া পাতালে উপনিবিষ্ট হইয়াছিল। তাহারা আর্য্য সভ্যতার যৎকিঞ্চিৎ যাহা শিখিয়াছিল তাহাই পাতালে (আমেরিকায়) প্রচারিত হইয়াছিল।

এই সমুদায় বিষয়ে প্রমাণাদি পাওয়া যায় অন্যান্য বিষয়ে কোন স্পষ্ট প্রমাণ

সুপ্রাপ্য নহে। কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে আর্য্য সভ্যতার সাহায্য ব্যতীত কোন জাতি সভ্য হয় নাই। ধর্ম্ম-জ্ঞানও সভ্যতার এক অংশ মাত্র। জগতের এক-জন মাত্র কর্ত্তা আছেন তাঁহার অনেক অনুচর আছে এইরূপ বিশ্বাস, বোধ হয় মনুষ্যদের সৃষ্টি কাল হইতেই ছিল। কিন্তু সেই ঈশ্বর কিরূপ, তাঁহার অনুচর-দেরই বা কার্য্য এবং চরিত্র কিরূপ তৎ সম্বন্ধে মনুষ্যেরা নিজ নিজ অবস্থা ও চরিত্র দৃষ্টে ঈশ্বরকে সেই চরিত্রের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি মনে করিত। আর প্রত্যেক ভৌতিক কার্য্য ও পদার্থে অধিষ্ঠাতা দেবতাকে ঈশ্বরের অনুচর বা পারিষদ অনুমান করিয়া আপনাদের সদৃশ চরিত্রের প্রবলতর ব্যক্তি বলিয়া জ্ঞান করিত। প্রথমাবস্থায় কোন জাতীয় লোকের নিরাকার ব্রহ্মজ্ঞান ছিল না। যেমন মৃত্যুর কর্ত্তাকে আর্য্যেরা যম, গ্রীকেরা প্লুটো, ইহুদিরা গাব্রিএল (যবরেল) বলিত; অগ্নির অধিষ্ঠাতা দেবতাকে আর্য্যেরা অগ্নি, গ্রীকেরা ইগ্নিস্, রোমানেরা বল্‌কান এবং ইহুদিরা এরিএল বলিত। তাহার পর সভ্যতা বৃদ্ধি হইলে যে জাতীয় লোকেরা যে প্রকার কার্য্য ও চরিত্র সর্ব্বোৎকৃষ্ট জ্ঞান করিত তাহারা তাহাদের ঈশ্বরে সেইরূপ কার্য্য ও চরিত্র অধ্যাস করিয়াছে। আর প্রত্যেক জাতি স্ব স্ব বিবেচনা মত উপাসনা প্রণালী নির্ব্বাচন করিয়াছে। তাহাতেই ধর্ম্ম বিষয়ে পার্থক্য জন্মিয়াছে। কিন্তু অনুধাবন করিয়া দেখিলে যাবতীয় প্রাচীন সভ্য জাতির ধর্ম্মজ্ঞান যে আর্য্য জাতি হইতে গৃহীত বা অনুকৃত তাহা বুঝিতে পারা যায়। সুতরাং আর্য্য-জাতির সভ্যতার ইতিহাসকে সমস্ত পুরাতন সভ্যজাতির সমুন্নতির ইতিহাস বলা যাইতে পারে। সেই ইতিহাস সম্পূর্ণ পাইবার কোন উপায় নাই। কিন্তু যতটুক পুরাণাদি হইতে সংগ্রহ করা যায় তাহা অসম্পূর্ণ হইলেও অতিমাত্র প্রয়োজনীয় এবং উপদেশ পূর্ণ।

সর্ব্বপ্রথমে ব্রহ্মাবর্ত্তে চারিজাতীয় লোক বনমধ্যে বিচরণ করিত। এক জাতি শ্বেতবর্ণ, আর এক জাতি রক্তিমবর্ণ, তৃতীয় জাতি শ্যামবর্ণ এবং চতুর্থ জাতি কৃষ্ণবর্ণ। তাহারা সকলেই অসভ্য, মূর্খ ছিল। তাহারা কাঁচা ফল মূল বৃক্ষ পত্রাদি আহার করিত, উলঙ্গ থাকিত; নদী হ্রদ বা নির্ঝরে গিয়া জলপান করিত, ভূমিতে শয়ন করিত এবং রৌদ্র বৃষ্টি এবং শীত শরীরে সহ্য করিত। তাহাদের সকলের অবস্থা এবং কর্ম্ম বন্য পশুর ন্যায় ছিল। অবস্থা ও কর্ম্মের তুল্যতা হেতু তাহাদের মর্য্যাদার কোন ইতর বিশেষ ছিল না। প্রমাণ—

"ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ
ব্রহ্মণা পূর্ব্বং সৃষ্টং হি কর্ম্মণা বর্ণতাং গতাঃ।"

অস্যার্থ।—পূর্ব্বে ব্রহ্মা যখন সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তখন সকলই ঈশ্বরের সম্পত্তি ছিল। কোন ভূমি বা কোন দ্রব্য ব্যক্তি বিশেষের সম্পত্তি ছিল না। লোকের কর্ম্মগত ভিন্নতা না থাকায় সম্মানের কম বেশ ছিল না অর্থাৎ মান সম্ভ্রম কাহাকে বলে তাহা তাহারা জানিত না। পরে তাহাদের বুদ্ধি ও সভ্যতার উন্নতি হইল, প্রত্যেক বর্ণের কর্ম্মগত শ্রেষ্ঠতা দ্বারা মর্য্যাদার পার্থক্য হইয়াছিল। তদবধি শ্বেতবর্ণ লোক ব্রাহ্মণ, রক্তবর্ণ লোক ক্ষত্রিয়, শ্যামবর্ণ বৈশ্য এবং কৃষ্ণ-বর্ণ লোক শূদ্র হইয়াছিল।

অনেকে এই শ্লোকের এইরূপ অর্থ করেন যে, "প্রথমে সকলেই ব্রাহ্মণ ছিল পরে কর্ম্মের উচ্চনীচতা দ্বারা জাতিভেদ হইয়াছে।" এই অর্থ নিতান্ত অশুদ্ধ। বর্ণ শব্দের অর্থ শরীরের রঙ। কর্ম্ম দ্বারা সেই রঙ পরিবর্ত্তন হইতে পারে না। "বর্ণানাং" শব্দ হইতে শারীরিক বর্ণের ভিন্নতা প্রথমাবধি ছিল তাহা স্পষ্ট জানা যায়। আর "কর্ম্মণা বর্ণতাং গতঃ" এই বাক্য দ্বারা বুঝিতে হইবে যে কর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্বানুসারে মর্য্যাদার তারতম্য হইয়াছে। কর্ম্মদ্বারা গায়ের রঙ বদলাইয়া গিয়াছে এমন অর্থ হইতে পারে না, এবং সকলে এক জাতি ছিল ইহাও বুঝায় না। আর "সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ" এই বাক্যে সকলেই ব্রাহ্মণ ছিল এরূপ অর্থ কোন মতেই হইতে পারে না।

সেই বিভিন্ন বর্ণের লোকদের একবর্ণ অন্য বর্ণকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রাণী জ্ঞান করিত। তজ্জন্য বিভিন্ন বর্ণের স্ত্রী পুরুষের সংযোগ হইত না স্নুতরাং বর্ণসঙ্কর সন্তান জন্মিত না। বহুকাল পরে বেণ রাজা অশ্ব ও গর্দ্দভী যোগে খচ্চর উৎপন্ন হইতে দেখিয়া বিভিন্ন বর্ণের স্ত্রী পুরুষ সংযোগে সন্তান হয় কিনা পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তদ্রূপ বিষম যোগ সন্তান হইতে দেখিয়া বিষম যোগের আদেশ করিয়াছিলেন। তদনুসারে নানা প্রকার সঙ্কর জাতি উৎপন্ন হইয়াছে। বেণ রাজার পূর্ব্বে বিষম যোগ ও বর্ণসঙ্কর ছিল না। সন্তানেরা কেহ জনকের বর্ণ প্রাপ্ত হয়, কেহ বা জননীর বর্ণ প্রাপ্ত হয়, অপর কোন সন্তান উভয়ের মিশ্রিত বর্ণ প্রাপ্ত হয়। স্নুতরাং যত দিন বিষম যোগ ছিল না ততকাল জনক জননীর সমবর্ণত্বাৎ সমস্ত সন্তানই সেই বর্ণ প্রাপ্ত হইত। এজন্য তখন

কেবল শরীরের বর্ণ দৃষ্টে জাতি নির্ণীত হইতে পারিত।

পৃথুচরিতে ইহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। অধিকন্তু মনুসংহিতা এবং মহাভারতেও এ বিষয়ে কিছু কিছু উল্লেখ আছে।

প্রথমে বিবাহ ছিল না। নরনারী সকলেই বন মধ্যে স্বাধীন ভাবে বিচরণ করিত। সবর্ণ স্ত্রীপুরুষে সাক্ষাৎ হইলে সংযোগ হইত এবং তাহাতেই সন্তান জন্মিত। এক জননীর সন্তানেরা প্রায়শঃ এক স্থানে থাকিত। তখন জননী দ্বারাই সন্তানের পরিচয় হইত। তাহাদের জনক কোন্ ব্যক্তি তাহা প্রায়শঃ সন্তানেরা জানিত না। সুতরাং জনকের সহ কোন সম্পর্ক বা পরিচয় ছিল না।

শ্বেতবর্ণ লোকেরাই সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী ছিলেন। তাঁহারাই অন্যান্য লোকদিগের উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন। মনুষ্যেরা অন্য-প্রাণী বশীভূত ও অধীন করিবার পূর্ব্বে মনুষ্য বশ করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

এগার জন শ্বেতবর্ণ পুরুষ সমস্ত ব্রহ্মাবর্ত্ত অধিকার করিয়া প্রত্যেকের অধিকৃত ভূভাগ চিহ্নিত সীমা বিশিষ্ট করিয়াছিলেন। সেই এগার জন প্রজাপতি নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। প্রত্যেক প্রজাপতির অধিকৃত স্থানবাসী সমস্ত লোক সেই প্রজাপতির অধীন ও আজ্ঞাবহ হইয়া তাঁহার প্রজা নামে খ্যাত হইয়াছিল।

মনুষ্যেরা অন্য পশু পক্ষী অপেক্ষা গো জাতিকে সর্ব্বাগ্রে বশীভূত করিয়া পালনারম্ভ করিয়াছিল। প্রজাপতি এবং প্রজাগণ গো পালন করিতেন। এজন্য প্রত্যেক প্রজাপতির অধিকৃত স্থানকে তাঁহার গোত্র ও গোষ্ঠ বলা হইত। প্রত্যেক গোত্রবাসী লোকেরা সেই গোত্রীয় বা সেই গোষ্ঠী নামে পরিচিত হইত।

যত দিন মনুষ্যেরা প্রত্যেকে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র ছিল তত দিন তাহারা পশুবৎ নিকৃষ্ট ছিল। অধীনতা দ্বারাই তাহাদের উন্নতি হইতে আরম্ভ হইল। এখানে ইহা জ্ঞাতব্য যে হিন্দুরা দশ জন স্বাধীন লোক একত্র হইয়া কখন কোন মহৎ কার্য্য করিতে পারে নাই। যখন বহু সংখ্যক হিন্দু কোন এক ব্যক্তির আজ্ঞাধীন হইয়াছে তখন তাহারা মহৎ কার্য্য করিতে সমর্থ হইয়াছে।

প্রত্যেক প্রজাপতি নিজ অধিকৃত ভূভাগ নিজ প্রজাদের মধ্যে চিহ্নিত।

প্রধানতঃ ভ্রাতা ভগিনীতেই বিবাহ হইত। স্বজাতিয় অন্য স্ত্রী পুরুষে বিবাহ হইত। কেবল "নগচ্ছেৎ জায়িকা জাতা গমণেঃ চাতি পাতকঃ" এই সূত্র মাত্র মান্য হইত, অর্থাৎ যাহার রক্ত হইতে নিজ শরীর উৎপন্ন হইয়াছে এবং নিজের রক্ত দ্বারা যাহার শরীর উৎপন্ন হইয়াছে তৎ সঙ্গম নিষিদ্ধ ছিল। তজ্জন্য কেহ নিজ জননী বা নিজকন্যা সহ সঙ্গম করিত না। তদ্ ভিন্ন স্বজাতীয় স্ত্রী পুরুষ সঙ্গমে কোন নিষেধ ছিল না।

দক্ষ প্রজাপতি শুষ্ক কাষ্ঠ ঘর্ষণ দ্বারা অগ্নি উৎপাদন করিলেন। অমনি প্রত্যেক প্রজাপতি স্ব স্ব প্রজাদিগকে নিজ নিজ গৃহে অগ্নি রাখিতে আদেশ দিলেন। তদবধি মনুষ্যেরা অপর জন্তু হইতে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিল। মনুষ্যেরা অগ্নি সংযুক্ত কাষ্ঠের সাহায্যে সিংহ ব্যাঘ্রাদি জন্তুদিগকে তাড়াইয়া শান্তি লাভ করিল। সেই অবধি দক্ষ প্রজাপতি সকল প্রজাপতির শ্রেষ্ঠ গণ্য হইলেন। এই অবধি যাবতীয় ধর্ম্মকর্ম্মে অগ্নি সংস্থান করিতে বিধান হইল। অগ্নি প্রতিষ্ঠা ব্যতীত কোন পুণ্য কার্য্য হইত না।

প্রজাপতিদের নাম শুনিয়া অনেকের বিশ্বাস হয় যে, "একাদশ প্রজাপতি" ঠিক সেই এগারটা ব্যক্তি মাত্র। তাহা সম্পূর্ণ ভুল। দক্ষ, কশ্যপাদি এগার জন প্রথমে প্রজাপতি হইয়াছিলেন। পরে সেই নাম তাঁহাদের পদবীর নাম হইয়াছিল। যে কেহ দক্ষ প্রজাপতির পদে অভিষিক্ত হইতেন তাহাকেই দক্ষ প্রজাপতি বলা যাইত। সেইরূপ যিনি যখন কশ্যপ প্রজাপতির স্থলাভিষিক্ত হইতেন তিনিই কশ্যপ প্রজাপতি বলিয়া আখ্যাত হইতেন। একই দক্ষ, একই কশ্যপ, একই অত্রি প্রভৃতি যে চিরকাল থাকিতে পারে না ইহা সহজেই বুঝা যায়। পরন্তু কাশীতে বাপুদেব শাস্ত্রী, দক্ষিণের দয়ানন্দ সরস্বতী, ভাস্করানন্দ স্বামী, নেপালের পণ্ডিত কাশীনাথ বলিয়াছেন যে, "প্রজাপতিদের যে নাম পাওয়া যায় তাহা প্রথমে এক এক ব্যক্তির নাম ছিল পরে পদবীগত নাম হইয়াছিল।" কিন্তু বাঙ্গালী পণ্ডিতবর্গের মধ্যে অনেকের বিশ্বাস যে "সেই একমাত্র দক্ষ কশ্যপাদি যুগযুগান্তর ব্যাপিয়া জীবিত ছিলেন। তাঁহারা কলিকালে অদৃশ্য হইয়াছেন। মহাদেবের কোপে দক্ষ নির্ব্বংশ হইয়াছেন। অন্যান্য প্রজাপতিরা অদৃশ্য ভাবে এখনও বিদ্যমান আছেন।" বাঙ্গালী পণ্ডিতদের এই বিশ্বাস সঙ্গত বোধ হয় না।

প্রজাপতিরা দেখিলেন যে, ভাই ভগ্নীতে বিবাহ হইলে ভিন্ন গোত্রীয় লোক সহ পরিচয় এবং আত্মীয়তা থাকে না। অধিকন্তু সঙ্গম সুলভ হওয়াতে অতি অল্প বয়সেই স্ত্রী পুরুষ সংযোগ আরম্ভ হইয়া তাহাদের তেজঃ ক্ষয় হয়। এজন্য তাঁহারা নিয়ম করিলেন যে, "একই গোত্রীয় স্ত্রী পুরুষের বিবাহ হইবে না। বিবাহ গোত্রান্তরে দিতে হইবে। পত্নী স্বামীর গৃহ-বাসিনী হইয়া তদ্ গোত্রীয় হইবে। পরন্তু মাতৃগোত্রে, পিতার মাতৃগোত্রে মাতার মাতৃগোত্রে বিবাহ হইতে পারিবে বটে, কিন্তু নৈকট্য কতিপয় পুরুষ ত্যাগ করিতে হইবে। ইহা মনে রাখা উচিত যে, তখন সগোত্র বলিলে এক স্থানবাসী বুঝাইত। এখন যেমন একই গ্রামে বিভিন্ন গোত্রীয় লোক বাস করে তখন তাহা ছিল না।

প্রজার সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে, প্রজাপতিগণ তাহাদের নিকট যে পরিমাণ খাদ্য দ্রব্য পাইতেন তাহা তাঁহাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত হইত। তাঁহারা সেই উদ্বৃত্ত দ্রব্য আর্ত্ত প্রজাদিগকে দিলেন। ইহা হইতে দয়া এবং দানধর্ম্ম সৃষ্ট হইল।

প্রজাপতিরা দূরবর্ত্তী প্রজাকে ডাকিতে কিংবা অন্য কোন কার্য্য করিতে কোন প্রজাকে নিযুক্ত করিলে তাহাকেও নিজের উদ্বৃত্ত খাদ্য দিতেন। তাহা হইতেই বেতন ও ভৃত্যভাব সৃষ্ট হইল।

প্রজাপতিরা সকল বিষয়েই প্রজাদের উপর কর্ত্তা ছিলেন। তাঁহারাই রাজা, ধর্ম্মগুরু, শিক্ষক, রক্ষক, বিচারক, প্রতিপালক এবং রোগের চিকিৎসক ছিলেন। তাঁহারা প্রজাদের হিতার্থ তপস্যা করিতেন অর্থাৎ উন্নতিকর বিষয়ে চিন্তা করিতেন এবং যে কিছু উপায় উদ্ভাবন করিতেন তাহা প্রজা-দিগকে শিক্ষা দিতেন। তাঁহারাই গৃহনির্ম্মাণ, মৃত্তিকার বাসন গঠন, অস্ত্র চালনা, উটজ এবং পশম ও চর্ম্ম দ্বারা বস্ত্র ও শয্যা নির্ম্মাণ প্রণালী উদ্ভাবন করিয়া প্রজাদিগকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। তাঁহারা গ্রাম ও সমাজ স্থাপন করিয়াছিলেন এবং সেই সমাজ রক্ষার জন্য নিয়মাবলী প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহারা প্রজাদের মনে ধর্ম্ম জ্ঞান সঞ্চার করিয়া উপাসনার রীতি প্রচলিত করিয়াছিলেন। তাঁহারা সোমলতা হইতে রস চোয়াইয়া সুরা তৈয়ারী করিয়াছিলেন।

প্রজাপতিদের শাসন থাকিতেই লেখা পড়ার চর্চ্চা আরম্ভ হইয়াছিল। কিন্তু যথোচিত উন্নতি প্রাপ্ত হয় নাই। একাক্ষরী অভিধান দৃষ্টে অনুমান হয় যে, চীন ভাষার ন্যায় সংস্কৃতেও প্রথমে শব্দমূলা ভাষা ছিল অর্থাৎ এক একটী শব্দের পরিবর্ত্তে এক একটি চিহ্ন ব্যবহৃত হইত। অক্ষর ও বর্ণ পরে উদ্ভাবিত হইয়াছিল। পরবর্ত্তী কালে স্বায়ম্ভুব মনু কৃত ব্যবস্থাগুলিকে মনুর বচন এবং স্মৃতি বলে। তাহা হইতে অনুমান হয় যে, সেই মনুর সময়েও লেখা পড়ার অবস্থা এতদূর উন্নত হয় নাই যে মনুর ব্যবস্থাগুলি যথারীতি লিপিবদ্ধ হইতে পারে।

প্রজাপতিদিগের কৃত নিয়মাবলীকে প্রজাপতি-সূত্র বলে। সেইগুলিই মানবজাতির প্রাচীনতম আইন। প্রজাপতি-সূত্র নেপালে পাওয়া যাইতে পারে। আমরা যতদূর অনুসন্ধান করিয়াছি তাহাতে আমাদের বিশ্বাস এই যে অন্য কুত্রাপি প্রজাপতি-সূত্র বিদ্যমান নাই।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে প্রজাপতিদিগের মধ্যে দক্ষ সর্ব্বপ্রধান ছিলেন। মহাদেবকে অবজ্ঞা করায় দক্ষ প্রজাপতির বংশ ধ্বংস হইয়াছে। অবশিষ্ট দশ প্রজাপতির সন্তান হইতে দশটি গোত্র ব্রাহ্মণ হইয়াছিল। সেই মূল দশ গোত্র আবার শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হইয়াছে।

বংশরক্ষার্থ মর্ত্ত্য-প্রাণীদের সন্তান হয়। অমর দেবদেবীর সংযোগ আছে, কিন্তু তাহাতে কোন সন্তান হয় না। মর্ত্ত্যলোকসহ দেবদেবীর সংযোগে সন্তান হইলে সেই সন্তান মৃত্যুর অধীন হয় এবং সে মর্ত্ত্য উৎপাদকের জাতি প্রাপ্ত হয়। যেমন দেবতার ঔরসে ব্রাহ্মণীগর্ভজাত সন্তান ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়গর্ভজাত ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যাগর্ভজাত সন্তান বৈশ্য হয়। দেবী গর্ভে ব্রাহ্মণের ঔরস-জাত সন্তান ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় জাত সন্তান ক্ষত্রিয় হইয়াছে। দেবীসহ বৈশ্য-শূদ্র সংযোগ নাই এবং শূদ্রানীসহ দেবসংযোগ নাই সুতরাং তাদৃশ অপকর্ষণ জাত সন্তানও নাই। সবর্ণ অর্থাৎ সূর্য্যদেবের ঔরসে ব্রাহ্মণী গর্ভে সাবর্ণি মুনির জন্ম হয়। তিনি অষ্টম মনু নামে বিখ্যাত। তাঁহার সন্তানেরা সাবর্ণি গোত্রীয় ব্রাহ্মণ।

ক্ষত্রিয় রাজা কুশিকের পুত্র বিশ্বামিত্র তপস্যা দ্বারা ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু ব্রাহ্মণের যাজকতা করিতে তদ্বংশীয়দের অধিকার নাই। বিশ্বামিত্রের সন্তানেরা কৌশিক গোত্র।

এইরূপে পূর্ব্বোল্লিখিত দ্বাদশগোত্রীয় ব্রাহ্মণ আবার অনেক শাখায় বিভক্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু উক্ত দ্বাদশগোত্রীয় ব্রাহ্মণেরাই বিশুদ্ধ দ্বিজ। স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র ভৃগু পূর্ব্বোক্ত ভৃগুপ্রজাপতির পদবী লাভ করায় তদ্বংশীয়েরাও ভার্গব বলিয়া গণ্য।

এতদ্ভিন্ন তীর্থ ব্রাহ্মণ অনেক আছে। তাহারা নিজ নিজ অধিষ্ঠিত তীর্থে সর্ব্বলোক গুরু। সুব্রাহ্মণেরাও সেই তীর্থে তাহাদিগকে "তীর্থগুরু-ব্রাহ্মণায় নমঃ" বলিয়া নমস্কার করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু সেই সেই তীর্থের বাহিরে তাহারা ব্রাহ্মণ মধ্যে গণ্য নহে। ইহাদের মধ্যে মথুরার সনাঢ্য ব্রাহ্মণ এবং গয়ায় গয়ালী ব্রাহ্মণগণই বিশেষ প্রসিদ্ধ।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে প্রজাপতিদিগের কর্ত্তব্যকার্য্য অত্যন্ত অধিক ছিল। যখন তাঁহাদের প্রজাসংখ্যা অত্যন্ত অধিক হইল, তখন তাঁহারা দেখিলেন যে তাদৃশ সমস্ত কর্ত্তব্য পালন করা অসাধ্য। তজ্জন্য তাঁহারা রাজ্যশাসন এবং ধর্ম্মশাসন পৃথক্ করিয়া রাজ্যশাসনভার ক্ষত্রিয়দিগকে দিয়া কেবল ধর্ম্মশাসনাদি কার্য্য আপনাদের হাতে রাখা ধার্য্য করিলেন। কিন্তু প্রজাপতি কশ্যপ তাহাতে সম্মত হইলেন না। তিনি কহিলেন, ক্ষত্রিয়েরা শাসন ভার লাভ করিলে পরে তাহারা নিতান্ত গর্ব্বিত এবং অত্যাচারী হইবে। তখন ব্রাহ্মণসহ তাহাদের সর্ব্বদা বিবাদ বিসংবাদ হইবে। অতএব সর্ব্ব-বিষয়ে ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য রক্ষা করাই কর্ত্তব্য। অন্যান্য প্রজাপতিদের অবধারণ ক্রমে ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ বেণ প্রজাশাসন ভার প্রাপ্ত হইলেন। বেণ প্রথমতঃ সর্ব্বলোকের মনোরঞ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তজ্জন্য তাঁহার "রাজন" উপাধি হইয়াছিল।

প্রজাপতি কশ্যপ ক্ষত্রিয়ের অধীন হইতে অনিচ্ছু হইয়া নিজ অনুগামী-গণসহ হিমাচলগর্ভে সতীহ্রদ মধ্যস্থিত দ্বীপে গিয়া বাস করিয়াছিলেন। সেই স্থান পরে কাশ্মীর নামে খ্যাত হইয়াছে। কাশ্মীরে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য জাতীয় লোকের বসতী ছিল না। সেই জন্য কাশ্মীরে সমস্ত ব্যবসায় ব্রাহ্মণেরা করিত। কাশ্মীরের ধোবা, নাপিত, কামার, কুম্ভকার সকলেই ব্রাহ্মণ ছিল।

বেণ রাজা অশ্ব ও গর্দ্দভীযোগে খচ্চর জন্মিতে দেখিয়া অনুমান করিলেন যে বিভিন্ন বর্ণের নরনারী সংযোগে সন্তান হইতে পারে। তিনি বৈশ্যানী

সহ শূদ্রের এবং শূদ্রানীসহ বৈশ্যের সংযোগ করাইয়া জানিতে পারিলেন যে তাদৃশ বিষমযোগে সন্তান হইতে পারে এবং সেই বিষমযোগে সুখ ভিন্ন অসুখ হয় না। তদবধি তিনি বিষমযোগ বিধিসিদ্ধ করিলেন। প্রজাপতি-গণ তাঁহাকে তাদৃশ বিধান প্রত্যাহার করিতে বলিলেন। বেণ তাহা গ্রাহ্য করিলেন না। পালে পালে বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হইল। তাহারা কেহ জনকের বর্ণ পাইল, কেহ জননীর বর্ণ পাইল, আর কেহ বা উভয়ের মিশ্রিত বর্ণ পাইল। তদবধি ভারতবর্ষে নানাবর্ণের লোক হইল। পূর্ব্বে যেমন শরীরের বর্ণ দেখিয়া জাতি পরিচয় হইত এখন তাহা অসাধ্য হইল। আর্য্য অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ প্রজাপতিগণের আদেশে বেণ রাজাকে হত্যা করিয়া তৎপুত্র পৃথুকে রাজা করিলেন। মূল চারি জাতি এবং আটটি সঙ্কর জাতি লইয়া হিন্দুদের বার জাতি হইল। তাহাদের জীবিকা নির্ব্বাহ জন্য প্রজাপতিগণ প্রত্যেক জাতির ব্যবসায় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। রাজা পৃথু সর্ব্বগুণান্বিত ছিলেন। তাঁহার রাজত্ব মগধের পশ্চিম হইতে গান্ধার দেশ পর্য্যন্ত এবং উত্তর দক্ষিণে হিমালয় হইতে নর্ম্মদা নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। তাঁহার সাম্রাজ্য আর্য্যাবর্ত্ত নামে খ্যাত হইয়াছিল। তিনি নিজ রাজ্যের মধ্যে অবস্থিত অধিকাংশ পাহাড় চূর্ণ করিয়া সমভূমি করত সমস্ত স্থান কৃষিক্ষেত্রে পরিণত করিয়াছিলেন। দৈত্য, দানব ও রাক্ষসেরা তাঁহার ভয়ে দূরে পলায়ন করিয়াছিল। তিনি পাহাড় চূর্ণ করিতে নানা প্রকার মণি মাণিক্য এবং স্বর্ণ রৌপ্যাদি ধাতু পাইয়া অতিশয় ধনী হইয়াছিলেন। তিনি বিষম যোগ মধ্যে অনুলোম সংযোগ প্রশুদ্ধ রাখিয়া প্রতিলোম সংযোগ রহিত করিয়াছিলেন। তিনি নগর গ্রাম প্রভৃতি স্থাপন করিয়াছিলেন এবং তিনি সুপন্থা নির্ম্মাণ করিয়া তৎসমুদায়ে যাতায়াতের সুবিধা করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি প্রত্যেক গ্রামে ও নগরে লোকদের ব্যবসায় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। কেহ সেই ব্যবসায়ের ব্যভিচার করিলে দণ্ডিত হইত। তাঁহার কোন প্রজা নিরন্ন পরপ্রত্যাশী ছিল না। তিনি ধার্ম্মিক এবং যাগযজ্ঞপরায়ণ ছিলেন। তাঁহার রাজ্যে যথাকালে বৃষ্টি হইত। তাঁহার রাজ্যে দুর্ভিক্ষ, মহামারী বা অকাল মৃত্যু ছিল না। তিনি চৌদ্দযুগ (১৬৮ বৎসর) রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম

হইতেই অবনিমণ্ডলের নাম পৃথিবী হইয়াছে, রাজাগণের উপাধি পার্থিব হইয়াছে। এখন পর্য্যন্ত রাজাদের অভিষেকের পূর্ব্বে পৃথুচরিত শুনান হইয়া থাকে। পৃথু হিন্দু রাজগণের আদর্শ চরিত্র।

পুরুষেরা নানা কারণে প্রবাস গমনে বাধ্য হয়। তথায় তাহারা পত্নী সঙ্গে লইয়া যাইতে পারে না কিন্তু কাম প্রবৃত্তি তাহাদের সঙ্গেই থাকে। যতদিন সতীত্ব ধর্ম্ম ছিল না ততদিন বেশ্যাবৃত্তির প্রয়োজন ছিল না। সতীত্ব ধর্ম্ম স্থাপিত হইলে বেশ্যা প্রয়োজনীয় হইল। পৃথু রাজার রাজত্ব কালেই সর্ব্ব প্রথমে বারবনিতা বারজাতির স্ত্রী অর্থাৎ বেশ্যা শব্দ দেখা যায়। তাহা হইতে অনুমান হয় যে পৃথু রাজার রাজত্ব কালেই বেশ্যা-বৃত্তি সৃষ্টি হইয়াছিল।

প্রজাপতিদের সময়ে দ্রব্য বিনিময়ে দ্রব্য লইতে হইত। অবশেষে কপর্দ্দক অর্থাৎ কৌড়ী দ্বারা ক্রয় বিক্রয়ও চলিত হইয়াছিল। পৃথু রাজা প্রচুর ধাতু রত্নাদি পাহাড় চূর্ণ করিতে পাইয়াছিলেন। তিনি ধাতু গলাইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহাই ভৃত্যদের বেতন স্বরূপে দিতেন, যজ্ঞে তাহাই ঋত্বিকগণকে দিতেন এবং সেই ধাতু খণ্ডকেই বিনিময়ের মূল্যরূপে ধার্য্য করিয়াছিলেন। সেই সময়ে রৌপ্য খণ্ডকে দ্রবিন এবং স্বর্ণ খণ্ডকে নিষ্ক বলিত। তাহাতে "পৃথু" এই শব্দটি অঙ্কিত থাকিত। ইহাই হিন্দুদের আদিম মুদ্রা।

অতঃপর পৃথুর উত্তরাধিকারীরা রাজা হইয়া রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। শাস্ত্রকার মনু মানব ধর্ম্ম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ব্যবস্থা করিলেন। রাজা প্রজা সকলেই সেই ব্যবস্থা মত কার্য্য করিতে লাগিল। কোন বিষয়ে সংশয় হইলে কোন বিজ্ঞ ধার্ম্মিক ব্যক্তিকে "মনু" রূপে বরণ করা হইত। প্রজাপতিরা সকলেই ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহাদের মোট সংখ্যা কত এক্ষণে তাহা নির্ণয় করা যায় না। মনুদিগের মোট সংখ্যা চৌদ্দটি। তন্মধ্যে প্রথম স্বায়ম্ভুব মনু এবং সপ্তম বৈবস্বত মনু দেবতা ছিলেন। অবশিষ্ট ১২ জন মনু ব্রাহ্মণ ছিলেন। স্বায়ম্ভুব মনু ব্রাহ্মণ কন্যা বিবাহ করায় তৎসন্তানেরা ব্রাহ্মণ, এবং বৈবস্বত মনু ক্ষত্রিয় কন্যা বিবাহ করায় তৎসন্তানেরা ক্ষত্রিয় হইয়াছিল। বৈবস্বত মনুর পুত্র ইক্ষাকু হইতে সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রকুল

উৎপন্ন হইয়াছে। বৈবস্বতের কন্যা ইলার সন্তানেরা চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়।

বৈবস্বত মনুর রাজ্যের নাম কোশল দেশ। তাহা গঙ্গা যমুনার উভয় পার্শ্বে বিস্তৃত ছিল। বৈবস্বতের মৃত্যুকালে ইক্ষ্বাকু অজ্ঞাত স্থানে তপস্যা করিতে ছিলেন। তাঁহাকে মৃত জ্ঞান করিয়া ইলা রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া চন্দ্রতনয় বুধের সহ বিবাহিতা হইয়াছিলেন। তাহার পর ইক্ষ্বাকু উপস্থিত হইলে তাঁহার সহ বুধের বিবাদের উপক্রম হইল। পুরোহিত বশিষ্টদেব মধ্যস্থ হইয়া উত্তর কোশল অর্থাৎ গঙ্গার উত্তরবর্ত্তী অংশ ইক্ষ্বাকুকে দিলেন। অযোধ্যা তাঁহার রাজধানী হইল। দক্ষিণ কোশল ইলাকে দিলেন। প্রয়াগে তাঁহার রাজধানী হইয়াছিল।

সূর্য্যবংশ ও চন্দ্রবংশ স্থাপিত হইলে রাজশাসন সর্ব্বত্র প্রচলিত হইল। প্রজাপতি ও মনুর পদবী রহিত হইল।

যদিও পৃথুরাজা অনুলোম বিবাহ বিশুদ্ধ বলিয়া ধার্য্য করিয়া ছিলেন, তথাপি তাদৃশ বিবাহের সন্তানেরা জনক ও জননীর মধ্যবর্ত্তী জাতি প্রাপ্ত হইত। কিন্তু ত্রেতাযুগে ক্ষত্রিয়েরা অতিশয় প্রবল হইয়া সেই বিধি লঙ্ঘন করিতে লাগিল। ক্ষত্রিয়গণ বৈশ্য, শূদ্র, অসুর, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি যে কোন জাতীয়া কন্যা বিবাহ করিত, তাহাদের সকল সন্তানই বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় হইত। তজ্জন্য ক্ষত্রিয় জাতি মধ্যেও নানা বর্ণের লোক হইল।

বহুকাল পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণদের বর্ণ ব্যত্যয় ঘটে নাই। অবশেষে অযোধ্যার সূর্য্যবংশীয় রাজারা বহুকাল যাবৎ সমস্ত ক্ষত্রিয়ের শ্রেষ্ঠ ছিল। তাহারা নানা জাতীয়া কন্যা বিবাহ করিয়া নানা বর্ণের সন্তান জন্মাইত। কিন্তু তাহারা কোন কন্যা ক্ষত্রিয় সহ বিবাহ দিত না। তাহাদের সমস্ত কন্যাই ব্রাহ্মণ সহ বিবাহিতা হইত। আবার অযোধ্যাধিপতির সম্মান রক্ষার্থ সেই কন্যাদের সন্তানেরা বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ হইত। মহারাজ মান্ধাতার কন্যা অঙ্গা কৃষ্ণবর্ণা ছিলেন। ভৃগুবংশীয় সানন্দ মুনির সহ তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। তাঁহার পুত্র ঋচীক কৃষ্ণবর্ণ ছিলেন। ভৃগু তাঁহার উপনয়ন দিতে অন্যান্য বিপ্রেরা আপত্তি করিলেন যে "কৃষ্ণবর্ণ কথং দ্বিজঃ" অর্থাৎ এই কালবর্ণ বালক কিরূপে ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য হইবে। রাজ পুরোহিত বশিষ্টদেব বলিলেন যে, "যখন ক্ষত্রবীর্য্যে জাত সন্তান যে কোন বর্ণ হউক গুণবান হইলে সকলেই ক্ষত্রিয় বলিয়া গণ্য হয়

তখন ব্রহ্মবীর্য্যে সমুৎপন্ন সন্তান গুণবান হইলে অবশ্যই ব্রাহ্মণ হইতে পারে।" তখন মান্ধাতা, বশিষ্ট ও ভৃগুর অনুরোধে এই বিধান হইল যে "ব্রহ্মবীর্য্যে উৎপন্ন সন্তান, যে কোন বর্ণ হউক এবং যে কোন জাতীয়া জননীর গর্ভজাত হউক, গুণবান্ হইলেই ব্রাহ্মণ হইতে পারিবে। অথচ ব্রাহ্মণের ঔরসে না হইলে কেহ যত কেন গুণবান্ হউক না সে ব্রাহ্মণ হইবে না। কিন্তু দেবতার শ্রেষ্টত্ব হেতু দেবতার ঔরসে ব্রাহ্মণী গর্ভজাত সন্তান সুব্রাহ্মণ হইবে।" সেই বিধান মতে ক্ষত্রিয়া গর্ভজাত ঋচীক ব্রাহ্মণ হইলেন। শূদ্রানী গর্ভজাত ব্যাসদেবও বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। এইরূপে ব্রাহ্মণ মধ্যেও নানা বর্ণ লোক হইল। তদবধি বর্ণদৃষ্টে জাতি নির্ণয় হইত না। কিন্তু কাশ্মীরে অনুলোম বিবাহ প্রচলিত হয় নাই। কাশ্মীরে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য জাতি না থাকায় সেখানে বর্ণ ব্যত্যয় হয় নাই। কাশ্মীরী ব্রাহ্মণদের যে বর্ণ এখন আছে তাহাই সমস্ত ব্রাহ্মণদের আদিম বর্ণ।

বাঙ্গালার

সামাজিক ইতিহাস।

প্রথম অধ্যায়।

বাঙ্গালা দেশ।—বাঙ্গালা দেশের লোক বাঙ্গালী।—বাঙ্গালা ভাষা।—বাঙ্গালা দেশে ক্ষত্রিয় না থাকার হেতু।—পাষণ্ডদলন।—করদরাজ্য।—গৌড়ীয় পঞ্চরাজ্য।

বাঙ্গালা দেশ।

হিন্দুরাজত্বকালে সমস্ত বাঙ্গালাদেশ একটি মাত্র দেশ বলিয়া গণ্য ছিল না এবং তাহার একত্রীকৃত কোন নামও ছিল না। গৌড়নগরের বৈদ্যরাজগণ ক্রমশঃ বরেন্দ্রভূমি, বঙ্গ, মিথিলা, রাঢ় এবং বকদ্বীপ (বগ্‌দি) এই পাঁচটি রাজ্য অধিকার করিয়া সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিয়াছিলেন। তদবধি ঐ পাঁচটি রাজ্য গৌড়ীয় পঞ্চরাজ্য নামে উক্ত হইত। মুসলমানেরা সেই পঞ্চরাজ্য অধিকার করিয়া, মগধ ও মিথিলা দেশ একত্র করিয়া সুবে বেহার, এবং অবশিষ্ট চারিটি দ্বারা সুবে বাঙ্গালা গঠিত করিয়াছিলেন। সেই "বাঙ্গালা" শব্দ হইতেই বাঙ্গালা দেশ নামকরণ হইয়াছে। তাহার পর সেই বাঙ্গালা দেশের উত্তর ও পূর্ব্বদিকে যে সকল স্থান বাঙ্গালা দেশের শাসনকর্ত্তার অধীন হইয়াছে, তাহাও বাঙ্গালা দেশের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। এইরূপে বাঙ্গালা দেশ একটি বিস্তীর্ণ দেশ হইয়াছে।

বর্ত্তমান বাঙ্গালা দেশের উত্তরে শিকিম ও ভোটান; পূর্ব্বে আসাম, মনিপুর পাহাড় ও ব্রহ্মদেশ; দক্ষিণে আরাকান, বঙ্গোপসাগর এবং উড়িষ্যা; পশ্চিমে ছোট নাগপুর ও বেহার প্রদেশ। ইহার পূর্ব্ব পশ্চিমে দৈর্ঘ্য গড়ে ২০৪ ক্রোশ

এবং প্রস্থ উত্তর দক্ষিণে গড়ে ১৮২ ক্রোশ; অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ছয় কোটি। ইহার পূর্ব্ব প্রান্ত পাহাড় ও জঙ্গলময়; পশ্চিম দক্ষিণ প্রান্তেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড় দেখা যায় কিন্তু তাহাতে কোন নিবিড় জঙ্গল নাই। আবার ইহার পূর্ব্ব দক্ষিণ প্রান্তে সুন্দরবন নামে ভয়ানক ব্যাঘ্রসর্পসঙ্কুল নিবিড় জঙ্গল। কিন্তু তাহাতে কোন পাহাড় পর্ব্বত নাই। সমস্ত মধ্যভাগ প্রকাণ্ড উর্ব্বর সমতল ক্ষেত্র। তাহাই প্রকৃত বাঙ্গালা দেশ।

বাঙ্গালা দেশের লোক বাঙ্গালী।

দেশভেদে প্রাণিভেদ দেখা যায়। এক এক দেশে এরূপ কতপ্রকার প্রাণী আছে, যাহা অন্য কোন দেশেই নাই। তদ্দারা জানা যায় যে, ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন প্রাণী উৎপন্ন হইয়াছে, সর্ব্বপ্রকার প্রাণী একদেশে উৎপন্ন হয় নাই। আবার ইহাও দেখা যায় যে, একপ্রকার প্রাণী অন্যপ্রকার প্রাণিদিগকে ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করে। ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, ভক্ষ্যপ্রাণিদের সংখ্যা প্রচুর বৃদ্ধি হইলে পর, ভক্ষকপ্রাণিগণের সৃষ্টি হইয়াছে; কেননা, ভক্ষ্য এবং ভক্ষক যদি একই কালে উৎপন্ন হইত, তবে ভক্ষকগণ ভক্ষ্য-প্রাণিদিগকে খাইয়া নিঃশেষ করিত, নতুবা নিজেরাই অনাহারে মরিত। অতএব ইহা সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, সমস্ত প্রাণী এক সময়ে বা একদেশে উৎপন্ন হয় নাই। মনুষ্য সম্বন্ধেও ঠিক তদ্রূপ অনুমান যুক্তি ও শাস্ত্রসঙ্গত। যেমন সিংহ, ব্যাঘ্র, গো, মহিষ, শূকর ও কুক্কুরাদি কতকগুলি প্রাণীর সাধারণ নাম পশু; আর পক্ষ-বিশিষ্ট কাক, বক, হাড়গিলা, চড়ুই প্রভৃতি কতকগুলি প্রাণীর সাধারণ নাম পক্ষী; তদ্রূপ হস্তপদবিশিষ্ট কতকগুলি প্রাণীর সাধারণ নাম মনুষ্য। তাহারা এক আদিপুরুষের সন্তান নহে এবং তাহারা এক দেশে বা এক সময়ে সৃষ্ট হয় নাই। বিভিন্নপ্রকার পশুপক্ষীদের আকৃতি, প্রকৃতি ও বর্ণের যতদূর বিভিন্নতা, বিভিন্নজাতীয় মনুষ্যের বিভিন্নতা তদ্রূপ বা ততধিক। একজাতীয় মনুষ্য অন্য-জাতীয় মনুষ্যের মাংস ভক্ষণ করিত। সভ্যতা-বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে তাদৃশ ব্যবহার হ্রাস হইয়াছে বটে, কিন্তু এখনও সম্পূর্ণ তিরোহিত হয় নাই! অতএব সমস্ত মনুষ্যজাতিকে এক আদিম মানব-দম্পতির সন্তান বলিয়া অনুমান করা যুক্তি, প্রমাণ এবং হিন্দুশাস্ত্র-বিরুদ্ধ। বাগ্‌দি, পোদ, গারো, কুকি প্রভৃতি জাতি বোধ হয় বাঙ্গালা দেশেই সৃষ্ট হইয়াছিল। তাহারা অন্য স্থান হইতে আসিয়া এদেশে

বাস করিতেছে, এরূপ কোন প্রবাদ বা প্রমাণ নাই। পক্ষান্তরে, অন্যান্য অনেক জাতীয় লোক যে, বিভিন্ন সময়ে স্থানান্তর হইতে এদেশে আসিয়া বাস করিয়াছে, তাহার প্রমাণ বা কিংবদন্তী পাওয়া যায়। যাহারা দীর্ঘকাল যাবৎ বাঙ্গালাদেশে বাস করিয়া বাঙ্গালা ভাষা ব্যবহার করিতেছে, তাহাদের জাতি ও ধর্ম্মগত পার্থক্য সত্বেও একটি সাধারণ নাম "বাঙ্গালী" হইয়াছে।

য়ুরোপীয়েরা অনুমান করেন যে, গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রনদ-প্রবাহিত মৃত্তিকা দ্বারা বাঙ্গালা দেশের দক্ষিণ ভাগ নূতন উৎপন্ন হইয়াছে। সেই অনুমান প্রকৃত বলিয়া বোধ হয় না। কেননা কালীঘাট পীঠস্থানের নাম অতি প্রাচীন শৈবপুরাণে দেখিতে পাওয়া যায়। বরং অনুমান হয় যে, গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, মহানদী, গোদাবরী, কাবেরী, ঐরাবতী প্রভৃতি নদীর স্রোতে মহাদেশের কতক ভূমি ভগ্ন হইয়া বঙ্গোপসাগর উৎপন্ন হইয়াছে। সেই সকল মৃত্তিকা সমুদ্রে চালিত হইয়া স্থানান্তরে দ্বীপ উৎপন্ন হইয়াছে। এই অনুমান যে যুক্তিসঙ্গত, তাহা অন্যান্য বৃহৎ নদীর মোহনার প্রতি দৃষ্টি করিলেই বোধগম্য হয়। নর্ম্মদা নদীর মুখে খাম্বাজ উপসাগর হইয়াছে, ইউফ্রেটিস নদীর মুখে পারস্য উপসাগর হইয়াছে এবং মীনাম ও মেকিয়াং নদী দ্বারা শ্যাম উপসাগর হইয়াছে। এইরূপ প্রত্যেক বেগবতী নদীর মুখে এক একটি ছোট বড় উপসাগর হইয়াছে। নদীর এক স্থান ভাঙ্গে, এবং সেই মাটির দ্বারা অন্য স্থানে চড়া পড়ে। সুতরাং নদী দ্বারা অতি অল্পই মৃত্তিকা সাগরসঙ্গমে নীত হয়। তদ্দ্বারা কোন প্রকাণ্ড ভূখণ্ড উৎপন্ন হয় না। যদি নদীর বালুকা দ্বারা দেশের সীমা বৃদ্ধি হইত। তবে হোয়াংহো, ইয়াংসিকিয়াং নদ দ্বারা চীনের সীমা বৃদ্ধি হইত। নীল নদ, আমেজন, মিসিসিপী প্রভৃতি নদ নদী দ্বারাও অনেক দেশ উৎপন্ন হইত। কিন্তু সর্ব্বত্রই যখন নদীর মোহনায় ভূভাগ বৃদ্ধি না হইয়া বরং সাগরের সীমাই বৃদ্ধি হয়, তখন নদীসমূহের বেগে বঙ্গোপসাগর উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া অনুমান করাই সমধিক সঙ্গত। ভারতবর্ষ অতি প্রাচীন দেশ, ইহার প্রত্যেক স্থানের অবস্থা বারংবার পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এখন যেখানে নিবিড় অরণ্য, পূর্ব্বে কোন সময়ে তথায় মহাসমৃদ্ধ নগর ছিল, তাহার প্রমাণও পাওয়া যায়। সুন্দরবনের স্থানে স্থানেও তদ্রূপ প্রাচীন পুরীর ভগ্নাবশেষ পরিলক্ষিত হয়। তজ্জন্য অনুমান হয় যে, ঐ সকল স্থানেও পূর্ব্বে জনপদ ছিল; পরে মগ ও পর্টুগিজদের দৌরাত্মে ঐ

স্থানের অধিবাসিবর্গ স্থানান্তর যাওয়াতে, তদবধি ঐ স্থান জঙ্গলে পরিণত হইয়াছে। ভাগীরথীর সাগরসঙ্গমস্থলে কোন জঙ্গল থাকার বিষয় রামায়ণে উল্লেখ নাই। সুতরাং সুন্দর জনপদ যে দস্যুপীড়নে অধুনা অরণ্যে পরিণত হইয়াছে, ইহাই বিশ্বাসযোগ্য।

বাঙ্গালা ভাষা।

আর্য্যজাতির সংস্কৃত ভাষা কোন কালেই কোন দেশের সাধারণ কথ্য ভাষা ছিল না। সাধারণ কথোপকথন প্রাকৃত ভাষায় হইত। প্রাকৃত ভাষা সংস্কৃতের অপভ্রংশ মাত্র। লিখন পঠনাদি কার্য্যে সংস্কৃত ভাষা ব্যবহৃত হইত। তাহা সমস্ত আর্য্যজাতির মধ্যে একবিধ ছিল। কিন্তু প্রাকৃত ভাষা সর্ব্বত্র একবিধ ছিল না। প্রত্যেক প্রদেশের প্রাকৃত ভাষা অন্য-ত্রের প্রাকৃত ভাষা হইতে কিছু কিছু বিভিন্ন ছিল। প্রত্যেক প্রদেশের নামানুসারে সেই সকল প্রাকৃত ভাষার নামকরণ হইত। বাঙ্গালা দেশ মধ্যে বারেন্দ্রী বা গৌড়ীয় ভাষা বারেন্দ্র ভূমি ও রাঢ় প্রদেশে প্রচলিত ছিল।

বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুদয়ের সময়ে মগধ দেশে শূদ্র-সাম্রাজ্য ছিল। সেই শূদ্র সম্রাট্‌গণ দেখিলেন যে, বৌদ্ধধর্ম্মে জাতিভেদ নাই। বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত হইলে জাতিভেদ উঠিয়া যাইবে। জাতিভেদ উঠিয়া গেলে শূদ্র সম্রাট্ বৈষয়িক শ্রেষ্ঠতাহেতু জনসমাজে সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ হইতে পারিবেন, এই আশায় মগধরাজগণ যথাসাধ্য বৌদ্ধধর্ম্মের পোষকতা করিতে লাগিলেন। নিম্ন শ্রেণীর লোক দলে দলে বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করিতে লাগিল। রাজানুগ্রহ লাভের প্রত্যাশায় অল্পসংখ্যক উচ্চজাতীয় লোকও বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিল। অতঃপর সম্রাট্ অশোক স্বয়ং প্রকাশ্য রূপে নবধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া দিগ্দেশে সেই ধর্ম্ম প্রচার জন্য প্রচারক প্রেরণ করিলেন। এতকাল রাজকার্য্য ও ধর্ম্মকার্য্য প্রভৃতি যাবতীয় উচ্চ কার্য্য সংস্কৃত ভাষায় পরিচালিত হইত। প্রাকৃত ভাষা কেবল সামান্য কার্য্যে ও কথাবার্ত্তায় প্রযুক্ত হইত মাত্র। মগধের বৌদ্ধগণ অধিকাংশই নীচজাতীয় লোক। তাহারা সংস্কৃত ভাষা জানিত না। এ জন্য সম্রাট্ অশোক নিজ রাজকার্য্যে ও ধর্ম্মকার্য্যে মগধদেশীয় প্রাকৃত ভাষা ব্যবহারের আদেশ দিলেন। মাগধী ভাষা পাটলিপুত্র নগরের ভাষা, এজন্য "পাটলি" শব্দের অপভ্রংশে সেই ভাষার নাম পালিভাষা হইল। পালি-ভাষা রাজ-ভাষা এবং ধর্ম্মভাষা রূপে প্রবর্ত্তিত হওয়ায় ক্রমশঃ ইহার উন্নতি হইতে লাগিল। কালের আবর্ত্তনে ভারতে বৌদ্ধধর্ম্ম ও বৌদ্ধরাজত্ব লোপ হইয়াছে

বটে, কিন্তু সংস্কৃত ভাষা আর পূর্ব্ববৎ প্রচলিত হয় নাই। পরবর্ত্তী হিন্দু রাজগণের অধিকাংশ রাজকার্য্য স্থানীয় প্রাকৃতভাষাতেই লিখিত ও পঠিত হইয়া আসিতেছে। কান্যকুব্জ ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থানে যে প্রাকৃতভাষা প্রচলিত হইয়াছিল, তাহার নাম ব্রজ-ভাষা। সেই ব্রজভাষা হইতেই বর্ত্তমান হিন্দী ও বাঙ্গালা ভাষা উৎপন্ন হইয়াছে।

বঙ্গভাষা বঙ্গ প্রদেশে এবং বগ্‌দির পূর্ব্বাংশে ব্যবহৃত হইত। বগ্‌দির পশ্চিম ভাগে নবদ্বীপ অঞ্চলে নানা স্থান হইতে লোক আসিয়া গঙ্গাতীরে বসত করিয়াছিল। তজ্জন্য এই স্থানে বঙ্গভাষা ও গৌড়ীয়ভাষা মিশ্রিত হইয়াছিল। এই স্থানে সংস্কৃত ভাষার চর্চ্চা অধিক হওয়ায় এখানকার প্রাকৃত ভাষা সমধিক মার্জ্জিত হইয়াছিল। সেই হেতু নদীয়া শান্তিপুরের প্রাকৃত ভাষাই সমস্ত বাঙ্গালা দেশের আদর্শ ভাষা হইয়াছিল। তাহাই এক্ষণে বাঙ্গালা ভাষা নামে পরিগৃহীত হইয়াছে। এখন বাঙ্গালা গদ্যে যেরূপ ভাষা সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হয় তাহা নদীয়া শান্তিপুরের সাধু ভাষা। কিন্তু সাধারণ কথোপকথনে এই সাধু ভাষা কুত্রাপি ব্যবহৃত হয় না। রাঢ় ও বারেন্দ্র ভূমিতে গৌড়ীয়-ভাষা, পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় বঙ্গভাষা এবং কলিকাতার নিকটবর্ত্তি স্থানে কলিকাতাই-ভাষা সাধারণ কথোপকথনে প্রচলিত আছে। বাঙ্গালা ভাষায় অধিকাংশ শব্দই সংস্কৃত মূলক। মুসলমান রাজত্বকালে আরবী ও পারসী শব্দ প্রচুর পরিমাণে বাঙ্গালা ভাষায় প্রবেশ করিয়াছে। পারসী লিখিবার ধরণ করণও কিছু কিছু বাঙ্গালা ভাষায় গৃহীত হইয়াছে। তাহারপর ইংরেজাধিকারে অল্প সংখ্যক ইংরেজী শব্দও বাঙ্গালা ভাষায় মিলিত হইয়াছে। পরন্তু ইংরেজী রচণা প্রণালী প্রচুর পরিমাণে বাঙ্গালা ভাষায় অনুকৃত হইয়াছে। এইরূপে সংস্কৃত ভাষা, প্রাকৃত ভাষা, পারসী, আরবী এবং ইংরেজী ভাষার সংস্রবে বর্ত্তমান বাঙ্গালা ভাষা সংগঠিত হইয়াছে।

বাঙ্গালা দেশে ক্ষত্রিয় না থাকার হেতু।

মগধ দেশে চন্দ্র নামে শূদ্রজাতীয় এক মহাবল পরাক্রান্ত সম্রাট্ ছিলেন। কাশীধাম হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্য্যন্ত তাঁহার রাজ্য বিস্তৃত ছিল। তিনি ক্ষত্রিয়দিগের সহিত বৈবাহিক আদান প্রদান করিয়া ক্ষত্রিয়দলে মিলিতে উৎসুক ছিলেন। ক্ষত্রিয়েরা তাঁহার সহ এরূপ আদান প্রদানে ঘৃণা প্রকাশ করায় তিনি দ্বিতীয় পরশুরামের ন্যায়

ক্ষত্রবিনাশে ব্রতী হইয়াছিলেন। বহুসংখ্যক ক্ষত্রিয় তাঁহা কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইয়াছিল, কতক দেশান্তরে পলায়ন করিয়াছিল। অবশিষ্ট যাহারা তাঁহার বাধ্য হইয়াছিল, তাহারা ক্ষত্রসমাজ হইতে বিচ্যুত হইয়া শূদ্রমধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। এজন্য মগধ-সাম্রাজ্যে কোন বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় ছিল না। বৌদ্ধ বিনাশ ও মগধ-সাম্রাজ্য ধ্বংসের পর ক্ষত্রিয়েরা কাশী, মগধ এবং মিথিলার অধিকাংশ স্থান পুনরায় দখল করিয়াছিল। সেই জন্য ঐ সকল স্থানে পুনরায় ক্ষত্রিয়ের আবাস হইয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালা দেশে ক্ষত্রিয়-আধিপত্য না হওয়ায় তথায় পুনরায় ক্ষত্রিয়দের বসতি হয় নাই।

করদ রাজ্য।

আধুনিক সম্রাট্‌গণ তাঁহাদের বিশাল সাম্রাজ্যের দূরবর্ত্তী প্রদেশ শাসনার্থ বেতনভোগী অস্থায়ী শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া থাকেন। প্রাচীন হিন্দু ও বৌদ্ধ সম্রাট্‌দের সময়ে এরূপ রীতি ছিল না। তাঁহারা দূরবর্ত্তী প্রদেশ শাসন জন্য, করদ রাজা নিযুক্ত করিতেন। তৎকালে প্রজার বার্ষিক লভ্যের ⅙ ষষ্ঠাংশ রাজস্ব রূপে নির্দ্দিষ্ট ছিল। করদ-রাজ্যের মধ্যে সেই হারে যে রাজস্ব আদায় হইত, করদ রাজগণ তাহার চতুর্থাংশ নিজ বেতন এবং দশমাংশ আদায়ের ব্যয়স্বরূপ প্রাপ্ত হইতেন। হিন্দীভাষায় ইহাকেই চৌথ ও সরদশমুখী বলে। অবশিষ্ট ¹³⁄₂₀ ভাগ করদ রাজারা নিজ প্রভুর নিকট প্রেরণ করিতেন। করদ রাজারা পুরুষানুক্রমিক ভূম্যধিকারী ছিলেন। তাঁহাদের উত্তরাধিকারিগণের মধ্যে কেহ কার্য্যনির্ব্বাহের অযোগ্য হইলে, সম্রাট্ তাঁহার কার্য্য চালাইবার জন্য কোন ব্যক্তিকে অস্থায়ী রূপে বেতনভোগী কার্য্যনির্ব্বাহক নিযুক্ত করিতেন। সেই কর্ম্মচারীকে সর্ব্বাধিকারী, সরবরাহকার বা ডিঠ্‌ঠা বলিত। ডিঠী ব্যতীত প্রাচীন রাজগণের স্বতন্ত্র বেতন-ভোগী শাসনকর্ত্তা ছিল না। এতদ্ব্যতীত আর একপ্রকার করদ রাজা ছিলেন, তাঁহাদিগকে সম্রাট্‌গণ নূতন নিযুক্ত করিতেন না। কোন দুর্ব্বল রাজা প্রবল পরাক্রান্ত রাজার সহিত যুদ্ধ করিতে অসমর্থ হইয়া তাঁহার বশ্যতা স্বীকার-পূর্ব্বক বার্ষিক কর দিতেন। কিংবা তদনুরূপ অল্পশক্তিশালী রাজা কোন প্রবল শত্রুর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবার উদ্দেশ্যে সাহায্য পাইবার আশায় অন্য কোন প্রবল পরাক্রান্ত রাজার আশ্রয় লইয়া তাঁহাকে কর প্রদান করিতেন। এইরূপ করদ রাজগণ বশী রাজা বলিয়া অভিহিত হইতেন। বশী রাজগণ নিজ প্রভুকে

যত টাকা কর দিতেন এবং যে যে সর্ত্তের অধীন হইতেন, তাহা সন্ধিপত্র দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইত। বশীদিগের প্রদত্ত করকে অনুকর বা নালবন্দী বলে। অনুকরের পরিমাণ প্রায়শঃ সমগ্র রাজস্বের ১/৩ ভাগ অপেক্ষা কম হইত।

পাষণ্ডদলন।

জনসমাজের হিত সাধন করাই সকল ধর্ম্মের উদ্দেশ্য এবং মূলমন্ত্র। কিন্তু চিরকালই প্রবল পক্ষ স্বধর্ম্মবিরুদ্ধবাদীদের উপর ঘোর অত্যাচার করিয়া থাকে। বরং ধর্ম্মবিদ্বেষ বশতঃ লোকে যত অত্যাচার ও অধর্ম্মাচরণ করিয়া থাকে, অন্য কোন কারণে ততদূর করে না। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রথম অবস্থায় হিন্দুরা বৌদ্ধদের উপর অত্যাচার করিত কিন্তু যখন বৌদ্ধধর্ম্ম সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়া প্রবল হইয়া উঠিল, তখন বৌদ্ধেরা হিন্দুদের উপর উৎপীড়ন করিতে আরম্ভ করিল। কান্যকুব্জবাসী ব্রাহ্মণেরা সেই অত্যাচার নিবারণ জন্য যজ্ঞাগ্নি হইতে কতকগুলি যোদ্ধা উৎপাদন করিয়াছিলেন। সেই যোদ্ধাদিগকে অগ্নিকুল বা অগ্নিসম্ভূত ক্ষত্রিয় বলে। প্রমার, পরিহর, চালুক্য ও চালুমান, এই চারি জন সেই অগ্নিকুলের নেতা ছিলেন। সেই অগ্নিকুলের সাহায্যে ব্রাহ্মণেরা সমগ্র ভারতবর্ষে বৌদ্ধদিগের বিনাশ সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। ইহার ফলে, কতক বিনষ্ট হইল, কতক দেশ হইতে বিতাড়িত হইল, অবশিষ্ট বশ্যতা স্বীকার করিল। ইহারই নাম পাষণ্ডদলন। এই পাষণ্ড-দলন দ্বারা কনোজ ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হইল এবং কান্যকুব্জ নগর আর্য্যবিদ্যার আদর্শ স্থান হইল। কান্যকুব্জ-ব্রাহ্মণদিগকে শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ বলিত। তাঁহারাই সকল ব্রাহ্মণের আদর্শরূপে পূজিত হইতেন। এজন্য গৌড়াধিপতি কান্যকুব্জ হইতে শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ আনিয়া নিজ রাজ্যে স্থাপন করিয়াছিলেন। অগ্নিকুল দ্বারা মগধসাম্রাজ্য ধ্বংস হইলে তথাকার এক রাজকুমার ব্রহ্মদেশে গিয়া রাজ্য স্থাপন করেন। সেই রাজবংশ আড়াই হাজার বৎসর ব্রহ্মদেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন। ব্রহ্মদেশীয় লোকদিগকে যে "মগ" বলে, তাহা মগধ শব্দের অপভ্রংশ। *

* মগধ হইতে মগহ, তাহা হইতে মঘ বা মগ। ব্রহ্মদেশের শেষ রাজা থেবাকে ইংরেজেরা ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে বন্দী করিয়া তাঁহার রাজ্য গ্রহণ করিয়াছেন।

গৌড়ীয় পঞ্চরাজ্যের ইতিহাস বৈদ্য-রাজ্যারম্ভ হইতেই ধারাবাহিক রূপে পাওয়া যায়। তৎপূর্ব্ববর্ত্তী বৃত্তান্ত পুরাণাদি গ্রন্থে যাহা পাওয়া যায়, তাহা ধারাবাহিক না হইলেও অতীব প্রয়োজনীয় কথা। এজন্য তাহা বিবৃত করা গেল।

গৌড়ীয় পঞ্চ রাজ্য।

মিথিলাদেশ—ইহার পূর্ব্বে বরেন্দ্রভূমি, দক্ষিণে গঙ্গা, পশ্চিমে নারায়ণী নদী, উত্তরে নেপাল। বেণ রাজার সময়ে ব্রহ্মাবর্ত্তে চতুর্ব্বর্ণ-মিশ্রণে নানাপ্রকার সঙ্কর জাতি উৎপন্ন হইয়াছিল। তন্মধ্যে বিদেহ-নামক সঙ্কর জাতি আসিয়া এই দেশে প্রথমে বাস করে। এই জাতির নাম হইতেই এই দেশের আদিম নাম "বিদেহ" হয়। তাহার পর চন্দ্রবংশীয় মিথি-নামক রাজা এই দেশ জয় করিয়া নিজ রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম হইতেই এই দেশের নাম মিথিলা দেশ এবং রাজধানীর নাম মিথিলা নগর হইয়াছে। মিথি-বংশ বহুকাল এই দেশে রাজত্ব করিয়াছিল। প্রসিদ্ধ রাজর্ষি জনক এই মিথিবংশীয় ছিলেন। কুরু-পাণ্ডবদের সময়ে এই দেশ মগধরাজ জরাসন্ধের অধীন ছিল এবং তাঁহার করদরাজগণ দ্বারা উক্ত প্রদেশ শাসিত হইত। মগধের নন্দবংশীয় শূদ্র রাজা এবং বৌদ্ধ সম্রাটের সময়েও এই দেশ মগধসাম্রাজ্যের অধীন ছিল; তখন এই দেশ পাল-উপাধিধারী করদরাজগণ কর্ত্তৃক শাসিত হইত। পাষণ্ড-দলনের পর এই দেশের অধিকাংশ স্থান ক্ষত্রিয়গণ অধিকার করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু মিথিলার পূর্ব্বাংশে পালবংশেরই রাজত্ব ছিল। অবশেষে গৌড়াধিপতি বল্লালসেন, গোবিন্দপাল এবং অন্যান্য ক্ষত্রিয় রাজগণকে পরাজিত করিয়া সমগ্র মিথিলা দেশ নিজের অধীন করিয়াছিলেন। তদবধি এই দেশ বৈদ্যরাজ্যভুক্ত হইয়াছিল।

বরেন্দ্রভূমি—ইহার পূর্ব্বে করতোয়া নদী ও চলনবিল, দক্ষিণে পদ্মানদী, পশ্চিমে মিথিলা, উত্তরে কোচবিহার। দৈত্যরাজ বলির পত্নী সুদেষ্ণার গর্ভে দীর্ঘতমা মুনির ঔরসে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, ওড্র এবং পুণ্ড্র নামে পাঁচটি ক্ষেত্রজ পুত্র হইয়াছিল। তাঁহারা প্রত্যেকে স্বনামখ্যাত এক একটী রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে বঙ্গ এবং পুণ্ড্রের রাজ্য বর্ত্তমান বাঙ্গালা দেশের অন্তর্গত। মালদহ জেলার অন্তর্গত পাণ্ডুয়া নগরের চতুষ্পার্শবর্ত্তী স্থান পুণ্ড্রের

অধিকারভুক্ত ছিল। তাঁহার নাম হইতেই ইহাকে পৌণ্ড্রদেশ এবং ইহার রাজধানীকে পৌণ্ড্রপট্টন বলিত। * কালক্রমে বরেন্দ্র-নামক একজন ক্ষত্রিয় পৌণ্ড্র রাজ্য জয় করিয়া সমস্ত বরেন্দ্রভূমিতে নিজ প্রভুত্ব স্থাপন করত এই রাজ্যের নাম বরেন্দ্রভূমি রাখিয়াছিলেন, এবং তিনি পৌণ্ড্রপট্টন হইতে সরাইয়া গৌরবনগরে রাজধানী সংস্থাপিত করেন। কালক্রমে এই দেশ মগধসাম্রাজ্যের অধীন হইয়া ক্ষত্রিয়শূন্য হইয়াছিল। বৌদ্ধদিগের প্রাধান্যের সময় পালবংশীয় রাজগণ মগধসম্রাজ্যের অধীনে এই দেশে রাজত্ব করিতেন। তাঁহারা বৌদ্ধ-মতাবলম্বী ছিলেন। সেই সময়ে পৌণ্ড্রপট্টনের নাম পাণ্ডুয়া, গৌরবনগরের নাম গৌড়, এবং বরেন্দ্রভূমির নাম বরিন্দা হইয়াছিল। পাষণ্ডদলনের পর এই দেশের পাল-রাজগণ স্বাধীন হইয়া ক্রমে ক্রমে সনাতন ধর্ম্ম গ্রহণ করত শৈব হইয়াছিলেন। পালবংশীয়েরা হিন্দু হইলেও শূদ্র বলিয়া গণ্য হইতেন। মদনপাল এই বংশের শেষ রাজা। তাঁহার পত্নী মন্ত্রীর সহযোগে বিষপ্রয়োগে স্বামি-হত্যা করিয়াছিলেন। কিন্তু সেনাপতি শূরসেন-নামক বৈদ্য সেই দুষ্টা রাণী সহ মন্ত্রীকে বন্দী করিয়া অগ্নিতে দগ্ধ করেন এবং মৃত রাজার কোন সন্তান না থাকায় স্বয়ং রাজা হন। তদবধি গৌড়ে বৈদ্যরাজ্য স্থাপিত হইল; কিন্তু বরিন্দার উত্তর ও পূর্ব্ব প্রান্তে তখনও পালবংশীয় কোন কোন রাজার আধিপত্য ছিল। বৈদ্যরাজগণ ক্রমে ক্রমে পালরাজ্য ধ্বংস করিয়া সমস্ত বরিন্দা অধিকার করিয়াছিলেন।

বঙ্গদেশ।—ইহার পূর্ব্বে ব্রহ্মপুত্র, দক্ষিণে পদ্মা, পশ্চিমে বরেন্দ্রভূমি এবং উত্তরে জঙ্গল। ইহার কতকাংশে বঙ্গের রাজ্য ছিল বলিয়া ইহা বঙ্গদেশ বলিয়া অভিহিত হয়। ভগবান্ পরশুরাম ব্রহ্মার মানস-সরোবর হইতে খাল কাটিয়া এই দেশে ব্রহ্মপুত্র নদ আনয়নপূর্ব্বক জলদানের পুণ্যে মাতৃহত্যাজনিত পাপ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। যে স্থানে স্নান করিয়া তাঁহার পাপান্ত হইয়াছিল, সেই স্থান পরশুরামক্ষেত্র ও পৌষনারায়ণী নামে খ্যাত। এই দেশের কতকগুলি ক্ষত্রিয় প্রাণভয়ে পরশুরামের নিকট আপনাদিগকে ধীবর বলিয়া পরিচয় দিয়াছিল। তাহাদের সন্তানেরাই রাজবংশী। এই দেশও মগধরাজ্যের

* পৌণ্ড্রপট্টন স্থলে আধুনিক কেহ কেহ পৌণ্ড্রবর্দ্ধন বলেন, তাহা অশুদ্ধ। চীন ভাষা হইতে অনুবাদ করিতে ঐ ভুল উৎপন্ন হইয়াছে।

অধীন এবং ক্ষত্রিয়শূন্য হইয়াছিল। তখন এই দেশ মগধের বৌদ্ধ সম্রাট্‌দিগের অধীন পালউপাধিধারী করদরাজগণ দ্বারা শাসিত হইত। পাষণ্ডদলনের পর সেই পালগণ স্বাধীন হইয়া ক্রমে ক্রমে শৈব হিন্দু হইয়াছিলেন। পালবংশের ধর্ম্মপাল প্রথম সনাতন ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। তৎপুত্র দেবপাল বা দেপাল গৌড় নগর হইতে কয়েকজন কায়স্থ আনিয়া বঙ্গদেশে স্থাপিত করেন এবং তাঁহাদের সহিত বৈবাহিক আদান প্রদান করিয়া সেই সমাজে মিলিত হইয়াছিলেন। তৎপুত্র রামপাল এই বংশের শেষ রাজা। রামপালের পত্নী ও পুত্রবধু কায়স্থ কন্যা। তদীয় রাজ্যের প্রধান কার্য্যকারক সমস্তই কায়স্থ ছিল। রামপালের একমাত্র পুত্র যক্ষপাল এক প্রজার পত্নীকে বলাৎকার করায় অপক্ষপাতী রাজা তাহার প্রাণদণ্ড করিয়াছিলেন। তাঁহার পত্নী ও পুত্রবধূ শোকে বিমুগ্ধ হইয়া ব্রহ্মপুত্র নদে আত্মবিসর্জ্জন করিলেন। রামপাল নিজে গঙ্গাতীরে গিয়া শিবভক্ত বিজয় সেনকে নিজ রাজ্য প্রদান করত অনশনে প্রাণত্যাগ করিলেন। এই সময় হইতেই বঙ্গদেশে বৈদ্যরাজত্বের সূত্রপাত হয়।

রাঢ়দেশ।—ইহার পূর্ব্বে ভাগীরথী, দক্ষিণে উড়িষ্যা, পশ্চিমে মগধ, এবং উত্তরে গঙ্গা। ইহার প্রাচীন নাম প্রাঠদেশ। বৌদ্ধ-সাম্রাজ্যের সময় সেই শব্দ অপভ্রষ্ট হইয়া রাঠ বা রাঢ় নামে পরিণত হয়। এই দেশ বহুকাল মগধদেশের অধীন ছিল। জরাসন্ধের প্রসিদ্ধ রাজধানী পঞ্চকূট এই দেশের অন্তর্গত। মগধের শূদ্র রাজাদের অধীনে এই দেশও ক্ষত্রিয়শূন্য হইয়াছিল। বৌদ্ধ-রাজত্বের সময় এই দেশ পালউপাধিধারী করদরাজগণ মগধসম্রাটের অধীন থাকিয়া ভোগ করিতেন। পাষণ্ডদলনের পর এ দেশের উত্তরভাগ গৌড়াধিপতির অধীনে উত্তর রাঢ় নামে খ্যাত হয়। দক্ষিণ রাঢ় স্বাধীন হইয়াছিল। আদিশূর ও তৎপরবর্ত্তী বৈদ্য রাজারা ক্রমশঃ সমস্ত রাঢ়দেশ অধিকার করিয়া এই দেশ বৈদ্যরাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন।

বকদ্বীপ।—ইহার পূর্ব্বে পদ্মা, দক্ষিণে সমুদ্র, উত্তরে গঙ্গা এবং পশ্চিমে ভাগীরথী। বৌদ্ধদিগের সময় ভাষা অপভ্রষ্ট ও সংকীর্ণ হইয়া ইহার নাম 'বগ্‌দি' হইয়াছে। ইহার আদিম অধিবাসীদিগকে বাগদি বলে। ইহা স্বতন্ত্র কোন রাজ্য ছিল না। ইহার উত্তরভাগ বরেন্দ্রভূমির, পূর্ব্বভাগ বঙ্গের এবং পশ্চিম ভাগ রাঢ়ের অধীন ছিল। মধ্য ও দক্ষিণ ভাগ জঙ্গলাকীর্ণ ছিল, তাহাতে

বাগদিগণ ও বন্য পশুরা বাস করিত। বৈদ্যরাজগণ ক্রমশঃ এই দেশ সম্পূর্ণ অধিকারপূর্ব্বক স্বরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া শান্তি ও সভ্যতা স্থাপন করিয়াছিলেন। য়ুরোপীয়েরা এই দেশকে আধুনিক উৎপন্ন বলিয়া অনুমান করেন; কিন্তু হিন্দুশাস্ত্রাদি দৃষ্টে সেই অনুমান ভ্রান্তিমূলক বোধ হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

আর্য্যগণের আদিম নিবাস।—অম্বিষ্ঠ জাতি।—বৈদ্যরাজত্ব।—বঙ্গে ব্রাহ্মণাগমন।—বিজয়সেন।—বল্লালসেন।—কৌলীন্য মর্য্যাদা।—সুবর্ণবণিকদিগের পতন।—লক্ষণসেন।—বংশানুক্রমিক কৌলীন্য প্রথা।—রোমথা।—শেখ শুভোদয়া।—পাঠান কর্ত্তৃক বঙ্গ বিজয়।—বাঙ্গালীর বীরত্ব।—হিন্দুদিগের দিগ্বিজয় প্রণালী।—প্রাচীন টাকা।—পাঠান শাসন প্রণালী।

সংস্কৃত ভাষায় যাহাকে হূণ দেশ বলে, য়ুরোপীয়েরা তাহাকেই সাইথিয়া বলিতেন। এখন মুসলমানেরা সেই দেশকে তুরাণ বলেন এবং ইংরেজেরা সেই দেশকে তুর্কিস্থান বলেন। সেই দেশ হইতে তার্ত্তার জাতি দলে দলে গিয়া য়ুরোপ জয় করত তদ্দেশবাসী হইয়াছে। সেই দৃষ্টান্তে য়ুরোপীয়েরা অনুমান করেন যে, আর্য্যজাতিও সেইরূপ একদল তার্ত্তার জাতির শাখা। তাহারা সাইথিয়া হইতে আসিয়া ভারতবর্ষ জয় করিয়া এই দেশবাসী হইয়াছে। ভারতের আদিম নিবাসীদের সন্তানেরাই শূদ্র। এই অনুমানের পোষক কোন প্রমাণ নাই, সুতরাং তাহা বিশ্বাসের অযোগ্য।

মোক্ষমূলর-প্রমুখ সংস্কৃতজ্ঞ য়ুরোপীয়গণ অনুমান করেন যে, আর্য্যজাতি পারস্য দেশ হইতে আসিয়া ভারতবর্ষ জয় করিয়া এই দেশে বাস করিয়াছে। এই অনুমান সমর্থন জন্য তাঁহারা দেখান যে, সংস্কৃত ভাষার সহিত প্রাচীন পার্সী অর্থাৎ জেন্দ ভাষার প্রচুর ঐক্য আছে এবং আচার ব্যবহারেও কতক ঐক্য আছে। অথচ এই দুই জাতির মধ্যে যে প্রাচীন কালে ঘোরতর বিবাদ ও

বিদ্বেষ ছিল, তাহাও স্পষ্ট প্রতিপন্ন হয়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ তদ্দৃষ্টে সিদ্ধান্ত করেন যে, আর্য্য জাতি আদৌ পারস্য দেশে বাস করিয়া দেবতা ও অসুর উভয়কে পূজা করিত। পরে তাহাদের মধ্যে একদল সুর অর্থাৎ দেবগণের ভক্ত হয় এবং অপর দল অসুর ভক্ত হয়। সেই ধর্ম্মবিদ্বেষে উভয় দলে বিবাদ হইলে, দেবভক্তগণ পরাস্ত এবং স্বদেশ হইতে তাড়িত হইয়া, ভারতে আসিয়াছিলেন এবং এই দেশ জয় করিয়া ইহাতে বাস করিয়াছেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের উপরোক্ত সিদ্ধান্ত সম্ভবতঃ ভ্রমপূর্ণ। আর্য্য জাতির অন্য দেশ হইতে ভারতে আসিবার কোন প্রমাণ কোন দেশের কোন পুস্তকে নাই এবং তাদৃশ কোন কিংবদন্তীও কুত্রাপি নাই।* বরং মনুসংহিতাতে স্পষ্ট লিখিত আছে যে, ব্রহ্মাবর্ত্তই আর্য্যজাতির আদিম স্থান, তথা হইতে তাহারা নানা দেশে বিস্তৃত হইয়াছে। ঋগ্বেদ ও জেন্দ অবস্তার শ্লোক সমস্ত তুলনা করিলে জানা যায় যে, আদিম আর্য্যজাতিরা সুরাসুর উভয়-পূজক ছিল। পরে একদল কেবলমাত্র সুরভক্ত এবং অন্যদল কেবলমাত্র অসুরভক্ত হইয়াছিল। তজ্জন্য তাহাদের মধ্যে বিবাদ হইয়াছিল। দেবগণ সুরভক্তদের সহায় হইয়াছিলেন, পক্ষান্তরে অসুর ও রাক্ষসগণ অসুরভক্তদের পক্ষ হইয়াছিল। ইহাই দেবাসুরযুদ্ধ। কিছু দিন পরে উভয়ের সন্ধি হইয়াছিল এবং উভয়ে মিলিয়া সমুদ্র-মন্থন করিয়াছিল। সমুদ্রমন্থন শব্দের অর্থ বোধ হয় "সামুদ্রিক বাণিজ্য" অথবা "সমুদ্র পথে দিগ্বিজয়"। † সেই যৌত বাণিজ্যে বা দিগ্বিজয়ে যাহা কিছু লাভ

* এ বিষয়ে নানা লোকের নানা মত। শ্রীযুক্ত বালগঙ্গাধর তিলক, বেদ ও জ্যোতিষ হইতে যে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন তাহাতে আর্য্যদিগের আদিম বাসস্থান মেরু প্রদেশ নির্ণয় করিয়াছেন। তিলক মহাশয় বৈজ্ঞানিক যুক্তির বলেও প্রমাণ করিতে চাহেন যে পুরাকালে আর্য্যগণের বাস মেরু সন্নিহিত প্রদেশে ছিল। সে দেশ তখন সুখের ছিল, কিন্তু কালক্রমে তাহা হিমাচ্ছন্ন হইলে আর্য্যগণ দক্ষিণে আগমন করেন। ১০।৮৯।২ ঋকে ইন্দ্র (সূর্য্য) রথের চক্রের ন্যায় চতুর্দ্দিকে ঘূর্ণিত করিতে থাকেন; ১।২৪।১০ ঋকে ঋক্ষগণ অর্থাৎ সপ্তর্ষিগণ 'উচ্চে' অবস্থিত। তিলক বলেন, সূর্য্যের চক্রবৎ পরিভ্রমণ দ্বারা ও সপ্তর্ষিগণ মাথার উপর থাকায় মেরুদেশের অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। বিশেষতঃ সপ্তর্ষিগণ মাথার উপর থাকা ভারতবর্ষে হইতে পারে না। যে দেশের অক্ষাংশ ৫০ কি ৫৫, সে দেশের লোকদিগের মাথার উপর সপ্তর্ষি থাকেন। অন্ততঃ ইহা বেশ বলা যায় যে, বৈদিক ঋষিগণের কতকগুলির বাস ভারতবর্ষের বহু উত্তরে ছিল। তাঁহারা ভারতবর্ষ হইতে গিয়া তথায় বাস করিতে পারেন। বাস্তবিক তিলকের উদ্ধৃত কোন শ্লোক দ্বারা প্রমাণ হয় না যে, আর্য্যজাতি উত্তর দেশ হইতে আসিয়া ভারতে বসতি করিয়াছিলেন।

† "সামুদ্রিক বাণিজ্যই" অধিক সঙ্গতার্থ।

হইয়াছিল, দেবগণ ও দেবভক্তগণ তাহা সমস্তই আত্মসাৎ করাতে পুনরায় উভয় দলে বিবাদ হইয়াছিল। সেই বিবাদে দেবভক্তগণ জয়ী হইয়া বিপক্ষগণকে দেশ হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিল। অসুর ও অসুরভক্তগণ সিন্ধুনদের পরপারে পলায়ন করিয়াছিল এবং রাক্ষসগণ পাতালে গিয়া বাস করিয়াছিল; সুতরাং সমস্ত ভারতবর্ষ দেবভক্ত আর্য্যগণের অধিকৃত হইয়াছিল। পাতাল শব্দে পদতলবর্ত্তী দেশ অর্থাৎ পৃথিবীর বিপরীত পৃষ্ঠ। য়ুরোপীয়েরা যাহাকে আমেরিকা বলেন, তাহারই নাম পাতাল। আর্য্যগণ যে অতি প্রাচীন কাল হইতে আমেরিকার অস্তিত্ব অবগত ছিলেন, তাহা ঋগ্বেদের ঐতরেয় ব্রাহ্মণ দশম মণ্ডল ৯০।৯১।৯২ শ্লোক পাঠ করিলেই স্পষ্ট জানা যায়। আর আদিম আমেরিক লোকদের চরিত্রে এবং রাক্ষসচরিত্রে সম্পূর্ণ ঐক্যও দেখা যায়। তদ্দ্বারা পৌরাণিক উক্তির সত্যতা প্রমাণ হয়। অধিকন্তু অনুমান হয় যে, রাক্ষসেরা পাতালে যাতায়াতের পথে কতকগুলি অষ্ট্রেলিয়া, পলিনেসিয়া, ফিলিপাইন প্রভৃতি দ্বীপে বাস করিয়াছিল।

পারস্যদেশ শব্দের অর্থ "সিন্ধোঃ পারস্য দেশঃ" অর্থাৎ সিন্ধুনদের পরপারবর্ত্তী দেশ। গ্রীক জাতির কথিত পার্সিয়া শব্দ এই পারস্য শব্দের রূপান্তর মাত্র। এই নামটি দ্বারাই স্পষ্ট বুঝা যায় যে, পার্সী জাতি আগে ভারতবর্ষে ছিল, পরে সিন্ধুর পশ্চিম পারে গিয়া বসতি করিয়াছিল। মনু ব্রহ্মাবর্ত্ত সম্বন্ধে যেমন বলিয়াছেন "স দেশো দেবনির্ম্মিতঃ," জেন্দ অবস্তাতেও ঠিক সেইরূপ লিখিত হইয়াছে যে, "অহুরা মজ্‌দা যত দেশ সৃষ্টি করিয়াছেন, তন্মধ্যে হপ্ত হিন্দব এবং হরহৈতি দেশ সর্ব্বোৎকৃষ্ট।" 'অহুরা মজ্‌দা' শব্দ সংস্কৃত "মস্ত অসুর" শব্দের রূপান্তর। আর 'হপ্ত হিন্দব' শব্দ সপ্তসিন্ধু বা বর্ত্তমান পঞ্জাব বোধক। 'হরহৈতি' শব্দ সংস্কৃত সরস্বতী শব্দের অপভ্রংশ। অহুরা মজ্‌দা বা মস্ত অসুর পার্সীদিগের পরমেশ্বর বোধক শব্দ। ব্রহ্মাবর্ত্ত সরস্বতী নদীর তীরে অবস্থিত, সুতরাং হরহৈতি শব্দ যে ব্রহ্মাবর্ত্ত-বোধক, তাহাতে সন্দেহ নাই। জেন্দগণ ব্রহ্মাবর্ত্ত ও পঞ্জাবকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেশ বলায় উহা যে তাহাদের সুখকর আদিম বাসস্থান, তাহা প্রতিপন্ন হয়। অবস্তায় আরও উক্ত হইয়াছে যে "চোরদিগের দলপতি দুরাত্মা ইন্দ্র আমাদের শস্য এবং ধন সর্ব্বদা হরণ বা নষ্ট করে, তজ্জন্য আমরা সতত শঙ্কিত থাকি।" এই বচন দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, দেবভক্তদের উৎপাতে

তিষ্ঠিতে না পারিয়া পার্সীরা ব্রহ্মাবর্ত্ত ও পঞ্জাব ত্যাগ করিয়া সিন্ধুনদের পশ্চিম পারে বাস করিতে বাধ্য হইয়াছিল। আবার পুরাণে দেখা যায় যে মহর্ষি অঙ্গিরা দেবগণের এবং অসুরগণের পুরোহিত ছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র দেবগুরু বৃহস্পতি এবং কনিষ্ঠ পুত্র অসুরগুরু সম্বর্ত্ত, উভয়েই দেবাসুর উভয় কুলের পূজ্য ছিলেন। ঐরূপ অসুরগুরু শুক্রাচার্য্যও উভয় কুলের মান্য ছিলেন। ইহা দ্বারা অনুমান হয় যে, দেবভক্ত ও অসুরভক্তদের ধর্ম্ম বিষয়ে বিবাদ তত গুরুতর ছিল না, বরং বিষয় সম্পত্তি লইয়া বিবাদই তাহাদের শত্রুতার প্রধান কারণ। অতএব ইহা নিশ্চিত হইতেছে যে, আর্য্যজাতির আদিম নিবাস ব্রহ্মাবর্ত্ত ছিল, তথা হইতে তাহারা নানা কারণে চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়াছিল। আবার মনুসংহিতা, রামায়ণ এবং মহাভারত দৃষ্টে স্পষ্ট জানা যায় যে, সেই বিদেশ-প্রস্থিত আর্য্যগণ মধ্যে প্রায় সকলেই ক্ষত্রিয় ছিল। তাহারা দেশান্তরে গিয়া ব্রাহ্মণের উপদেশ না পাওয়াতে ভ্রষ্টাচারী ও দস্যুবৃত্তিপরায়ণ হইয়াছিল। ভ্রষ্টা-চারী অর্থে অন্ন, যোনি এবং ব্যবসায়ে বিচারবিহীন অর্থাৎ যাহাদের আহার বিষয়ে, বিবাহ বিষয়ে এবং ব্যবসায় বিষয়ে কোন বাধা-বিচার নাই।

ব্রহ্মাবর্ত্ত আর্য্য-সদাচারের আদর্শ স্থান ছিল। আর্য্যরাজ্যে শ্বেতবর্ণ ব্রাহ্মণ, রক্তবর্ণ ক্ষত্রিয়, শ্যামবর্ণ বৈশ্য এবং কৃষ্ণবর্ণ শূদ্রদিগের জন্য খাদ্য দ্রব্য, বিবাহ এবং ব্যবসায় বিষয়ে নির্দ্দিষ্ট নিয়মাবলী ছিল। বেণ রাজার রাজত্বকালে এবং তৎপরে সেই চতুর্ব্বর্ণ-সংমিশ্রণে কতকগুলি সঙ্কর জাতি উৎপন্ন হইয়াছিল। তাহা-দের জন্যও অধিকাংশ স্থলে ব্যবসায় নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছিল। পরস্ত্রী-গমনে এবং পরধন-হরণে যেরূপ দণ্ড হইত, তেমনি একজাতীয় লোক অন্য জাতির ব্যবসায় করিলে, আর্য্যরাজ্যে তাহার কঠিন দণ্ড হইত; সেই জন্য যে জাতির নিমিত্ত কোন ব্যবসায় ধার্য্য হয় নাই, তাহারা আর্য্যরাজ্যে জীবিকানির্ব্বাহের উপায় না পাইয়া স্থানান্তরে যাইতে বাধ্য হইত। আবার যে জাতির নির্দ্দিষ্ট ব্যবসায় ছিল, সেই জাতির কোন ব্যক্তি, জাতিব্যবসায় দ্বারা জীবিকা চালাইতে না পারিলে অগত্যা স্থানান্তরে যাইত। এই কারণে বিদেহজাতি মিথিলায়, মগধজাতি মগধদেশে, উগ্রক্ষত্র জাতি রাঢ়দেশে এবং অম্বিষ্ঠ জাতি বরেন্দ্রভূমিতে গিয়া বাস করিতে বাধ্য হইয়াছিল। * বাঙ্গালা দেশে অম্বিষ্ঠেরা অধিকাংশই

* আধুনিক বাঙ্গালা পুস্তকে অম্বিষ্ঠ শব্দ স্থলে অম্বষ্ঠ লেখা হয়, তাহা অশুদ্ধ। (অম্বিকায়াঃ)

চিকিৎসা ব্যবসায় করিত। যাহারা অন্য ব্যবসায় করিত, তাহারাও চিকিৎসাকার্য্য কতক জানিত। এজন্য বাঙ্গালা দেশে তাহারা বৈদ্য নামে খ্যাত হইয়াছিল। বাঙ্গালা দেশের বাহিরে বৈদ্য নামে কোন জাতি নাই। মগধদেশে অম্বিষ্ঠ জাতিকে 'অম্বিষ্ঠ কায়েত' বলে। হিন্দুস্থানে ইহাদিগকে 'বৈস্ ঠাকুর' বলে। মহারাষ্ট্র দেশে এই জাতিকে 'পরভূ জাতি', এবং দ্রাবিড় দেশে 'করণ জাতি' বলে।

প্রাচীন কালে অনুলোম-বিবাহ প্রচলিত ছিল। ব্রাহ্মণের বিবাহিত বৈশ্যার গর্ভজাত সন্তানেরাই অম্বিষ্ঠ। ব্রাহ্মণ ও শূদ্রাজাত করণ জাতিও বোধ হয় অম্বিষ্ঠ সহ মিলিত হইয়াছে। করণ জাতি জারজ সন্তান নহে। কেন না ব্রাহ্মণের বৈশ্যা বা শূদ্রা উপপত্নীর সন্তান কুত্রাপি অম্বিষ্ঠ বা করণ জাতি বলিয়া গণ্য হয় না। এই সঙ্কর জাতি বাঙ্গালা দেশে এবং দাক্ষিণাত্যে বৈশ্যশ্রেণীভুক্ত, মগধদেশে কায়স্থশ্রেণীভুক্ত এবং হিন্দুস্থানে ক্ষত্রিয়শ্রেণীভুক্ত।

বৈদ্য ও কবিরাজ শব্দ পণ্ডিত এবং চিকিৎসক এই উভয় অর্থ-প্রতিপাদক। ইংরেজী ডক্টর ও আরবী হেকিম শব্দ ঠিক এই দুই অর্থ-বোধক। তজ্জন্য অনুমান হয় যে, প্রাচীন কালে প্রধান প্রধান পণ্ডিতেরাই চিকিৎসাকার্য্য করিতেন। প্রাচীনকালে চিকিৎসা-ব্যবসায় ব্রাহ্মণদের একচাটিয়া ছিল। অথচ কলিযুগে ইহা ব্রাহ্মণের পক্ষে নিষিদ্ধ হইয়াছে। তাহাতে অনুমান হয়, ব্রাহ্মণেরা এই ব্যবসায় অম্বিষ্ঠদিগকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। কলিকালে কোন ব্রাহ্মণ লোভবশে পুনরায় সেই ব্যবসায় করিয়া অম্বিষ্ঠদিগের জীবিকানির্ব্বাহে ব্যাঘাত না করে, এই উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মণের পক্ষে তাহা নিষিদ্ধ হইয়াছে।

"শব্দকল্পদ্রুম" নামক অভিধানে "অম্বষ্ঠঃ জারজঃ বৈদ্যঃ" বলিয়া যে লিখিত হইয়াছে, তাহা ভুল বলিয়া বোধ হয়। কেননা অম্বা+স্থা+ড=অম্বস্থ হয়। অম্বষ্ঠ শব্দটি ব্যাকরণশুদ্ধ নহে। আর জারজ শব্দ, বৈদ্য শব্দ এবং অম্বষ্ঠ শব্দ কদাচ তুল্যার্থক হইতে পারে না। "বিশ্বকোষ" অভিধানে পরভূ জাতি স্থলে "প্রভু" শব্দ লিখিত হইয়াছে এবং তাহাদিগকে কায়স্থ বলিয়া লেখা হইয়াছে। তাহাও অশুদ্ধ। পরভূ শব্দের অর্থ পরবর্ত্তী কালে উৎপন্ন জাতি অর্থাৎ আদিম

অম্বি+স্থা+ড=অম্বিষ্ঠ। হিন্দুস্থানী পণ্ডিতেরা অম্বিষ্ঠ লিখিয়া থাকেন, তাহাই ব্যাকরণসিদ্ধ। পাণিনি ব্যাকরণে বিশেষ সূত্র দ্বারা অম্বষ্ঠ শব্দ সাধিয়াছেন বটে কিন্তু পরবর্ত্তী ব্যাকরণে তাহা গৃহীত হয় নাই।

চতুর্ব্বর্ণের পরে উৎপন্ন জাতি। ইহা "প্রভু" শব্দের অপভ্রংশ নহে। আর ব্রাহ্মণের ঔরসে মারাঠী শূদ্রার গর্ভে এই জাতির উৎপত্তি। ইহাদিগকে কায়েত বলা যায় না। আমি যতদূর অনুসন্ধান করিয়াছি, তাহাতে জানিয়াছি যে, দাক্ষিণাত্যে কায়স্থ জাতি নাই। পরভূ ও করণ জাতিগণকে অম্বিষ্ঠ জাতি-মধ্যে গণ্য করা যায়।

বৈদ্যরাজত্ব।

পাষণ্ডদলনের পর সমস্ত বরেন্দ্রভূমি একটি রাজ্য ছিল না। গৌড়নগরের পালরাজ্যই সর্ব্বাপেক্ষা বিস্তীর্ণ ছিল। উত্তর রাঢ়দেশও তাহারই অধীন ছিল। উত্তর দিকের দিনাজপুর অঞ্চলে আর একটি পালরাজ্য ছিল। পূর্ব্বদিকে বগুড়া অঞ্চলে তৃতীয় পালরাজ্য ছিল। ফলতঃ বরেন্দ্রভূমিতে তিন চারিটি রাজ্য ছিল। মদনপাল গৌড়রাজ্যে পালবংশের শেষ রাজা। শূরসেন-নামক একজন বৈদ্য তাঁহার সেনাপতি ছিলেন। মদনপাল ভ্রষ্টা পত্নী কর্ত্তৃক বিষপ্রয়োগে নিঃসন্তান অপহৃত হইলে, শূরসেন সেই রাণীকে ও তাহার উপপতিকে অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া স্বয়ং রাজা হইয়াছিলেন। বৈদ্যজাতির মধ্যে তিনিই প্রথম রাজা; এইজন্য তিনি আদিশূর নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। আদিশূর চতুর্দ্দিকে নিজরাজ্য বিস্তার করিয়া অতিশয় পরাক্রান্ত হইয়াছিলেন। এইরূপে বৈদ্যরাজত্ব-কালেই শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদিগের বাঙ্গালাদেশে বাস আরম্ভ হয়। তাঁহাদের দ্বারাই বাঙ্গালা দেশের সর্ব্বপ্রকার উন্নতি আরম্ভ হয়। ৯৪৪ শকাব্দের কয়েক বৎসর পূর্ব্বে গৌড়ে বৈদ্যরাজত্ব স্থাপিত হইয়াছিল।

আধুনিক কোন কোন ব্যক্তি অনুমান করেন যে, আদিশূর ও তৎপরবর্ত্তী রাজগণ ক্ষত্রিয় ছিলেন। এই অনুমানের পোষক কোনই যুক্তি বা প্রমাণ নাই; বরং যুক্তি প্রমাণাদি যাহা পাওয়া যায়, তাহা সমস্তই উক্ত প্রকার অনুমানের বিরুদ্ধ। শূরসেন (আদিশূর) হইতে মাধবসেন পর্য্যন্ত এগার জন রাজা প্রায় তিন শত বৎসর বাঙ্গালা দেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন। যদি তাঁহারা ক্ষত্রিয় হইতেন, তবে তাঁহাদের জ্ঞাতি কুটুম্ব অবশ্যই বাঙ্গালা দেশে থাকিত। কিন্তু তাদৃশ কোন ক্ষত্রিয় বাঙ্গালা দেশে বা কোন নিকটবর্ত্তী স্থানে নাই এবং কখন ছিল বলিয়াও জানা যায় না। কোন শ্রেণীর হিন্দু রাজা স্বশ্রেণীর লোক ব্যতীত থাকিতে পারেন না। সুতরাং সেন রাজারা যে ক্ষত্রিয় ছিলেন না, ইহাই তাহার

অকাট্য প্রমাণ। দ্বিতীয়তঃ—ক্ষত্রিয়দিগের কোথাও কৌলিক "সেন" উপাধি নাই। তৃতীয়তঃ—রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগের কুলশাস্ত্রে ইহাঁদিগকে বৈদ্য-জাতীয় বলিয়া উল্লেখ আছে। চতুর্থতঃ—বৈদ্যদিগের মধ্যে লক্ষ্মণসেনের মতের বৈদ্য এবং বল্লালসেনের মতাবলম্বী বৈদ্য এখনও আছে। অতএব ইহাঁরা যে বৈদ্যজাতীয় ছিলেন, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

বৈদ্য রাজাদের পুত্র-কন্যাসহ ক্ষত্রিয় রাজাদের পুত্র-কন্যার বিবাহে আদান প্রদান প্রচলিত ছিল। আদিশূর কান্যকুব্জের ক্ষত্রিয় রাজা চন্দ্রকেতুর কন্যা চন্দ্র-মুখীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। এক সময়ে আদিশূরের রাজ্যমধ্যে অনাবৃষ্টি দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি ঈতি উপস্থিত হইল। রাণী কহিলেন—রাজার পাপে রাজ্য মধ্যে ঈতি হয়। অতএব রাজার চান্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্ত করা কর্ত্তব্য। রাজমন্ত্রিগণ এবং রাজা নিজেও তাহাই কর্ত্তব্য স্থির করিলেন। বাঙ্গালাদেশ বহুকাল বৌদ্ধ রাজার অধীন ছিল। বৌদ্ধদিগের প্রাধান্যে হিন্দু ধর্ম্মের কিছু গ্লানি হইয়াছিল। সেই জন্য এদেশীয় ব্রাহ্ম-ণেরা কতক ভ্রষ্টাচারী হইয়াছিল। ধর্ম্মশাস্ত্রে ও সংস্কৃত ভাষায় তাহাদের বিজ্ঞতা কম ছিল। অথচ সেই সময়ে কান্যকুব্জ আর্য্যধর্ম্মের এবং বিদ্যার আদর্শ স্থল ছিল। এদেশীয় ব্রাহ্মণেরা চান্দ্রায়ণ যজ্ঞ করাইতে অপারক হওয়ায় রাজা আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চগোত্রীয় পাঁচজন সুপণ্ডিত আনিয়া তাঁহাদের দ্বারা যজ্ঞ সম্পাদন করিলেন। তাহাতেই তাঁহার রাজ্যের সমস্ত দুর্নিমিত্ত শান্তি হইল। রাজা তদ্দৃষ্টে ভক্তি-পূর্ব্বক শ্রোত্রিয়গণকে প্রচুর দক্ষিণা দিলেন এবং গো অশ্ব শকটাদি দান করি-লেন। শ্রোত্রিয়েরা শাস্ত্রবিদ্যায় যেমন পারদর্শী ছিলেন, শস্ত্রবিদ্যায়ও সেইরূপ ছিলেন। তাঁহারা যেমন ধার্ম্মিক এবং পণ্ডিত ছিলেন, তেমনই বলবান্ বীর-পুরুষও ছিলেন। তাঁহারা দূরদেশে যাইতে শাস্ত্র এবং শস্ত্র উভয়ই সঙ্গে লইয়া যাইতেন। তাঁহারা শাপ দ্বারা এবং শর দ্বারা দুষ্ট দমন করিতে পারিতেন।

শ্রোত্রিয়েরা প্রত্যেকে একজন ভৃত্যসহ শাস্ত্র ও শস্ত্র লইয়া পদব্রজে গৌড়ে আসিয়াছিলেন। তথায় দক্ষিণা ও প্রতিগ্রহ প্রচুর পরিমাণে পাইয়া তাঁহারা অশ্ব আরোহণে স্বদেশে চলিলেন। তাঁহাদের ভৃত্যগণ তাঁহাদের প্রাপ্তধন শকটে চাপাইয়া তদুপরি আরোহণে প্রভুর পশ্চাতে চলিল। তাঁহারা স্বদেশে পৌছিলে, তাঁহাদের প্রতিবেশিগণ তাঁহাদের ঐশ্বর্য্য দৃষ্টে ঈর্ষাপরবশ হইয়া কহিল, "'কলৌ

বৈশ্যঃ শূদ্রবৎ'; সুতরাং তোমরা শূদ্রের পৌরোহিত্য করিয়া পতিত হইয়াছ। আমরা তোমাদের সহ আহার ব্যবহার করিব না।”

উক্ত পঞ্চ শ্রোত্রিয় রাজনিয়োগে গৌড়ে গিয়াছিলেন। তাঁহারা প্রতিবেশী দ্বিজগণ কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়া রাজার নিকট অভিযোগ করিলেন। রাজা চেষ্টা করিয়াও দলাদলি মিটাইতে পারিলেন না। তখন সেই পঞ্চ বিপ্র স্বদেশীয়-দিগকে “যবন-লাঞ্ছিত হও” বলিয়া অভিসম্পাত করিলেন এবং নিজ নিজ পরিবার ও দাসদাসীগণ সহ নৌকাপথে পুনরায় গৌড়ে প্রত্যাগমন করিলেন।

রাজা আদিশূর তাঁহাদিগকে পুনরাগত দেখিয়া অতীব হৃষ্ট হইলেন এবং তাঁহাদিগকে নিজ রাজধানীতে বাস করিতে অনুরোধ করিলেন। শ্রোত্রিয়গণ কহিলেন, “নগরবাসী ব্রাহ্মণেরা লোভী এবং পাপাচারী হয়। আমরা রাজধানীতে বাস করিব না। আমাদিগকে গঙ্গাতীরে বাসস্থান প্রদান করুন।” রাজা তদনুসারে গঙ্গা ও মহানন্দা নদীর সংযোগস্থলে তাঁহাদের বাসস্থান করিয়া দিলেন এবং তাঁহাদের ভরণপোষণ জন্য প্রত্যেককে এক একখানি গ্রাম ব্রহ্মত্র দিলেন। তাঁহাদের বাসস্থানের পার্শ্বেই তাঁহাদের ভৃত্য ও নৌকার মাল্লাগণের বাড়ী হইল। কাজেই এখানে কনোজীয় লোকের একটি উপনিবেশ স্থাপিত হইল। উক্ত পণ্ডিতগণের আবাস হেতু ঐ স্থান ভট্টশালী গ্রাম নামে খ্যাত হইল। সন ৯৪৪ শকাব্দে ইংরেজী ১০২২ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালা দেশে শ্রোত্রিয়দিগের বাস হইল। ঠিক সেই বৎসরেই মহম্মদ গাজী গজনবী কর্ত্তৃক কান্যকুব্জ লাঞ্ছিত হইয়াছিল। শ্রোত্রিয়েরা বংশানুক্রমে একশত ছাব্বিশ বৎসর কাল সেই একমাত্র ভট্টশালী গ্রামে বাস করিয়াছিলেন। তাঁহাদের যতই বংশ বৃদ্ধি হইতেছিল, অমনি বৈদ্য রাজারা তাঁহাদিগকে নূতন নূতন ব্রহ্মত্র দিতেছিলেন। কিন্তু শরীকী বিভাগে তাঁহাদের আবাসবাটী অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হইল এবং তাঁহাদের নবলব্ধ ব্রহ্মত্র বাসস্থান হইতে বহুদূরবর্ত্তী হইয়া পড়িল। তাঁহারা সেই অসুবিধা তৎকালীন রাজা বল্লালসেনের নিকট বিজ্ঞাপন করিলেন।

এরূপ অনুমান হয় যে, শ্রোত্রিয়দিগের অনুচর শূদ্রগণ সেই একশত ছাব্বিশ বৎসর একমাত্র ভট্টশালী গ্রামে আবদ্ধ ছিল না। শ্রোত্রিয়েরা বিস্তীর্ণ ব্রহ্মত্র পাইলে তাঁহাদের পরিচারকগণ তহশীলদার স্বরূপ হইয়াছিল। সেই তহশীলদারদের সন্তানগণ মধ্যে অনেকে লেখা পড়া শিখিয়া নানা স্থানে গিয়া নানা ব্যবসায় ও

রাজকার্য্য করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কেননা আমরা দেখিতে পাই যে, রাজা বল্লালসেনের এবং বঙ্গাধিপতি রামপাল রায়ের কতিপয় কর্ম্মচারী কায়স্থ ছিল। আর বল্লালের সময়ে যখন শ্রেণীবিভাগ হইয়াছিল, তখন ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যের মধ্যে কেবল বারেন্দ্র ও রাঢ়ী এই দুইটী মাত্র শ্রেণী হইয়াছিল; কিন্তু কায়স্থদের মধ্যে তিন শ্রেণী দেখিয়া স্পষ্ট বোধ হয় যে, তাঁহারা বরেন্দ্রভূমি, রাঢ় ও বঙ্গ তিন বিভাগেই বিস্তৃত হইয়াছিলেন। আর ইহাও সহজেই অনুমান করা যায় যে, শ্রোত্রিয়দের বহু ভৃত্য প্রয়োজনীয় ছিল না। তাঁহারা যাহাদিগকে নিজ চাকর না রাখিতেন, তাহাদের প্রতিপালনের কোনপ্রকার সুবিধার জন্য তৎকালিন রাজা ও প্রধান লোকদিগকে অনুরোধ করিতেন। সমস্ত লোক তাঁহাদের ভক্ত ছিল, এজন্য তাঁহাদের অনুরোধ কদাচ ব্যর্থ হইত না। এখানে ইহাও বলা উচিত যে, শ্রোত্রিয়েরা নিজে কোন চাকরী করিতেন না। কেহ কেহ আবশ্যক মত কোন কোন প্রধান রাজকার্য্য সময়ে সময়ে নির্ব্বাহ করিতেন বটে, কিন্তু বেতনভোগী চাকরী করেন নাই।

সেই একশত ছাব্বিশ বৎসর মধ্যে রাজা আদিশূর তদ্বংশীয় লাউসেন (লবসেন), নবজসেন ও চন্দ্রসেনের রাজত্ব শেষ হইয়াছিল এবং চন্দ্রসেনের দৌহিত্র বল্লাল-সেনের রাজত্ব চলিতেছিল। লাউসেন ও নবজসেনের কোন বৃত্তান্ত জানা যায় না। কেবল অনুমান হয় যে, তাঁহারা পালবংশীয়দিগের রাজ্যের কতকাংশ অধিকার করিয়া নিজ নিজ রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। চন্দ্রসেনের পুত্র ছিল না। একমাত্র কন্যা প্রভাবতীকে তিনি বিজয়সেনের সহ বিবাহ দিয়াছিলেন। বিজয়সেন শিবভক্ত পরম তপস্বী ছিলেন। চন্দ্রসেন জামাতাকে কহিলেন, "বৎস! যাহাকে ঈশ্বর ও জনসমাজ যে কার্য্যে নিয়োগ করিয়াছেন, সেই কার্য্য করাই তাহার পরম ধর্ম্ম। স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া পরধর্ম্ম অবলম্বন মহাপাপ। তুমি রাজকার্য্য কর এবং সেই কার্য্যে ধর্ম্মে মতি রাখিয়া চল। যোগী হইয়া স্বকার্য্য ত্যাগ করিলে পুণ্য না হইয়া পাপ হয়। ভগবান্ রামচন্দ্র ব্রাহ্মণ তপস্বীদিগকে ভক্তি করিতেন, কিন্তু শূদ্র তপস্বীর প্রাণদণ্ড করিয়াছিলেন। সকল লোক তপস্বী হইলে সংসার চলে না। তুমি সর্ব্বদা ঈশ্বর স্মরণ রাখ, সেটি ভাল কিন্তু নিজ ব্যবসায়িক কার্য্য করিতে অবহেলা করিও না। যদি কোন ভৃত্য নিজ কর্ত্তব্য কার্য্য না করিয়া কেবল প্রভুর মৌখিক প্রশংসা করিয়া সময় কর্ত্তন করে,

তবে কোন প্রভুই তাদৃশ ভৃত্যকে ভালবাসে না, বরং দণ্ডই দেয়। তেমনই তুমি ঈশ্বরের ভৃত্য। ঈশ্বর তাঁহার লক্ষ লক্ষ প্রজার ধন প্রাণ রক্ষার্থে তোমাকে শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়াছেন। তুমি সেই কার্য্য না করিয়া ধ্যান ধারণাতে সময় ক্ষেপণ করিলে, অপরাধী হইবে।" বিজয়সেন কহিলেন, "আমি রাজা বা রাজপুত্র হইয়া জন্মি নাই। আমি আপনকার জামাতা। আমি সম্পর্কে পুত্রতুল্য, কিন্তু আমি আপনকার উত্তরাধিকারী নহি। সুতরাং আমি রাজকার্য্য না করিলে, আমার কোন পাপ হইবে না। আপনকার দৌহিত্র হইলে তাহাকে এই উপদেশ দিবেন। আমার বিষয়বাসনা নাই, আমি কোন বৈষয়িক কার্য্য করিব না।" রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, "তোমার বিষয়বাসনা নাই, কিন্তু ক্ষুধা তৃষ্ণা আছে। নিজ অন্ন-বস্ত্রের জন্য চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। প্রতিপণ ব্যতীত যাহা কিছু গ্রহণ করা যায়, তাহাতেই অপহরণ হয়। তুমি যদি কোন মূল্য না দিয়া এবং কোন প্রত্যুপকার না করিয়া কাহারও নিকট অন্নবস্ত্র গ্রহণ কর, তবে তাহাও অপহরণ করা হয়।" বিজয় উগ্রভাবে কহিলেন, "আচ্ছা, আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম যে, অদ্যাবধি আমি আর পরান্ন গ্রহণ করিব না, পরগৃহে বাস করিব না এবং পরপ্রদত্ত কোন বস্ত্র বা অন্য কোন বস্তু স্পর্শ করিব না।"

বিজয়সেন সন্ন্যাসিবেশে গঙ্গাতীরে কংসহট্টে (কানসাট) চলিলেন। শ্বশুর, শাশুড়ী বা অন্য কাহারও কোন অনুরোধ শুনিলেন না। প্রভাবতী তাঁহার পশ্চাতে চলিলেন। বিজয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কোথা যাও?" প্রভাবতী কহিলেন, "তুমি যেখানে যাও, আমিও সেখানে যাব; তুমি যে ভাবে থাক, আমিও সেই ভাবেই থাকিব।"

বিজয়। তুমি তত কষ্ট সহিতে পারিবে না।

প্রভা। যাহা তুমি সহ্য করিবে, তাহা আমিও সহিব। স্বামীই স্ত্রীলোকের একমাত্র ঈশ্বর। পত্নীর ইহকাল পরকালের সুখ সমস্তই স্বামিসেবাতেই হয়। তুমি এখানে ছিলে তজ্জন্যই আমি পিতৃ-গৃহে ছিলাম। তুমি আমাকে সঙ্গে লইয়া যাও, নতুবা প্রাণ বধ করিয়া যাও। আমি প্রাণ থাকিতে তোমাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিব না।

বিজয়। তবে তুমি বহুমূল্য অলঙ্কার ত্যাগ কর।

প্রভা তৎক্ষণাৎ শাঁখা খাড়ু ব্যতীত সমস্ত অলঙ্কার ত্যাগ করিয়া কহিলেন,

"আর কি করিব ?" বিজয় হাস্য করিয়া কহিলেন, "এখন বুঝিলাম তুমি আমার যথার্থ ধর্ম্মপত্নী। তুমি আমার সঙ্গে চল।"

প্রভা "যে আজ্ঞা" বলিয়া স্বামীর পশ্চাতে চলিলেন। চতুর্দ্দিকে সকলে ধন্যবাদ করিতে লাগিল। বিজয়সেন প্রভাবতীসহ কানসাটে গিয়া এক পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে বাস করিতে লাগিলেন। বিজয় প্রত্যহ জঙ্গল হইতে ফল, মূল, কাষ্ঠ ও বৃক্ষপত্র আনিয়া বাজারে বিক্রয় করিতেন। তাহাতে যে মূল্য পাইতেন, তাহাই সাংসারিক ব্যয় জন্য পত্নীকে দিতেন। কিন্তু নিজে এক মুহূর্ত্তও "শিব শিব বম্ বম্" শব্দ ত্যাগ করিতেন না। প্রভাবতী দাসীর ন্যায় সমস্ত কার্য্য স্বহস্তে করিতেন এবং দিবানিশি "শিবদুর্গা" নাম জপ করিতেন। রাজা ও রাণী গোপনে প্রভাবতীর আর্থিক সাহায্য করিতে চাহিলেন। প্রভাবতী কহিলেন, "আমি গোপনে প্রত্যহ সাহায্য লইলে তাহা কদাচ অপ্রকাশ থাকিবে না; বিশেষতঃ আমার স্বামী তপস্বী, তিনি দেবানুগ্রহে সমস্ত জানিতে পারিবেন। আপনারা যদি সাহায্য করিতে চাহেন, তবে আমার স্বামী যাহা বিক্রয় করেন, আপনারা অন্য লোক দ্বারা তাহাই কিছু বেশী মূল্যে ক্রয় করিবেন। ইহাতে আমার সাহায্য হইবে, অথচ কোন অপরাধ হইবে না।" রাজা রাণী এবং মন্ত্রী এই পরামর্শই সঙ্গত বোধ করিলেন। তাঁহারা বিজয়সেনের পণ্য যাহা পূর্ব্বে পাঁচ ছয় বুড়ী কৌড়ী মূল্যে বিক্রীত হইত, তাহাই এক কাহন মূল্যে ক্রয় করিতে লাগিলেন। বিজয়সেন তাদৃশ মূল্যবৃদ্ধির কারণ বুঝিলেন না। এইরূপে এক হাজার এক শত এগার দিন গত হইলে তাঁহার ভাগ্য প্রসন্ন হইল।

বঙ্গদেশের অধিপতি রামপাল রায় পরম শৈব ছিলেন। তিনি নিজের একমাত্র পুত্র যক্ষপালের গুরুতর অপরাধ হেতু প্রাণদণ্ড করিয়াছিলেন। পৃথিবীতে রামপালের স্বগণ কেহই ছিল না। গঙ্গাতীরে কানসাট তখন তীর্থস্থান ছিল। রামপাল শম্ভুধ্যানে অনশনে জীবন শেষ করিবার জন্য কানসাট আসিলেন। রাত্রিতে মহাদেব রামপালের নিকট আবির্ভূত হইয়া কহিলেন, "নৃপসত্তম! তোমার স্ত্রী, পুত্র ও বধূ সকলেই তোমার পুণ্যে কৈলাসে গিয়া তোমার প্রতীক্ষা করিতেছে। তুমি আমার পরম ভক্ত বিজয়সেন ও প্রভাবতীকে রাজ্য দান কর। পরশ্ব দিবস অর্দ্ধপ্রহর বেলায় তোমার উদ্ধার হইবে।" রাজা রামপাল রায় শৈবাদেশ মত বিজয়সেন ও প্রভাবতীকে নিজ উত্তরাধিকারী নির্দ্দেশ করিয়া

ইহলোক ত্যাগ করিলেন। রাজমন্ত্রী দামোদর ঘোষ বিজয়সেনের কুটীরে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের দৈন্যাবস্থা দৃষ্টে তুচ্ছ বোধ করিয়াছিলেন। পরে তাঁহাদের আভিজাত্য ও ধর্ম্মনিষ্ঠা জানিতে পারিয়া নূতন প্রভুকে ভক্তিপূর্ব্বক সম্বর্দ্ধনা করিলেন। বিষয়বিরাগী বিজয়সেন প্রথমতঃ রাজ্যগ্রহণে সম্মত হইলেন না। পরে মহাদেবের আদেশে তিনি রাজ্য গ্রহণ করিলেন বটে, কিন্তু তিনি মধ্যাহ্নে আহারান্তে চারিদণ্ড মাত্র রাজকার্য্য করিতেন। তিনি অবশিষ্ট সমস্ত সময় কেবল জপ তপে কাটাইতেন। রাজ্ঞী প্রভাবতী বুদ্ধিমতী ও বিদুষী ছিলেন। মন্ত্রী দামোদর অভিজ্ঞ বিচক্ষণ লোক ছিলেন। তাঁহারাই সমস্ত রাজকার্য্য চালাইতেন। বিজয়সেনের পুণ্যবলে তাঁহার প্রজাগণ নীরোগ ও সুখী হইল।

বল্লালসেন।

ওষধিনাথ-নামক এক দক্ষিণী ব্রাহ্মণ একটী ক্ষত্রিয়জাতীয়া পত্নী লইয়া ত্রিবেণীতে গঙ্গাবাস করিতেছিলেন। তাঁহাদের সন্তান সামন্তসেন ব্রহ্মক্ষত্র। ক্ষত্রিয় ও বৈদ্যেরা ব্রহ্মক্ষত্রগণকে কুলীন জ্ঞান করিত। সামন্তসেন এক বৈদ্য সামন্তের কন্যা বিবাহ করিয়া বৈদ্যজাতিতে মিলিত হইয়াছিলেন। তাঁহার আহার-ব্যবহার, পুত্র-কন্যার বিবাহ প্রভৃতি সমস্ত সামাজিক ক্রিয়া বোধ হয় বৈদ্যদের সহ হইয়াছিল। তাঁহার পুত্র হেমন্তসেনও বৈদ্যকন্যাই বিবাহ করিয়াছিলেন। হেমন্তের পুত্র বিজয়সেন গৌড়াধিপতি চন্দ্রসেনের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহারই পুত্র রাজাধিরাজ বল্লালসেন। অধুনিক অনেকে বল্লালসেনকে ব্রহ্মক্ষত্র বলেন। কিন্তু বল্লালচরিত-পাঠে জানা যায় যে, বল্লাল আপনাকে বৈদ্যজাতীয় বলিয়া পরিচয় দিতেন। সামন্তসেন ব্রহ্মক্ষত্র ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি ও তাঁহার বংশধরেরা বৈদ্যসমাজে মিলিত হওয়ায় তাঁহাদিগকে বৈদ্যজাতীয় বলাই সঙ্গত। প্রাচীন পণ্ডিতেরা সকলেই তাঁহাদিগকে বৈদ্য বলিয়া জ্ঞান করিতেন। কেহ বলেন যে, রাজা আদিশূরের বংশের পর এবং বিজয়সেনের পূর্ব্বে বৈদ্যরাজত্ব লুপ্ত হইয়া মধ্যে কিছু দিন পালবংশের রাজত্ব হইয়াছিল; তাহা ভুল। আদিশূরের বংশের দৌহিত্রকুলে বল্লালের জন্ম হয়, ইহা বারেন্দ্রকুলপঞ্জিকায় স্পষ্ট লেখা আছে। যৎকালে আদিশূরের বংশীয়েরা রাজত্ব করিতেছিলেন, সেই সময়ে স্থানে স্থানে পালউপাধিধারী রাজাও ছিল। তাহারাও আপনাদিগকে গৌড়দেশাধিপতি বলিয়া পরিচয় দিতেন। তজ্জন্যই ঈদৃশ ভ্রম

হইতে পারে। প্রকৃত পক্ষে আদিশূর হইতে মুসলমান-অধিকার পর্য্যন্ত বৈদ্য-রাজত্ব ধারাবাহিক রূপে চলিয়াছিল, তাহার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়।

আধুনিক কেহ কেহ আদিশূরের বংশীয় প্রত্যেক ব্যক্তির নামেই 'শূর' শব্দ যোগ করেন। রাঢ়ী বারেন্দ্র কুলশাস্ত্রে এরূপ নাম নাই এবং বল্লালচরিতেও নাই। পূর্ব্বে এরূপ নাম শুনা যায় নাই। অনুমান হয় যে, রাজা শূরসেনের যেমন আদিশূর উপাধি হইয়াছিল, সেইরূপ তাঁহার বংশীয় লাউসেন, নবজসেন প্রভৃতিরও ভূশূর, মহীশূর প্রভৃতি উপাধি হইয়া থাকিবে। উহা যে প্রকৃত নাম নহে, তাহা নিশ্চিত।

যে সময়ে বিজয়সেন বঙ্গদেশে রাজত্ব করিতেছিলেন, সেই সময়ে ১০৩৩ শকাব্দে রামপাল নগরে বল্লালসেনের জন্ম হয়। বল্লাল, বিজয়সেনের ঔরস পুত্র নহেন। শৈব বরে বল্লালের জন্ম হওয়াতে বিজয়সেন পুত্রের নাম "বর-লাল" রাখিয়াছিলেন। বল্লাল শব্দ তাহারই অপভ্রংশ। বল্লাল দীর্ঘকায়, বল-বান্, বুদ্ধিমান্, মেধাবী এবং সর্ব্বসুলক্ষণযুক্ত পরমসুন্দরাকৃতি ছিলেন। তিনি চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়সেই শস্ত্রবিদ্যায় এবং শাস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী হইয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় মিষ্টভাষী এবং শিষ্টাচারী কেহ ছিল না।

বল্লালের চৌদ্দ বৎসর বয়সের সময় তাঁহার মাতামহ সাংঘাতিক পীড়িত হইয়া তাঁহাকে নিকটে আহ্বান করিলেন। বল্লাল ও প্রভাবতী বিজয়সেনের তদ্বিষয়ে অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। বিজয় কহিলেন, "আমি শ্বশুরের কোনরূপ সাহায্য লইব না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি বটে, কিন্তু তাহাতে তোমাদের কোন বাধা নাই। তোমরা তাঁহার সন্তান। তাঁহার আসন্ন সময়ে তাঁহার সেবা করা তোমাদের লোকতঃ ধর্ম্মতঃ একান্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম। আমি স্বচ্ছন্দচিত্তে অনুমতি দিতেছি যে, তোমরা তাঁহার নিকট গিয়া শুশ্রূষায় রত হও।" প্রভাবতী পুত্রসহ গৌড়ে গিয়া পিতার চরণ ধরিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। রাজা চন্দ্রসেন হাস্য করিয়া কহিলেন, "তোমার কোন দোষ নাই, ক্ষমা কি করিব? তুমি যে পিতৃ-গৃহ ত্যাগ করিয়া স্বামীর অনুসরণ করিয়াছিলে, তাহা উত্তম। তুমি যে সর্ব্বসুখ ত্যাগ করিয়া দাসীর ন্যায় দরিদ্র স্বামীর সেবা করিয়াছ, তাহা শ্লাঘ্য। তোমার রাজ্যলাভ ও সুসন্তানলাভ আমি পরম লাভ জ্ঞান করি। আর বিজয় যে তোমাদিগকে এখানে আসিতে সম্মতি দিয়াছে, তাহাতে আমি তুষ্ট হইলাম।

তোমার পুত্রই আমার একমাত্র উত্তরাধিকারী। আমি তাহাকে রাজ্য দিয়া অচিরে গঙ্গাযাত্রা করিব।" বল্লালকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়া রাজা চন্দ্রসেন কানসাটে গমন করিলেন। বল্লাল ও প্রভাবতী তাঁহার সঙ্গে গেলেন। বিজয়সেনও তথায় আসিয়া শ্বশুরের সেবা করিতেন, কিন্তু কদাচ শ্বশুরগৃহে জলগ্রহণ করিতেন না। চন্দ্রসেনের মৃত্যু হইলে তৎপত্নী স্বামীর চিতায় সহমৃতা হইলেন। বল্লাল দুই বৎসর গৌড়ে রাজত্ব করার পর তাঁহার ষোড়শ বর্ষ উত্তীর্ণ হইল দেখিয়া বিজয়সেন বল্লালের বিবাহ দিয়া বঙ্গরাজ্যেও তাঁহাকে রাজা করিলেন এবং নিজে সন্ন্যাসী হইয়া তীর্থযাত্রা করিলেন। এই তীর্থযাত্রা হইতে তিনি আর প্রত্যাগমন করেন নাই। সেতুবন্ধ রামেশ্বরে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল বলিয়া প্রবাদ আছে।

এইরূপে বল্লাল মাতামহের এবং পিতার উত্তরাধিকারিস্বত্বে গৌড় ও বঙ্গ দুইটি রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া অতিশয় পরাক্রান্ত হইয়াছিলেন। তিনিই সমস্ত বরেন্দ্রভূমি, রাঢ়, বঙ্গ, বগ্‌দি, মিথিলা জয় করিয়া সম্পূর্ণ স্বায়ত্ত করিয়াছিলেন, এবং পালরাজবংশ সহ বৌদ্ধ রাজত্বের শেষ চিহ্ন* পর্য্যন্ত নিঃশেষ করিয়া বাঙ্গালাদেশে সনাতন ধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে পুনঃ স্থাপন করিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন আরও সাতটি দেশের রাজগণ তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিয়া তাঁহাকে অনুকর দিতেন। বল্লাল দ্বাদশ রাজ্যের অধিপতি হইয়া বিশ্বজিৎ যজ্ঞ করিলেন, এবং সার্ব্বভৌম সম্রাট্ উপাধি ধারণ করিলেন। এই উপলক্ষে তিনি শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণদিগের প্রত্যেককে এক এক সুবর্ণগাভী ও অন্যান্য দ্রব্যাদি দান করিয়াছিলেন। প্রত্যেক সুবর্ণ গাভী ওজনে একশত আট তোলা ছিল।

ভট্টশালীগ্রাম-নিবাসী শ্রোত্রিয়দিগের সংখ্যা অতিমাত্র বৃদ্ধি হইয়াছিল, তজ্জন্য তাঁহাদের একই গ্রামে বাস করা অসম্ভব হইয়াছিল। তাঁহারা সেই অসুবিধা সম্রাটের নিকট বিজ্ঞাপন করিলে, বল্লাল তাঁহাদের মধ্যে কতকগুলিকে নিজ প্রকাণ্ড রাজ্যের নানা স্থানে প্রেরণ করিয়া তথায় তাঁহাদের ভরণ-পোষণের

* বৌদ্ধদের বহু মঠ ও সংঘারাম ছিল। সংঘারাম শব্দটি সংস্কৃত সংগ্রহম্ শব্দের অপভ্রংশ। ইহাতে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা একত্র বাস করিতেন। বল্লাল সেই মঠ ও সংঘারামগুলি দেবালয়রূপে পরিণত করিয়াছিলেন।

যোগ্য ব্রহ্মত্র দিয়াছিলেন। আর একশত ছাপান্ন ঘর শ্রোত্রিয়গণকে নিজ রাজধানীর নিকটেই রাখিয়া এক এক ঘরকে এক এক বিভিন্ন গ্রামে বাসস্থান দিয়া সেই সেই গ্রামেই তাঁহাদের ব্রহ্মত্র দিয়াছিলেন। ইহাঁদের মধ্যে একশত ঘর গঙ্গার বাম পারে বরেন্দ্রভূমিতে বাসস্থান পাইয়া বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। আর ছাপান্ন ঘর গঙ্গার অপর পারে রাঢ় দেশে ব্রহ্মত্র পাইয়া তথায় বাস করায় রাঢ়ী ব্রাহ্মণ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আর সেই সময়ে যিনি যে গ্রামে বাস করিয়াছিলেন, তদ্বংশীয়েরা সেই গাঁই বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। ইহাই রাঢ়ী ও বারেন্দ্র বিভাগের প্রকৃত কারণ। ইদানীন্তন অনেকে শ্রোত্রিয়দের রাঢ়ী ও বারেন্দ্র বিভাগের অন্যান্য নানারূপ কারণ বলিয়া থাকেন, কিন্তু তাহার একটিও যুক্তিসঙ্গত হয় না। যে পঞ্চ ব্রাহ্মণ প্রথম গৌড়ে আগমন করেন, তাঁহাদের নাম বারেন্দ্র মতে নারায়ণ, সুষেণ, পরাশর, ধরাধর ও গৌতম। কিন্তু রাঢ়ীয় মতে তাঁহাদের নাম (ভট্ট) নারায়ণ, দক্ষ, শ্রীহর্ষ, বেদগর্ভ ও ছান্দড়। এইরূপ নামের ভিন্নতা দৃষ্টেই বোধ হয় তাঁহাদের ভিন্নতা কল্পিত হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে উক্ত নামেরই ভিন্নতা, ব্যক্তির ভিন্নতা নহে। ঘটনা যখন ঠিক একই প্রকার, তখন নামের ভিন্নতা, ব্যক্তির ভিন্নতা হইতে পারে না। ব্রাহ্মণ মাত্রে সকলেরই দুইটি করিয়া নাম থাকে। একটি প্রকাশ্য ডাকিবার নাম, আর একটি সঙ্কল্পের নাম। প্রকাশ্য নাম কখন বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দ হয়, কখন বা পাঁচকড়ি, বেচারাম, প্রভৃতি অসংস্কৃত শব্দও হয়। কিন্তু সঙ্কল্পের নামগুলি সর্ব্বত্রই বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দ। ছান্দড় শব্দটি বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দ নহে। তদ্দৃষ্টে অনুমান হয় যে, রাঢ়ীর কুলশাস্ত্রে উক্ত পঞ্চ ব্রাহ্মণের প্রকাশ্য নাম গৃহীত হইয়াছে, আর বারেন্দ্র কুলশাস্ত্রে তাঁহাদের সঙ্কল্পের নাম গৃহীত হইয়াছে। রাঢ়ী বারেন্দ্র বিভাগ যে কেবল ব্রাহ্মণের মধ্যে আছে, তাহা নহে। বৈদ্য, কায়স্থ এবং অধিকাংশ অপর জাতির মধ্যেও আছে। বঙ্গরাজ রামপাল কর্ত্তৃক বহুসংখ্যক কায়স্থ পূর্ব্ববঙ্গে স্থাপিত হওয়ায় কায়স্থদিগের মধ্যে রাঢ়ী, বারেন্দ্র এবং বঙ্গজ, এই তিন শ্রেণী হইয়াছিল। পরে আবার কায়স্থদের মধ্যে উত্তররাঢ়ী ও দক্ষিণরাঢ়ী বিভাগ হওয়ায় কায়স্থের চারি শ্রেণী হইয়াছে। এই সকল শ্রেণী ও গাঁই বিভাগ যে কেবল বাসস্থানের নাম অনুসারে হইয়াছে, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু পরবর্ত্তী কালে লোকের বাসস্থান যত কেন পরবর্ত্তিত হউক না,

তজ্জন্য তাহাদের শ্রেণী বা গতি পরিবর্ত্তন হয় নাই।

যত দিন শ্রোত্রিয়েরা সকলেই একমাত্র ভট্টশালী গ্রামে বাস করিয়াছিলেন, ততদিন তাঁহারা আপনাদিগকে বাঙ্গালী বলিয়া জ্ঞান করিতেন না। তাঁহারা কনোজের ভাষা, পরিচ্ছদ, আচার, ব্যবহার সমস্তই আপনাদের মধ্যে ঠিক রাখিয়াছিলেন। বাঙ্গালী লোকেও তাঁহাদিগকে পশ্চিমা ঠাকুর বলিত। পরে যখন তাঁহারা এক এক ঘর এক এক বিভিন্ন গ্রামে গিয়া বাস করিলেন, তখন সমস্ত বাঙ্গালীর মধ্যে এক ঘর পশ্চিমা ঠাকুর পূর্ব্ববৎ পার্থক্য রক্ষা করিতে পারিলেন না। কোন কোন বিষয়ে বাঙ্গালী লোকে তাঁহাদের অনুকরণ করিল, আবার কোন কোন বিষয়ে তাঁহারা বাঙ্গালীর অনুকরণ করিলেন; ফলতঃ তদবধি তাঁহারা ক্রমে ক্রমে বাঙ্গালী হইলেন।

সভ্য জাতির মধ্যে সম্মান অতীব আদরণীয় পদার্থ। সম্মানলাভার্থে অথবা সম্মানরক্ষার্থে লোকে বহু কষ্ট স্বীকার করিতে পারে; এমন কি ধন, প্রাণ সর্ব্বস্ব দিতে পারে! সম্মানলাভার্থে সমস্ত প্রজা সৎপথে চলিবে, এই উদ্দেশ্যে বল্লালসেন কৌলীন্য মর্য্যাদা সৃষ্টি করিয়াছিলেন। শ্রোত্রিয়গণ মধ্যে যাঁহারা নবগুণবিশিষ্ট*ছিলেন, বল্লাল তাঁহাদিগকে কুলীন উপাধি দিয়াছিলেন। আর যাঁহারা অন্যূন ছয়টি গুণবিশিষ্ট, তাঁহারা সিদ্ধ-শ্রোত্রিয়; অবশিষ্ট সমস্তই কষ্ট-শ্রোত্রিয় হইয়াছিলেন। বৈদ্যদিগের মধ্যে যাহারা ধার্ম্মিক ও গুণবান এবং কায়স্থদিগের মধ্যে যাহারা শ্রোত্রিয়দের পরিচারক-সন্তান, বল্লাল তাহাদিগকেই কুলীন উপাধি দিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, শ্রোত্রিয়দের পরিচারক শূদ্রেরা অনেকে অবস্থা উন্নত করিয়াছিল। তন্মধ্যে দত্ত-গোষ্ঠীয়দের অবস্থাই বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা ভাল হইয়াছিল। তাহারা আপনাদিগকে পরিচারক-সন্তান বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করিয়া আনুযাত্রিক বলিয়া পরিচয় দিল। কিন্তু ঘোষ, বসু, গুহ ও মিত্র-বংশীয় পরিচারক-সন্তানদের সাক্ষ্য দ্বারা দত্ত-গোষ্ঠীর পরিচারকত্ব প্রমাণ হওয়ায় সম্রাট্ তাহাদিগকে মিথ্যাবাদী বলিয়া অকুলীন করিলেন। তজ্জন্য ঘোষ, বসু, গুহ ও মিত্রগোষ্ঠী কায়স্থদের মধ্যে কুলীন হইল; আর দত্তগোষ্ঠী এবং অপর অনুচর-সন্তানগণ সকলেই অকুলীন হইল। ইহারাই এক্ষণে মৌলিক কায়স্থ নামে খ্যাত †।

* আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনং। নিষ্ঠা শান্তিস্তপো দানং নবধা কুললক্ষণং॥

† রাজা রামপাল প্রভৃতি যে সকল উন্নত অবস্থাপন্ন শূদ্র, কায়স্থ জাতিতে মিলিত হইয়াছিলেন

তিলী, তাঁতি, কামার, কুমার প্রভৃতি সৎশূদ্রদের গুণ ও সঙ্গতি দেখিয়া তাহাদের শ্রেষ্ঠ লোকদিগকে বল্লাল কুলীন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাদিগকে তিনি কুলীন উপাধি দেন নাই। তাহাদের কুলীনেরা মানী বা পরামাণিক নামে খ্যাত। অবশিষ্ট অপশূদ্রদের বল্লালী মর্য্যাদা হয় নাই। বল্লাল সেই সকল মর্য্যাদা পুরুষানুক্রমিক করেন নাই। তিনি নিয়ম করিয়াছিলেন যে, প্রত্যেক ছত্রিশ বৎসর অন্তে এক এক বার বাছনি হইবে, এবং তাহাতে গুণ ও কর্ম্ম দৃষ্টে পুনরায় কুলীন ও অকুলীন নির্ব্বাচিত হইবে। সুতরাং কুলমর্য্যাদা লাভার্থে সকলেই ধার্ম্মিক এবং গুণবান্ হইতে চেষ্টা করিবে। বল্লালের সেই আশা প্রথম প্রথম কতক সফলও হইয়াছিল। কিন্তু লক্ষ্মণসেনকৃত ব্যবস্থায় সেই কৌলীন্য-প্রথায় যে কুফল হইয়াছিল, তাহা পরে বর্ণিত হইবে।

অতি প্রাচীন বড় লোকদের যেমন সর্ব্বত্রই একই চরিত্র দেখা যায়, কলিযুগে বড় লোকদের চরিত্র তদ্রূপ নহে। তাঁহারা বহুরূপীর ন্যায় অবস্থানুসারে বিভিন্ন চরিত্র ধারণ করিতেন। বল্লালও সেইরূপ ছিলেন। তিনি গুরুজনের নিকট পরম ভক্ত, পিতামাতার নিকট আদরের ছেলে, যজ্ঞস্থলে পরম ধার্ম্মিক ও দাতা, সভা মধ্যে পণ্ডিত, যুদ্ধস্থলে মহাবীর, শত্রুদমনে চতুর প্রবঞ্চক এবং উপপত্নী-আগারে লম্পট মাতাল ছিলেন। পণ্ডিতেরা "বল্লালো নৃপসত্তমঃ" বলিয়া তাঁহার প্রশংসা করিতেন, এবং প্রজা ও ভৃত্যগণ "নৃপেষু বল্লালঃ শ্রেষ্ঠঃ" বলিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিত। তিনি ৪২ বৎসর কাল সর্ব্বজন-প্রশংসনীয়রূপে রাজত্ব করিয়াছিলেন। যদি শেষ পর্য্যন্ত সেই ভাব চলিত, তবে বল্লাল একজন দেবাবতার বলিয়া গণ্য হইতে পারিতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এমন দুইটি ঘটনা ঘটিল, যাহার জন্য সেই বল্লাল সর্ব্বজননিন্দিত হইয়া শেষ জীবন অতিবাহিত করিলেন।

এখন যেমন বৈদ্য ও কায়স্থ জাতি মধ্যে জিগীষা ভাব চলিতেছে, পূর্ব্বে বৈদ্য ও বৈশ্য মধ্যে তদ্বৎ জিগীষা ছিল। বাঙ্গালা দেশের বৈশ্যেরা সুবর্ণবণিক্, স্বর্ণকার, গন্ধবণিক্ এবং শঙ্খবণিক্ এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। গন্ধ-বণিকদের মধ্যে যাহারা মহাজনী করিত তাহারা সাধু বণিক ও সাহুকার নামে খ্যাত ছিল। তন্মধ্যে সুবর্ণবণিকেরাই সর্ব্বাপেক্ষা ধনী ও প্রবল ছিল। বল্লভানন্দ শেঠ

তাহারাও অকুলীন। কৃত্রিম কায়স্থ অনেক হইয়াছে, কিন্তু তাহারা কেহই কুলীন হইতে পারে নাই।

(শ্রেষ্ঠী) তাহাদের নেতা ছিলেন। তাঁহার ষোল কোটি টাকার সঙ্গতি ছিল। বাঙ্গালা দেশে বৈশ্যেরাও বৈশ্যশ্রেণীতেই গণ্য ছিল। বৈশ্যেরা রাজপদ লাভ করিলে অন্যান্য বৈশ্যেরা তাহাদের সহ স্পষ্ট কোন বিবাদ করিত না। কিন্তু সুবর্ণবণিকেরা বৈশ্য-দিগকে ভয় না করিয়', তাহাদের সহ জেদ বাদ করিয়া চলিত। তাহাদিগকে অপদস্থ করিতে বৈশ্য রাজাদের ইচ্ছা প্রবল ছিল। কিন্তু সুযোগ অভাবে কিছুই করিতে পারেন নাই। বল্লালের সময়ে সেই বিষয়ে একটি সুযোগ উপস্থিত হইল।

কুন্দন আচার্য্য নামক এক ব্রাহ্মণের বাটীতে অর্দ্ধরাত্র কালে এক ব্রাহ্মণ অতিথি উপস্থিত লইল। কুন্দন বাড়ীতে ছিলেন না। তাঁহার পত্নীর হাতে কোন রোকড় টাকা কড়ী ছিল না। এত রাত্রিতে ধারে কোন দ্রব্য পাওয়া যায় না। অথচ অতিথিসেবা না করিলেও অধর্ম্ম হয়। দ্বিজপত্নী এই সঙ্কটে পড়িয়া রাজদত্ত সুবর্ণ ধেনু গচ্ছিত রাখিয়া মণিদত্ত নামক সুবর্ণবণিকের দোকান হইতে পঞ্চ বুটিকা (এক পয়সা) মূল্যের দ্রব্য আনিয়া অতিথির ভোজন করাইলেন। পরদিন কুন্দন গৃহে আসিয়া পত্নীর নিকট বৃত্তান্ত শুনিলেন এবং মণিদত্তের নিকটে গিয়া দ্রব্যমূল্য লইয়া স্বর্ণগাভী প্রত্যর্পণ করিতে বলিলেন।

মণিদত্ত দুর্লোভের বশীভূত হইয়া সমস্ত ঘটনাই অস্বীকার করিল। কুন্দন নগরপালকে সংবাদ দিলেন। এদিকে মণিদত্ত সুবর্ণগাভী ভাঙ্গিয়া একটি ঢেঁপা তৈয়ারী করিল। নগরপাল সেই ঢেঁপার ওজন ঠিক ১০৮ তোলা দেখিয়া সন্দিহান হইল এবং ঢেঁপা সহ বণিক্‌কে বিচারার্থ চালান করিল। বল্লাল স্বয়ং সেই মকদ্দমায় বিচার করিতে বসিলেন। এই উপলক্ষে সমস্ত সুবর্ণবণিক্‌দিগকে পাতিত করা তাঁহার মনস্থ ছিল। মণিদত্ত বল্লভানন্দের ভাগিনেয়, সম্রাট্ তাহা জানিতেন। এজন্য তিনি বল্লভানন্দ শেঠকে ডাকিয়া ঐ সোণার গোলাতে অন্য কিছু মিশ্রিত আছে কি না তদ্বিষয়ে প্রশ্ন করিলেন। বল্লভ ভাগিনার স্নেহে মিথ্যা বলিলেন। বল্লাল তখন অন্যান্য সুবর্ণবণিক্‌দিগকে ডাকিয়া একে একে জিজ্ঞাসা করিলেন,তাহারা সকলেই তাহাদের দলপতি বল্লভানন্দের উক্তি সমর্থন করিল। তাহার পর বল্লাল গন্ধবণিক্ ও শঙ্খবণিক্‌দের মতামত জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা কহিল, "আমরা সুবর্ণপরীক্ষায় সুপটু নহি, মহারাজ, স্বর্ণকারদিগকে জিজ্ঞাসা করুন।" সম্রাট্ স্বর্ণকারদিগকে তলপ করিলেন। বল্লভানন্দ নিজ মিথ্যাবাক্য ধরা পড়িবে বুঝিয়া উৎকোচ দ্বারা স্বর্ণকারদিগকে বশীভূত করিলেন। তাহারাও

শেঠের উক্তিই পোষণ করিল। কুন্দন সেই স্বর্ণ-গোলা নিজ স্বর্ণ-গাভীর বিকৃতি বলিয়া জিদ করিতে লাগিলেন। বল্লাল কাশীধাম হইতে স্বর্ণকার আনাইলেন। তাহাদিগকে এরূপ সাবধানে পরিবেষ্টিত রাখিলেন যে, তাহাদের সহ কেহ কোন ঘুষের চুক্তি করিতে পারিল না। সেই স্বর্ণকারেরা অষ্টধাতু ও অলক্তক-মিশ্রিত স্বর্ণ উক্ত ঢেঁপাতে প্রমাণ করিল। বল্লাল সেই বিদেশীয় স্বর্ণকারদিগকে পুরস্কার দিয়া বিদায় করিলেন। সোণার ঢেঁপা এবং ক্ষতিপূরণ দিয়া কুন্দন আচার্য্যকে বিদায় দিলেন। তাহার পর স্বর্ণকার ও সুবর্ণবণিক্‌দিগকে পাতিত করিয়া কহিলেন, "অদ্যাবধি এই সুবর্ণকীটেরা বিষ্ঠার কৃমি অপেক্ষাও অপকৃষ্ট গণ্য হইবে।" তাহাদের সমস্ত সম্পত্তি নিঃসাৎ অর্থাৎ জব্দ হইল। তিনি তাহাদের মস্তক মুণ্ডন করাইয়া বগ্‌দির দক্ষিণাংশে নির্ব্বাসিত করিলেন। তাহারাই এখন 'সোণার বাণিয়া' এবং 'স্যাকরা' নামে পরিচিত। বাঙ্গালাদেশের আভ্যন্তরিক ইতিহাসে এই ঘটনা অতি গুরুতর। তাহার ফলাফল এখনও বাঙ্গালাদেশে বিদ্যমান আছে। স্বর্ণবণিক্ ও স্বর্ণকারদের পতনে দেশের অবস্থা অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল।

বল্লালের মাসিক লক্ষ নিষ্ক আয় ছিল। দুশ টাকা মূল্যের স্বর্ণ-মুদ্রার নাম নিষ্ক।* সুতরাং বল্লালের প্রকাণ্ড সাম্রাজ্যের বার্ষিক আয় মোট এক কোটি বিংশতি লক্ষ টাকা ছিল। তৎকালে সমস্ত দ্রব্যের মূল্য কম ছিল। সুতরাং তখন এই আয় অসাধারণ বলিয়া গণ্য ছিল। তথাপি তাহাতে বল্লালের ব্যয় সঙ্কুলন হইত না। তাঁহার সদসৎ ব্যয় অত্যন্ত বেশি ছিল। তিনি সর্ব্বদাই ঋণগ্রস্ত ছিলেন। সুবর্ণবণিক্ ও স্বর্ণকারদের সমস্ত ধন জব্দ হওয়ায় বল্লালের দারিদ্র্য মোচন হইল। যে ধন কয়েক জন বণিকের নিজস্ব ছিল, বল্লালের দানশীলতায় সেই ধন সমস্ত সাম্রাজ্যে বিস্তৃত হইল। তাঁহার রাজ্যে দরিদ্র কেহই থাকিল না। কোন ব্যক্তির প্রচুর আয় সত্ত্বেও সর্ব্বদা অনাটন থাকিলে তাহার দারিদ্র্যকে লোকে এখনও "বল্লালী দারিদ্র্য" বলে। ইদানীং মুর্শিদাবাদের নবাবেরও ঠিক বল্লালের ন্যায় দরিদ্র অবস্থা হওয়ায় ঈদৃশ দারিদ্র্যকে "নবাবী দারিদ্র্যও" বলা হয়।

সুবর্ণবণিকদের পতনে বৈশ্য বণিকের সংখ্যা কম হওয়ায় শুঁড়ী ও তিলী জাতীয় কতকগুলি লোক সম্রাটের অনুমতি লইয়া দোকানদারী ও মহাজনী

* তখন এক তোলা স্বর্ণের মূল্য ১৬৲ টাকা ছিল। এখন স্বর্ণের মূল্য বৃদ্ধি হইয়া এক তোলার দাম ২৫৲ টাকা হইয়াছে। সুতরাং এখন এক নিষ্কের মূল্য ৩১।৵০ আনা।

ব্যবসায় আরম্ভ করিল। সংস্কৃত ভাষায় বণিকদিগকে "সাধু" বলে। ব্রজ ভাষায় তাহার অপভ্রংশে সাহু বলে, তদপভ্রংশে বাঙ্গালা ভাষায় সাউ বলে। সৌ, সাহা এবং সা শব্দ সেই সাউ শব্দ হইতে উৎপন্ন। পূর্ব্বে অনেক ব্যবসায়ীদের জাতি নির্ব্বিশেষে একই উপাধি হইত কিন্তু তদ্দ্বারা তাহাদের জাতি পরিবর্ত্তিত হইত না। বাণিজ্য ব্যবসায়ী বৈশ্য সন্তান গন্ধবণিকদের ও সাধুবণিকদের যেমন সাহা উপাধি হইয়াছে সেইরূপ বাণিজ্যব্যবসায়ী শুঁড়ী, তিলী, কৈবর্ত্ত, মুসলমান প্রভৃতিরও সাহা উপাধি হইয়াছে। অনেকে চাকরী দ্বারাও সেইরূপ নানা জাতীয় লোকের একই উপাধি হইয়াছে, যেমন—খাঁ, মুন্সী, বখ্শী ইত্যাদি। আবার জমিদারী তালুকদারী প্রভৃতি সম্পত্তি হেতুও নানা জাতীয় লোকের একই উপাধি হইয়াছে, যেমন—রায়, চৌধারী, তালুকদার ইত্যাদি। এইরূপ বিষয়গত উপাধি সকল দেশেই কিয়ৎ পরিমাণে পরিলক্ষিত হয় বটে কিন্তু বাঙ্গালা দেশে যত বেশি ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে তত বেশি দেখা যায় না।

স্বর্ণকারদিগের পতনে লৌহকারেরাই কতকটি স্বর্ণকারের ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছিল। তজ্জন্য স্বর্ণকার ও লৌহকার উপাধি লুপ্ত হইয়া উভয় ব্যবসায়ী-দিগেরই "কর্ম্মকার" উপাধি হইয়াছে। বাঙ্গালা ভিন্ন অন্য কুত্রাপি "কর্ম্মকার" উপাধি কোন জাতির নাই। অন্যত্র সোণার এবং লোহার উপাধি চলিত আছে।

বল্লভানন্দ শেঠের কন্যা পদ্মিনী বল্লালকে প্রতিফল দিবার জন্য ছদ্মবেশে বল্লালের প্রমোদকাননে উপস্থিত হইল। সম্রাট্ মত্ত অবস্থায় তাহাকে বকুল বৃক্ষের ছায়ায় দেখিতে পাইলেন। পদ্মিনীকে পরম সুন্দরী যুবতী দেখিয়া বিমোহিত বল্লাল তাহাকে নিজ উপপত্নী করিলেন। সুন্দরী নিজ পরিচয় না দিয়া কেবল মাত্র বলিল "আমি ব্রাহ্মণী নহি"। সম্রাট্ অল্পদিন মধ্যেই পদ্মিনীর বশীভূত হইলেন। তিনি তাহার উচ্ছিষ্ট সুরা পান করিলেন; তিনি তাহার বাধ্য হইয়া সন্ধ্যা পূজা ত্যাগ করিলেন এবং স্বীয় উপবীত পদ্মিনীর চরণে সমর্পণ করিলেন। তখন পদ্মিনী আপনাকে হড্ডিকা বলিয়া পরিচয় দিল।

বল্লালের স্ত্রী, পুত্র, গুরু, পুরোহিত এবং অমাত্যগণ বারংবার তাঁহাকে হড্ডিকা ত্যাগের জন্য অনুরোধ করিল। তিনি হাস্যমুখে কহিলেন, "আমি কাহাকেও ত্যাগ করিতে জানি না, সুতরাং আমি তাহা পারিব না। আমি কখন কাহাকেও কটু নিষ্ঠুর বাক্য বলি নাই, এবং বলিতে পারিব না। আমি

কাহাকেও প্রতিপালন করিতে অস্বীকার করি নাই, এবং তাহা করিতে পারিব না। আমার চক্ষুলজ্জা অত্যন্ত অধিক, আমি তাহা ত্যাগ করিতে পারিব না। ইহাতে ঈশ্বর আমার ভাগ্যে যাহা ঘটান, তাহা আমার অনিবার্য্য।” সম্রাটের এই অযোগ্য অথচ যথার্থ উত্তর শুনিয়া সকলেই চিন্তিত হইল। বল্লালের দিগ্‌দেশ-ব্যাপী নিন্দা হইল। তাঁহার পুত্র লক্ষ্মণসেন হড্ডিকাকে বিদূরিতা করিবার মানসে একদল সেনা সংগ্রহ করিলেন। নিজ জননী, গুরু, পুরোহিত এবং বৈদ্য সামন্তগণ কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া লক্ষ্মণসেন বলপূর্ব্বক হড্ডিকাকে দেশান্তর করিতে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু যখন বল্লাল তাঁহাকে নিবারণ করিতে সম্মুখীন হইলেন, তখন লক্ষ্মণের সেনাগণ সম্রাটের সহ যুদ্ধ না করিয়া পলায়ন করিল। লক্ষ্মণ নিজ জননী ও কতকগুলি বৈদ্য সামন্ত লইয়া রাঢ় দেশে গিয়া স্বাধীন হইলেন। বল্লাল সংবাদ পাইয়া পুত্রকে পত্র লিখিলেন, “বৎস! তুমি আমার একমাত্র পুত্র এবং দ্বাদশ রাজ্যের একমাত্র উত্তরাধিকারী। তুমি একমাত্র রাঢ় দেশের রাজা হইয়া নির্ব্বোধের কার্য্য করিয়াছ। আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, তুমি আসিয়া সমস্ত সাম্রাজ্য গ্রহণ কর। আমি তীর্থবাস করিতে যাই।” লক্ষ্মণ পিতার পত্র পাঠে অতীব লজ্জিত হইলেন, কিন্তু মাতার প্রবর্ত্তনায় পিতার নিকট আসিলেন না। বল্লাল পুত্রের কোন দণ্ড করিলেন না; বরং পুত্রবধূর অভিপ্রায় জানিয়া তাহাকেও রাঢ়ে পাঠাইয়া দিলেন। তিনি লক্ষ্মণের বিদ্রোহের সাক্ষী কোন ব্যক্তিকেই কোন দণ্ড করেন নাই। লক্ষ্মণ-সেনের সহ যে সকল বৈদ্য রাঢ় দেশে গিয়াছিল, তাহারা রাঢ়ীয়বৈদ্যের সহ মিলিত হইয়াছিল। তাহাদের অম্বিষ্ঠ-নীতি মত উপনয়নাদি চলিতেছে। যাহারা বরেন্দ্রভূমিতে ছিল, তাহারা বল্লালের সহ সমাজবদ্ধ থাকায় হড্ডিকা-সংস্পৃষ্ট বলিয়া তাহাদের উপনয়ন হইত না। পদ্মিনী যে প্রকৃত পক্ষে বৈশ্যকন্যা, তাহা প্রকাশ হইলেও বারেন্দ্র বৈদ্যেরা অপকৃষ্ট ভাবেই ছিল। গত বিশ বৎসর মধ্যে তাঁহারাও প্রায়শ্চিত্ত করিয়া উপবীত ধারণ করিতেছেন।

বল্লালের গুরু, পুরোহিত এবং সভাস্থ পণ্ডিতেরা দেখিলেন যে, সম্রাট্ অপজাতিসংস্রবে ভ্রষ্টাচার ও পতিত হইয়াছেন। তাঁহার নিকটে থাকিলে সংস্রবদোষ অবশ্য ঘটিবে। এজন্য তাঁহারা দূরদেশে গিয়া বাস করিলেন। রাজ-পুরোহিত ভীম ওঝা কালিয়া গ্রামবাসী ছিলেন। তদ্বংশীয়েরা অদ্যাপি কালিয়াই

গোষ্ঠী বলিয়া পরিচিত। সেই ভীম ওঝা কালিয়া গ্রাম ত্যাগ করিয়া পূর্ব্ববঙ্গে গিয়া ছাতক নামক গ্রামে বাস করিয়াছিলেন। তখন পূর্ব্ববঙ্গে আর শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ ছিল না। এজন্য ভীমের সন্তানদিগকে লোকে "বাঙ্গাল ওঝা" বলিত। এই সময়ে কতকগুলি শ্রোত্রিয় দক্ষিণ-বাঙ্গালায় গিয়া নবদ্বীপ ও শান্তিপুরে বাস করিয়াছিলেন। গৌড় নগর একবারে শ্রোত্রিয়শূন্য হইয়াছিল। তথাপি বল্লাল কোনরূপ কটু ব্যবহার করেন নাই। বরং ছাতক, নবদ্বীপ ও শান্তিপুর-প্রস্থিত বিপ্রগণের ভরণপোষণ জন্য সেই স্থানেই তাঁহাদিগকে ব্রহ্মত্র দিয়াছিলেন। বল্লালের জামাতা হরিসেন বকদ্বীপে গিয়া বনমধ্যে বাস করিয়াছিলেন। সম্রাট্ তাঁহাকেও সেই স্থলে "জামাইভাতী" দিয়াছিলেন। ঐ স্থান এখন যশোর জেলায় অবস্থিত এবং সেনহাটী নামে খ্যাত।

এইরূপে সুবর্ণবণিক্‌দের পতনে বহুলোকের অবস্থা পরিবর্ত্তন, ব্যবসায় পরিবর্ত্তন ও বাসস্থান পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল, যাহার ফলাফল অদ্যাপি বাঙ্গালাদেশে অধিকাংশই বিদ্যমান আছে। বল্লাল সর্ব্বজননিন্দিত ও সজ্জনপরিত্যক্ত হইয়া আট বৎসর হড্ডিকা-প্রেমে (?) বিমুগ্ধ থাকিলেন। তাহার পর চৌষট্টি বৎসর বয়সে বল্লালের কঠিন পীড়া হইল। বল্লাল অতি সুস্থকায় ছিলেন, তাঁহার পীড়া কদাচিৎ হইত, বিশেষতঃ গুরুতর ব্যাধি পূর্ব্বে কখন হয় নাই। এক্ষণে বৃদ্ধকালে সর্ব্বপ্রথমে কঠিন পীড়া হওয়ায় চিকিৎসকেরা সেই রোগ সাংঘাতিক বলিয়া ব্যাখ্যা করিলেন। সম্রাট্ লক্ষ্মণসেনকে নিকটে আনিতে দূত পাঠাইলেন এবং স্বয়ং গঙ্গাতীরে কানসাটে চলিলেন। সেই স্থানে একদিন সন্ধ্যার পর হড্ডিকা মলিন বেশে বল্লালের নিকটে আসিয়া উগ্রভাবে কহিল, "বল্লাল! আমি হড্ডিকা নহি, আমি বল্লভানন্দ শেঠের কন্যা পদ্মিনী। রাজা যে প্রজার নিকট কর গ্রহণ করেন, সেই প্রজার সর্ব্বদা হিত সাধন করাই রাজধর্ম্ম। নতুবা রাজা দস্যুতুল্য হন এবং গৃহীত কর অপহরণ করা হয়। তুমি জাতিবিদ্বেষের পরবশ হইয়া রাজধর্ম্ম লঙ্ঘন করিয়া কূটবিচারে আমার পিতৃকুলকে পাতিত করিয়াছ। আমিও প্রতিহিংসা-পরবশ হইয়া সতীধর্ম্ম লঙ্ঘনপূর্ব্বক তোমার ভোগ্যা হইয়াছিলাম এবং তোমাকে ও তোমার স্বজাতিগণকে পাতিত করিয়াছি। অন্যের অনিষ্ট করিব না বলিয়া আমার প্রতিজ্ঞা ছিল। তজ্জন্য তোমার প্রচুর রক্ষা হইয়াছে, নতুবা আমি তোমার দ্বারা ব্রহ্মহত্যা গোহত্যা সকলই করাইতে

পারিতাম। যাহা হউক, আমার উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে। তোমার আসন্ন সময়ে আমি তোমার আর কোন অনিষ্ট করিতে চাই না। তুমি নিজকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর; আমি তোমার অন্নে পালিত হইয়া কপটতা পূর্ব্বক তোমার যে সকল অনিষ্ট করিয়াছি, সেই পাপ বিমোচন জন্য গঙ্গাতে আত্মবিসর্জ্জন করিতে মনস্থ করিয়াছি। তুমি আমাকে যে সকল রত্নালঙ্কার দিয়াছিলে, তাহা গ্রহণ কর।" এই বলিয়া পদ্মিনী বস্ত্রাবদ্ধ অলঙ্কারাদি সম্রাটের সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া অতি দ্রুতপদে প্রস্থান করিল। বল্লাল ডাকিলেন, পদ্মিনী ফিরিল না। তিনি পদ্মিনীকে ফিরাইয়া আনিতে ভৃত্যদের প্রতি আদেশ করিলেন। কিন্তু তাহারা পদ্মিনীর কোন উদ্দেশ পাইল না। সম্রাট্ গম্ভীর ভাবে স্বীয় অপকর্ম্ম স্মরণ করিয়া অনুতাপ করিতে লাগিলেন।

তৃতীয় দিন পূর্ব্বাহ্নে লক্ষ্মণসেনের পুত্র দ্বাদশবর্ষীয় মধুসেন আসিয়া পিতামহের বন্দনা করিল। বল্লাল তাহার পরিচয় পাইয়া আহ্লাদে উঠিয়া বসিলেন এবং মধুকে বক্ষে ধারণ করিয়া বারংবার চুম্বন করিলেন। এই সময়ে তিনি তিনটি শ্লোক পড়িয়াছিলেন, তাহার অর্থ এই যে—

(১) আমি যত্নপূর্ব্বক যে বিষবৃক্ষ রোপণ করিয়া পঞ্চামৃত দ্বারা সেচন করিয়াছিলাম, কি আশ্চর্য্য যে, এই অমৃত ফলটি সেই বিষবৃক্ষেই উৎপন্ন হইয়াছে।

(২) আশ্চর্য্যই বা কিরূপে বলি, যখন সর্প ব্যাঘ্রাদি মারাত্মক হিংস্র জন্তুর শরীর হইতে এমন সমস্ত মহৌষধ প্রস্তুত হয়, যদ্দ্বারা উৎকট ব্যাধি আরাম হয় এবং মুমূর্ষু লোকের প্রাণ রক্ষা হয়।

(৩) অথবা আমার স্ত্রী পুত্র আমার পাপের উপভোগ্য নরকস্বরূপ। আর সর্ব্বপ্রকার মধু হইতে সুমধুর যে এই মধু (মধুসেন), সে আমার পিতৃপুণ্যের ফল।

লক্ষ্মণসেন গোপনে কানসাটের সংবাদ এরূপ যোজনা করিয়া রাখিয়াছিলেন যে, প্রতি দণ্ডে তাঁহার নিকট সমাচার পৌঁছিত। তিনি পদ্মিনীর আত্মবিসর্জ্জন-বার্ত্তা পাইবামাত্র আট জন পণ্ডিত সহ মধুসেনকে কানসাটে পাঠাইয়াছিলেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, সমস্ত পণ্ডিতগণ বল্লালের সভা ত্যাগ করিয়াছিলেন। এখন মধুসেন সহ সমাগত পণ্ডিতগণ পাইয়া বল্লাল শাস্ত্রমত প্রায়শ্চিত্ত করিলেন। তদুপলক্ষে গঙ্গাস্নান ও পরিশ্রমে বৃদ্ধ সম্রাটের রুগ্নদেহ একবারে অবসন্ন হইয়া

পড়িল। চিকিৎসকেরা নাড়ী ধরিয়া কহিলেন, "মহারাজ! সময় আগত।" বল্লাল কহিলেন, "আমিও প্রস্তুত। পৃথিবীতে যত প্রকার সুখ হইতে পারে, আমি তাহা সমস্তই দীর্ঘ কাল ভোগ করিয়া বিতৃষ্ণ হইয়াছি। আমার একমাত্র দুঃখ ছিল যে, অন্তিম কালে আমার সন্তানগণ কেহই নিকটে নাই। শ্রীমান্ মধুকে পাইয়া আমার সেই দুঃখেরও অবসান হইয়াছে। সংসার দুঃখসাগর; তাহা হইতে এই সময়ে অবসর লওয়াই ক্ষেম। আমার রাজত্ব, প্রভুত্ব, ধনসর্ব্বস্ব আমি সমস্তই মধুকে দিলাম। এই মধুই আমার একমাত্র উত্তরাধিকারী। আমাকে অবিলম্বে গঙ্গাতে লইয়া চল।" আজ্ঞাপেক্ষী ভৃত্যগণ তাঁহাকে গঙ্গা-বক্ষে লইয়া গেল। বল্লাল নাভি পর্য্যন্ত গঙ্গাজলে ডুবাইয়া ইষ্ট মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিকে তারকব্রহ্ম রাম নাম উচ্চৈঃস্বরে উদ্গীত হইল। সহসা ব্রহ্মরন্ধ্র স্ফুটিত হইয়া অগ্নিশিখার ন্যায় প্রাণবায়ু নির্গত হইল। বঙ্গের অদ্বিতীয় সম্রাট্ বল্লালসেনের কীর্ত্তিময়ী মানবলীলা শেষ হইল। দ্রুতগামী জলযান যোগে লক্ষ্মণসেনের নিকট সমাচার প্রেরিত হইল। মধুসেন রাজপ্রতিনিধিরূপে মৃত সম্রাটের মুদ্রাঙ্ক ভাঙ্গিতে এবং দেহ অগ্নিসাৎ করিতে আদেশ করিলেন। তিনি নিজেই পিতামহের অগ্নিকার্য্য যথাসময়ে সমাপন করিয়া পূরক পিণ্ড দিলেন।

লক্ষ্মণসেন।

লক্ষ্মণসেন কানসাটে আসিয়া পিতার অন্তিম শ্লোকত্রয় শুনিয়া শোকে অশ্রুপাত করিলেন। তিনি কহিলেন, "আমি যথার্থই বিষবৃক্ষ; আমার ন্যায় কুপুত্রের দায় গ্রহণ অনুচিত। পিতা মধুকে উত্তরাধিকারী নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সুতরাং রাজত্ব সঙ্গতরূপে তাহারই প্রাপ্য।" তিনি শোকে রোদন করিলেন। বৈদ্য সামন্তেরাও বল্লালের গুণরাশি স্মরণ করিয়া আক্ষেপ করিল। উপস্থিত পণ্ডিতেরা কহিলেন, "মধু নাবালক; সে সদাশয় হইলেও তাহা দ্বারা সাম্রাজ্য শাসন চলিতে পারে না। সে রাজা হইলে অশাসন ও পরিবেদন দুইটি দোষ হইবে। অতএব আপনি রাজত্ব গ্রহণ করুন। শাস্ত্রমতে পৃথক্ ভোগে পিতাপুত্রে ভিন্নতা নাই। নাবালক মধু রাজা হইলেও আপনি তদুপরি কর্ত্তা আর আপনি রাজা হইলেও মধু যুবরাজ। সুতরাং স্বর্গীয় সম্রাট্ রাজত্ব মধুকে দিলেও তজ্জন্য আপনকার রাজত্ব গ্রহণে কোন দোষ হইবে না। প্রজার সুপালন

দ্বারা রাজার সর্ব্বপাপ ধ্বংস হয়। কুরুরাজ দুর্য্যোধন বহুপাপী হইয়াও প্রজা-পালনে সুব্রত হেতু স্বর্গলাভ করিয়াছিলেন। অতএব আপনি রাজত্ব গ্রহণ করিয়া প্রজাপালনে ব্রতী হউন। তদ্দ্বারাই সর্ব্বপাপ-বিমুক্ত হইয়া অন্তিমে স্বর্গলাভ করিতে পারিবেন। যদি অভিষেকের পূর্ব্বেই পাপক্ষয় করিতে চান, তবে যথাশাস্ত্র প্রায়শ্চিত্ত করুন। মনে কোনরূপ দ্বিধা রাখিবেন না।” লক্ষ্মণ-সেন পিতৃদ্রোহ-পাপ ক্ষয় জন্য একশত আটটী জলাশয় খনন করাইয়া উৎসর্গ করিলেন। পরে তিনি ও তদনুচর বৈদ্য সামন্তগণ রাজদ্রোহপাপ শান্তি জন্য চান্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্ত করিলেন। এই সকল কার্য্যে প্রায় দুই বৎসর গত হইল। তাহার পর লক্ষ্মণসেন অভিষিক্ত হইয়া রাজতিলক ধারণ করিলেন। কিন্তু তাঁহার মন সর্ব্বদা নিরুৎসাহ থাকিত। যখন পিতার অন্তিম শ্লোক তাঁহার মনে উদয় হইত, তিনি তখনই অশ্রুপাত করিতেন। লক্ষ্মণসেন স্বায়ত্ত পঞ্চরাজ্যের অধীশ্বর হইলেন। কিন্তু বশী রাজগণ তাঁহাকে কর দিলেন না। এইরূপ ঘটনা নূতন নহে। হিন্দুদের মধ্যে এরূপ ঘটনা প্রায় সর্ব্বদাই ঘটিত। কোন সার্ব্বভৌমের অভাব হইলে বশী রাজারা অমনি স্বপ্রধান হইতে চেষ্টা করিত। নিজ পরাক্রম না দেখাইয়া কেবল মৃত সম্রাটের উত্তরাধিকারিত্বে কেহ সামন্ত রাজাদের নিকট অনুকর পাইত না, সুতরাং রাজ্য প্রাপ্তি মাত্র কেহ সার্ব্বভৌম হইত না। লক্ষ্মণসেন অবাধ্য বশী রাজাদিগকে বাধ্য করিতে চেষ্টা করেন নাই, সুতরাং তিনি সার্ব্বভৌম সম্রাট্ উপাধি প্রাপ্ত হন নাই।

লক্ষ্মণসেনের রাজত্বের পঞ্চদশ বর্ষে শ্রোত্রিয়দিগের দ্বিতীয় বার নির্ব্বাচন করিয়া কৌলীন্য মর্য্যাদা দানের সময় হইল। রাজা নিজ সভাসদ্ পণ্ডিতগণ লইয়া নির্ব্বাচন করিলেন। তৎকালে কোন সাধারণ পরীক্ষার নিয়ম ছিল না। দুই চারি দিনের পরীক্ষা দ্বারাও প্রকৃত বিদ্যা বুদ্ধির পরিমাণ ঠিক হয় না, বিশেষতঃ ধর্ম্মশীলতার পরিমাণ নিরূপণ জন্য কোন সাধারণ পরীক্ষাই হইতে পারে না। সুতরাং লক্ষ্মণসেনের কৃত নির্ব্বাচন যে খুব বিশুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা বলা যায় না। এই নির্ব্বাচন হইতে কাহারও উন্নতি হয় নাই, বরং কয়েক শ্রেণীর কয়েক জন লোকের অধঃপতন হইয়াছিল। বারেন্দ্র শ্রেণীর মধ্যে ভরদ্বাজ-গোত্রীয় ভাদড় গাঁই কুলীনেরা পতিত হইয়া সিদ্ধ শ্রোত্রিয় হইলেন। রাঢ়ী শ্রেণীর মধ্যে কতকগুলি কুলীন পতিত হইয়া “বংশজ” নামে খ্যাত হইলেন।

বারেন্দ্র মধ্যে বংশজ নাই। এবার নির্ব্বাচনক্রমে যাহাদের মর্য্যাদা পূর্ব্বাপেক্ষা কম হইল অথবা যাঁহারা বাঞ্ছিত উন্নতিলাভে অযথা নিরাশ হইলেন, তাঁহারা মহা গোলযোগ উপস্থিত করিলেন। তাহাতে ক্রমশঃ তর্কবিতর্ক, রাগারাগি, গালাগালি, অবশেষে মারামারি পর্য্যন্ত হইল। যাঁহার আশা ভঙ্গ হইল, তিনি রাজাকে ও নির্ব্বাচক পণ্ডিতগণকে শাপ দিতে দিতে চলিয়া গেলেন। পিতার ন্যায় লক্ষ্মণের তেজস্বিতা ছিল না। বল্লাল হাস্যমুখে ভিন্ন কটুমুখে কথা কহিতেন না, কাহারও কোন দণ্ড করিতেন না, অথচ তিনি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতেন; কেহ তাঁহার প্রতিবাদ করিতে সাহস পাইত না। কিন্তু এই উপলক্ষে অনেকগুলি শ্রোত্রিয় রাজা লক্ষ্মণসেনকে প্রচুর তিরস্কার করিলেন এবং অভিসম্পাত পর্য্যন্ত করিলেন। লক্ষ্মণসেন বিবেচনা করিলেন যে, নির্ব্বাচন প্রথা প্রচলিত থাকিলে এইরূপ গোলযোগ প্রত্যেক নির্ব্বাচন উপলক্ষেই হইবে। অতএব তিনি নির্ব্বাচনপ্রথা একবারে উঠাইয়া দিয়া নিয়ম করিলেন যে, "এই অবধি কৌলীন্য মর্য্যাদা বংশানুক্রমিক হইবে এবং পুত্রকন্যার বিবাহের উৎকর্ষ অপকর্ষ দ্বারা সেই মর্য্যাদা হ্রাস বৃদ্ধি হইতে পারিবে। পুনরায় আর নির্ব্বাচন করিয়া মর্য্যাদা প্রদান করা হইবে না।"

শ্রোত্রিয়দিগের নির্ব্বাচন করিতে বিষম গোল দেখিয়া রাজা বৈদ্য, কায়স্থাদি অন্য কোন জাতির নির্ব্বাচন করিলেন না। যাহার যে মর্য্যাদা ছিল, তাহাই বংশানুক্রমিক থাকিল। কেবল পুত্র-কন্যার বিবাহ দ্বারা সেই মর্য্যাদা হ্রাস বৃদ্ধির এক মাত্র উপায় করা হইল।

এই নূতন নিয়ম দ্বারা নির্ব্বাচনের গোলযোগ শান্তি হইল বটে, কিন্তু অন্যান্য সহস্র দোষ উপচিত হইল। শ্রোত্রিয়গণ বহুব্যয় করিয়া কুলীনে কন্যাদান করিয়া কুল মর্য্যাদা বৃদ্ধির চেষ্টা করিতে লাগিল। কুলীনেরা অর্থলোভে বহুবিবাহ করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ জীবিকানির্ব্বাহ জন্য বিবাহই একমাত্র ব্যবসায় করিয়া তুলিলেন! কুলীন কন্যাদের বিবাহ কেবল নামমাত্র হইত। তাহারা প্রায় সমস্ত জীবনকাল পিতৃগৃহেই থাকিত। যে যে মহদ্‌গুণে প্রথম কৌলীন্য মর্য্যাদা লাভ হইত, কুলীন পুত্রেরা সে সমস্ত গুণ উপেক্ষা করিয়া কেবল বিবাহ বিষয়ে কুল রক্ষা করত সম্পূর্ণ কুলগৌরব ভোগ করিতে লাগিলেন। কষ্ট শ্রোত্রিয়ের সন্তান সহস্র গুণবান্ হইয়াও নিকৃষ্টই থাকিলেন।

তাঁহাদের অনেকেরই বিবাহ হইত না। বিবাহ বিষয়ে এইরূপ বৈষম্য হেতু ব্যভিচার দোষ উৎপন্ন হইল। কষ্ট শ্রোত্রিয় ও বংশজদিগের বিবাহ না হওয়ায় বংশলোপ হইতে লাগিল। ফলতঃ যে সদুদ্দেশ্যে বল্লাল কৌলীন্য মর্য্যাদা সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহা না হইয়া সেই মর্য্যাদা অসংখ্য অনিষ্টের কারণ হইয়াছিল।

মহারাজ লক্ষ্মণসেন অতি সুন্দর, দীর্ঘ, পুষ্ট ও বলবান্ ছিলেন। তিনি অস্ত্র ও অশ্বচালনে সুপটু ছিলেন। তিনি বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্, জিতেন্দ্রিয় এবং ধর্ম্মশীল ছিলেন। তিনি সদ্বক্তা, প্রজাবৎসল, অপক্ষপাতী, সুবিচারক, একান্ত গুণগ্রাহী এবং শান্তিপ্রিয় লোক ছিলেন। কিন্তু অস্থিরচিত্ত, অনুদ্যোগী ছিলেন। তাঁহার সাহস এবং কষ্টসহিষ্ণুতা বোধ হয় কম ছিল। তিনি মাতার পরামর্শে পিতার অবাধ্য হইয়াছিলেন এবং পিতৃশাপগ্রস্ত হইয়াছিলেন। তজ্জন্য পরে সর্ব্বদা আক্ষেপ করিতেন। তাঁহার মাতার গলৎকুষ্ঠ রোগ হইলে তিনি মাতাকে বলিয়াছিলেন, "স্ত্রীজাতির পক্ষে স্বামী মহাগুরু। তুমি স্বামীর সহ সদ্ব্যবহার কর নাই। তোমারই কুপরামর্শে আমিও পিতার সহ সদ্ব্যবহার করিতে পারি নাই। তোমার এই ব্যাধি সেই মহাপাপের ফল।" তাঁহার মাতা ক্রুদ্ধা হইয়া শাপ দিলেন, "তুই যেমন আমার কলঙ্ক উদ্‌ঘোষণ করিলি, তেমনি তোর চিরস্থায়ী কলঙ্ক হইবে।" এইরূপে অস্থিরচিত্ত রাজা পিতার ও মাতার শাপ-গ্রস্ত হইয়াছিলেন এবং উভয় শাপই ফলিয়াছিল।

লক্ষ্মণসেনের প্রজাপালনপ্রণালী অতীব উৎকৃষ্ট; এমন কি, অতুল্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তিনি প্রত্যেক প্রজার অবস্থা ও চরিত্র তদন্ত করিতেন এবং প্রত্যেকের অভাব মোচন করিয়া জীবিকানির্ব্বাহের সদুপায় করিয়া দিতেন। তাঁহার রাজ্যে নিতান্ত দরিদ্র কেহই ছিল না। "অভাবে স্বভাব নষ্ট" একটি প্রসিদ্ধ কথা। তাঁহার রাজত্বে কাহারও অভাব না থাকায় চুরি ডাকাতি প্রভৃতি কুকর্ম্ম করিতে কাহারও প্রবৃত্তি ছিল না। তিনি সুবর্ণবণিক্‌দের পাতিত্য খণ্ডন করেন নাই বটে, কিন্তু তাহাদিগকে পুনরায় বাণিজ্য ব্যবসায় করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন। তিনি শিল্প, বাণিজ্য, জ্যোতিষ, কৃষিকার্য্য ও সঙ্গীত-বিদ্যার উন্নতি সাধনে বিশেষ যত্নশীল ছিলেন। তাঁহার পিতা বল্লালসেনের সময়ে বঙ্গদেশে "অদ্ভুতসাগর" নামক জ্যোতিষ-সংহিতা সর্ব্বপ্রথম প্রচারিত হয়। তিনি শ্রোত্রিয়দিগকে বিদ্যার এবং ধর্ম্মচর্চ্চার জন্য সর্ব্বদা উৎসাহ দিতেন। তিনি নিজে

পণ্ডিত ছিলেন। তিনি পণ্ডিতদিগের পরীক্ষা করিয়া যথেষ্ট পুরস্কার দিতেন। তজ্জন্য তাঁহার রাজত্বে বাঙ্গালা দেশ আর্য্যবিদ্যার প্রধান স্থল হইয়াছিল। চিকিৎসাবিদ্যার প্রতি তাঁহার অনুরাগ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ছিল। তিনি বৈদ্যগণকে বলিতেন যে, "চিকিৎসাই আমাদের জাতীয় বিদ্যা; যেমন গায়ত্রীহীন ব্রাহ্মণ, যুদ্ধবিমুখ ক্ষত্রিয়, আয়ুর্বেদবিহীন বৈদ্যও তদ্রূপ জঘন্য।" তিনি বৈদ্যদিগকে প্রত্যেক বস্তুর গুণ নির্ণয় জন্য আদেশ দিয়াছিলেন এবং সেই কার্য্যের সাহায্য জন্য বিজ্ঞ কবিরাজদিগকে "রোমথা" যোগাইতেন।

হিন্দুরাজ্যে প্রাণদণ্ডের অপরাধীদিগকে চারি প্রকারে প্রাণদণ্ড করা হইত। ১ম, শ্মশানে লইয়া কালীদেবীর সম্মুখে বলিদান; ২য়, শূলে দেওয়া, ৩য়, হাত পা বাঁধিয়া অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ; ৪র্থ, সজীব অবস্থায় মাটিতে পুতিয়া ফেলা। অতি সম্ভ্রান্তবংশীয় অপরাধীদিগের প্রথম প্রকারে প্রাণদণ্ড হইত; আর মহাব্যাধিযুক্ত অপরাধীদিগের চতুর্থ প্রকারে প্রাণদণ্ড হইত। প্রথম ও চতুর্থ প্রকারে দণ্ডনীয় অপরাধীরা রোম্‌থা হইত না। দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রকারের অপরাধী মধ্যে যাহাদিগকে সবল ও সুস্থদেহ দেখা যাইত, চিকিৎসকেরা তাহাদিগকে রাজার নিকট চাহিয়া লইয়া "রোম্‌থা" করিতেন। রোম্‌থাদিগের কপালে উল্‌কি দ্বারা "রোম্‌থা" এই শব্দটি চিরস্থায়ীরূপে লিখিয়া দেওয়া হইত। রোম্‌থাদের দেহ এবং প্রাণ কবিরাজদের সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাধীন ছিল। কবিরাজেরা তাহাদের শরীরে ঔষধের গুণ পরীক্ষা করিতেন। কোন্ ঔষধ খাইলে বা মালিশ করিলে মনুষ্যদেহে কি ফল হয়, তাহা নিরূপণ জন্য কবিরাজেরা সেই বস্তু রোম্‌থাদিগকে খাওয়াইতেন বা মালিশ করিতেন। তাহাতে রোম্‌থার ব্যারাম হউক বা মৃত্যু হউক, তজ্জন্য কবিরাজের কোন অপরাধ হইত না। কখন বা রোম্‌থাকে বাঁধিয়া তপ্ততৈল বা ঘৃতপূর্ণ কটাহে ফেলিয়া দিয়া "মহামাস তৈল, মহামাস ঘৃত" তৈয়ারী করা হইত। অন্য সময়ে রোম্‌থারা কবিরাজের ভৃত্যের কাজ করিত। কখন বা কবিরাজেরা তুষ্ট হইয়া কোন কোন রোম্‌থাকে বাড়ী যাইতে ছুটি দিতেন অথবা একবারেই মুক্তি দিতেন। কবিরাজেরা মুক্তি দিলে রোম্‌থার পূর্ব্ব অপরাধের জন্য আর কোন দণ্ড হইত না। ইংরেজ রাজত্বে রোম্‌থা না পাওয়ায় কবিরাজদিগের অনেক ঔষধ এখন তৈয়ারি হয় না।

লক্ষ্মণসেনের যত্নে, ব্যয়ে এবং উৎসাহে বাঙ্গালী বৈদ্যেরা চিকিৎসাবিদ্যায় পৃথিবী মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইয়াছিল। কালক্রমে রাজকীয় সাহায্য অভাবে, অর্থাভাবে, ঔষধের সামগ্রী অভাবে বৈদ্যচিকিৎসার গুণ বিস্তর হ্রাস হইয়াছে বটে, তথাপি আর্য্য চিকিৎসাবিদ্যায় অন্য কেহ অদ্যাপি বাঙ্গালীদের তুল্য হইতে পারে নাই। নাড়ীজ্ঞান বাঙ্গালী চিকিৎসকের তুল্য অন্য কোন জাতীয় চিকিৎসকের নাই।

লক্ষ্মণসেন জিতেন্দ্রিয়, অপক্ষপাতী সুবিচারক ছিলেন। তিনি যদি শান্তিময় সময়ে রাজা হইতেন, তবে তাঁহার চিরস্থায়ী সুযশ হইত। কিন্তু তাঁহার সময়ে সকল গুণ অপেক্ষা যুদ্ধবিক্রম অধিকতর প্রয়োজনীয় ছিল, অথচ সেই গুণ লক্ষ্মণের নিতান্ত কম ছিল। সেই জন্য তিনি চিরস্থায়ী কলঙ্কভাগী হন এবং বিদেশে নিঃসহায় অবস্থায় মানবলীলা সংবরণ করেন।

লক্ষ্মণসেনের রাজত্বের পঁয়তাল্লিশ বর্ষে, যখন তাঁহার বয়স প্রায় আশী বৎসর, সেই সময় শেখ জালালুদ্দীন নামক একজন মুসলমান সাধু (দরবেশ) পারস্য দেশের তবরেজ নগর হইতে ভ্রমণ করিতে করিতে গৌড় নগরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। লক্ষ্মণসেন সেই সাধুর অসাধারণ গুণগ্রাম দৃষ্টে তাঁহাকে বাইশ হাজার বিঘা ভূমি নিষ্কর দিয়াছিলেন। সেই বাইশ হাজারী পীরপাল এখনও মালদহ জেলায় বিদ্যমান আছে। সেই মুসলমান সাধুর বৃত্তান্ত লইয়া "শেখ শুভোদয়া" নামক গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। সেই গ্রন্থ হইতে বৈদ্যরাজবংশের কতক বিবরণ জানা যায়।

রাজা লক্ষ্মণসেন সেই দরবেশের প্রমুখাৎ শুনিলেন যে, তাঁহার রাজধানী অচিরে মুসলমানেরা অধিকার করিবে। রাজা নিজ সভাস্থ পণ্ডিতগণকে তদ্বিষয়ে প্রশ্ন করায় তাঁহারাও গণনা করিয়া সেই ভবিষ্যদ্বাণী সত্য বলিয়া স্বীকার করিলেন। ইহাতে লক্ষ্মণসেনের মনে ঘোর বৈরাগ্য উপস্থিত হইল। তিনি মধুসেনের উপর রাজ্যভার দিয়া নিজে কতিপয় পণ্ডিতসহ নবদ্বীপে গিয়া গঙ্গাবাস করিতে লাগিলেন। নবদ্বীপ তৎকালে ভাগীরথীর পবিত্র-সলিল-পরিবেষ্টিত প্রকৃত দ্বীপ ছিল এবং তীর্থস্থান বলিয়া গণ্য ছিল। নবদ্বীপ রাজধানী ছিল না। অথবা সমৃদ্ধ নগর ছিল না। তথায় কোন দুর্গ ছিল না এবং সৈন্যের ছাউনী ছিল না। তথায় কোন রাজকার্য্য হইত না এবং রাজপরিবারও তথায় থাকিত

না। লক্ষ্মণসেন একাকী তথায় কতিপয় পণ্ডিত ও ভৃত্য সহ থাকিয়া জপ, তপ, পূজা এবং ধর্ম্মশাস্ত্রালোচনায় সময় ক্ষেপণ করিতেন মাত্র। রাজা তথায় কেবল এক বৎসর দশমাস মাত্র থাকার পর ঐ স্থান মুসলমান কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল।

রামপ্রসাদ নামক এক জন ক্ষত্রিয় বা পাঞ্জাবী ক্ষেত্রি গজনীপতি সাহেবদ্দীন মহম্মদ গোরী কর্ত্তৃক বন্দী হইয়া উক্ত সম্রাটের গোলাম হইয়াছিল। সে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া কুতুবুদ্দীন* নাম ধারণ করিয়াছিল এবং আদিষ্ট কার্য্যে দক্ষতা দেখাইয়া উক্ত সম্রাটের প্রিয়পাত্র হইয়াছিল। সম্রাটের কোন সন্তান ছিল না। তাঁহার প্রিয়তম চল্লিশ জন গোলামই তাঁহার পুত্রবৎ হইয়াছিল। সেই গোলামের দলমধ্যে উক্ত কুতুবুদ্দীন এবং এলদোস খাঁ সর্ব্বপ্রধান ছিলেন। গোরীর মৃত্যুর পর ১২০৬ খৃষ্টাব্দে এলদোস খাঁ সিন্ধুর পশ্চিম পারে এবং কুতুবুদ্দীন সিন্ধুর পূর্ব্বপারে স্বাধীন সম্রাট্ হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রভুর জীবদ্দশায় যখন কুতুব দিল্লীর শাসক মাত্র ছিলেন, সেই সময়ে তিনি নিজের অধীন সেনাদল লইয়া অযোধ্যা,প্রয়াগ ও কাশীধাম পর্য্যন্ত জয় করিয়া নিজ অধিকার বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। তাহার পর কুতুবুদ্দীন মগধ ও গৌড়রাজ্য জয় করিবার জন্য নিজ সেনাপতি বখ্‌তিয়ার গিল্‌জীকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। সেই সময়ে নবোৎসাহে মুসলমানেরা সর্ব্বত্রই অজেয় হইয়াছিল। বখ্‌তিয়ার অতি সহজেই মগধ রাজ্য অধিকার করিলেন। তিনি শুনিলেন যে,পঞ্চরাজ্যের অধিপতি লক্ষ্মণসেন নবদ্বীপে বাস করেন। এজন্য তিনি ঐ স্থানই রাজধানী বিবেচনায় তাহাই আক্রমণ করিতে চলিলেন। তিনি ভাগীরথীর পশ্চিম পারে জঙ্গলে সমস্ত সেনা সহ গোপনে থাকিলেন এবং তাজীম খাঁর অধীনে সতর জন মাত্র অশ্বারোহী ছলপূর্ব্বক তোরণদ্বার অধিকার জন্য পাঠাইলেন। তাজীম প্রচার করিলেন যে, তাঁহার উপরিস্থ সেনাপতি সহ বিবাদ হওয়ায় তিনি গৌড়াধিপতির নিকট চাকরী প্রার্থনায় আসিয়াছেন।

* কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে কুতুবদ্দীন প্রথমে তুর্কস্থান হইতে আনীত হইয়া নিশাপুরের এক বণিকের নিকট বিক্রীত হন। তাঁহার তীক্ষ্ণবুদ্ধি দেখিয়া, বণিক্ তাঁহাকে পারস্য ও আরবী ভাষা উত্তমরূপে শিক্ষা দেন। বণিকের মৃত্যুর পর মহম্মদ গোরী তাঁহাকে ক্রয় করেন। তাঁহার কনিষ্ঠ অঙ্গুলী ভগ্ন ছিল বলিয়া, মহম্মদ তাঁহাকে আয়বক বলিয়া ডাকিতেন। আয়বকের বিদ্যাবুদ্ধি দেখিয়া মহম্মদ তাঁহাকে দিন দিন উচ্চপদে উন্নীত করিতে লাগিলেন; এবং অবশেষে "কুতুবুদ্দীন" উপাধি দিয়া তাঁহাকে ভারতবর্ষের রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত করেন।

তাঞ্জীম বিনা বাধায় গঙ্গাপার হইয়া রাজবাটীর তোরণদ্বারে প্রবেশ করিলেন। তথায় সৈন্য সামন্ত অল্প দেখিয়া হঠাৎ আক্রমণ দ্বারা রক্ষিগণকে নষ্ট করিয়া তোরণদ্বার অধিকার করিলেন। রাজভৃত্যেরা স্বল্পকাল মধ্যে তাঁহাদিগকে নিষ্কাশিত করিতে পারিল না। সংবাদ পাইয়া বখ্‌তিয়ার অবশিষ্ট সেনা লইয়া মুক্ত তোরণদ্বার দিয়া রাজবাটীতে প্রবেশ করিলেন। লক্ষ্মণসেনের যুদ্ধোপযোগী কোন আয়োজনই ছিল না। তাঁহার রাজধানী গৌড় নগর যবনেরা অধিকার করিবে জানিয়া তিনি রাজধানী ত্যাগ করিয়া দূরদেশে নবদ্বীপে বাস করিতেছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে তাহাই প্রথম আক্রান্ত হইল। উপায়ান্তর না দেখিয়া তিনি দ্রুতগামী নৌকা-যোগে জগন্নাথক্ষেত্রে পলায়ন করিলেন। তথায় বন্ধুহীন অবস্থায় তিনি মনোদুঃখে গতাসু হন।

রাজা লক্ষ্মণসেন বিনা যুদ্ধে পলায়ন করায় মুসলমান ইতিবেত্তা ফেরেস্তা তাঁহাকে তুচ্ছ করিয়া "লছমনিয়া" বলিয়া লিখিয়াছেন। তাহা হইতেই ইংরেজী ইতিহাসে এবং তদনুরূপ বাঙ্গালা ইতিহাসে লাক্ষ্মণ্যসেন বা দ্বিতীয় লক্ষ্মণসেন রাজা এবং নবদ্বীপ তাঁহার রাজধানী বলিয়া কল্পিত হইয়াছে। তাহা সমস্তই ভুল। নবদ্বীপ কখন রাজধানী ছিল না এবং লাক্ষ্মণ্যসেন নামে কোন রাজাও ছিল না। মীর ফর্জন্দ হোসেন লিখিয়াছেন যে, পারসীতে তুচ্ছার্থে নামের উত্তর 'ইয়া' প্রত্যয় হয়। তাহাতেই কাপুরুষ লক্ষ্মণসেনকে লছমনিয়া লেখা হইয়াছে।

"সতর জন পাঠান অশ্বারোহী বাঙ্গালা দেশ জয় করিয়াছিল" বলিয়া যাহারা বাঙ্গালীর অপবাদ করে, তাহারা মিথ্যা নিন্দুক মাত্র। সতর জন পাঠান সমস্ত বাঙ্গালাদেশ দূরে থাকুক, নবদ্বীপের ন্যায় অরক্ষিত পল্লীগ্রামও জয় করিতে পারে নাই। সতর জন পাঠান চাকরী প্রার্থনার ভাণ করিয়া নবদ্বীপে রাজবাটীর তোরণদ্বারে প্রবেশ করিয়াছিল এবং বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্বক দৌবারিকদিগকে হত্যা করিয়া তোরণদ্বার অধিকার করিয়াছিল। রাজভৃত্যেরা স্বল্পকাল মধ্যে তাহাদিগকে নিষ্কাশিত করিতে পারিল না। ইতিমধ্যে অবশিষ্ট পাঠান সৈন্য আসিয়া সেই মুক্ত তোরণদ্বার দিয়া রাজবাটীতে প্রবেশ করিল। লক্ষ্মণসেনের যুদ্ধের আয়োজন কিছুই ছিল না। তিনি হঠাৎ আক্রান্ত হইয়া অগত্যা পলায়ন করিলেন। নবদ্বীপ পাঠানদের হস্তগত হইল। ঈদৃশ ঘটনা হইতে বৃদ্ধ রাজার কিংবা বাঙ্গালীদের দৌর্ব্বল্য বা ভীরুতা কিছুমাত্র প্রমাণ হয় না। যখন কামান

বন্দুকাদি অনিবার্য্য অস্ত্র ছিল না, তখন সঙ্কীর্ণ স্থানে অত্যল্প লোকে বহু লোকের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করিতে পারিত। ইহা যুক্তিসিদ্ধ এবং ইতিহাসে ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দেখা যায়। টাস্‌কেনীর রাজা লার্‌স্‌ পোর্সেনা সম্মুখ যুদ্ধে চল্লিশ হাজার রোমীয় সৈন্য পরাজয় করিয়াছিলেন, অথচ টাইবর নদের সেতুমুখে তিন জন মাত্র রোমীয় বীর পোর্সেনার নব্বই হাজার যোদ্ধার গতিরোধ করিয়াছিল। তুরুস্ক সেনাপতি সালারুদ্দীন তিরাশী হাজার সৈন্য লইয়া ছয় লক্ষ খৃষ্টান সৈন্য পরাজয় করিয়াছিলেন, অথচ সেই পরাজিত পলায়িত খৃষ্টানদিগের মধ্যে কেবল বিরানব্বই জন যোদ্ধা যেরুশালমের তোরণদ্বারে সালারুদ্দীনের সমস্ত সৈন্যের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করিয়াছিল। সুতরাং সতর জন পাঠান যে সহস্র বাঙ্গালীর বিরুদ্ধে নবদ্বীপের তোরণদ্বারে আত্মরক্ষা করিয়াছিল, তাহা এক পক্ষের অসাধারণ বীরত্বের অথবা অন্য পক্ষের একান্ত দৌর্ব্বল্যের প্রমাণ নহে।

মুসলমানদিগের প্রথম উন্নতির সময়ে তাহারা সর্ব্বত্রই অজেয় হইয়াছিল। কোন দেশের কোন জাতিই তাহাদের বিপক্ষতা করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। সেই সময়ে যে তাহারা বাঙ্গালা দেশ জয় করিয়াছিল, ইহাও বাঙ্গালীর দৌর্ব্বল্যের প্রমাণ নহে। বরং বাঙ্গালীরা যে পঁয়ষট্টি বৎসর কাল তাহাদের প্রতিকক্ষতা করিয়াছিল, তাহাই যথেষ্ট গরিমার বিষয়। রাজত্বের সঙ্গে সঙ্গেই বৈদ্যদিগের বিক্রম বিলুপ্ত হইয়াছিল। ইহার পর বৈদ্যেরা বিদ্যা বুদ্ধির জন্য অনেকে প্রসিদ্ধ হইয়াছে বটে, কিন্তু কখন কেহ বীরত্বের খ্যাতি লাভ করে নাই। কিন্তু বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও চণ্ডালগণ অনেকে বিলক্ষণ শৌর্য্য বীর্য্য প্রকাশ করিয়াছে। তাহারা বারংবার পাঠান মোগলের প্রতিযোগিতা করিয়াছে এবং সময়ে সময়ে তাহাদিগকে পরাজয় করিয়া তাহাদের উপর আধিপত্য করিয়াছে। জেলা রঙ্গপুরে কাঁকিনার রাজারা বারেন্দ্র কায়স্থ। তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা বরাবর কোচবেহার-রাজের সেনাপতি ছিলেন এবং তাঁহারা পাঠান, মোগল ও ভুটিয়াদের সহ পুনঃ পুনঃ যুদ্ধ করিয়াছেন। দিনাজপুরের মহারাজের পূর্ব্বপুরুষেরা বরাবর বাঙ্গালার নবাবদিগের সেনাপতি থাকিয়া বাঙ্গালা দেশের উত্তর দিক্ রক্ষার্থ নিযুক্ত ছিলেন। শুশুং ও বাহির-বন্দের রাজারা বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ। তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষেরাও নবাবের সেনাপতিরূপে বাঙ্গালার উত্তর-পূর্ব্বদিক্ রক্ষা করিতেন। রাঙ্গামাটিয়ার রাজারা

উত্তর-রাঢ়ী কায়স্থ ছিলেন। পরে আসামের কলতা কায়েতের সহ আদান প্রদানে কলতা কায়েত হইয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা আসাম-রাজের সেনাপতি ছিলেন। ঔরংজীব বাদশাহের প্রসিদ্ধ সেনাপতি নবাব মীরজুম্লাকে তাঁহারাই পরাজয় করিয়া আসাম হইতে তাড়াইয়াছিলেন। বাঙ্গালার নবাব-দিগের অধিকাংশ সৈন্য ও সেনাপতি বাঙ্গালী ছিল। নবাব শিরাজদ্দৌলা ও মীরকাশীম যে সৈন্য লইয়া ইংরেজের সহ যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহারাও অধিকাংশ বাঙ্গালী ছিল। ইংরেজদিগের দেশীয় সেনা মধ্যেও প্রথম প্রথম অনেক বাঙ্গালী যোদ্ধা ছিল। ফলতঃ বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ ও কায়স্থেরা যেমন বুদ্ধির জন্য প্রসিদ্ধ, তেমনই বীরত্বের জন্যও প্রসিদ্ধ ছিলেন। বাস্তবিক, বীরত্ব কোন দেশবিশেষের বা জাতিবিশেষের গুণ নহে। প্রয়োজন ও সুযোগ দ্বারা এই গুণ উৎপন্ন হয় এবং অভ্যাস দ্বারা বর্দ্ধিত হয়। বীরত্ব প্রকাশের সুযোগ নাই এবং অভ্যাস নাই বলিয়াই বাঙ্গালীরা এখন নির্ব্বীর্য্য হইয়াছে। নীলকরদিগের দৌরাত্ম্য-সময়ে সলোপের সান্যাল, বালিয়াকান্দির চৌধুরী, ভাওয়ালের রাজা, রাজাপুরের রাণী এবং নড়াইলের বাবুরা বিলক্ষণ বিক্রম প্রকাশ করিয়াছিলেন। সিপাহি-বিদ্রোহকালে প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (The fighting Munsiff) এবং বর্ত্তমান কালে লেফ্‌টেণাণ্ট-কর্ণেল সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস বীরত্বখ্যাতি লাভ করিয়া-ছিলেন। সুতরাং বাঙ্গালীরা চিরকাল ভীরু বলিয়া অনুমান ভ্রম ও কুসংস্কার-মূলক।

নবদ্বীপ অধিকার করায় বাঙ্গালা দেশের কোন অংশই যবনদিগের হস্তগত হইল না। একটি লোকও তাহাদের অধীনতা স্বীকার করিল না। তাহাদিগকে দেখিয়া প্রজাগণ পলায়ন করিত। তাহারা কেবল লুঠ পাট করিয়া জীবন ধারণ করিত। মূল্য দিয়াও তাহারা কোন দ্রব্য কিনিতে পাইত না। এই অবস্থায় বখ্‌তিয়ার গৌড়নগর আক্রমণ করিতে চলিলেন। লক্ষ্মণসেন যে কলঙ্কপঙ্কে বাঙ্গা-লীর নাম ডুবাইয়াছিলেন, মধুসেন তাহা কতক উদ্ধার করিয়াছিলেন। গৌড়নগর সহজে বিজিত হয় নাই। বহু যুদ্ধের পর পাঠানেরা গৌড়নগর অবরোধ করিল। ইংরেজী ১২০৩ খৃষ্টাব্দে নবদ্বীপ পাঠানদিগের হস্তগত হয়। আর ১১২৭ শকাব্দে অর্থাৎ ইংরেজী ১২০৫ খৃষ্টাব্দে গৌড়নগর যবনাধিকৃত হয়। সুতরাং মধুসেন যে এক বৎসরের অধিককাল পাঠানদিগের সহ যুদ্ধ চালাইয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে কোন

সন্দেহ নাই। তাহারা ঐ স্থান হানা দিয়া দখল করিতে পারে নাই। তিন মাস অবরোধের পর রসদ নিঃশেষ হওয়ায় রাজা মধুসেন রাজধানী ত্যাগ করিয়া পূর্ব্ব-বঙ্গে প্রস্থান করিলেন। গৌড় বখ্‌তিয়ারের হস্তগত হইল। সেই সঙ্গে সমস্ত বরেন্দ্রভূমি, রাঢ়, মিথিলা এবং বগ্‌দির পশ্চিমভাগ পাঠানদিগের অধিকৃত হইল। রাজা মধুসেন কেবল বঙ্গদেশে এবং বগ্‌দির পূর্ব্বাংশে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। বিজয়ী পাঠানেরা মহোৎসাহে পূর্ব্ববঙ্গ আক্রমণ করিল। এই সময়ে পূর্ব্ববঙ্গে একডালা নামে এক অভেদ্য দুর্গ ছিল। যে স্থানে পদ্মা ও ব্রহ্মপুত্র নদের সম্মিলন হইয়াছে, ঠিক সেই স্থানে এই দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই দুর্গ ইংরাজী ১৮১৮ অব্দে সম্পূর্ণ জলমগ্ন হইয়াছে। ইহার প্রাচীর প্রায় ৮ হাত পুরু ছিল এবং গাঁথনি অতীব দৃঢ় ছিল। কেহ হানা দিয়া এই দুর্গ জয় করিতে পারিত না। নৌকাপথে রসদ ও নূতন সৈন্য আনিবার সুবিধা থাকায়, এই দুর্গ অবরোধ করিয়া কোন ফল ছিল না। তজ্জন্য এই দুর্গ অজেয় বলিয়া বিখ্যাত ছিল। স্থানীয় লোকে বলে যে, "রাজা বিক্রমাদিত্য বিক্রমপুর নগর স্থাপন করিয়া তাহাতে এই দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।" বিক্রমাদিত্য নামে বহু রাজা ছিলেন। তাঁহারা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। নামের একতা হেতু অনেক সময়ে একজনের কার্য্য অন্যে আরোপিত হয়। কিন্তু উজ্জয়িনীর প্রসিদ্ধ সম্রাট্ বিক্রমাদিত্য যে এই একডালার দুর্গ-স্থাপক নহেন সে বিষয়ে সন্দেহের কোন কারণ নাই।

বখ্‌তিয়ার পূর্ব্ববঙ্গ আক্রমণ করিলে রাজা মধুসেন একডালার দুর্গে আশ্রয় লইলেন। বখ্‌তিয়ার কিছুই করিতে পারিলেন না, বর্ষার প্রারম্ভে ফিরিয়া আসিলেন। দ্বিতীয় বৎসর পুনরায় পাঠানেরা পূর্ব্ববঙ্গ আক্রমণ করিল। মধুসেন আসামরাজের সাহায্যে তাহাদিগকে বিমুখ করিয়া দিলেন। বখ্‌তিয়ার ক্রুদ্ধ হইয়া আসাম দেশ আক্রমণ করিলেন। তথায় জঙ্গল মধ্যে বহু সৈন্য একত্র সমাবেশ করা অসাধ্য হইল। সেই সময়ে সুযোগ পাইয়া আসামীরা পাঠান-দিগকে আক্রমণ করিয়া পরাজয় করিল। জঙ্গলের জলবায়ুতে রুগ্নদেহ এবং পরাজয়ে ভগ্নমনে বখ্‌তিয়ার গৌড়ে ফিরিয়া আসিয়াই লীলা সংবরণ করিলেন। খৃঃ ১২০৭ সালে এই ঘটনা হয়। ইহার পর বহু দিন পর্য্যন্ত মুসলমানেরা পূর্ব্ববঙ্গ আক্রমণ করে নাই। পশ্চিমবঙ্গে পাঠান রাজ্য এবং পূর্ব্ববঙ্গে

বৈদ্যরাজ্য স্থির ছিল। সেই সময়ে বহুসংখ্যক সুব্রাহ্মণ পশ্চিম বঙ্গ ত্যাগ করিয়া পূর্ব্ববঙ্গে গিয়া বাস করিয়াছিলেন। বৈদ্যের সংখ্যা পূর্ব্ববঙ্গে প্রচুর, অথচ বরেন্দ্রভূমিতে অতি অল্প। ইহাতে জানা যায় যে, বৈদ্যেরা প্রায় সমস্তই এই সময়ে পূর্ব্ববঙ্গে গিয়া বাস করিয়াছিল। মধুসেন, কেশবসেন, শুকসেন এবং মাধব (দনুজ) সেন মোট চৌষট্টি বৎসর মুসলমানদের প্রতিকক্ষতা করিয়া পূর্ব্ববঙ্গে রাজত্ব করিয়াছিলেন। অবশেষে নবাব তোগরলবেগ নৌকাপথে আসিয়া হঠাৎ আক্রমণ দ্বারা একডালার দুর্গ অধিকার করিলেন। মাধবসেন পরাজিত হইয়া নৌকাপথে ত্রিপুরারাজ্যে পলাইতেছিলেন ; পথিমধ্যে ঝড় হওয়াতে সপরিবারে জলমগ্ন হইলেন। তাহাতেই বৈদ্যরাজবংশ সমূলে নিঃশেষ হইল এবং সমস্ত বাঙ্গালা দেশ পাঠানরাজ্য হইল। খৃঃ ১২৬৮ সাল।

পুরাতন শ্রোত্রিয়েরা এই বৈদ্যরাজবংশের অজস্র প্রশংসা করিয়াছেন। সেই প্রশংসা কিছুমাত্র অসঙ্গত বোধ হয় না। তাঁহারা ক্ষত্রিয় রাজাদের ন্যায় যুদ্ধপ্রিয় ছিলেন না। বল্লালসেন ভিন্ন অন্য কাহারও বিশেষ বীরত্বখ্যাতি দেখা যায় না। কিন্তু সদাচার, সুবিচার এবং প্রজাপালন বিষয়ে তাঁহারা ক্ষত্রিয় রাজাদিগের অপেক্ষা সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। ক্ষত্রিয় রাজারা প্রায়ই মূর্খ ছিল। কিন্তু বৈদ্য রাজারা সকলেই বিদ্বান্ এবং বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। বল্লাল ও লক্ষ্মণসেনের রাজ্যমধ্যে কোন প্রজা দরিদ্র ছিল না, কেহ ভিক্ষুক ছিল না এবং কেহ চোর ছিল না। বৈদ্যরাজবংশের সুশাসনই বাঙ্গালাদেশের উন্নতির মূল। তাঁহারা নিতান্ত দুর্ব্বল ছিলেন, তাহাও বোধ হয় না। কেননা তাঁহাদের যত বড় বিস্তীর্ণ রাজ্য সম্পূর্ণ আয়ত্ত ছিল, তত বড় রাজ্য ক্ষত্রিয় রাজাদের খুব কম দেখা যায়।

বাঙ্গালাদেশে পশমী কাপড় তৈয়ারী হইত না। কিন্তু কার্পাসবস্ত্র ও রেশমী কাপড় অতি উৎকৃষ্ট হইত এবং তাহা পারস্য, আরব, মিসর, তুরাণ এবং রোম নগর পর্য্যন্ত রপ্তানী হইয়া সমাদৃত হইত। সোণার ও রূপার অলঙ্কার এবং কাঁসা, পিতল ও তামার বাসন অতীব উৎকৃষ্ট হইত। কিন্তু এই সকল শিল্পের উৎপত্তি কোন্ সময়ে আরম্ভ হয় তাহা নিরূপণ করা যায় না। বৈদ্যরাজবংশ বাঙ্গালাদেশে স্থাপিত হইবার পূর্ব্বেই রোমরাজ্য উৎসন্ন হইয়াছিল। রোম রাজ্যে এই সকল দ্রব্যের সমাদর দেখিয়া ইহা নিশ্চিত বলা যায় যে বৈদ্যরাজ-

বংশের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বাবধি বাঙ্গালাদেশে এই সকল শিল্পের উন্নতি হইয়াছিল।

বাঙ্গালাদেশে হিন্দু রাজত্ব এবং বৌদ্ধ রাজত্ব কালে যেরূপ টাকা প্রচলিত ছিল, তাহা সমচতুষ্কোণ ছিল। কোন কোন রাজার সময়ে সমষট্‌কোণ টাকাও তৈয়ারী হইত। সেই টাকাতে বিশুদ্ধ রৌপ্য ব্যবহৃত হইত। টাকা কাটা রূপাই আদর্শ চাঁদী বলিয়া মান্য হইত। আবার সেই টাকাই সর্ব্বপ্রকার পরিমাণের মূলীভূত ছিল। চব্বিশটি টাকা এক সারিতে রাখিলে যত বড় দীর্ঘ হইত তাহারই নাম এক হাত। সেই হাতের আশী হাতে এক রশি এবং একশত রশিতে এক ক্রোশ হইত। সুতরাং সেই টাকাই সমস্ত দৈর্ঘ্য পরিমাপের মূলীভূত ছিল। পরন্তু সেই টাকা একশতটির যে ওজন তাহারই নাম এক শের। চল্লিশ শেরে এক মাণ এবং চৌষট্টি মাণে এক রাশি বা পুঞ্জ হইত। সুতরাং সেই টাকাই ওজনের মূলীভূত ছিল। এইরূপে সেই টাকা সর্ব্বপ্রকার তুলনার আধার হেতু টাকাকে "তোলা" বলিত। সেই টাকা যখন যে রাজার অনুশাসনে তৈয়ারী হইত সেই রাজার নাম তাহাতে লেখা থাকিত; তাঁহার রাজ্যের নাম এবং শকাব্দ, কলি অব্দ কিংবা সম্বৎ লেখা থাকিত কিন্তু কোন টাকায় কোন প্রতিমূর্ত্তি থাকিত না। ইংরেজী টাকায় যেরূপ গলদেশ পর্য্যন্ত মূর্ত্তি থাকে, বোধ হয় হিন্দু ও মুসলমানেরা এইরূপ গলাকাটা মূর্ত্তি দেওয়া অশুভ জ্ঞান করিতেন। আধুলি, সিকি বা দোয়ানী ছিল না। আনা পয়সা প্রভৃতিও ছিল না। টাকা ভাঙ্গাইলে এক বোঝা কড়ী পাওয়া যাইত। তদ্দ্বারাই ক্রয় বিক্রয়াদি কার্য্য হইত। পাঠান রাজত্বেও ঐরূপ ব্যবহারই ছিল। মোগল রাজ্যারম্ভে সর্ব্বপ্রথমে গোলাকার টাকা প্রচলিত হইয়াছিল। তুরাণী ভাষায় গোল টাকাকে তঙ্কা বলে। সেই তঙ্কা শব্দের অপভ্রংশে "টাকা" শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে।

মন্বাদি শাস্ত্রকারেরা দিগ্বিজয় জন্য চেষ্টা করা ক্ষত্রিয় রাজাদিগের একটি প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তজ্জন্য প্রত্যেক পরাক্রান্ত হিন্দু রাজাই দিগ্বিজয়ের চেষ্টা করিতেন। হিন্দুরাজাদের দিগ্বিজয়ের অর্থ কি তাহা য়ুরোপীয় লোকের বোধগম্য হয় না। তজ্জন্য হিন্দু রাজগণের নানা দেশ জয় করিবার বর্ণনা দেখিয়া য়ুরোপীয়েরা তাহা কবিদিগের কল্পনা বলিয়া জ্ঞান করেন।

হিন্দু রাজগণ বহু বিবাহ করিতেন এবং তাঁহাদের বহু সন্তান হইত। যদি রাজগণ যুদ্ধ বিগ্রহ না করিয়া শান্তি ভোগ করিতেন, তবে অল্পকাল মধ্যেই তাঁহাদের

বংশধরগণের সংখ্যা অতিমাত্র বৃদ্ধি হইত। রাজকুমারদের স্বল্প ব্যয়ে জীবিকা নির্ব্বাহ হয় না। এজন্য রাজবংশ বৃদ্ধি হইলে প্রজাদের অর্থ অধিক পরিমাণে শোষণ করিয়া রাজপুত্রদের ব্যয় চালাইতে হইত। সেই হেতু রাজবংশ বৃদ্ধি পৃথিবীর ভার বৃদ্ধি নামে উক্ত হইত। সেই ভার হ্রাস করার জন্যই শাস্ত্রকারেরা ক্ষত্রিয়দিগের সর্ব্বদা যুদ্ধ বিগ্রহে ব্যাপৃত থাকার ব্যবস্থা করিয়াছেন। দিগ্বিজয় ও বিবাহ উপলক্ষে ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইত। তাহাতে বহুসংখ্যক রাজপুত্র ও ক্ষত্রিয় নিহত হইয়া পৃথিবীর ভার কম হইত। অধিকন্তু বীরত্ব অভ্যাসমূলক। যাহারা কখন যুদ্ধ করে নাই, যুদ্ধ দেখে নাই তাহারা যত কেন বলবান হউক না, এবং অস্ত্রচালনে যত সুশিক্ষিত হউক না, কদাচ বীর হইতে পারে না। তাহারা মৃত্যু হইবে অথবা শরীরে আঘাত লাগিবে ভাবিয়া ভীত হয়। তজ্জন্য তাহারা স্থির হইয়া যুদ্ধ করিতে পারে না। ক্ষত্রিয়-দিগের মধ্যে সর্ব্বদা যুদ্ধ বিগ্রহ প্রচলিত থাকায় তাহারা যুদ্ধ করিতে অথবা মরিতে ভয় পাইত না।

হিন্দুদিগের দিগ্বিজয়ে একটি রাজ্য অপর রাজ্যের অন্তর্গত হইত না। পরা-জিত রাজা জেতার অধীনতা স্বীকার করিয়া তাঁহাকে বার্ষিক কিছু কিছু অনুকর দিতে স্বীকার করিলেই হইত। পরন্তু পরাজিত রাজা হত হইলে তাঁহার স্থানে তাঁহারই কোন দায়াদ রাজা হইত। পরাজিতের রাজ্য কখন জেতার নিজ রাজ্য হইত না। সুতরাং দিগ্বিজয় দ্বারা প্রজাগণের কোনরূপ ক্ষতি বৃদ্ধি হইত না। সেই জন্য ভারতবর্ষীয় প্রজারা কখন দলবদ্ধ হইয়া বিজেতার সহ যুদ্ধ করিত না। রাজা এবং রাজপুত্রগণ পরাজয়ে ক্ষতিগ্রস্থ হইতেন এজন্য তাঁহারাই কেবল যুদ্ধ করিতেন। প্রজাগণ রাজাজ্ঞায় বা রাজভক্তি বশতঃ রাজার সাহায্য করিত এবং যোদ্ধৃগণ রাজার পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিত। রাজা যুদ্ধে হত হইবামাত্র সেনাগণ যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়া প্রস্থান করিত। যুদ্ধ দুই প্রকার ছিল (১) দ্বৈরথ্য যুদ্ধ-বা দ্বন্দ্ব যুদ্ধ (২) চমূ যুদ্ধ। দ্বন্দ্ব যুদ্ধে দুই পক্ষের রাজা বা নায়ক পরস্পর যুদ্ধ করিতেন। তাহাতে উভয় পক্ষের সেনাগণ কেবল দর্শকরূপে থাকিত। তাহারা যোধ্যমান বীরদ্বয়ের কোন সাহায্য করিতে পারিত না। চমূ যুদ্ধে উভয় পক্ষের সেনাগণ যুদ্ধ করিত। রাজা ও নায়কগণ ব্যূহ রচনা করিতেন এবং সেনা চালাইতেন মাত্র। চমূ যুদ্ধেও সময়ে সময়ে

নায়কে নায়কে যুদ্ধ হইত এবং নায়ক নিহত হইলেই যুদ্ধ শেষ হইত। ক্ষত্রিয়দের মধ্যে যুদ্ধ এক প্রকার ক্রীড়া কৌতুক সদৃশ ছিল। মহাভারতে দেখা যায় যে, কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন যে, "মগধরাজ জরাসন্ধের সৈন্যবল অত্যন্ত অধিক; চমূযুদ্ধে তাঁহাকে পরাজয় করা অসাধ্য। অথচ তাঁহাকে বিনাশ না করিলে রাজসূয় যজ্ঞ সম্পন্ন হইবে না। এজন্য আমি ভীমার্জ্জুনকে লইয়া গিয়া জরাসন্ধ সহ দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিয়া তাহাকে বিনাশ করিব।" তদনুসারে ভীমার্জ্জুন সহ কৃষ্ণ জরাসন্ধের নিকট গিয়া দ্বন্দ্ব যুদ্ধ প্রার্থনা করিলেন। ভীম ও জরাসন্ধে যুদ্ধ তিন দিন পর্য্যন্ত চলিল। কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন অতিথিরূপে জরাসন্ধের বাড়ীতে থাকিলেন এবং যুদ্ধ দেখিতে লাগিলেন। জরাসন্ধ নিহত হইলে তৎপুত্র সহদেব রাজা হইলেন। যে সকল রাজা জরাসন্ধের নিকট বন্দী ছিল কৃষ্ণ তাহাদিগকে মুক্ত করিয়া ভীমার্জ্জুন সহ ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরিয়া আসিলেন। মগধ রাজ্যের অপর লোকদের অবস্থা কিছুই পরিবর্ত্তন হইল না। সকল হিন্দুরাজাই মন্বাদি শাস্ত্রকার-দিগের নিয়মে প্রজা শাসন করিতেন। সুতরাং রাজপরিবর্ত্তনে প্রজার অবস্থা কিছুই পরিবর্ত্তিত হইত না। এই জন্য রাজগণের যুদ্ধে প্রজারা মনোযোগ করিত না। জাতীয় স্বাধীনতা কাহাকে বলে প্রজারা তাহা জানিত না।

বৌদ্ধরাজত্ব অবধি দ্বন্দ্ব যুদ্ধ প্রথা রহিত হইয়াছিল। তদবধি এক রাজা যুদ্ধ করিয়া অন্য রাজার রাজ্য অধিকার করা কতক প্রচলিত হইয়াছিল। কিন্তু সকল রাজারই শাসনপ্রণালী একইরূপ ছিল এজন্য প্রজাদের অবস্থা রাজপরি-বর্ত্তনে বিশেষ পরিবর্ত্তিত হইত না। এই কারণে প্রজারা যোট করিয়া দেশের স্বাধীনতা রক্ষার্থ বা উদ্ধারার্থ কদাচ চেষ্টা করিত না।

য়ুরোপে গ্রীস, রোম প্রভৃতি দেশে সাধারণ তন্ত্র শাসন ছিল। তথায় এক জাতি বা এক দেশীয় লোক অন্য দেশ বা রাজ্য জয় করিলে, বিজেতৃ জাতীয় প্রত্যেক ব্যক্তি জিত দেশ হইতে নিজ স্বার্থলাভের চেষ্টা করিত। জিত জাতির সমস্ত ধন সম্পত্তি জেতৃগণ লইত এবং জিত জাতীয় লোকেরা জেতৃগণের দাস বা তত্তুল্য হইত। এইজন্য য়ুরোপে প্রজাগণ প্রাণপণে জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষার জন্য বা তদুদ্ধার জন্য চেষ্টা করে। এশিয়া খণ্ডে সর্ব্বত্রই রাজতন্ত্র শাসন প্রণালী প্রচলিত। এশিয়াতে এক দেশের রাজা অন্য দেশ জয় করিলে তিনি উভয় দেশের রাজা বলিয়া গণ্য হন এবং উভয় দেশের প্রজাগণকে তিনি তুল্য বিবেচনা

করেন। এশিয়াখণ্ডে জাতীয় দিগ্বিজয় নাই, জাতীয় পরাজয় নাই সুতরাং জাতীয় স্বাধীনতা জ্ঞানও নাই। য়ুরোপীয়েরা এশিয়াখণ্ডের লোকদিগের বিশেষতঃ হিন্দুদিগের দিগ্বিজয়ের উদ্দেশ্য ও ফলাফল বুঝেন না। তাঁহারা বিলাতী ধরণে এশিয়াখণ্ডে দিগ্বিজয়ের যে ফলাফল অনুমান করেন তাহা কাজে কাজেই ভ্রমপূর্ণ হয়।

গৌড়ীয় পঞ্চরাজ্য পাঠানদিগের অধিকৃত হইলে তাহারা মিথিলারাজ্য মগধ দেশের সহ মিলিত করিয়া শুবে বেহার নাম দিয়াছিল। অবশিষ্ট চারিটি রাজ্য দ্বারা শুবে বাঙ্গালা গঠিত করিয়াছিল। এই দুই শুবায় কদাচিৎ পৃথক্ পৃথক্ নবাব নিযুক্ত হইত। সচরাচর এক জন নবাবই এই দুই শুবা শাসন করিতেন। গৌড় নগরে নবাবের রাজধানী ছিল। সুবর্ণগ্রাম, সপ্তগ্রাম, পাটনা ও সাসারাম, এই চারিটি স্থানে চারিজন শরীফ বা উপনবাব ছিল। তাহারা নিকটবর্ত্তী প্রদেশের রাজা, ভূঁইয়া ও গাঁইয়াদিগের নিকট রাজস্ব আদায় করিয়া নবাব-সরকারে পাঠাইত। ঐ পাঁচটি নগরে দুর্গ ছিল। তাহাতে কতকগুলি পাঠান সৈন্য থাকিত। ঐ সকল নগরের আশে পাশে পাঠান সর্দ্দারদিগের জাগীর এবং মুসলমান সাধুদিগের পীরপাল ছিল। অবশিষ্ট সমস্ত দেশ হিন্দু জমীদারেরাই শাসন করিতেন। কিন্তু সেই সকল জমীদারদের জমীদার উপাধি ছিল না। বৃহৎ জমীদারদিগের "রাজা" বা "মহারাজ" উপাধি ছিল। আর ক্ষুদ্র জমীদারগণের 'গাঁইয়া' ও 'ভূঁইয়া' উপাধি ছিল। রাজা মহারাজগণের অধীনেও অনেক গাঁইয়া, ভূঁইয়া ছিল। মোগলরাজত্বকালে সেই সকল রাজা মহারাজদের জমীদার উপাধি হইয়াছিল। তাঁহাদের অধীন গাঁইয়া ভূঁইয়াদের উপাধি তালুকদার হইয়াছিল। আর যে সকল গাঁইয়া ভূঁইয়া কোন রাজার অধীন ছিল না, তাহাদের উপাধি হুজুরী তালুকদার হইয়াছিল। তাহারা নবাব-সরকারে রাজস্ব দিত।

পাঠানেরা কুটিল রাজনীতি জানিত না। রাজ্য মধ্যে জরিপ জমাবন্দি কিংবা অন্য কোন পাকা বন্দোবস্ত ছিল না। জমীদারেরা যে রাজস্ব দিত, এবং বণিকেরা যে শুল্ক দিত, তাহাই নবাবদিগের আয় হইত। তাহা হইতে নিজ ব্যয় বাদে অবশিষ্ট টাকা নবাবেরা দিল্লীর সম্রাট্কে পাঠাইতেন। জরিমানা ও উপঢৌকন স্বরূপে নবাবেরা যাহা পাইতেন তাহা তাঁহাদের নিজস্ব ছিল।

তাহার জন্য কোন হিসাব নিকাশ বাদশাকে দিতে হইত না। নবাবেরা সম্রাট্‌কে মালগুজারী দিতেন বটে, কিন্তু নিজ নিজ শুবায় তাঁহারা যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারিতেন। সেইরূপ, জমীদারেরা নবাবকে রাজস্ব দিয়া নিজ নিজ চত্বরে সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিতেন। প্রভু কখন অধীনগণের আভ্যন্তরিক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন না।

বহুলোক এক যৌত পরিবাররূপে বাস করা হিন্দুদিগের মধ্যে চিরকাল প্রচলিত ছিল। বিলাতী কুশিক্ষায় সেই নিয়ম কতক দূর ভঙ্গ হইয়াছে বটে কিন্তু অনেক স্থানেই এখনও বিদ্যমান আছে।

রাজা মহারাজদিগের রীতিমত অভিষেক হইত এবং তাঁহাদের কেবল এক জন মাত্র উত্তরাধিকারী হইত। তাঁহাদের অপর দায়াদগণ ভরণ পোষণ জন্য আয়মা* পাইত। গাঁইয়া ভুঁইয়াদের অভিষেক হইত না এবং তাঁহাদের উত্তরাধিকারিগণ শাস্ত্রমত দায় ভাগ করিয়া লইতেন। জমীদারগণের উত্তরাধিকারে বিবাদ হইলে অথবা দুই জমীদারের মধ্যে রাজ্যের সীমানা লইয়া বিবাদ উপস্থিত হইলে তাহার মীমাংসা যুদ্ধ কিংবা সালিশ দ্বারা হইত। কদাচিৎ পরাজিত পক্ষ নবাবের দরবারে নালিশ করিত। ঈদৃশ নালিশ করা নিতান্ত কাপুরুষের কার্য্য বলিয়া গণ্য ছিল। নবাবের কর্ম্মচারী সমস্তই ঘুষখোর ছিল। বিবাদের পক্ষগণ মধ্যে যে বেশী টাকা ব্যয় করিতে পারিত, বিবাদে প্রায়শঃ তাহারই জয় হইত। সুতরাং পরাজিত পক্ষ নালিশ করিয়া প্রায়ই কোন ফল পাইত না। তজ্জন্য ঈদৃশ নালিশ অতি অল্পই হইত। জমীদারদিগের অধীন প্রজারা কখন নবাব দরবারে নালিশ করিতে যাইত না। নবাবেরাও তাদৃশ প্রজা সাধারণ সম্বন্ধে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করিতেন না। সুতরাং সাধারণ প্রজার সহ নবাবের কোন সম্বন্ধ ছিল না।

বেহার প্রদেশে অধিকাংশ জমীদার ক্ষত্রিয় ছিল, অবশিষ্ট ব্রাহ্মণ ছিল। বাঙ্গালা দেশে ক্ষত্রিয় না থাকায় ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থেরাই সমস্ত দেশের জমীদার ছিল। কোন নিকৃষ্টজাতীয় লোক ভূম্যধিকারী হইতে পারিত না। নবাব কিংবা শরীফগণ কোন ছোট লোককে কখন কখন গাঁইয়া ভুঁইয়া নিযুক্ত করিতেন।

* আয়মা শব্দ আরবী-ভাষামূলক। কোন রাজপুত্র বা অপর বড় মানুষের ভরণপোষণ জন্য প্রাপ্ত ভূমির নাম আয়মা। ইহা সংস্কৃত 'নাম্নু কর' শব্দের তুল্য।

কিন্তু প্রজারা তাদৃশ জমীদারকে মান্য করিত না এবং সুযোগ পাইলেই হত্যা করিত। পাঠান রাজত্ব দৃঢ়ীভূত হইলে, নবাবেরা হিন্দু জমীদারদিগকে বিচ্যুত করিয়া পাঠান সর্দ্দারগণকে জমীদারী দিতে পারিতেন। কিন্তু নবাবেরা তদ্রূপ চেষ্টা বা ইচ্ছা করেন নাই। তাহার অনেকগুলি কারণ ছিল। বাঙ্গালা-দেশে এক্ষণে যেরূপ অরক্ষণীয় সমতল ক্ষেত্র, পূর্ব্বে এরূপ ছিল না। নদী, হ্রদ ও জঙ্গল দ্বারা বাঙ্গালাদেশ অতি দুর্ভেদ্য স্থান ছিল। ঈদৃশ দুর্গম দেশের অভ্যন্তরে স্বল্পসংখ্যক পাঠান ছড়াইয়া পড়িলে হিন্দুগণ কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইবার ভয় ছিল। যদি পাঠান সর্দ্দারের সঙ্গে উপযুক্ত সৈন্য সামন্ত থাকিত, তবে তাহাদের ব্যয়েই সমস্ত রাজস্ব নিঃশেষ হইত; নবাবের ভাণ্ডারে কিছুই প্রেরিত হইত না। অধিকন্তু পাঠান সর্দ্দারেরা অনেকেই লেখা পড়া জানিত না, আদায় তহশীল কার্য্য কিছুমাত্র বুঝিত না, অথচ অতিশয় উগ্রপ্রকৃতি এবং বহুব্যয়ী ছিল। তাহারা যুদ্ধস্থলে যেমন বীর ছিল, তেমনই আবার শান্তি সময়ে নিতান্ত অলস ও বিলাসী ছিল। তাহাদিগকে জমিদারী দিলে তাহারা উপযুক্ত পরিমাণে রাজস্ব আদায় করিতে পারিত না এবং যাহা আদায় করিত, তাহাই ব্যয় করিয়া ফেলিত। সুতরাং নবাবের নিকট মালগুজারী দিতে পারিত না। সেই বাকির জন্য পীড়াপীড়ি করিলে অমনি পাঠান সর্দ্দার বিদ্রোহী হইত। এই সমস্ত কারণে নবাবেরা পাঠানদিগকে দেশের অভ্যন্তরে জমীদারী দিতেন না। সুতরাং বাঙ্গালাদেশ মুসলমানদিগের অধিকৃত হইলেও দেশের অভ্যন্তরে হিন্দুরাজ্যই চলিতেছিল।

তৃতীয় অধ্যায়।

সমসুদ্দীন।—সান্যাল ও ভাদুড়ীবংশ।—সান্যালগড়।—ভাদুড়ীচক্র।—একটাকিয়া ভাদুড়ীদের উপাধি।—চলনবিল।—সপ্তদুর্গা—ফুলমতী।—কংসরাম।—বজ্রবাহু।—ময়জুদ্দীন।—হাব্‌সী রাজগণ।

বাঙ্গালাদেশ মুসলমান অধিকারভুক্ত হইলে, দেড় শত বৎসরকাল দিল্লীর সম্রাটের অধীন ছিল। তাহার পর বিকৃতবুদ্ধি মহম্মদ তোগলকের অত্যাচারে সাম্রাজ্য ভঙ্গ হইতে আরম্ভ হয়। শুবায় শুবায় নবাবেরা স্বাধীন হইয়াছিল। বাঙ্গালার নবাব সমসুদ্দীন* তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রথম পথপ্রদর্শক। এখন নানা কারণে বাঙ্গালাদেশে মুসলমানের সংখ্যা অতিমাত্র বৃদ্ধি হইয়াছে। এখন বাঙ্গালাদেশে যত মুসলমান আছে, পৃথিবীর অন্য কোন দেশেই এই পরিমাণ স্থানে এত অধিক সংখ্যক মুসলমান নাই। কিন্তু সমসুদ্দীনের সময়ে সমস্ত বাঙ্গালা ও বেহারে চৌত্রিশ হাজারের বেশী মুসলমান ছিল না। সমসুদ্দীন বেশ বুঝিয়াছিলেন যে, সেই স্বল্পসংখ্যক মুসলমানগণের সাহায্যে তিনি কদাচ সম্রাটের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করিতে পারিবেন না। অধিকন্তু বিদ্রোহকালে সেই সকল মুসলমান তাঁহার স্বপক্ষে থাকিবে কি না তাহাও অনিশ্চিত। এজন্য তিনি একদল হিন্দু-সেনা সংগ্রহ করিতে মনস্থ করিলেন। তিনি নিজ হিন্দু-কর্ম্মচারীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাদের হিন্দুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে?" তাহারা কহিল, "হিন্দুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কুলীন, আর কুলীনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, আমরা যতদূর জানি, দামনাশের সান্যাল এবং ভাজনীর ভাদুড়ী।" সেই কথা শুনিয়া নবাব দামনাশ হইতে শিখাই (শিখিবাহন) সান্যালকে এবং ভাজনী হইতে সুবুদ্ধিরাম ভাদুড়ী, কেশবরাম ভাদুড়ী এবং জগদানন্দ ভাদুড়ীকে আহ্বান করিয়া নিজ উদ্দেশ্য সাধনে নিযুক্ত করিলেন।

এই ভাদুড়ীবংশ চিরবিখ্যাত। যে সময়ে পশ্চিমবঙ্গে পাঠানরাজত্ব এবং পূর্ব্ববঙ্গে বৈদ্যরাজত্ব চলিতেছিল, সেই সময়ে বালিহাটী গ্রামে (বর্ত্তমান ঢাকা

---

* মুদ্রায় অঙ্কিত সম্পূর্ণ নাম সমসুদ্দীন আবুল মজঃফর ইলিয়াস শাহ। সমসুদ্দীন অত্যন্ত ভাঙ্গ খাইতেন বলিয়া লোকে তাঁহাকে 'ভাঙ্গরা' বলিত।

জেলার বালিয়াটী) মহাত্মা উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ীর জন্ম হয়। তাঁহার তুল্য পণ্ডিত বাঙ্গালা দেশে এ পর্য্যন্ত আর কেহ হয় নাই। তাঁহার তীর্থপর্য্যটন সময়ে চিত্রকূট পর্ব্বতে শঙ্করাচার্য্য সহ সপ্তাহকালব্যাপী যে তর্ক বিতর্ক বিচার হয়, তাহাই দিগ্‌দেশবিখ্যাত। দাক্ষিণাত্যবাসী শঙ্করাচার্য্য বেদবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন বটে, কিন্তু বুদ্ধিমান্ বাঙ্গালী পণ্ডিতের ন্যায় সুতার্কিক ছিলেন না। শঙ্কর যে তর্কে মণ্ডন পণ্ডিত ও তৎপত্নী উভয়ভারতীকে পরাজয় করিয়াছিলেন, উদয়নের সম্মুখে তাহা খাটিল না। * উদয়নাচার্য্যের রচিত 'কুসুমাঞ্জলি', 'তীর্থ-মাহাত্ম্যং' প্রভৃতি অনেক গ্রন্থ আছে, তাহা বাঙ্গালাদেশের বাহিরে প্রচার নাই। এই মহাত্মার বংশে যত পণ্ডিত, যত রাজা এবং যত বীরপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তত বাঙ্গালাদেশের অন্য কোন বংশেই দেখা যায় না। বৃহস্পতি ভাদুড়ীর পুত্র উদয়ন আচার্য্য। তাঁহার পঞ্চম পুরুষে কৃষ্ণ ভাদুড়ী। কৃষ্ণের পুত্র সুবুদ্ধি, কেশব এবং জগদানন্দ। তাঁহাদের সন্তানই একটাকিয়া রাজবংশ। এরূপ অনুমান হয় যে উদয়ন যখন মিথিলাদেশে ন্যায় শাস্ত্র পড়িতেন তখন তথায় এক বিবাহ করিয়াছিলেন। বোধ হয় তখন এরূপ বিবাহ রীতিবিরুদ্ধ ছিল না। সেই বিবাহের সন্তানও মিথিলা প্রদেশে বিদ্যমান আছে।

জগদানন্দ পারসী ভাষা জানিতেন; নবাব তাঁহাকে "রায়" উপাধি দিয়া দেওয়ান (রায়রাইয়াঁ) করিলেন। আর শিখাই, সুবুদ্ধি ও কেশবকে "খাঁ" উপাধি দিয়া সেনাপতিপদে বরণ করিলেন। সান্যাল ও ভাদুড়ীত্রয় নবাবের কর্ম্ম স্বীকার করিয়া হিন্দুদের স্বাভাবিক প্রভুভক্তি অনুযায়ী নবাবের উদ্দেশ্য সাধনে ব্রতী হইলেন। এক বৎসর মধ্যেই নবাবের ভাণ্ডারে মহাযুদ্ধের উপযুক্ত অর্থ ও রসদ সঞ্চিত হইল। আর পঞ্চাশ হাজার হিন্দু-সেনা সংগৃহীত ও সুশিক্ষিত হইল। নবাব তাঁহার হিন্দু-কর্ম্মচারীদের যোগ্যতা এবং প্রভুভক্তি দর্শনে অতীব তুষ্ট হইলেন। তাঁহার মুসলমান-সেনাগণ বিপক্ষে যোগ না দিতে পারে এই উদ্দেশ্যে তিনি কতকগুলি মুসলমান-সৈন্য সেই হিন্দু-সেনাপতিদের অধীনে দিলেন। আবার কতকগুলি হিন্দু-সৈন্য লইয়া মুসলমান-সেনাপতির অধীনস্থ করিলেন। হিন্দু ও মুসলমানগণ পরস্পরকে দৃঢ় বিশ্বাস করিত না। সুতরাং নবাবের নিজ সৈন্যদের মধ্যে ষড়্‌যন্ত্র বা বিদ্রোহের আশঙ্কা থাকিল না। এইরূপে আট

* শঙ্করঃ শঙ্করাংশস্তু উদয়নো নারায়ণঃ স্বয়ম্।

ঘাট বাঁধিয়া ৭৪৬ হিজরীতে সম্‌সুদ্দীন "শাঃ" অর্থাৎ স্বাধীন রাজা উপাধি গ্রহণ করিলেন। সম্রাট্‌ মহম্মদ তোগলক এবং পরে ফেরোজ তোগলক কোন মতে সম্‌সুদ্দীনকে আয়ত্ত করিতে না পারিয়া অবশেষে তাঁহার স্বাধীনতা স্বীকার করিলেন। এই অবধি দুইশত বৎসরকাল বাঙ্গালা ও বেহার একটি স্বাধীন সাম্রাজ্য ছিল। তৎকালে সম্রাট্‌ বা বাদশাঃ বলিলে দিল্লীর সম্রাট্‌কেই বুঝাইত, এইজন্য বাঙ্গালার সম্রাট্‌দিগকে "গৌড়-বাদশাঃ" বলা হইত।

সান্যাল এবং ভাদুড়ীত্রয়ই সম্‌সুদ্দীনের উন্নতির প্রধান সহায় ছিলেন। এজন্য তিনি তাঁহাদিগকে দুইটি প্রকাণ্ড জাগীর দিয়াছিলেন। শিখাই সান্যালের জাগীর পদ্মার উত্তরে চলনবিলের দক্ষিণে অবস্থিত ছিল। সান্যালগড় বা সাঁতোড়ে তাঁহার রাজধানী ছিল। তাঁহার জাগীরের বার্ষিক মুনাফা একলক্ষ টাকা ছিল। যদিও গৌড়বাদশাহের দরবারে শিখাইর খাঁ উপাধি ছিল, তথাপি শিখাই বা তদ্বংশীয়েরা কখন মফঃস্বলে খাঁ উপাধি গ্রহণ করেন নাই। তাঁহারা ঐশ্বর্য্যজ্ঞাপক অন্য কোন উপাধিও ধারণ করেন নাই। তাঁহারা কুলপতির সন্তান বলিয়া অত্যন্ত কুলাভিমানী ছিলেন। তজ্জন্য তাঁহারা নিজ সান্যাল উপাধিই বরাবর স্থিরতর রাখিয়াছিলেন। শিখাই সান্যালের তিন পুত্র; প্রথম, বলাই সাঁতোড়ে রাজা হন; দ্বিতীয়, কানাই কুলের রাজা বা কুলপতি এবং তৃতীয়, সত্যবান্‌ বা প্রিয়দেব ফৌজদার। এই সত্যবানের পুত্র রাজা কংসরাম বাদশাঃ।

ভাদুড়ীত্রয়ের জ্যেষ্ঠভ্রাতা সুবুদ্ধি খাঁ জাগীর পাইয়া রাজা হইয়াছিলেন। তাঁহার জাগীর চলনবিলের উত্তরে ছিল। নিজ চলনবিলও এই দুই জাগীরদারের অধিকৃত ছিল। ভাদুড়ীর জাগীর চাকলে ভাদুড়িয়া (ভাতুড়িয়া) নামে খ্যাত হইয়াছিল। পণ্ডিতেরা সেই নাম সংস্কৃত করিয়া "ভাদুড়ীচক্র" বলিতেন। এই জাগীরের মুনাফা একলক্ষ টাকার অধিক ছিল। সুবুদ্ধি খাঁ তাহাতে প্রায় স্বাধীন রাজার ন্যায় ছিলেন। তিনি নিজ নামে মুদ্রা ছাপিতেন না এবং বার্ষিক এক টাকা গৌড়বাদশাকে নজর দিতেন। এজন্য তদ্বংশীয় রাজাদিগকে "এক-টাকিয়া রাজা" বলিত। তাহার পর সুবুদ্ধি খাঁ, কেশব খাঁ এবং জগদানন্দ রায়ের সন্তানেরা সকলেই "একটাকিয়া ভাদুড়ী" বলিয়া পরিচিত হইতেন। খাঁ, সিংহ এবং রায় এই তিনটি উপাধি ইঁহাদের প্রসিদ্ধ। একটাকিয়া ভাদুড়ীবংশে অন্য কোন উপাধি নাই।

গৌড়বাদশাহের সেনাপতি হইলেই হিন্দুদের খাঁ উপাধি হইত। তাঁহাদের সম্মান বৃদ্ধি হইলে খাঁ সাহেব বলা যাইত। বঙ্গীয় রাঢ়ী ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থের মধ্যেও খাঁ উপাধি আছে। কিন্তু "খাঁ সাহেব" উপাধি বাদশাহী দরবারে একটাকিয়া ভাদুড়ীদের ভিন্ন অন্য কাহারও হয় নাই। বাঙ্গালাদেশ ভিন্ন অন্যত্র কোন হিন্দুর খাঁ উপাধি নাই। একটাকিয়াদের মধ্যে যিনি রাজা হইতেন, প্রথম প্রথম কেবল তাঁহারই "খাঁ সাহেব" উপাধি হইত। রাজার ভ্রাতাদের মধ্যে যিনি সৈনিক বিভাগে কর্ম্ম করিতেন, তাঁহার সিংহ উপাধি হইত, আর যিনি দেওয়ানী বিভাগে কর্ম্ম করিতেন, তাঁহার রায় উপাধি হইত। তাহার পর ক্রমশঃ ঐ সকল উপাধি বংশানুক্রমিক হইয়াছিল। সিংহ উপাধি ক্ষত্রিয়দিগেরই প্রসিদ্ধ।— পশ্চিমপ্রদেশে অনেক ব্রাহ্মণেরও সিংহ উপাধি আছে। বাঙ্গালাদেশে একটাকিয়া ভাদুড়ীবংশে ও সুশুঙ্গের রাজবংশে ভিন্ন অন্য কোন ব্রাহ্মণের সিংহ উপাধি নাই।

"রায়" এবং মহারাষ্ট্রদেশীয় "রাও" উপাধি "রাজ"শব্দের অপভ্রংশ। প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকে দেখা যায় যে, মহারাজ শব্দের অপভ্রংশে "মহারায়" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে "মহা" কথাটুকু ত্যাগ করিয়া রাজ শব্দ স্থানে রায় শব্দ বা রাও শব্দ চলিত হইয়াছে। তাহারই স্ত্রীলিঙ্গে রায়ণী বা রাণী শব্দ হইয়াছে। রাজা ও রাণী উপাধি অনেক মুসলমানের আছে। কিন্তু রায় এবং রাও উপাধি কুত্রাপি কোন মুসলমানের নাই। জগদানন্দের বংশে রায় উপাধি এবং সুবুদ্ধি খাঁর ও কেশব খাঁর বংশে খাঁ ও সিংহ উপাধি এখনও আছে।

বরেন্দ্রভূমিতে "চলনবিল" নামে একটি অতি প্রসিদ্ধ বিস্তীর্ণ হ্রদ আছে। পূর্ব্বে তাহার আয়তন আরও বেশী ছিল। বহুসংখ্যক নদ নদী ও শাখানদী এই হ্রদে পতিত হইয়াছে, আর কয়েকটি নদী ও সোঁতা এই হ্রদ হইতে নির্গত হইয়াছে। সেই সকল নদ নদী দ্বারা আনীত বালুকায় এই হ্রদ ক্রমশঃ পূর্ণ হইয়া যাইতেছে। বর্ষাকালে এই হ্রদের মধ্যস্থল হইতে চারিদিক্ দৃষ্টি করিলে স্থল কূল কিছুই দৃষ্ট হয় না। বোধ হয় যেন সেই প্রকাণ্ড জলরাশি অর্দ্ধবর্ত্তুলাকার আকাশের সহ মিলিত হইয়াছে। হ্রদের জল সর্ব্বাংশে গভীর নহে। গ্রীষ্মকালে অনেকাংশের জল শুষ্ক হইয়া যায়। প্রতি বৎসর নূতন পলি পড়ায় এই শুষ্ক

অংশের ভূমি অতি উর্ব্বরা। বিনা পরিশ্রমে বা অত্যল্প পরিশ্রমে সেই জমিতে প্রচুর শস্য হয়। ভাদুড়ীচক্র ধনধান্যপরিপূর্ণ অতি সমৃদ্ধ রাজ্য ছিল। পুরাতন-অবস্থা-অপরিজ্ঞাত ব্যক্তির নিকট ভাদুড়িয়ার লক্ষ টাকা রাজস্ব সামান্য বোধ হইতে পারে। কিন্তু তাহাদের জানা উচিত যে, তখন জিনিসের মূল্য অতি কম ছিল। তখন এক টাকায় আট দশ মণ চাউল মিলিত। এখন একমণ চাউলের দাম পাঁচ ছয় টাকা। এক্ষণে দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি হওয়ায় টাকার মূল্য সেই অনুপাতে কমিয়া গিয়াছে। তখনকার একলক্ষ টাকা সুতরাং এখনকার ত্রিশ চল্লিশ লক্ষ টাকার তুল্য ছিল। তখন সমস্ত বাঙ্গালা বেহারের অধিপতি গৌড়বাদশাহের বার্ষিক লভ্য পঞ্চাশ লক্ষ টাকার বেশী ছিল না। তখন বিদেশী দ্রব্যের আমদানী অতি কম ছিল। এখন আমরা যত প্রকার দ্রব্য প্রয়োজনীয় বোধ করি, তখন এত দ্রব্য প্রয়োজনীয় বলিয়া গণ্য ছিল না। সুতরাং একটাকিয়াদের বার্ষিক লক্ষ টাকা মুনাফায় অতি ধুমধামে রাজত্ব চলিত।

চলনবিলের উত্তরাংশে একটি দ্বীপে ভাদুড়িয়ার রাজধানী ছিল। তখন সর্ব্বদা রাজবিপ্লব ও দস্যুভয় থাকাতে বড় মানুষেরা নিসর্গসংরক্ষিত দুরাক্রম্য স্থানে বাসস্থান করিতে চেষ্টা করিতেন। তাহা না ঘুটিলে কৃত্রিম উপায়ে বাসস্থান সুরক্ষিত করিতেন। প্রাচীন রাজধানী সমস্তই পর্ব্বত, জঙ্গল, জলাশয় বা মরুভূমি দ্বারা বেষ্টিত অতি দুর্ভেদ্য স্থানে স্থাপিত হইত। ভাদুড়িয়ার রাজধানী যেমন জলাশয় দ্বারা বেষ্টিত, তেমনি আবার দুর্গ প্রাচীরাদি কৃত্রিম উপায়ে সংরক্ষিত ছিল। আদৌ সমস্ত দ্বীপই প্রাচীরবেষ্টিত ছিল, পরে নদীস্রোতে সঞ্চিত বালুকা দ্বারা প্রাচীরের বাহিরে পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকে চড়া পড়ায় সেই দিকে পরিখা খনন করা হইয়াছিল, আবার পরিখার উপর দুইটি কাঠের পুল নির্ম্মিত হইয়াছিল। জলপথে সর্ব্বদা যাতায়াতের সুবিধা থাকায় এখানে বাণিজ্যের একটি প্রধান আড্ডা ছিল। নগরে প্রচুর দ্রব্য আমদানী হইত, সুতরাং বহু লোক সত্ত্বেও এখানে কোন দ্রব্য দুর্ম্মূল্য ছিল না। নগরের চতুর্দ্দিক্‌বর্ত্তী জলে স্রোত ছিল। তাহাতে নিক্ষিপ্ত ময়লা সেই স্রোতে সুদূরে বাহিত হইত; এজন্য স্থানটি বেশ স্বাস্থ্যকর ছিল।

নগরের বাহিরে বিল ভরাট জমিতে কেহ বাস করিতে পারিত না। তথায়

কেবল বাগান, কৃষিক্ষেত্র এবং পশুচারণ ভূমি ছিল। তাহাতে কখন কখন কৃষক, পশুপালক এবং রজকেরা সামান্য কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া অস্থায়ী ভাবে বাস করিত। কোন শত্রু-আক্রমণের আশঙ্কা হইলে অমনি সেই সকল সামান্য কুটীর দগ্ধ করা হইত, পরিখার পুল ভাঙ্গা হইত এবং আবশ্যক হইলে শস্য-ক্ষেত্রাদিও নষ্ট করা হইত। কোন বিপক্ষ আসিয়া নগরের বাহিরে কোন খাদ্যদ্রব্য এবং বাসস্থান না পায়, ইহাই প্রধান লক্ষ্য ছিল। নগরের উত্তর প্রান্তে একটি, পূর্ব্বে একটি ও দক্ষিণে দুইটি এবং পশ্চিমে তিনটি দুর্গ ছিল। এই জন্য সেই নগরের নাম সাতগড়া হইয়াছিল। পণ্ডিতেরা সেই নাম সংস্কৃত করিয়া "সপ্তদুর্গা" বলিতেন।

প্রাচীরবেষ্টিত নগর উত্তর দক্ষিণে লম্বা ছিল। তাহার সর্ব্বোত্তরে দুর্গবদ্ধ রাজবাটী, রাজার ঠাকুরবাড়ী, অতিথিশালা এবং বাগান ছিল। পশ্চিমদিকে অধিকাংশ দেশোয়ালীর বাস ছিল এবং সমস্ত মুসলমান-সিপাহী ও কর্ম্মচারিগণ পশ্চিম পাড়ায় বাস করিত। ঐ দিকেই তাহাদের মস্‌জিদ, দর্গা এবং ইমাম-বাড়ী ছিল। সমস্ত ব্রাহ্মণের বাস পূর্ব্ব পাড়ায় ছিল। বৈদ্য কায়স্থদেরও কতক পূর্ব্ব পাড়ায় থাকিত। তাহাদের ক্রীত দাস দাসী স্ব স্ব প্রভুর বাড়ীর একপার্শ্বে বাস করিত। নগরের মধ্যভাগে বাজার, থানা এবং কারাগার ছিল। অবশিষ্ট সমস্ত লোক দক্ষিণ পাড়ায় বাস করিত। বাজারের রাস্তাগুলি বেশ পরিসর ছিল, কিন্তু পাড়ার ভিতর গলি সমুদায় অতি সঙ্কীর্ণ ছিল।

হিন্দু মুসলমানে কোন বিবাদ না হয় এই উদ্দেশ্যে সাতগড়ায় কয়েকটি বিশেষ নিয়ম ছিল। সাতগড়ায় কেহ শূকর আনিতে পারিত না এবং মুসলমানের পর্ব্বদিনে শঙ্খধ্বনি করিতে পারিত না। মুসলমানেরা নিজ পর্ব্ব উপলক্ষে রাজকীয় সাহায্য পাইত। মুসলমান সাধুরা নিষ্কর ভূমি অর্থাৎ পীরপাল পাইত; কেহ কেহ নগদ টাকা বৃত্তি পাইত। পক্ষান্তরে তাহারা গোহত্যা ও গোমাংস ভক্ষণ করিতে পারিত না; পিতৃকুলে বিবাহ করিতে পারিত না। ইহা ভিন্ন মুসলমানেরা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক অনেক হিন্দু ব্যবহার গ্রহণ করিয়াছিল। সান্যাল-রাজ্যে ও ভাদুড়ী-রাজ্যে মুসলমানদের উত্তরাধিকারিত্ব হিন্দু দায়ভাগ অনুসারে হইত। অথচ তদ্বিষয়ে কোন রাজনিয়ম ছিল না। সুবুদ্ধি খাঁ যে উদ্দেশ্যে এই সকল নিয়ম করিয়াছিলেন, তাহা সম্পূর্ণ সফল

হইয়াছিল। যে সময়ে হিন্দু মুসলমানে এবং মুসলমানে মুসলমানে সর্ব্বদা কাটাকাটি মারামারি হইত, সেই সময়ে সাতগড়ায় মুসলমানেরা নির্ব্বিবাদে বংশানুক্রমে বিশ্বস্তরূপে একটাকিয়া রাজবংশের চাকরি করিয়াছিল। তাহারা কখন রাজার সহ কোন বিবাদ করে নাই, হিন্দুদের সহ কোন বিবাদ করে নাই এবং নিজেরাও পরস্পর কোন গুরুতর বিবাদ করে নাই। একটাকিয়া রাজবংশের প্রতি সেই মুসলমানদের যে অচলা ভক্তি ছিল, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়।

জাগীরদারেরা প্রকৃত পক্ষে গৌড়-বাদশাহের চাকর ছিলেন। তাঁহারা যে নিষ্কর ভূমি ভোগ করিতেন, তাহাই তাঁহাদের বেতনস্বরূপ ছিল। তাঁহারা স্বয়ং বা প্রতিনিধি দ্বারা বাদশাহের দরবারে উপস্থিত থাকিতেন এবং তাঁহার হুকুম অনুযায়ী কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। ইহাতে জাগীরদারদের লাভ ভিন্ন ক্ষতি ছিল না। তাঁহাদের প্রতিনিধিরা ফৌজদার অর্থাৎ সেনাপতি নামে অভিহিত হইতেন। গৌড়-বাদশাহগণ যাবতীয় রাজকার্য্য সেই ফৌজদারদের সহ পরামর্শ করিয়া নির্ব্বাহ করিতেন। প্রদেশীয় শাসনকর্ত্তা কিংবা অন্য কোন সম্ভ্রান্ত কর্ম্মচারীর পদ খালি হইলে ফৌজদারগণ-মধ্য হইতে কোন কোন ব্যক্তি মনোনীত হইতেন, সুতরাং ফৌজদারদের অর্থ এবং সম্মান উভয়ই লাভ হইত। সমসুদ্দীনের অধীনে কেবল চারিজন হিন্দু-ফৌজদার ছিল, অবশিষ্ট সমস্তই মুসলমান ফৌজদার। সুবুদ্ধি খাঁর পক্ষে তাঁহার ভ্রাতৃপুত্র মধুসূদন খাঁ এবং শিখাই সান্যালের পক্ষে তাঁহার তৃতীয় পুত্রের পুত্র কংসরাম সান্যাল (খাঁ) ফৌজদার ছিলেন।

সমসুদ্দীন সুবর্ণগ্রামের নিকট ব্রজযোগিনী (বজ্রযোগিনী) গ্রামে একটি পরমা সুন্দরী নবযুবতী বিধবা ব্রাহ্মণকন্যা দেখিয়া বলপূর্ব্বক তাহাকে আহরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার হিন্দু-ফৌজদারগণ এই কার্য্য রাজধর্ম্মের বিরুদ্ধ বলিয়া কন্যাটির মুক্তি প্রার্থনা করিল। বাদশাহ কহিলেন, "যদি কোন ব্রাহ্মণ তাহাকে বিবাহ করে, তবে আমি তাহাকে ছাড়িয়া দিতে পারি। নতুবা আমি নিজে তাহাকে নিকা করিব। আমি এই সুন্দর ফুলটি কদাচ বৃথা নষ্ট হইতে দিব না।" বাদশাহ স্বয়ং তাহাকে নিকা করিয়া তাহার নাম ফুলমতী বেগম * রাখিয়াছিলেন।

* ফুলমতী বেগমের পূর্ব্বনাম ও পরিচয় এখন পাওয়া যায় না। ইনি বঙ্গদেশের ক্লিওপেট।

যুদ্ধ শেষ হইবামাত্র জুনা খাঁ ফুলমতীকে নিকা সম্পাদন করিতে অনুরোধ করিলেন। কংসরাম নিশ্চয় জানিতেন যে, জুনা খাঁ বেগমকে নিকা করিলে নিজের কোন কর্ত্তৃত্ব থাকিবে না। এজন্য তিনি জুনা খাঁকে বিনাশ করিতে সংকল্প করিয়া রাখিয়াছিলেন। গয়সুদ্দীনের দলবল বিনষ্ট হইবামাত্র কংসরাম জুনা খাঁর আত্মীয়গণকে উচ্চ কর্ম্ম দিয়া পরস্পর দূরবর্ত্তী বিভিন্ন স্থানে পাঠাইলেন। এই উপায়ে জুনা খাঁকে নিঃসহায় করিয়া কংস তাঁহাকে হঠাৎ বন্দী করিলেন এবং বিশ্বাসঘাতক বলিয়া প্রাণদণ্ড করিলেন। ইহাতে তাঁহার আত্মীয়গণ ক্ষেপিয়া উঠিল বটে, কিন্তু তাহারা পূর্ব্বে কিছুই না জানায় যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতে পারে নাই। পক্ষান্তরে কংস পূর্ব্বেই, তাদৃশ বিপক্ষগণের প্রতিকার জন্য সমস্ত উদ্‌যোগ করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার বীরবর পুত্র জনার্দ্দন সান্যাল, পাঠানেরা একত্র সমবেত হইবার পূর্ব্বেই, তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া একে একে বিনাশ করিলেন। তখন কংসরাম * "রাজা" উপাধি গ্রহণ করিয়া ময়জুদ্দীনের অভিভাবক ও ফুলমতীর উপপতিরূপে গৌড় সাম্রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন।

অধিকাংশ পাঠান সামন্তগণ গয়সুদ্দীনের পক্ষ হইয়া যুদ্ধে বিনষ্ট হইয়াছিল। তাহার পর আবার জুনা খাঁর আত্মীয় পাঠান সর্দ্দারগণ বিনষ্ট বা দেশত্যাগী হইয়াছিল। এই দুই কারণে মুসলমান কর্ম্মচারিগণের সংখ্যা অতিশয় কম হইয়াছিল। কংসরাম সেই সমস্ত পদে হিন্দুকর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। মীর ফর্জন্দ হোসেন লিখিয়াছেন যে, "রাজা কংস অতিশয় মুসলমান-বিদ্বেষী

---

* গোলাম হোসেন এই কংসরামের কোন উল্লেখ করেন নাই। তাঁহার মতে সমসুদ্দীনের মৃত্যু হইলে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সেকেন্দর শাহ সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। গোলাম হোসেন যে রাজা কংসের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা ভ্রমপূর্ণ, কারণ, তাহা রাজা গণেশের বৃত্তান্তের সহিত অনেক ঐক্য হয়। 'গণেশের' পার্সী বর্ণবিন্যাসে 'কন্‌স' হইয়া পড়া স্বাভাবিক। ষ্টুয়ার্ট সাহেব 'কংস' স্থলে 'গণেশ' লিখিয়াছেন। আরও, গোলাম হোসেন যে সময়ে কংসের রাজত্ব নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা রাজা গণেশ হইলে উক্ত সময়ের বহু পরবর্ত্তী কালের ঘটনা। গোলাম হোসেনের মতে কংশের পুত্র যদু মুসলমান হইয়াছিলেন, কিন্তু রাজা গণেশের পুত্র যদুই মুসলমান ছিলেন। ইহা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, গোলাম হোসেন সময়ের ঠিক সামঞ্জস্য রাখিতে পারেন নাই।

ছিলেন। তিনি তাহাদের প্রতি ঘোর অত্যাচার করিতেন এবং মুসলমান সর্দ্দার ও ফৌজদারদিগকে পদচ্যুত করিয়া হিন্দুদিগকে সেই সকল কর্ম্ম দিয়া নিজ পরাক্রম বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। ময়জুদ্দীনকে বিনাশ করিয়া স্বয়ং সম্রাট্ হওয়া তাঁহার অভিপ্রায় ছিল।" কিন্তু এই সকল কথার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তিনি মুসলমানদের প্রতি যে কিছু দণ্ড করিয়াছিলেন, রাজবিপ্লবই তাহার একমাত্র কারণ; ধর্ম্মবিদ্বেষ তাহার হেতু বলা যায় না। কারণ, শান্তি-স্থাপনের পর তিনি কোন মুসলমানকেই বিনাশ কিংবা কর্ম্মচ্যুত করেন নাই। সাধারণ লোকে তাঁহাকে কংসরাম বাদশাহ বলিত বটে, কিন্তু তিনি নিজে কখন বাদশাহ উপাধি গ্রহণ করেন নাই অথবা ময়জুদ্দীনকে বিনাশ করিতে চেষ্টা করেন নাই। যুদ্ধবিপ্লবে বহুসংখ্যক মুসলমান বিনষ্ট হওয়ায়, কংস তাহাদের স্থানে হিন্দুদিগকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু স্বপক্ষীয় মুসলমানদেরও প্রচুর উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। সেইজন্য মীর ফর্জন্দ হোসেনের উক্তি পক্ষপাত-দূষিত বলিয়া বোধ হয়।

কংসরামের শাসনসময়ে ব্রহ্মদেশের মগরাজ অতিশয় প্রবল হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি আরাকানের রাজাকে দূরীকৃত করিয়া তাহার সমস্ত রাজ্য নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন এবং ত্রিপুরার রাজার অধিকাংশ রাজ্য দখল করিয়া লইয়াছিলেন। আরাকান-রাজ মৌসং আসিয়া রাজা কংশরামের শরণাপন্ন হইলেন। কংসরাম ত্রিশ হাজার সৈন্য সহ নিজ পুত্র জনার্দ্দনকে তাঁহার সাহায্যার্থে পাঠাইলেন।* তাঁহারা মেঘনা-নদী পার হইলে, ত্রিপুরার রাজা জনার্দ্দনের সাহায্যার্থী হইলেন। জনার্দ্দন বহু যুদ্ধে মগদিগকে পরাজয় করিয়া আশ্রিত রাজদ্বয়কে স্ব স্ব রাজ্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত ও প্রপন্ন করিলেন। তাঁহার বীরত্ব ও সদ্ব্যবহার জন্য তিনি সর্ব্বত্র প্রশংসিত হইলেন। তিনি গৌড়ে প্রত্যাগমন করিলে, অমনি পাটনার নবাবী পদে নিযুক্ত হইলেন। তিনি পূর্ব্বে বারংবার মুসলমানদিগকে পরাজয় করিয়াছিলেন, এক্ষণে মগদিগকে পরাজয় করিয়া তিনি 'বজ্রবাহু' উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহাদের উন্নতি দ্বারা সাঁতোড় রাজ্যেরও প্রচুর উন্নতি হইয়াছিল এবং সাম্রাজ্যের সমস্ত হিন্দুদিগের সমুন্নতি হইয়াছিল।

কংসরাম প্রভূত পরাক্রম সহ অতি প্রশংসিতরূপে সাত বৎসরকাল গৌড়-সাম্রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে ময়জুদ্দীন বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেন। তাহার

পর একবৎসর গত হইল অথচ কংসরাম ময়জুদ্দীনের হাতে রাজ্য ছাড়িয়া দিলেন না। ইহাতে ময়জুদ্দীনের মনে সন্দেহ এবং ক্রোধ হইল। তিনি কংসরামের বিনাশে চেষ্টিত হইলেন। তিনি প্রকাশ্যে কোন বিবাদ না করিয়া বরং অধিকতর আনুগত্য করিতে লাগিলেন। ফুলমতীর এক দাসী ময়জুদ্দীনের ধাত্রী ছিল। সম্রাট্ তাহার দ্বারা পানের খিলিতে তীক্ষ্ণ বিষ প্রয়োগ করিয়া কংসরামের জীবন শেষ করিলেন এবং স্বয়ং সেকেন্দর উপাধি গ্রহণ করিয়া প্রকাশ্যরূপে শাসন-ভার স্বহস্তে লইলেন। তিনি নিজ মাতাকেও এক প্রকোষ্ঠে আটক করিয়া রাখিলেন।

কংসরামের পুত্র বজ্রবাহু তৎকালে পাটনার নবাব ছিলেন। তিনি পিতার অপহত্যার সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র জ্বলন্ত কোপে পিতৃহন্তা শত্রুর বিরুদ্ধে চলিলেন। গঙ্গা পার হইবার সময় ময়জুদ্দীন তাঁহাকে প্রতিরোধ করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া গৌড়ের দুর্গে আশ্রয় লইলেন। জনার্দ্দন গৌড়নগর অবরোধ করিলেন। ময়জুদ্দীন বিপদে পড়িয়া মাতার নিকট সদুপদেশ জিজ্ঞাসা করিলেন। কংসরামের অপহত্যা জন্য ফুলমতী ময়জুদ্দীনকে বহু তিরস্কার করিলেন। তিনি কহিলেন, "সাম্রাজ্য রক্ষা করিবার ক্ষমতা যখন তোমার নাই, তখন রাজ্যশাসন হস্তগত করিবার জন্য বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া দেওয়ানজীকে বিনাশ করিলে কেন? রাজা কংস আমার সম্পূর্ণ বাধ্য ছিল। তুমি আমাকে বলিলে আমি নির্ব্বিবাদে সমস্ত শাসনভার তোমার হাতে দেওয়াইতে পারিতাম। এখন প্রকাশ্য যুদ্ধে আমি কি করিতে পারি? আমি স্ত্রীলোক, আমার সাধ্য কি? তুমি মধুসূদন খাঁকে স্বপক্ষ করিতে চেষ্টা কর। নতুবা রক্ষার কোন সদুপায় হইবে না।" ফুলমতী উভয়পক্ষের মধ্যে সন্ধিস্থাপন জন্য মধু খাঁকে আহ্বান করিলেন। তিনি যে উপায়ে জুনা খাঁকে বশ করিয়াছিলেন, আবার সেই উপায়েই মধু খাঁকে বশীভূত করিলেন। মধু খাঁ বজ্রবাহুর সহ যুদ্ধ করিতে সাহসী হইলেন না। মধু খাঁ সন্ধির প্রস্তাব করিয়া বজ্রবাহুর নিকট দূত পাঠাইলেন। এদিকে নানাপ্রকার চক্রান্তমূলক চিঠিসমূহ এরূপভাবে বজ্রবাহুর সামন্তদের নামে পাঠাইতে লাগিলেন, যাহা বহু কষ্টে ধরা পড়ে।

সেই সকল চিঠি পাইয়া বজ্রবাহু অলীক ভ্রমে পতিত হইলেন। তাঁহার বিশ্বাস হইল যে "আমার অধিকাংশ সৈন্য ও সেনাপতি উৎকোচের বশ হইয়া

বিপক্ষের সহ ষড়যন্ত্র করিতেছে। তাহারা আমাকে বন্দী করিয়া শত্রুহস্তে অর্পণ করিবে।” সেই অলীক ভয়ে প্রতারিত হইয়া জনার্দ্দন তিনশত মাত্র বিশ্বস্ত লোকসহ নিজ ছাউনী ত্যাগ করিয়া আরাকান যাত্রা করিলেন। অমনি মধু খাঁ বজ্রবাহুর ত্যক্ত সেনাগণকে ময়জুদ্দীনের বশীভূত করিয়া দিলেন। মধু খাঁর মিথ্যা চিঠি কাজে সত্যবৎ প্রতীয়মান হইল। ময়জুদ্দীন মধু খাঁর কৌশলে রক্ষা পাইলেন।

বজ্রবাহু আরাকানে উপস্থিত হইলে মৌসং অতি সমাদরপূর্ব্বক তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহার সাহায্যার্থ উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। ত্রিপুরার রাজাও জনার্দ্দনের সাহায্য করিতে স্বীকার করিলেন। ইতিমধ্যে আরাকানের জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ মৌসংকে জানাইলেন যে “বাঙ্গালাদেশে বজ্রবাহুর ভাগ্য প্রসন্ন হইবে না। তিনি লঙ্কার অধীশ্বর হইবেন এবং তদ্বংশীয়েরা বহুকাল লঙ্কায় রাজত্ব করিবে।” জনার্দ্দন সেই ভবিষ্যৎ কথা শুনিয়া উপহাস করিলেন। এদিকে মৌসঙের কন্যা তুপ্পা বজ্রবাহুর পত্নী হইতে ব্যগ্র হইল। মৌসং জনার্দ্দনকে তাঁহার কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। জনার্দ্দন সম্মত হইলেন না। মৌসং ক্রুদ্ধ হইয়া একদিন মধ্যে তাঁহাকে নিজরাজ্য ত্যাগ করিতে বলিলেন। স্থলপথে তিন দিনের কমে আরাকান রাজ্য ত্যাগ করা যায় না। এজন্য মৌসং তাঁহাকে জাহাজে * উঠিতে বলিলেন। জনার্দ্দন সঙ্গিগণ

* বহুকাল হইতে ভারতবর্ষে অর্ণবপোত নির্ম্মাণ হইত। সংস্কৃত কলেজ পুস্তকালয়ে “যুক্তিকল্পতরু” নামক একখানি প্রাচীন হস্তলিপি গ্রন্থে জলযান নির্ম্মাণ শিল্পের বিস্তারিত আলোচনা আছে। পূর্ব্বকালে যানের কক্ষগুলি কনক, রজত ও তাম্র এই ধাতুত্রয় বা তিনের মিশ্রিত দ্রব্য দ্বারা সুসজ্জিত করা হইত। চতুঃশৃঙ্গ বা চারি মাস্তুলের অর্ণবপোত সিত বা শাদা বর্ণে, ত্রিশৃঙ্গযান রক্তবর্ণে, দ্বিশৃঙ্গযান পীতবর্ণে এবং একশৃঙ্গযান নীলবর্ণে চিত্রিত করিবার নিয়ম ছিল। যানের মুখ বা গলুই কেশরী, মহিষ, নাগ, হস্তী, ব্যাঘ্র, পক্ষী, ভেক বা মানুষের মুখের মত করিয়া প্রস্তুত করা হইত। আবার, মন্দির বা কক্ষের হিসাবে যানগুলিকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইত। যে জলযানে খুব বৃহৎ মন্দির থাকিত তাহাকে “সর্ব্বমন্দিরা” বলা হইত। এই শ্রেণীর যান রাজধন, অশ্ব ও রমণী বহনে ব্যবহৃত হইত। দ্বিতীয় শ্রেণীর যানকে “মধ্য-মন্দিরা” বলা হইত। এই জাতীয় পোতের মধ্যভাগে মন্দির থাকিত, এবং ইহা বর্ষাকালে রাজাদের বিলাস যাত্রার জন্য ব্যবহৃত হইত। তৃতীয় শ্রেণীর যানগুলির গলুইর দিকে কক্ষ থাকিত এবং ইহাদিগকে “অগ্রমন্দিরা” বলা হইত। এই যানগুলি চিরপ্রবাস যাত্রায় ও রণে ব্যবহৃত হইত।

সহ জাহাজে উঠিয়া নাবিকদিগকে উৎকলে যাইতে বলিলেন। উৎকল তখন স্বাধীন পরাক্রান্ত হিন্দুরাজ্য ছিল। জনার্দ্দন উড়িষ্যা রাজ্যে সহায়তার আশা করিলেন জাহাজ মধ্যসমুদ্রে পৌঁছিলে নাবিকেরা বজ্রবাহুকে কহিল, "আপনি যদি রাজকুমারী তুপ্পাকে বিবাহ করেন, তবে আমরা আপনার আজ্ঞাবহ হইয়া চলিব, নতুবা এইখানে জাহাজ ডুবাইয়া সহচরগণ সহ আপনাকে বধ করিব, ইহাই আমাদের প্রতি রাজাজ্ঞা।" জনার্দ্দনের আনুযাত্রিক মধ্যে সাতাইশ জন ব্রাহ্মণ ছিল। তাহারা প্রাণভয়ে জনার্দ্দনকে বিবাহে সম্মত হইতে বাধ্য করিল। রাজকুমারী তুপ্পা সেই সঙ্গেই অন্য জাহাজে গুপ্তভাবে ছিলেন। বজ্রবাহু সম্মত হইলে তুপ্পা জনার্দ্দনের নিকটে আসিয়া কহিলেন, "'আপনি আমাকে গ্রহণ না করিলে আমি আত্মহত্যা করিব' এই কথা আমি পিতার নিকট প্রকাশ করায় তিনি এই কৌশল করিয়াছিলেন। আপনি আমাকে ক্ষমা করিবেন, অশ্রদ্ধা করিবেন না।" জনার্দ্দন পূর্ব্বে তুপ্পাকে দেখেন নাই। এখন তাঁহার রূপ, যৌবন, দৃঢ় প্রণয় ও সরলতা দৃষ্টে মুগ্ধ হইলেন। প্রাণভয়ে বিবাহ করিলে দম্পতির মনোমিলন হয় না। কিন্তু তুপ্পার চরিত্রে ও সৌন্দর্য্যে বজ্রবাহুর অসন্তোষ তিরোহিত হইল। অমনি সেই জাহাজেই মালা বদল করিয়া বিবাহ হইল। বিবাহের পর জনার্দ্দন জানিলেন যে তাঁহারা উড়িষ্যায় যাইতেছেন। কিন্তু শেষে জানিলেন যে তিনি লঙ্কাদ্বীপে উপস্থিত হইয়াছেন। সেই খানে মৌসঙের মন্ত্রী বজ্রবাহুর নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "ঠাকুর! তুমি মগের কন্যা বিবাহ করিয়াছ, এখন উৎকলের হিন্দুসমাজে গেলে তোমার সম্মান থাকিবে না। আর আমাদের রাজকুমারীর তদধিক লাঞ্ছনা হইবে। উৎকলরাজ তোমার কোন সাহায্য করিবে না। বাঙ্গালাদেশে তোমার জ্ঞাতি কুটুম্বেরাও তোমার সহায় হইবে না, বরং তোমাকে একঘরিয়া করিয়া আত্মীয়গণ ঘৃণা প্রকাশ করিবে। বাঙ্গালাদেশে তোমার ভাগ্য প্রবল হইবে না। এই জন্য তোমাকে লঙ্কায় আনিয়াছি। এখানে চারিজন রাজপদের দাবীদার হইয়া ঘোর যুদ্ধ ও বিপ্লব উপস্থিত করিয়াছে। মহারাজ মৌসং তোমার সাহায্যার্থে প্রচুর সেনা পাঠাইয়াছেন। তুমি অতি সহজে ঐ দ্বীপ অধিকার করিতে পারিবে। এখানকার লোক আরাকানী মগদের সমধর্ম্মী। এখানে তুমি অতি সুখে পুরুষানুক্রমে রাজত্ব করিতে পারিবে।"

মন্ত্রীর কথাই কার্য্যতঃ ঠিক হইল। বিপ্লবকারীদের মধ্যে দুর্ব্বলপক্ষ আসিয়া জনার্দ্দনের শরণাগত হইল। ক্রমে তিন পক্ষ আসিয়া বজ্রবাহুর আশ্রয় লইলে তাঁহার দলবল প্রবল হইল। তখন প্রবল পক্ষও ক্রমশঃ জনার্দ্দনের অধীনতা স্বীকার করিল। বজ্রবাহু বিনা যুদ্ধে সমগ্র লঙ্কার অধীশ্বর হইলেন। তদ্বংশীয়েরা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী হইয়াছিল এবং বহুকাল লঙ্কায় রাজত্ব করিয়াছিল। *

এদিকে ময়জুদ্দীন নিরাপদ হইয়া সাঁতোড় রাজ্য ধ্বংস করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। কিন্তু ফুলমতী ও মধু খাঁর উপদেশে ক্ষান্ত হইলেন। তথাপি তিনি জাগীর সান্যালচক্র জব্দ করিয়া তাহার উপর বার্ষিক চৌদ্দ হাজার টাকা মালগুজারী ধার্য্য করিলেন এবং সাঁতোড়রাজের "খাঁ সাহেব" উপাধি রহিত করিলেন; তদবধি সাঁতোড়ের রাজারা "ভূঁইয়া" শ্রেণীতে অবনীত হইলেন। এখানে বলা আবশ্যক যে, ঔরংজীব বাদশাহের সময় হইতে ভূম্যধিকারীদের "জমীদার" উপাধি হইয়াছে। তৎপূর্ব্বে জমীদারদিগের "ভূঁইয়া বা ভূমিয়া" উপাধি ছিল। আর "পরগণা" শব্দের পরিবর্ত্তে "চাকলা" শব্দ প্রচলিত ছিল। "পরগণা" ও "জমিন্দার" শব্দ আরবী ভাষামূলক। আর "ভূমিয়া, ভূঁইয়া ও চাকলা" শব্দ

* কথিত আছে, বিজয় সিংহ খৃষ্টপূর্ব্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে সিংহল অধিকার করেন। আধুনিক ঐতিহাসিকেরা কিম্বদন্তী অপেক্ষা লিখিত বৃত্তান্তের উপর সমধিক বিশ্বাস করেন। কিন্তু ইহার কোন বিশেষ কারণ দেখা যায় না। যে ব্যক্তি মিথ্যা বলিতে পারে সে তাহা লিখিতেও পারে। বজ্রবাহু সম্বন্ধে রাজসাহী ও চট্টগ্রাম প্রদেশে যেরূপ জনপ্রবাদ আছে তাহা হইতে এই বৃত্তান্ত লিখিত হইয়াছে। এই বহুজনকথিত বহুকালব্যাপি প্রবাদ মধ্যে অনেক সত্য নিহিত থাকা বিশেষ সম্ভব। আরও, শাস্ত্রীয় মতানুসারে লঙ্কা ও সিংহল দুইটী স্বতন্ত্র দ্বীপ। মার্কণ্ডেয় পুরাণ ৫৮ অধ্যায়—"লঙ্কাকালাজিনাশ্চৈব শৈলিকা নিকটস্তথা॥ ঋষভাঃ সিংহলাশ্চৈব তথা কাঞ্চীনিবাসিনঃ॥" ভাগবত, ৫।১৯।৩০, বৃহৎসংহিতা, ১৪।১৫, প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থেও লঙ্কা ও সিংহল দুইটী স্বতন্ত্র দ্বীপ বলিয়াই উল্লিখিত হইয়াছে। কেবল পালিগ্রন্থ "মহাবংশের" মতে সিংহলের অপর নাম লঙ্কা। ভাস্করাচার্য্য লিখিয়াছেন—যখন লঙ্কায় সূর্য্যোদয় হয়, তখন (তাহার নব্বই অংশ পূর্ব্বে) যমকোটিতে মধ্যাহ্ন, ইত্যাদি। যমকোটি উজ্জয়িনীর ঠিক পূর্ব্বে নব্বই অক্ষাংশ দূরে অবস্থিত, আবার লঙ্কা যমকোটির ঠিক পশ্চিমে, উজ্জয়িনীর পশ্চিমে নহে। সূর্য্যসিদ্ধান্তের মতে—(১২।৩৯) লঙ্কা ভারতবর্ষের একটি নগর। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের মতে (অনুসঙ্গপাদে ৫৩ অঃ) যবদ্বীপের পর মলয় দ্বীপ, এই মলয় নামক দ্বীপের অন্তর্গত পর্ব্বতের সানুদেশে লঙ্কাপুরী। পূর্ব্বকালে ভারতমহাসাগরীয় দ্বীপগুলিও ভারতবর্ষের মধ্যেই গণিত হইত। সুতরাং ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের মতানুসারে মলয়দ্বীপের অন্তর্গত লঙ্কাপুরী বলিলে, পৌরাণিক মতে তাহা ভারতবর্ষ ছাড়া নহে, এবং সূর্য্যসিদ্ধান্তের সহিতও অনৈক্য হয় না। এই সমস্ত হইতে বোধ হয়, বজ্রবাহুর লঙ্কা বিজয় নিতান্ত অমূলক নহে।

সংস্কৃতমূলক—ভূমি এবং চক্র শব্দ হইতে উৎপন্ন। ভূঁইয়া বা জমীদারগণের অধিকার বৃহৎ হইলে যথাক্রমে চৌধারী, রায়, রায়চৌধারী এবং রাজা উপাধি হইত *। সাঁতোড়ের রাজার "রাজা" উপাধি পূর্ব্ববৎ থাকিল; "খাঁ সাহেব" উপাধি তাঁহারা ধারণ করিতেন না। সুতরাং সেই উপাধি রহিত হওয়ায়, সাঁতোড়-রাজ ক্ষতি বোধ করেন নাই। কেবল চৌদ্দ হাজার টাকা মালগুজারী ধার্য্য হওয়াই তাঁহাদের লোকসান হইল।

আইন আকবরীতে রাজা কংসের যে বৃত্তান্ত আছে, তাহা ভ্রমপূর্ণ। উক্ত গ্রন্থে লিখিত আছে যে, "রাজা কংস সম্‌সুদ্দীনের অব্যবহিত পরে গৌড়ে স্বাধীন সম্রাট্ হইয়াছিলেন। তিনি মুসলমানদিগের প্রতি ঘোর অত্যাচার করিতেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল।" রাজা কংস-রামকে লোকে কংসরাম বাদশাহ বলিত বটে, কিন্তু তিনি প্রকাশ্যরূপে সম্রাট্ বা বাদশাহ উপাধি গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার পুত্র সম্রাট্ হয় নাই এবং মুসলমানও হয় নাই। উপরি উক্ত বৃত্তান্ত গণেশনারায়ণ খাঁর সহ কতক ঐক্য হয়। গণেশ স্বাধীন সম্রাট্ হইয়াছিলেন এবং তাঁহার পুত্র মুসলমান হইয়াছিল বটে, কিন্তু গণেশ ৫০ বর্ষ পরবর্ত্তী কালের লোক। তিনি মুসলমানদের প্রতি কখন কোন অত্যাচার করেন নাই বরং তাহাদের পরম বন্ধু ছিলেন। তাঁহার শত্রুপক্ষীয় গোঁড়া মুসলমানেরা তাঁহাকে অত্যাচারী বলিয়া মিথ্যা প্রচার করে। আর একজন রাজা কংসনারায়ণ রায় আরও পরবর্ত্তী কালের লোক। তিনি তাহিরপুরের রাজা ছিলেন। তিনি আকবর বাদশাহের সময়ে শুবে বাঙ্গালার নবাব-দেওয়ান ছিলেন এবং কিছুদিন নবাব-নাজিমের কাজও করিয়াছিলেন। তিনি সম্রাট্ আকবরের সমকালীন লোক। অতএব আইন আকবরীতে যে রাজা কংসের বৃত্তান্ত আছে, তাহা অশুদ্ধ। সময়ের প্রতি লক্ষ্য করিলে বোধ হয় যে আইন আকবরীতে রাজা কংসরাম সান্যালের কথাই ভ্রমবশতঃ অশুদ্ধ-রূপে লেখা হইয়াছে। তাহাতে কতক কংসরামের বৃত্তান্ত এবং কতক গণেশের বৃত্তান্ত মিশ্রিত করা হইয়াছে।

---

* চৌধারী শব্দের অর্থ চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী ভূমির অধিপতি। এখন চৌধারী শব্দের স্থানে চৌধুরী লেখা হয়, তাহা ভুল। চৌধুরী শব্দে চারি ভার বিশিষ্ট; কিন্তু সেই চারি ভার কি, তাহা কেহই জানে না।

মুসলমানেরা অধিকাংশ গয়সুদ্দীনের পক্ষ হইয়া ময়জুদ্দীনের বিপক্ষ হইয়াছিল, এই জন্য ময়জুদ্দীন মুসলমান কর্ম্মচারীদিগকে দৃঢ় বিশ্বাস করিতেন না। সাঁতোড়ের রাজবংশের প্রতিও তাঁহার বিদ্বেষ ছিল। এজন্য মধু খাঁ তাঁহার একমাত্র প্রিয়পাত্র ও বিশ্বাসী হইয়াছিলেন। ময়জুদ্দীন নিতান্ত অলস, বিলাসী এবং অকর্ম্মণ্য লোক ছিলেন। তিনি নানা জাতীয় বহুসংখ্যক উপপত্নী সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তাহাদিগকে লইয়া নৃত্য, গীত, বাদ্য, উত্তম আহার, বস্ত্র, গন্ধ, শয্যা ইত্যাদি বিলাসিজনপ্রিয় বস্তু লইয়া দিবারাত্রি সময়ক্ষেপণ করিতেন। তিনি রাজকার্য্য কিছুই করিতেন না। মধু খাঁ তাঁহার নিকট যে সকল কাগজ পাঠাইতেন, তিনি সেই বিলাস-মন্দিরে বসিয়াই তাহা দস্তখত মোহর করিয়া দিতেন। মধু খাঁ বাদশাহের উজির এবং ফুলমতীর উপপতি হইয়া সমস্ত রাজকার্য্য চালাইতেন। মধু খাঁর কর্ত্তৃত্বসময়ে ভাতুড়িয়ার রাজা তাঁহার জাগীর ভাতুড়িয়ার চতুষ্পার্শ্বে রামবাজু, প্রতাপবাজু, সোণাবাজু ও বড়বাজু নামে চারিটি পরগণা অতি অল্প মালগুজারীতে জমীদারীরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আর একটাকিয়া ভাতুড়ীদের এবং তাহাদের আত্মীয় কুটুম্বদের মধ্যে অনেকেই প্রধান প্রধান রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিল। লোকের মনোরঞ্জন করিবার জন্য একটাকিয়াদিগের বিশেষ ক্ষমতা ছিল। তাহারা যে কেহ যে কোন কার্য্যে নিযুক্ত হউক, তাহাতেই সকলের নিকট প্রশংসিত হইত। ইহাতে একটাকিয়া বংশের মান, পদবী, ঐশ্বর্য্য এবং ক্ষমতা অত্যন্ত অধিক হইয়াছিল।

ময়জুদ্দীনের একান্ত অকর্ম্মণ্যতা বাঙ্গালাদেশের পক্ষে অত্যন্ত কল্যাণকর হইয়াছিল। কারণ মধু খাঁ ও ফুলমতী এরূপ সুচারুরূপে রাজকার্য্য চালাইতেন যে, ময়জুদ্দীনের রাজত্ব রামরাজ্যের ন্যায় প্রজাগণের সুখকর হইয়াছিল। ফুলমতী দয়া এবং দানশীলতার জন্য প্রসিদ্ধা এবং মধু খাঁ সুবিচার ও কার্য্যদক্ষতার জন্য সর্ব্বত্র প্রশংসিত হইয়াছিলেন। ফুলমতীর অন্যান্য সদ্‌গুণ এত অধিক ছিল যে, তাহার অসতীত্ব সত্ত্বেও লোকে তাহাকে ভক্তি করিত। গৌড় বাদশাহের ঘরে একটাকিয়া ভাতুড়ীদের সম্মান ও কর্ত্তৃত্ব যথেষ্ট ছিল। তাহাদের কেহ উজির, কেহ নাজির, কেহ মন্ত্রী, কেহ সেনাপতি, কেহ বা প্রদেশীয় শাসনকর্ত্তা ছিল। পরবর্ত্তী কালে মোগল সম্রাট্‌দের ঘরে রাজপুত রাজাদের যাদৃশ সম্ভ্রম ও ক্ষমতা হইয়াছিল গৌড়বাদশাহের ঘরে একটাকিয়াদের তদপেক্ষা বেশী বই কম ছিল

[illegible] করাইয়া দিতে অনুরোধ করি-

[illegible], শ্যামচাঁদ ও রামচাঁদ প্রত্যেকে পঁচিশ খাদা অর্থাৎ ৪০০/বিঘা ভূমি বার্ষিক তিন টাকা দুই আনা জমায় আয়মা পাইবে। কালীকিশোর নিজে দুই খাদা জমি ব্রহ্মত্র পাইবেন। শ্যামা রামার অনুচরগণ সাঁতোড়ের সৈন্যদলে চাকরী করিবে। আর তাহারা দুই ভ্রাতা প্রত্যেকে একশত এক টাকা বেতনে রাজার সৈন্যগণের সেনানী হইবে *। তাহাদের গত কালের কুকার্য্য জন্য কোন দণ্ড হইবে না, এবং তাহারা ভবিষ্যতে কোনরূপ দৌরাত্ম্য করিবে না। কালীকিশোর অনেক ইতস্ততঃ করিয়া সন্ধি করাইতে সম্মত হইলেন। শ্যামা রামা গুরুর উপদেশ লঙ্ঘন করিল না। কেবল আয়মা ৮০০/ বিঘা স্থলে ১০০৮/ বিঘা লইয়া অন্যান্য সমস্ত প্রস্তাব স্বীকার করিল। তদবধি সাঁতোড়রাজ্য-ধ্বংস পর্য্যন্ত শ্যামা রামার বংশ সান্যালরাজ্যের সেনাপতি ছিল। তাহাদের বংশীয়েরা এখনও অষ্টমিন্‌সা গ্রামে বাস করিতেছে। গৌড় বাদশাহ শ্যামা রামাকে ধরিয়া দিতে রাজা অবনীনাথকে অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি নিজ প্রতিজ্ঞা হেতু সম্মত হন নাই। অধিকন্তু তিনি ইহাও বাদশাহকে জানাইলেন যে, শ্যামা রামাকে দণ্ড করিলে পুনরায় ডাকাতী ও নানারূপ অশান্তি আরম্ভ হইবে।

জাগীর লাভের পর রাজা কংসরামের আধিপত্যসময়ে সাঁতোড়ের রাজারা আরও পাঁচ পরগণা জমিদারী পাইয়াছিলেন। একটাকিয়ারাও মধু খাঁর অধিপত্য-কালে রামবাজু, প্রতাপবাজু, সোণাবাজু এবং বড়বাজু নামে চারি পরগণা জমিদারী পাইয়াছিলেন। ইহাতে উভয় রাজ্যেরই পরাক্রম বৃদ্ধি হইয়াছিল। সাঁতোড় চলনবিল হইতে দূরে ছিল, কিন্তু সাতগড়া চলনবিলের মধ্যে ছিল। শ্যামা রামা রাজা অবনীনাথের চাকরী স্বীকার করায় সমস্ত চলনবিল সাঁতোড় রাজ্যের অধীন

* হিন্দুরা অঙ্কের শেষে শূন্য থাকা অশুভ জ্ঞান করিত। এজন্য বিবাহের পণ, বেতন ও ঋণ গ্রহণে অঙ্কের শেষে শূন্য রাখিত না।

ছিল এবং মুসলমানের...

অধিকাংশ মুসলমান এবং সেনাপতিগণ পাঠান ।...। শ্যামা ...

ভাতুড়িয়ার উপর পড়িয়া লুঠপাট আরম্ভ করিল। গণেশ চলনবিল ঘুরিয়া সাঁতোড় রাজ্য আক্রমণ করিলেন। রাজা অবনীনাথও তাহার প্রতিকার জন্য সসৈন্যে উপস্থিত হইলেন। এমন সময়ে কালীকিশোর মধ্যবর্ত্তী হইয়া সন্ধির প্রস্তাব করিলেন।

কালীকিশোর আচার্য্য প্রথমে গণেশের নিকট গিয়া কহিলেন, "যাহাতে আপনাদের উভয় রাজার জয়লাভ হয়, উভয়ের সুখ ও সম্মান বৃদ্ধি হয়, আমি এমন সদুপায় করিতে পারি। আপনি সেই নিয়মে সন্ধি করুন।" গণেশ কহিলেন, "উভয় পক্ষের জয় কিরূপ?" কালীকিশোর কহিলেন, "তাহা পরে বলিব। যদি আপনি চলনবিলের উত্তরার্দ্ধ পান এবং আপনার সম্মান বৃদ্ধি হয়, তবে আপনি সম্মত হন কি না?" গণেশ সম্মতি দিলেন। পরে কালীকিশোর অবনীনাথের নিকট ঐরূপ সন্ধিতে তাঁহার সম্মতি লইলেন। তাহার পর কালীকিশোর গণেশের পুত্র যদুনারায়ণের সহ অবনীনাথের কন্যা নবকিশোরীর বিবাহ দিয়া চলনবিলের উত্তরার্দ্ধ কন্যাকে যৌতুক দিতে বলিলেন। উভয়েই কুলীনব্রাহ্মণ এবং রাজা। অবনীনাথ বাৎস্যগোত্র এবং গণেশ কাশ্যপগোত্র। উভয়েরই পুত্র কন্যা সুন্দর। সুতরাং সেই প্রস্তাব উভয়েই সাগ্রহে স্বীকার করিলেন। কাটাকাটি, লুঠপাট প্রজাপীড়নের পরিবর্ত্তে আমোদ প্রমোদ ও পুণ্য প্রতিষ্ঠায় যদুর সহ নবকিশোরীর বিবাহ হইল। রাজা অবনীনাথ চলনবিলের উত্তরার্দ্ধসহ বহুলক্ষ টাকার দ্রব্যজাত যৌতুক দিলেন। গণেশ কহিলেন, "যদু আমার এ পর্য্যন্ত একমাত্র পুত্র। যদি ভবিষ্যতে অন্য পুত্র হয়, তথাপি জ্যেষ্ঠ পুত্রই রাজ্য পাইবে। সুতরাং আমি সর্ব্বস্বই এই পুত্র ও বধূকে দিতে পারি।" যাহা হউক, তিনি নিজের অর্দ্ধরাজ্য তৎক্ষণাৎ পুত্রবধূকে দান করিলেন। উভয়পক্ষ হইতে জয়ধ্বনি হইল।

যুদ্ধের পরিবর্ত্তে নৃত্য, গীত, বাদ্য এবং মহোৎসব হইল। উভয়পক্ষ বহুতর দান বিতরণ করিলেন। কালীকিশোর উভয় রাজার নিকট নানারূপ পুরস্কার এবং ব্রহ্মত্র পাইলেন। উভয় রাজারই সম্মান ও পরাক্রম বৃদ্ধি হইল। গণেশ মহানন্দে সাতগড়ায় প্রত্যাগমন করিলেন।

এই সময়ে গৌড়বাদশাহ সৈফুদ্দীনের মৃত্যু হইল। তাঁহার বড় বেগমের পুত্র আজিম শাহ বয়সে ছোট ছিলেন এবং ছোট বেগমের পুত্র নসেরিৎ শাহ বয়সে বড় ছিলেন। নসেরিৎ মুসলমানদিগের সাহায্যে দ্বিতীয় সমসুদ্দীন নাম ধারণপূর্ব্বক গৌড়সিংহাসন অধিকার করিলেন। আজিম গৌড়নগর হইতে বাহির হইয়া শাহ উপাধি ধারণ করিলেন। তিনি ভাদুড়ীদের সাহায্যে একদল সেনা সংগ্রহ করিলেন এবং তৎকালীন একটাকিয়ার রাজা গণেশের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। গণেশ তাঁহার সহায়তা করিতে স্বীকার করিয়া নিজ দলবল ও রসদ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন, তাঁহার নূতন বৈবাহিকের নিকটও সাহায্য চাহিলেন। রাজা অবনীনাথ শ্যামা রামার অধীনে দ্বাদশসহস্র সৈন্য পাঠাইলেন। গণেশ নিজের বিশ-হাজার সিপাহী এবং বৈবাহিকের বার হাজার, মোট বত্রিশ হাজার সৈন্য লইয়া আজিমের সাহায্যার্থ চলিলেন।

তখন সাতগড়া হইতে গৌড়ে যাইবার দুইটি পথ ছিল। একটি চলনবিলের উত্তরবর্ত্তী, অপরটি দক্ষিণবর্ত্তী। গণেশ উত্তরবর্ত্তী পথে আজিম শাহের সহ যোগ দিতে গৌড়াভিমুখে চলিলেন। কিন্তু আজিম শাহ শত্রুতাড়িত হইয়া সে দিকে যাইতে পারিলেন না। তিনি দক্ষিণবর্ত্তী পথে সাতগড়া চলিলেন। নসেরিৎ শাহ আজিমের পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন।

তানোরের নিকট উভয় ভ্রাতার যে যুদ্ধ হইল, আজিম তাহাতে হত হইলেন। এ দিকে গণেশ আসিয়া গৌড়নগর অধিকার করিলেন। নসেরিৎ সংবাদ পাইয়া ফিরিয়া আসিলেন, কিন্তু গণেশের সহ যুদ্ধে তিনিও হত হইলেন। এই ঘটনা হিজরী ৭৮৭ সালে সংঘটিত হয়। নসেরিতের কোন সন্তান ছিল না। আশমানতারা নামে আজিম শাহের একটি নাবালিকা কন্যা মাত্র ছিল। মুসলমান-রীতি অনুসারে স্ত্রীলোকে রাজত্ব পাইতে পারে না, সুতরাং গণেশ নিজেই সম্রাট হইলেন। একটাকিয়া রাজারা হিন্দু মুসলমান উভয় জাতিরই সমান ভক্তিপাত্র ছিলেন, সুতরাং কেহই তাঁহাকে কোন বাধা দিল না। তিনি রাজা অবনীনাথকে

সহায়তার পুরস্কারস্বরূপ চারি পরগণা জমীদারী দিয়াছিলেন। নসেরিতের ও আজিমের বেগমেরা গণেশের উপপত্নীরূপে গৌড়ের রাজপ্রাসাদেই থাকিলেন। গণেশের নিজ পরিবার পাণ্ডুয়াতে থাকিত। মীর ফর্জন্দ হোসেন লিখিয়াছেন যে, "রাজা গণেশ বেগমদিগকে গোপনে নিকা করিয়াছিলেন। তিনি যখন গৌড়ে থাকিতেন, তখন প্রায় মুসলমানের ন্যায় চলিতেন। আবার যখন তিনি পাণ্ডুয়াতে থাকিতেন অতি নিষ্ঠাচারী ব্রাহ্মণের ন্যায় সদাচারে থাকিতেন। হিন্দু মুসলমান উভয় জাতিই তাঁহাকে স্বজাতি জ্ঞান করিত। তিনি বেগমদের নামে গৌড়নগরে অনেক দর্গা ও মসজীদ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। আবার পাণ্ডুয়া, টণ্ডা এবং বাঁট্‌রাতে নিজ নামে বহুতর দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তিনি অতি মিষ্টভাষী ও শিষ্টাচারী ছিলেন। তিনি উভয় ধর্ম্মেরই উৎসাহ দিতেন। কিন্তু কাহাকেও ভিন্ন ধর্ম্মের নিন্দা করিতে দিতেন না।" তিনি পরমসুখে সাত বৎসর সাম্রাজ্য ভোগ করিয়া উপরত হইলে তৎপুত্র যদুনারায়ণ খাঁ সম্রাট্ হইয়াছিলেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

জেলালুদ্দীন (যদুমল্ল)।—আশমানতারা।—অনুপনারায়ণের একটাকিয়ার অভিষেক।—রাণী কিশোরী।—জেলালুদ্দীনের মৃত্যু।

গণেশ সম্মুখ যুদ্ধে মুসলমান সম্রাট্‌কে নষ্ট করিয়া প্রকাশ্যরূপে সম্রাট্ হইয়াছিলেন এবং তিন পুরুষ বরাবর রাজত্ব করিয়াছিলেন। মহারাষ্ট্রে শিবজী এবং পঞ্জাবে রণজিৎ সিংহ ভিন্ন আর কোন হিন্দু রাজা এরূপ করিতে পারেন নাই। যদি গণেশের সন্তানেরা বরাবর স্বধর্ম্মে থাকিতেন, তবে এই ঘটনা ভাদুড়ী বংশের এবং সমস্ত বাঙ্গালীর বড়ই গৌরবের বিষয় হইত। কিন্তু যদুনারায়ণ মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করায়, বাঙ্গালী হিন্দুরা ভাদুড়ীবংশের বৈষয়িক উন্নতি স্বজাতির গৌরব জ্ঞান না করিয়া বরং কলঙ্ক জ্ঞান করিতেন। যদু মল্লযুদ্ধে পটুতা জন্য যদুমল্ল নামে খ্যাত ছিলেন। সেই যদুমল্ল (যদ্‌মাল) শব্দের অপভ্রংশে ফেরেস্তা তাঁহার নাম চেৎমল লিখিয়াছেন। গণেশের জীবদ্দশাতেই যদু আজিম শাহের কন্যা আশমানতারার প্রতি আসক্ত হইয়াছিলেন। তৎকালে ধনবান্ লোকের পক্ষে উপপত্নী রাখা এবং যবনীগমন দুষ্য ছিল না। আশমানতারার মাতা গণেশের উপপত্নী ছিলেন। সুতরাং গণেশ যদুকে নিবারণের কোন চেষ্টা করেন নাই। যদু সম্রাট্ হওয়ার তিন বৎসর পর আশমানতারার গর্ভ হইল। তিনি যদুকে কহিলেন, "আমি বাদশাহের কন্যা; আমার সন্তান ঘৃণিত জারজ হইবে, ইহা আমি সহ্য করিতে পারিব না। তুমি যদি আমাকে বিবাহ না কর, তবে আমি আত্মহত্যা করিব।" যদু নানাস্থান হইতে পণ্ডিত আনাইয়া কৌশলে তাঁহাদিগকে প্রশ্ন করিলেন যে, "যবনীকে প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া ব্রাহ্মণে তাহাকে বিবাহ করিতে পারে কি না?" পণ্ডিতেরা কহিলেন, "যবনীকে হিন্দুয়ানী করা যায়, কিন্তু তাহারা শূদ্রাণী হয়। ব্রাহ্মণের সহ তাহার বিবাহ লোকতঃ ধর্ম্মতঃ অসিদ্ধ। দ্বাপর যুগে গর্গমুনি যবনীগর্ভে কালযবনকে উৎপাদন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু বৈধবিবাহ হয় নাই। ক্ষত্রিয় রাজারা ম্লেচ্ছযবনাদি-রাজকন্যা

সময়ে সময়ে বিবাহ করিয়াছেন, কিন্তু ব্রাহ্মণের তাদৃশ বিবাহ কোন শাস্ত্রে বা ব্যবহারে নাই।" যত্ন সনাতন ধর্ম্মে থাকিয়া আশমানতারাকে বিবাহ করিবার কোন পন্থা না পাইয়া নিজেই মুসলমান হইলেন এবং জেলালুদ্দীন নাম ধারণপূর্ব্বক আশমানতারাকে বিবাহ করিলেন।

যত্নর মাতা বৃদ্ধা রাণী ত্রিপুরা, যত্নর পত্নী নবকিশোরী এবং যত্নর শিশুপুত্র অনুপনারায়ণ পাণ্ডুয়াতে ছিলেন। রাণীরা এই দুর্ঘটনার সংবাদ পাইয়া দলবল সহ গৌড়ে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের আগমনে যত্ন আশমানতারা সহ গৌড়ের দুর্গে প্রচ্ছন্ন থাকিলেন। রাণী কিশোরী দুঃখে ও ক্রোধে লজ্জা ত্যাগ করিয়া খড়্গহস্তে উগ্রচণ্ডার ন্যায় আশমানতারাকে কাটিতে বাহির হইলেন, কিন্তু দুর্গে প্রবেশ করিতে না পারিয়া ফিরিয়া আসিলেন। তখন রাণী ত্রিপুরা সমস্ত সৈন্য, সামন্ত, অমাত্য, ভৃত্য এবং প্রজাগণকে সমবেত করিয়া কহিলেন, "শাস্ত্রমতে জাতিপাত অপমৃত্যুর তুল্য। যত্নর জাতিনাশ হওয়াতে সমস্ত স্বত্ব নাশ হইয়াছে। এখন তৎপুত্র এই শিশু অনুপনারায়ণ সাম্রাজ্যের প্রকৃত অধিকারী। আমি তাহাকে বাদশাহী দিব। তোমরা আমার সাহায্য করিতে প্রতিজ্ঞা কর। তোমরা পুরুষানুক্রমে একটাকিয়ার আশ্রিত ও প্রতিপালিত। তোমাদের রক্তমাংস একটাকিয়ার অন্নে গঠিত। তোমরা ভয় এবং লোভ ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি কর। এই শিশুকে উপেক্ষা করিলে তোমাদের ইহকাল পরকাল উভয়ই নষ্ট হইবে।" রাণী কিশোরী এবং অন্যান্য রাজমহিলাগণ অমনি তীব্র করুণ স্বরে রোদন আরম্ভ করিল। এই রোদনধ্বনিতে গৌড়ের রাজভবন প্রতিধ্বনিত হইল।

সভাস্থ সকলেই দুঃখিত হইল, কেহ কেহ অশ্রুমোচন করিল; কিন্তু কেহই সাহস করিয়া তাঁহার সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইতে পারিল না। তাহিরপুরের রাজা জীবনরায় যত্নারায়ণের মাস্‌তো ভাই এবং দেওয়ান ছিলেন। তিনি কিছু দূরবর্ত্তী সম্পর্কে রাণী কিশোরীর মামাতো ভাই। তিনি অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া বিনীতভাবে কহিলেন, "মহারাণী যাহা বলিলেন, তাহাই শাস্ত্রসঙ্গত বটে। কিন্তু দেশ কাল ও পাত্র ভেদে সকল ব্যবস্থাই পরিবর্ত্তিত হয়। বর্ত্তমান অবস্থায় ধর্ম্মভ্রষ্ট রাজাকে বিচ্যুত করিতে গেলে প্রচুর অনিষ্ট হইবে। দেশ মধ্যে মুসলমানেরা অতি প্রবল। আপনকার সৈন্য ও সেনাপতির সারাংশ মুসলমান।

মহারাজ মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করায় তাহারা অতিশয় তুষ্ট হইয়াছে। তাহারা অবশ্যই তাঁহার পক্ষ হইবে। মহারাজ নিজে অতি বুদ্ধিমান্ বীরপুরুষ। তাঁহাকে রাজ্যভ্রষ্ট করা আমাদের অসাধ্য। তিনি কেবল লজ্জা প্রযুক্ত পলাইয়া আছেন, তিনি ভীত হন নাই। আপনারা তাঁহার বিরোধী হইলে অনেকের প্রাণ নাশ অবশিষ্টের ধর্ম্মনাশ হইবে। একটাকিয়ায় জলপিণ্ড লোপ পাইবে। আপনারা এই সংকল্প ত্যাগ করুন। ভাতুড়ীচক্রই একটাকিয়ার প্রকৃত রাজ্য। আপনারা সেখানে অনুপকে রাজা করুন। তাহাতে বোধ হয় বাদশাহ কোন আপত্তি করিবেন না। যদি করেন, তবে আমরা তাঁহাকে নিবারণ করিব। আশমানতারা গৌড়বাদশাহের কন্যা। তাহার সন্তানকে গৌড়ে বাদশাহী করিতে দিন। ইহাতে দশদিক্ রক্ষা হইবে এবং সর্ব্বত্র মঙ্গল হইবে।" সভাস্থ সকলে অমনি "সাধু সাধু!" বলিয়া তাঁহার মতের পোষকতা করিল। রাণীরাও অবশেষে দেওয়ানজীর উপদেশই অনুসরণ করা কর্ত্তব্য স্থির করিলেন।

রাণীদের সাতগড়া গমন জন্য নৌকা সংগৃহীত হইল। গৌড়ের ছত্র দণ্ড সিংহাসন এবং গৌড় ও পাণ্ডুয়ার রাজপ্রাসাদ হইতে যাবতীয় উৎকৃষ্ট মূল্যবান্ দ্রব্য সেই সকল নৌকায় বোঝাই করা হইল। তাহার পর বৃদ্ধা রাণী জীবন রায়কে তোষাখানা খুলিয়া দিতে হুকুম দিলেন। দেওয়ানজী নিজ দায়িত্ব বুঝিয়া যদুর নিকট এত্তেলা দিলেন। যদু কহিলেন, "তোষাখানা খুলিয়া দাও, মাতৃদেবীর যাহা ইচ্ছা তাহাই লইয়া যাইতে দাও, তাঁহারা যাহাতে শীঘ্র চলিয়া যান তাহারই চেষ্টা কর।" অনুমতি পাইয়া জীবন রায় সমস্ত ধনাগার খুলিয়া দিলেন। রাণীরা সমস্ত অস্থাবর সম্পত্তি লইয়া সাতগড়া চলিলেন। যদু দূত দ্বারা জননীকে প্রণাম পাঠাইলেন। বৃদ্ধা রাণী সক্রোধে কহিলেন, "আমার যদু এখন নাই, সে মরিয়াছে।" তাঁহার ক্রোধ দেখিয়া দূত ভয়ে পলায়ন করিল।

রাণীদের প্রস্থানের পর যদু দুর্গ হইতে বাহির হইয়া রাজকার্য্য আরম্ভ করিলেন। তিনি নামের মোহর পরিবর্ত্তন করিয়া জেলালুদ্দীন শাহ নামে মোহর করিলেন। তিনি ধর্ম্মোপাসনা বিষয়ে গোঁড়া মুসলমান হইয়াছিলেন। তিনি প্রত্যহ পাঁচ সন্ধ্যা নমাজ পড়িতেন; প্রাতে এবং সন্ধ্যার পর কোরাণ পাঠ করিতেন; রমজান ও মহরমের রোজা অর্থাৎ উপবাস করিতেন এবং যাবতীয় মুসলমান পর্ব্ব যথারীতি নির্ব্বাহ করিতেন। কিন্তু আহার ব্যবহারে পূর্ব্ববৎ

হিন্দু-পদ্ধতি স্থির রাখিয়াছিলেন। তিনি কখন বিছানায় বসিয়া আহার করিতেন না ; ব্রাহ্মণের অখাদ্য কোন দ্রব্য খাইতেন না এবং স্নান না করিয়া ভোজন করিতেন না। তিনি পাণ্ডুয়ায় দেবসেবার ব্যয় পূর্ব্ববৎ রাজকোষ হইতে দিতেন। তিনি গোহত্যা এবং পিতৃকুলে বিবাহ পূর্ব্ববৎ নিষিদ্ধ রাখিয়াছিলেন। প্রকাশ্য স্থানে কেহ কোন ধর্ম্মের নিন্দা করিলে কঠিন দণ্ড হইত। তাঁহার হিন্দু মুসলমান কর্ম্মচারী সকলেই পূর্ব্ববৎ থাকিল। তাঁহার হিন্দু উপপত্নীগণ বিদায় প্রার্থনা করায় তাহাদিগকে কিছু কিছু অর্থ দিয়া বিদায় করিলেন। সংক্ষেপতঃ একটাকিয়ার রাজারা যেমন সমদর্শী এবং সমতাপ্রিয় ছিলেন, যদু মুসলমান হইয়াও তদ্রূপই থাকিলেন। দিনরাজ ঘোষ নামক একজন উত্তররাঢ়ী কুলীন কায়স্থকে তিনি উত্তর বাঙ্গালার নবাব নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহারই সন্তান দিনাজপুরের রাজা।

রাণীরা সাতগড়ায় আসিয়া ভাতুড়িয়া এবং বাজুচতুষ্টয় অধিকার করিলেন। তাহার পর ছিন্দাবাজু প্রভৃতি আর তিনটি পরগণা অতিরিক্ত দখল করিলেন। একটাকিয়ার রাজারা গৌড়বাদশাহকে যেরূপ নর্ম্মা (নজরানা) ও রাজস্ব দিতেন, রাণী ত্রিপুরা তাহা বন্ধ করিয়া অনুপের অভিভাবিকারূপে রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। অনুপ যদুর কুশনির্ম্মিত মূর্ত্তি দাহ করিলেন। জাতিভ্রষ্টের শ্রাদ্ধ হয় না, এ জন্য তিনি মস্তক মুণ্ডন ও স্বর্ণ উৎসর্গ করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিলেন। এই অবধি রাণী নবকিশোরী বৈধব্য আচরণ করিতেন। জেলালুদ্দীন সমস্ত সংবাদ পাইলেন, কিন্তু কিছুতেই কোন আপত্তি করিলেন না।

ইহার পর পঞ্চম বৎসরে অনুপের ষোল বৎসর বয়স পূর্ণ হইল। রাণী ত্রিপুরা গৌড় হইতে প্রচুর ধনরাশি আনিয়াছিলেন, তিনি সেই অর্থবলে মহাধুমধামে অনুপের বিবাহের এবং রাজ্যাভিষেকের আয়োজন করিলেন। তিনি যদুকে কোন কথা কিছুই জানান নাই। কেবল রাণী কিশোরী, বাদশাহকে এইরূপ ব্যঙ্গ করিয়া নিমন্ত্রণপত্র পাঠাইয়াছিলেন। যথা—

প্রবল প্রতাপান্বিত শ্রীল শ্রীযুক্ত জেলালুদ্দীন শাহ বাহাদুর রাজোন্নতিষু—

আমা সেলামপূর্ব্বক নিবেদনঞ্চ বিশেষ—

মৃত মহারাজা যদুনারায়ণ খাঁ সাহেবের পুত্র শ্রীমান্ অনুপনারায়ণ শর্ম্ম খাঁ সাহেবের শুভ বিবাহ ও ভাতুড়ীরাজ্যে অভিষেক হইবে। পত্র দ্বারা নিমন্ত্রণ করিলাম। হজুর আপনি বেগম সহ

আগমন পূর্ব্বক শ্রীমানের কল্যাণ প্রার্থনা করিবেন এবং সময়োচিত সভাসৌষ্ঠব করিবেন। ইতি—

আজ্ঞাধীনা—

শ্রীনবকিশোরী দেব্যাঃ।

বাদশাহ সেই পত্র পাইয়া চিন্তা করিলেন, "যদুনারায়ণ প্রকৃতই এখন মৃত। যদুর মাতা, স্ত্রী, পুত্র, জ্ঞাতি, কুটুম্ব সকলই আছে। কিন্তু এখন আমার সহ তাহাদের কোন সম্পর্ক নাই। যদুর মাতা সর্ব্বদা যদুর দীর্ঘ জীবন প্রার্থনা করিতেন, যদুর ব্যারাম হইলে আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া তাহার শুশ্রূষা করিতেন এবং যদুকে দেখিলে তাঁহার আনন্দের সীমা থাকিত না। সেই মা এখন আমাকে দেখিতে চান না, আমার নাম শুনিতে পারেন না, সর্ব্বদা আমাকে শাপ দেন। যে সকল লোক যদুর পাদোদক এবং উচ্ছিষ্ট সেবন করিয়া পুণ্য জ্ঞান করিত, এখন আমি স্পর্শ করিলে তাহাদের অন্নজল অপবিত্র হয়। তবে আমি কি সেই যদুনারায়ণ দেবশর্ম্মা আছি? ভদ্রং ন কৃতং—আমি ভাল কাজ করি নাই। যে কোন ব্যক্তি যখন ইচ্ছা তখনই মুসলমান হইতে পারে, কিন্তু নূতন কেহ সহস্র তপস্যা করিয়াও যদুর ন্যায় কুলীন ব্রাহ্মণ হইতে পারে না। এখন পুনরায় ব্রাহ্মণ হইতে পারিব না। আত্মগ্লানি প্রকাশ করিলে মুসলমানেরাও তুচ্ছ জ্ঞান করিবে। অতএব মনের ভাব গোপন রাখাই উচিত। এখন রাণীর পত্রের কি উত্তর দেই?"

তিনি অনেক চিন্তা করিয়া রাণী কিশোরীকে কি পাঠ লিখিবেন, তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। এজন্য নিজ পক্ষ হইতে কোন উত্তর না দিয়া বেগমের পক্ষ হইতে লিখিলেন যে—

প্রবল প্রতাপান্বিতা শ্রীল শ্রীযুক্তা মহারাণী নবকিশোরী দেবী বাহাদুরা

রাজ্যোন্নতিষু—

প্রণামা নিবেদনঞ্চ বিশেষ—

শ্রীযুত বাদশাহের নামিক আপনকার প্রেরিত পত্রে শ্রীমান্ অনুপনারায়ণ বাবাজীর শুভ বিবাহ ও রাজ্যাভিষেক সংবাদ প্রাপ্তে শ্রীযুত বাদশাহ নামদার এবং আমরা সকলেই পরম সন্তোষ লাভ করিলাম। স্বর্গীয় মহারাজ গণেশনারায়ণ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত পাণ্ডুয়ার দেবালয়ে এবং গৌড়ের মসজীদে শ্রীমানের কল্যাণার্থ পূজা ও উপাসনার আদেশ করা হইল। নিমন্ত্রণ রক্ষার্থ শ্রীযুত রাজা জীবন রায় দেওয়ানজীকে অভিষেকসামগ্রী সহ পাঠাইলাম। লজ্জাপ্রযুক্ত আমি ও বাদশাহ নিজে

খাইতে পারিলাম না। অপরাধ ক্ষমা করিবেন। ইতি—

আজ্ঞাধীনা—

শ্রীআশমানতারা বেগম।

রাণী কিশোরী লেখা পড়া জানিতেন। তিনি যদুর হস্তাক্ষর দেখিয়া চিনিতে পারিলেন। যদুর প্রেরিত ঠাণ্ডা চিঠি এবং অভিষেকসামগ্রী পাইয়া স্বামীর পূর্ব্বপ্রেম রাণীর মনে নবভাবে উদ্দীপিত হইল। পুরাতন শোক আবার নূতন হইল। তিনি কান্দিতে কান্দিতে কহিলেন, "আমি রাজার কন্যা, মহারাজার রাণী। পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত কখন কোন রকম দুঃখ কষ্ট পাই নাই। চব্বিশ বৎসর স্বামীর কাছে ছিলাম, সে কখন কোন অপ্রিয় কার্য্য করে নাই কিম্বা কখন একটি কটু কথাও বলে নাই।" এই বলিয়া তিনি মস্তকে করাঘাত করিলেন এবং মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পড়িলেন। তাঁহার এই অবস্থা দেখিয়া সমস্ত লোক ব্যস্ত হইল।

পুরন্ধ্রীগণ এবং দাসীরা নানাপ্রকার শুশ্রূষা করিতে লাগিল। কেহ বাতাস দিল, কেহ মাথায় গোলাপজল দিল, কেহ বুকে পিঠে শতধৌত ঘৃত মালিশ করিল। তাঁহার মূর্চ্ছার সংবাদ মুহূর্ত্ত মধ্যে সমস্ত রাজবাটীতে ও সমস্ত সহরে প্রচারিত হইল। চারিদিক্ হইতে লোক দৌড়িয়া আসিল। রাণী কিশোরীর সংজ্ঞা হইল, কিন্তু শোক দুঃখের ন্যূনতা হইল না।

হিন্দু রমণীরা প্রথম বয়সে কোন কর্ত্তৃত্ব করিতে পারিত না, কিন্তু বেশী বয়সে সংসারের সমস্ত কর্ত্তৃত্বই তাহাদের হাতে পড়িত। বিশেষতঃ পুত্রবধূর উপর শ্বশুড়ীর প্রভুত্বের সীমা ছিল না। রাণী ত্রিপুরা বধূর মূর্চ্ছার কারণ শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন। আজ অনুপের অভিষেক—শুভদিন জন্য বেশী গালাগালি দিলেন না, কেবল উগ্রভাবে কহিলেন, "কি লো বৌ! এত বেলা হ'লো তুই মঙ্গলচণ্ডীর পূজায় বসিস্ নাই, পুরাণো কান্না কান্দ্‌ছিস্। যা গিয়েছে তা হাতের বালাই পায়ের বালাই গিয়েছে, যা আছে তারই মঙ্গল দেখ্। তুই কি এই শুভদিনে সেই অপিণ্ডিয়ার জন্য কেঁদে আমার অনুপের অমঙ্গল ক'র্‌বি?" শাশুড়ীর তর্জ্জনে রাণী কিশোরী ভয়ে ব্যস্ত হইলেন। তাঁহার শোকাবেগ অজ্ঞাতসারে অন্তর্হিত হইল। তিনি উঠিয়া শাশুড়ীকে প্রণাম করিলেন এবং অগৌণে গরদের ধুতী ও নামাবলী পরিয়া পূজার জন্য চণ্ডীমণ্ডপে গেলেন।

যত্ন, রাণী ত্রিপুরার একমাত্র সন্তান এবং সমগ্র স্নেহের পাত্র ছিলেন। জাতি-পাত অবধি সমস্ত মাতৃস্নেহ তাঁহার ভাগ্য হইতে বিস্খলিত হইয়া অনুপের উপর পড়িয়াছিল। রাণী জানিতেন, শাস্ত্রমতে পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র তিনই সমান। সুতরাং তিনি অনুপকেই একমাত্র সন্তান জ্ঞান করিতেন। গৌড়ের সমস্ত রাজ-বৈভব তিনি সাতগড়ায় লইয়া আসিয়াছিলেন এবং যত্নপূর্ব্বক অনুপের জন্য রাখিয়াছিলেন। এখন তাহাদ্বারা তিনি মহানন্দে সাতগড়া সুশোভিত করিলেন। হিন্দু রমণীরা মুসলমান রমণীদের ন্যায় তত বেশী পরদানসিন ছিলেন না। রাণী ত্রিপুরা বৃদ্ধকালে বাহির বাড়ীতে যাইতেন। তিনি রাজগদীতে বসিতেন না বটে, কিন্তু বাহির দর্বারে পৃথক্ আসনে বসিয়া নিজে রাজকার্য্য করিতেন। অদ্য তিনি অনুপ ও তাঁহার পত্নীকে কোলে করিয়া প্রকাশ্য দর্বারে সিংহাসনে বসিলেন। তাহার পর একত্র দুই হাতী বাঁধিয়া তাহার উপর হাওদায় চড়িয়া নব দম্পতি সহ সমস্ত নগরে গস্ত ফিরিলেন। তাঁহার ধনের অভাব ছিল না। সপ্তাহ পর্য্যন্ত অজস্র দান বিতরণ করিলেন। সাতগড়া দ্বীপে যে কেহ আসিল, তাহাকেই অন্ন বস্ত্র দিলেন। পণ্ডিত ব্রাহ্মণদিগকে প্রচুর ধন দান করিলেন। অন্য ব্রাহ্মণদিগকেও যথেষ্ট পুরস্কার দিয়া বিদায় করিলেন। সমস্ত কয়েদীদিগকে মুক্ত করিয়া পথখরচা দিলেন। কুটুম্বদিগকে মহার্হ বস্ত্র অলঙ্কার দিয়া লৌকিকতা করিলেন। ভৃত্যদিগকে প্রচুর ইনাম দিলেন। সমস্ত প্রজার এক বৎসরের খাজনা মাফ দিলেন। জেলালুদ্দীনের প্রেরিত লোকদিগকেও প্রচুর পুরস্কার দিলেন। তন্মধ্যে একজন মুসলমান কর্ম্মচারী রাণীর মন বুঝিবার জন্য কহিল, "রাণী-মা! আপনার পুত্রের—"। বৃদ্ধা রাণী অমনি কহিলেন, "আমার পুত্র, পৌত্র, সর্ব্বস্ব এই অনুপ; পৃথিবীতে আমার আর কেহ নাই।" বলিতে বলিতে চক্ষের জলে তাঁহার বক্ষ ভাসিয়া গেল। রাজা জীবন রায় সক্রোধে ভ্রূভঙ্গি করিবামাত্র অমনি সেই মুসলমানটি দূরে সরিয়া গেল।

রাণী কিশোরী নিজের শাড়ী এবং অলঙ্কারগুলি একটি ঝালি (পেটরা) ভরিয়া জীবন রায়ের সহ আশমানতারাকে উপঢৌকন পাঠাইলেন। তিনি বৈধব্য বেশ ধারণকালে ভগ্ন শাঁখা খাড়ুর টুকরাগুলি একটি কৌটায় রাখিয়া-ছিলেন, এখন সেই কৌটাটি বাদশাহকে উপহার পাঠাইলেন।

বেগমকে রাণী কিশোরী এইরূপ চিঠি লিখিলেন—

সকল-মঙ্গলালয়া শ্রীশ্রীমতী আশমানতারা বেগম বাহাদুরা
রাজ্যোন্নতিষু—

আশীর্ব্বাদপূর্ব্বক নিবেদনঞ্চ বিশেষ—

দেওয়ানজী সাহেব সহ তোমার প্রেরিত দ্রব্যজাত যথাসময়ে পাইয়া সন্তোষ লাভ করিলাম। তোমাদের আশীর্ব্বাদে শ্রীমানের অভিষেক নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে। আমি বিধবা, আমার শাড়ী ও অলঙ্কার অব্যবহার্য্য। অনুপের বধূকে রাণী-মা সমস্তই নূতন তৈয়ারী করিয়া দিয়াছেন। এজন্য আমার বসন ভূষণ তোমাকে পাঠাইয়া দিলাম। তুমি ভাগ্যবতী, তাহা ব্যবহার করিয়া সার্থক করিবে। আমি পাগল হইয়াছি বলিয়া সকল দোষ ক্ষমা করিবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদিকা—
শ্রীনবকিশোরী দেব্যাঃ।

তিনি বাদশাহকে যে কৌটা পাঠাইলেন, তন্মধ্যে একটু ভূর্জ্জপত্রে নিম্নলিখিত কয়েকটি শ্লোক * লিখিয়া পাঠাইলেন,—

যবনীর তরে যদি স্বামী ছাড়ে জাতি।
কি পাঠ লিখিবে তারে কহ গৌড়পতি॥
* * * *
ধর্ম্মার্থে রমণীগণ পতিব্রতা হয়।
ধর্ম্মার্থে কিশোরী পতি ছেড়ে দূরে রয়॥
জীবিত থাকিতে পতি, বিধবা কিশোরী।
হেন অভাগিনী কেবা আছে মরি মরি॥

জেলালুদ্দীন দেওয়ানজীর নিকট অনুপের ধূমধামে অভিষেক এবং তাহাতে বৃদ্ধা রাণীর উৎসাহ শুনিয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "রাণী-মা গৌড়ের সিংহাসন অনুপকে দিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা দিয়াছেন। আমি সাহায্য ভিন্ন তাঁর কোন কার্য্যেই বাধা দেই নাই। তবে তাঁর আক্ষেপ কি?" তাহার পর তিনি রাণী কিশোরীর প্রেরিত উপহার পাইয়া নীরবে আত্মগ্লানি ভোগ করিতে লাগিলেন।

অতঃপর রাণী কিশোরী ক্রমেই কঠোরতর ব্রত আরম্ভ করিলেন। তিনি মাসে মাসে প্রায় আঠার দিন উপবাস করিতেন। তাঁহার শরীর ক্রমশঃ শুষ্ক ও দুর্ব্বল হইল। চতুর্থ বৎসরে তাঁহার গঙ্গাপ্রাপ্তি হইল। জেলালুদ্দীন সমস্ত

* মধ্যবর্ত্তী শ্লোকগুলি অপ্রাপ্য।

অবস্থার তদন্ত রাখিতেন। সাধ্বী সুশীলা কিশোরীর অকালমৃত্যুর তিনি নিজেই একমাত্র কারণ ইহা জানিয়া বাদশাহ একান্তে বসিয়া নীরবে অশ্রুপাত করিতে-ছিলেন, এমন সময়ে আশমানতারা উপস্থিত হইয়া তাঁহার রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। বাদশাহ দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া কহিলেন, "সুশীলা রাণী কিশোরী কঠোর ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করিয়া অকালে ইহলোক ত্যাগ করিলেন। আমি তোমার খাতিরে তাঁহার সহ সদ্ব্যবহার করিতে পারি নাই। ইহাই তাঁহার মৃত্যুর কারণ।" বেগম কহিলেন, "আমি কখন তোমার কাছে রাণী কিশোরীর কোন নিন্দা করি নাই কিংবা তৎপ্রতি কোন বিদ্বেষ প্রকাশ করি নাই। তুমি তদ্রূপ সুন্দরী সুশীলা পত্নী অকারণে ত্যাগ করিয়া অন্যায় করিয়াছ। আমার সন্দেহ হয় পাছে অন্যের খাতিরে আমার প্রতিও এইরূপ নিষ্ঠুর হইতে পার।" বাদশাহ কহিলেন, "যার জন্য করি চুরি সেই বলে চোর—তোমারই অনুরোধে মুসলমান হইলাম, তজ্জন্য অন্য স্ত্রী, পুত্র, মাতা, জ্ঞাতি, কুটুম্ব সহ বিচ্ছেদ হইল। তুমি তাঁহাদিগকে ত্যাগ করিতে বল নাই, আমিও ত্যাগ করি নাই। বিধর্ম্মাশ্রিত দেখিয়া আমাকে তাঁহারাই ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন।" বেগম কহিলেন, "তবে আমার দোষ কি?" বাদশাহ কহিলেন, "আমি তোমার দোষ দিই না কিংবা অন্য কাহারও দোষ দিই না, সকলই আমার নিজের দোষ। তুমি যে রাণী কিশোরীর গুণরাশি স্বীকার করিলে, আমি তজ্জন্য প্রশংসা করি; কেননা তোমার নিজের গুণ না থাকিলে কদাচ সপত্নীর গুণ স্বীকার করিতে পারিতে না। তিনি এখন স্বর্গে গিয়াছেন, তাঁহার কোন উপকার বা অপকার করা আমাদের সাধ্য নাই। তাঁহার পুত্র অনুপকে তুমি কদাচ হিংসা করিও না।" বেগম কহিলেন, "আমি অনুপকে জ্যেষ্ঠপুত্র জ্ঞান করি এবং চিরজীবন তাহাই জ্ঞান করিব।"

জেলালুদ্দীন দেখিলেন যে, অনুপ সাম্রাজ্যের প্রকৃত উত্তরাধিকারী, কিন্তু সে নির্ব্বিবাদে দখল পাইবে না এবং বিবাদ করিলেও কৃতকার্য্য হইবে না। ভাবী গোলযোগ নিবারণ জন্য তিনি আশমানতারার জ্যেষ্ঠ পুত্র আহমেদ শাহকে নিজ জীবমানে সাম্রাজ্য দিলেন। কিন্তু তাঁহাকে এবং যাবতীয় প্রধান সেনাপতি ও কর্ম্মচারীদিগকে প্রতিজ্ঞা করাইলেন যে, তাহারা অনুপকে তাহার দখলী আট পরগণা হইতে বঞ্চিত না করে। অষ্টাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত নির্ব্বিবাদে রাজত্ব করিয়া জেলালুদ্দীন হিজরী ৮১২ সালে গৌড়নগরে দেহত্যাগ করেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

আহমেদ শাহ।—অনুপনারায়ণ।—নাশের শাহ।—কালাপাহাড়।—হাব্সী রাজগণ।

জেলালুদ্দীনের মৃত্যুসংবাদ পাইয়া অনুপ নিজ কর্ত্তব্য সম্বন্ধে পণ্ডিতগণকে প্রশ্ন করিলেন। কোন পণ্ডিতই কোন সদুত্তর দিতে পারিলেন না। সেই সময়ে বিদ্যাভূষণ উপাধিধারী বিক্রমপুরনিবাসী একটি পণ্ডিত তাঁহাকে গয়াতে পিণ্ডদান করিতে ব্যবস্থা দিলেন *। সেই ব্যবস্থাই অনুপের মনোমত হইল। তদবধি অনুপ বিদ্যাভূষণের একান্ত অনুগত হইলেন। বিদ্যাভূষণ যাহা বলিতেন, অনুপ তাহাই করিতেন। তিনি অগোণে বিদ্যাভূষণকে লইয়া গয়াযাত্রা করিলেন। গয়ালীরা আপত্তি উত্থাপন করিল। গয়ালীরা কেবল তীর্থগুরু ব্রাহ্মণ বলিয়া মান্য। তাহাদের বিদ্যাসাধ্য বিশেষ কিছু ছিল না। তাহারা বিদ্যাভূষণের সম্মুখে তর্ক করিতে অপারগ হইয়া "মুসলমানের পিণ্ড দিব না" বলিয়া জিদ করিল। বিদ্যাভূষণ কহিলেন, "মুসলমানের শ্রাদ্ধ রাজা করিবেন না এবং আপনারাও করাইবেন না। যে দিন তাঁহার জাতি গিয়াছে, সেই দিন হইতে আমরা তাঁহাকে মৃত জ্ঞান করি; কিন্তু তৎপূর্ব্ববর্ত্তী যদুনারায়ণ শর্ম্মার শ্রাদ্ধ অবশ্য করাইবেন।" গয়ালীরা তাহাতে সম্মত হইলে, অনুপ বহুব্যয়ে যদুনারায়ণের পিণ্ডদান করিলেন। এদিকে পাটনার অপর পারে হাজীপুরে আহমেদ শাহ এক মস্জিদ্, অতিথিশালা ও পুষ্করিণী জেলালুদ্দীনের নামে উৎসর্গ করিলেন। এইরূপে যদুর দুই পুত্র দুই ধর্ম্মানুসারে তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করিয়াছিলেন।

অনুপ গয়া হইতে ফিরিয়া পাটনাতে নৌকায় উঠিলেন। ঠিক সেই সময়ে আহমদ শাহ হাজীপুর হইতে আসিয়া তাঁহার সহ সাক্ষাৎ করিলেন। তিনি যাবনিক রীতি অনুসারে সেলাম না করিয়া হিন্দুর ন্যায় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে প্রণাম করিলেন এবং সাম্রাজ্য গ্রহণ জন্য অনুরোধ করিলেন। অনুপ কহিলেন, "গরুর জন্য রাখাল, রাখালের জন্য গরু নহে। রাজ্য নিজ সুখের জন্য নহে, বরং প্রজার

---

* এই পণ্ডিতের নাম আমরা জানিতে পারি নাই, তিনি বিদ্যাভূষণ উপাধি দ্বারাই প্রসিদ্ধ।

সুখের জন্য রাজপদ সৃষ্ট হইয়াছে। পিতা তোমাকে সাম্রাজ্য দিয়াছেন, তুমি তাহা ভোগ করিয়া পিত্রাজ্ঞা পালন কর, প্রজার হিত সাধন করিয়া যশস্বী হও, আমি তাহাতে তুষ্ট আছি। আমি এই গঙ্গার মধ্যে বসিয়া, সাম্রাজ্যে আমার যে কিছু দাবী আছে, তাহা তোমাকে দান করিলাম। তুমি নিঃসন্দেহ হইয়া রাজত্ব ভোগ কর।"

অনুপের বার্ষিক মুনাফা প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকা ছিল। আহমেদ আর কিছু ভূমি তাঁহাকে দিয়া মুনাফা ছয় লক্ষ টাকা সম্পূর্ণ করিয়া দিলেন এবং তাঁহার স্বাধীনতা স্বীকার করিলেন। তাঁহাদের সদ্ভাব দেখিয়া মুসলমানেরা চমৎকৃত হইল।

আহমেদ শাহ প্রায় ষোল বৎসর রাজত্ব ভোগ করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে জুয়ানপুরের সুলতান ইব্রাহিম বহু সৈন্য লইয়া বঙ্গদেশ আক্রমণ করেন। আহমেদ ইব্রাহিমের নিকট পরাস্ত হইয়া হিরাটের রাজার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করেন। হিরাটরাজ সারুস্ ইব্রাহিমকে গৌড়াধিপতির উপর উৎপীড়ন করিতে নিষেধ করায়, বঙ্গদেশ ইব্রাহিমের অত্যাচার হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে। আহমেদ অতিশয় অত্যাচারী ও রক্তপিপাসু ছিলেন। গোলাম হোসেন বলেন যে, তিনি প্রজাবর্গকে নিরর্থক হত্যা ও গর্ভবতী রমণীগণের উদর বিদীর্ণ করিতেন *। তাঁহার অত্যাচারের মাত্রা এতদূর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল যে তাহা রাজ্যের ছোট বড় সকলেরই অসহ্য হইয়া উঠিল। তাঁহার অমাত্যবর্গ তাঁহাকে নিহত করিয়া সমসুদ্দীনের এক পৌত্রকে 'নাশের শাহ' উপাধি প্রদানপূর্ব্বক গৌড় সিংহাসনে অভিষিক্ত করিল।

আহমেদেব পতনের পর আশমানতারা অগত্যা অনুপের আশ্রয় লইলেন। বৃদ্ধা রাণী ত্রিপুরা তখনও জীবিতা ছিলেন। বেগম তাঁহাকে অত্যন্ত ভয় করিলেন, অনুপ বেগমকে অতি সম্মানপূর্ব্বক নিজ বাড়ীতে উঠাইলেন। রাজবাড়ীর এক সম্পূর্ণ প্রকোষ্ঠ তাঁহার বাসের জন্য ছাড়িয়া দিলেন। তাঁহার নিজ ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য মাসিক ৩০০৲ টাকা বৃত্তি দিলেন। তাঁহার আনুযাত্রিক

* ষ্টুয়ার্ট্ সাহেব কৃত বঙ্গের ইতিহাসে আহমেদ শাহের অত্যাচারের কথা আদৌ উল্লিখিত নাই, বরং তিনি অতি নিরপেক্ষ ভাবে প্রজাপালন করিতেন।

লোকগণকে নিজ চাকরীতে বহাল করিলেন। অনুপ তাঁহাকে মা বলিয়া ডাকিতেন এবং প্রত্যহ তাঁহার সহ সাক্ষাৎ করিয়া সমস্ত কর্ত্তব্য কার্য্যে পরামর্শ করিতেন।

বেগম অপমানভয়ে রাণী ত্রিপুরার সহ সাক্ষাৎ করেন নাই। বৃদ্ধা রাণী তাহা জানিতে পারিয়া নিজেই আসিয়া বেগমের প্রকোষ্ঠে উপস্থিত হইলেন। বেগম কাঁপিতে কাঁপিতে গিয়া তাঁহার পদানত হইলেন। বৃদ্ধা রাণী তাঁহার প্রতি কোন কটু ব্যবহার করিলেন না; বরং তাঁহার বংশলোপে ভাদুড়ী বংশের বাদশাহী লোপ হইল বলিয়া শোক প্রকাশ করিলেন। বেগমকে নানারূপ প্রবোধ দিলেন। তিনি বেগমকে কহিলেন, "যাহা গিয়াছে, তাহার চিন্তায় কোন ফল নাই। এখন অনুপকেই পুত্র জ্ঞান কর এবং তাহার সন্তানদিগকে পৌত্র জ্ঞান কর। সকলের সহ দেখা-সাক্ষাৎ আলাপ-আপ্যায়ন কর তাহাতেই মনের শান্তি হইবে। যতই নির্জ্জনে থাকিবে, ততই শোক ও দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হইবে। আমার সহ মধ্যে মধ্যে দেখা করিবে এবং যে কোন দ্রব্য প্রয়োজন হয় আমাকে বলিও। মেয়েলোকের পক্ষে শাশুড়ী মায়ের উপরে। মায়ের কাছে থাকা দশ বৎসর, শাশুড়ীর কাছে চল্লিশ বৎসর। আমার কাছে চাহিতে লজ্জা নাই। তোমার যখন যা লাগে আমি দিব।" শাশুড়ীর দয়া দেখিয়া বেগমের ভয় ভাঙ্গিল। বেগম নানারূপ স্তুতি মিনতি করিলেন। ইহার পর বৃদ্ধা রাণী এক বৎসর জীবিতা ছিলেন। বেগম প্রত্যহ তাঁহার সহ সাক্ষাৎ করিতেন। হিন্দুর মধ্যে থাকিয়া বেগম ক্রমে হরিভক্ত হইয়াছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণী বিধবার ন্যায় নিরামিষ একাহার করিতেন; একবস্ত্রে থাকিতেন এবং তুলসীতলায় বসিয়া হরিনাম জপ করিতেন। তিনি প্রত্যহ সন্ধ্যার পর ঠাকুরবাড়ীতে আরতি দেখিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিতেন। তিনি অনেক দিন জীবিতা ছিলেন। তাঁহার মৃত্যু হইলে গঙ্গার কাঁচি চড়ামধ্যে তাঁহার গোর দেওয়া হইয়াছিল।

অনুপ বিদ্যাভূষণের একান্ত বাধ্য ছিলেন, এবং তাঁহার পরামর্শে ব্রহ্মচারীর মত চলিতেন। বিদ্যাভূষণ অতি সুপণ্ডিত ও পরিনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ ছিলেন বটে, কিন্তু অতিশয় কটুভাষী এবং মুসলমান-বিদ্বেষী ছিলেন। অনুপ তাঁহাকে ঠাকুরবাড়ীতে বাসা দিয়াছিলেন। সেখানে মুসলমানের গতিবিধি ছিল না, সুতরাং

সেখানে তাঁহার যবনবিদ্বেষ তত প্রকাশ পাইত না। পাঠানেরা একটাকিয়াদিগের বরাবর প্রধান সহায় ছিল। ভাদুড়ীরাজ্যে তাহাদের কর্তৃত্ব প্রচুর ছিল। রাজারা পাঠান সর্দারদিগকে নাম ধরিয়া ডাকিতেন না কিংবা চাকর বলিয়া জ্ঞান করিতেন না। একটাকিয়ারা পাঠানদিগকে নিজ জ্ঞাতি কুটুম্বসদৃশ ব্যবহার করিতেন এবং কাহাকে দাদা, কাহাকে খুড়া, কাহাকে মামা বলিয়া ডাকিতেন এবং অতি সদ্ভাবে বশীভূত রাখিতেন। বিদ্যাভূষণ পল্লীগ্রামবাসী ব্রাহ্মণ। তিনি পাঠানদের দুর্দ্দান্ত স্বভাব অবগত ছিলেন না। তিনি একদিন প্রকাশ্য সভায় বলিয়া উঠিলেন "নাধমো যবনাৎ পরঃ" (যবন জাতি হইতে অধম কেহই নাই)। সেই কথা শুনিয়া উপস্থিত পাঠানেরা অমনি তরবারি খুলিয়া বসিল। অনুপ বহুকষ্টে বিদ্যাভূষণকে ঠাকুরবাড়ী পৌঁছাইলেন এবং বাহির হইতে নিষেধ করিলেন। ব্রাহ্মণের ক্রোধ অস্থায়ী, কিন্তু পাঠানের ক্রোধ চিরস্থায়ী। এই ঘটনার সাত মাস পর বিদ্যাভূষণ বিলে স্নান করিতে আরম্ভ করিলেন। পাঠানেরা সুযোগ পাইয়া একদিন তাঁহাকে হত্যা করিল। অনুপ, সংবাদ পাইয়া মনস্তাপে আহার নিদ্রা ত্যাগ করিলেন। হত্যাকারীর সন্ধান পাওয়া গেল না। হিন্দুরাজ্যে ব্রহ্মহত্যা হইল বলিয়া অনুপ প্রায়শ্চিত্ত করিলেন। কিন্তু তাঁহার মনোমালিন্য গেল না। সেই মনস্তাপেই তৃতীয় দিবসে তাঁহার মৃত্যু হইল।

অনুপ একান্ত সোহাগের ছেলে ছিলেন। বাল্যকালে পিতামহীর আদরে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। তাহার পর বিদ্যাভূষণের পরামর্শে ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করিতেন। তাঁহার শরীর অতি সুন্দর হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ ছিল। কিন্তু তাঁহার সাহস বা তেজস্বিতা ছিল না। অনুপ মেধাবী ছিলেন, কিন্তু কষ্ট স্বীকার না করায় অধিক বিদ্যা হয় নাই। বাঙ্গালা ও পারসীতে তিনি সাধারণ লেখাপড়া ও কথাবার্ত্তা চালাইতে পারিতেন। পরে বিদ্যাভূষণের কাছে অসংখ্য সংস্কৃত শ্লোক শুনিয়া মুখস্থ করিয়াছিলেন। অস্ত্রশস্ত্র চালনা কিছু কিছু শিখিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহাতে তাঁহার পটুতা জন্মে নাই। ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার দৃঢ় ভক্তি ছিল। তিনি সুদীর্ঘ জীবনে কদাচ একটি মিথ্যা কথা বলেন নাই কিংবা কাহারও কোন অনিষ্ট করেন নাই। তিনি দীর্ঘসূত্রী ছিলেন, কোন কাজ শীঘ্র করিতে পারিতেন না। অথচ আলস্যমাত্র তাঁহার ছিল না। তিনি অতি অল্পকাল

নিদ্রা যাইতেন এবং এক মুহূর্ত্তও নিষ্কর্ম্মা বসিয়া থাকিতেন না; এজন্য তাঁহার ধীরতা হেতু কোন কর্ত্তব্য কার্য্য অকৃত থাকিত না। তিনি বাল্যকালে বিলাসী ছিলেন, যৌবনে বিদ্যাভূষণের পরামর্শে তাহা সম্পূর্ণ ত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার কখন কোন ব্যারাম হয় নাই। তিনি কখন কোন কষ্টে বা বিপদে পড়েন নাই। তিনি অতি শান্ত ও দয়ালু ছিলেন। কাহারও কোন দুঃখের সংবাদ পাইলেই তিনি তাহা মোচন জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন। তিনি জিতেন্দ্রিয় ছিলেন এবং একমাত্র বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার কোন উপপত্নী ছিল না। তিনি কাহাকেও নিন্দা করিতেন না কিংবা কটুবাক্য বলিতেন না। তিনি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত লইয়া শাস্ত্রালোচনা করিতে ভাল বাসিতেন এবং পণ্ডিতদিগকে প্রচুর দান করিতেন। কৃষকদের প্রতি তাঁহার প্রচুর অনুগ্রহ ছিল। সেই সময়ে যুদ্ধবীরদিগের সর্ব্বত্র সম্মান ও সমাদর ছিল। কিন্তু অনুপ তাহাদিগকে কিছুমাত্র আদর করিতেন না। শিল্পী ও বণিক্‌দের প্রতিও অনুপের আদর ছিল না। তিনি নর্ত্তক, গায়ক, ভাঁড়, বাজীকরদিগকেও ঘৃণা করিতেন। পণ্ডিতেরা তাঁহাকে "অনুপম নারায়ণ" বলিয়া প্রশংসা করিতেন। সিপাহীরা তাঁহাকে "না-মরদ" অর্থাৎ কাপুরুষ বলিত।

অনুপনারায়ণ পরম সুখে ৬৪ বৎসর কাল রাজ্যভোগ করেন। তাঁহার রাজত্বকাল মধ্যেই নাশের শাহের মৃত্যু হয়। নাশের শাহ প্রায় ৩২ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। তৎপরে তাঁহার পুত্র বারবক গৌড় সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। তিনিই প্রথম ভারতবর্ষে আবিসিনীয় ও কাফ্রি দাসগণকে রাজকার্য্যে নিযুক্ত করেন। এই সময়েই প্রসিদ্ধ কালাপাহাড়ের দৌরাত্ম্য হইয়াছিল। কালাপাহাড়ের প্রকৃত নাম কালাচাঁদ রায়। বাল্যকালে তাঁহার মাতা তাঁহাকে "রাজু" বলিয়া ডাকিতেন। তিনি জগদানন্দ রায়ের বংশজাত একটাকিয়ার ভাদুড়ী। বর্ত্তমান জেলা রাজসাহী, থানা মান্দা, * বীরজাওন গ্রামে তাঁহার বাড়ী ছিল। তাঁহার পিতা নয়ানচাঁদ রায় ঐ গ্রাম ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থানের ভূঁইয়া ছিলেন এবং গৌড় বাদশাহের অধীনে ফৌজদারী কর্ম্ম করিতেন। তাঁহার রাজা উপাধি না থাকিলেও তিনি বিলক্ষণ সঙ্গতিপন্ন লোক ছিলেন।

* থানা মান্দা পূর্ব্বে দিনাজপুর জেলার সামিল ছিল।

নয়ানচাঁদের অল্প বয়সেই মৃত্যু হয়। কালাচাঁদ তখন নিতান্ত শিশু ছিলেন। তিনিই পিতা মাতার একমাত্র সন্তান। তাঁহার মাতামহ তাঁহার অভিভাবক ছিলেন। কালাচাঁদের পিতৃকুল শাক্ত এবং মাতামহ পরম বৈষ্ণব ছিলেন। মাতামহের শিক্ষাগুণে কালাচাঁদ হরিভক্ত হইয়াছিলেন। কালাচাঁদ অতিশয় বুদ্ধিমান্, মেধাবী, বলবান্, দীর্ঘকায় ও গৌরবর্ণ অতীব সুন্দর পুরুষ ছিলেন। তৎকালীয় একটাকিয়ারা যেরূপ শিক্ষা পাইতেন, কালাচাঁদ তাহা সমস্তই পাইয়াছিলেন। তিনি বাঙ্গালা ও পারসী ভাষায় সুবিজ্ঞ ছিলেন। তিনি সংস্কৃত জানিতেন না বটে, কিন্তু বহুসংখ্যক সংস্কৃত শ্লোক মুখস্থ করিয়াছিলেন। বিষ্ণুপূজা এবং সাধারণ প্রয়োজনীয় মন্ত্রাদিও তিনি জানিতেন এবং পঞ্জিকা দেখিয়া শুভাশুভ দিন ঠিক করিতে পারিতেন। তিনি শস্ত্রচালনায় এবং অশ্বারোহণেও পটু ছিলেন। তিনি শ্রীপুর গ্রামনিবাসী রাধামোহন লাহিড়ীর দুই কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

বিবাহের দুই বৎসর পর তিনি তৎকালীন গৌড় বাদশাহের নিকট চাকরী প্রার্থনা করিলেন। সম্রাট্ তাঁহার বিদ্যা, বুদ্ধি, সৌন্দর্য্য এবং আভিজাত্য দেখিয়া তাঁহাকে গৌড় নগরের ফৌজদার নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কালাচাঁদ গৌড় নগরে সম্রাটের বাড়ীর নিকটেই বাসা করিলেন। সুন্দরী রমণী হরণ করা মুসলমান বড়মানুষের প্রধান কলঙ্ক ছিল। এজন্য যে গ্রামে বা নগরে মুসলমান রাজপুরুষ বা জমি[illegible] করিত, তথায় [illegible]
ভদ্রলোক পরিবার

করিতেন। ধুতীর উপর চাপকান চোগা এবং মাথায় পাগড়ী লাগাইয়া হিন্দুরা কাচারীতে যাইত। মুসলমানেরা ধুতীর স্থলে ইজার পরিত। কালাচাঁদ যে পথে মহানন্দায় যাইতেন, তাহা সম্রাটের বাড়ীর পশ্চাদ্‌ভাগের অতি নিকট-বর্ত্তী ছিল।

বাদশাহের কন্যা দুলারী বিবি অতীব সুন্দরী ছিলেন। তাঁহার বয়স সতর বৎসর হইয়াছিল, কিন্তু সুপাত্র অভাবে তখনও বিবাহ হয় নাই। তিনি একদিন অট্টালিকার ছাদে দাসীগণ সহ বিচরণ করিতেছিলেন, এমন সময় কালাচাঁদ মহানন্দায় স্নান ও তর্পণ করিয়া স্তব পাঠ করিতে করিতে বাসায় যাইতেছিলেন। ছত্রধর তাঁহার মাথায় ছত্র ধরিয়া যাইতেছিল। দুলারী তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন। তাদৃশ সুন্দর পুরুষ তিনি আর কখন দেখেন নাই। কুমারী অমনি বিমোহিত চিত্তে সেই সুন্দর যুবককে আত্মসমর্পণ করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন। দাসীগণ কহিল, "এই ব্যক্তির কোন পরিচয় না জানিয়া ঈদৃশ প্রতিজ্ঞা করা অনুচিত।" দুলারী কহিলেন, "পরিচয় আমি যাহা পাইলাম তাহাই যথেষ্ট, উহার গলায় পৈতা দেখিয়া জানিলাম যে নীচজাতীয় নহে। উহার ছাতা বরদার এবং হাতে সোণার কোবা দেখিয়া বুঝিলাম যে, সে ধনী লোক। তাহার মন্ত্র পাঠ শুনিয়া আমি বুঝিলাম যে, সে মুর্খ লোক নহে। তাহার শরীর দেখিয়াই জানিলাম যে, সে পরম সুন্দর বলবান্ নবযুবক। আর বেশী পরিচয় নিষ্প্রয়োজন।"

...গণ সেই বৃত্তান্ত বেগ... ...ট বলিল। বেগম পর দিন প্রত্যুষে ছাদ-

...তাঁহাদের জাতি কুল

হইল। দুলারী সেই সংবাদে উন্মত্তার ন্যায় হইয়া খিড়্কী দ্বার দিয়া রাজবাড়ী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে গিয়া কালাচাঁদকে জড়াইয়া ধরিলেন এবং ঘাতুকদিগকে বলিলেন, "আমাকে হত্যা না করিয়া কেহ ইঁহাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না।" জল্লাদেরা হতবুদ্ধি হইয়া বাদশাহের নিকট সংবাদ দিল। বাদশাহ কিংকর্ত্তব্য চিন্তা করিতে করিতে দুলারীর নিকট চলিলেন। এদিকে কালাচাঁদ সেই সম্রাট্‌কুমারীর অদ্ভুত প্রেম, তাঁহার সৌন্দর্য্য ও নবযৌবন দৃষ্টে বিমোহিত হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করিতে সম্মত হইলেন। সম্রাট্ কালাচাঁদকে সম্মত দেখিয়া হৃষ্ট হইলেন এবং সেই দিনই বিবাহ দিলেন। সেই বিবাহ কি প্রণালীতে হইয়াছিল, তাহা জানা যায় না; কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে, কালাচাঁদ তখনও মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করেন নাই।

এই বিবাহ হেতু কালাচাঁদ সমাজচ্যুত হইলেন। তাঁহার মাতা তাঁহাকে নানারূপ তিরস্কার করিলেন এবং তাঁহার প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা লইলেন। তৎকালীন হিন্দু সমাজ যেন আত্মবিনাশের জন্য ব্যাকুল ছিল। তখন অতি সামান্য কার্য্যে বা কথাতেই হিন্দুদের জাতিপাত হইত এবং সহস্র প্রায়শ্চিত্ত করিয়াও পতিত ব্যক্তি সমাজে উঠিতে পারিত না। তখন সেই ব্যক্তি অগত্যা মুসলমান হইত এবং যথাসাধ্য হিন্দুদের অনিষ্ট করিত। কালাচাঁদের জীবনবৃত্তান্ত তাহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ। কালাচাঁদ যে অবস্থায় দুলারীকে বিবাহ করিয়াছিলেন, তাদৃশ অবস্থায় ঐ কার্য্য কোন মতেই দূষ্য নহে। অতি সামান্য প্রায়শ্চিত্ত করিলেই তাঁহাকে সমাজে গ্রহণ করা উচিত ছিল। কিন্তু হিন্দু সমাজ অতি অন্যায়রূপে ধর্ম্মনিষ্ঠ কালাচাঁদকে হিন্দু সমাজ হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিল। কালাচাঁদও তাহার জন্য চূড়ান্ত প্রতিফল দিয়াছিলেন। মাতার উপদেশ মত কালাচাঁদ প্রায়শ্চিত্ত করিলেন, তথাপি সমাজে একঘরিয়া হইয়া থাকিলেন। অবশেষে তিনি জগন্নাথক্ষেত্রে গিয়া ধন্না দিলেন। সপ্তাহ কাল অনাহারে ধন্না দিয়া থাকিলেন, তথাপি তাঁহার প্রতি ভগবানের কোন প্রত্যাদেশ হইল না, অধিকন্তু পাণ্ডারা তাঁহার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে অপমান করিয়া শ্রীমন্দির হইতে বাহির করিয়া দিল। তখন কালাচাঁদ ক্রোধে অধির হইয়া মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন এবং হিন্দু ধর্ম্ম একবারে বিলোপ করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন। তিনি মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে তাঁহার নাম মহম্মদ ফর্ম্মুলি হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার অত্যাচরা

হেতু হিন্দুরা তাঁহাকে "কালাপাহাড়" বলিত। সেই নামই সর্ব্বত্র বিখ্যাত; তাঁহার অন্য কোন নামই বিখ্যাত নহে।

কালাপাহাড় উড়িষ্যা হইতে ফিরিয়া আসিয়াই শ্বশুরকে উৎকল বিজয়ের জন্য অনুরোধ করিলেন। বাদশাহ সাগ্রহে সম্মত হইয়া নিজের সমস্ত সেনা জামাতার অধীনে উড়িষ্যায় পাঠাইলেন। উড়িষ্যা তখন একটি পরাক্রান্ত হিন্দুরাজ্য ছিল। ভাগীরথীতীর হইতে গোদাবরী পর্য্যন্ত এই রাজ্য বিস্তৃত ছিল। মুসলমানেরা বারংবার উড়িষ্যা আক্রমণ করিয়া পরাজিত হইয়াছিল। কিন্তু কালাপাহাড়ের বিক্রমে উৎকলপতি পরাজিত ও নিহত হইলেন। উড়িষ্যা মুসলমানদিগের অধীন এবং বাঙ্গালাদেশের অংশ হইল। তিনি উড়িষ্যায়, বিশেষতঃ শ্রীক্ষেত্রে যেরূপ্ অত্যাচার করিয়াছিলেন, তাহা বর্ণনা করা অসাধ্য।

তিনি উড়িষ্যা হইতে গৌড়ে প্রত্যাগমনকালে রাঢ় দেশেও ঘোরতর অত্যাচার করিয়াছিলেন। তিনি যাবতীয় দেবমূর্ত্তি চূর্ণ করিয়া বিষ্ঠায় ফেলিতেন। তিনি কতকগুলি শালগ্রাম শিলা সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন প্রত্যহ তাহাদের উপর প্রস্রাব করিতেন। গৌড়ের নিকটবর্ত্তী বরেন্দ্রভূমিতে ও মিথিলাতেও তাঁহার ঐরূপ অত্যাচার হইয়াছিল। তিনি লক্ষ লক্ষ হিন্দুকে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণে বাধ্য করিয়াছিলেন। যে ব্যক্তি যতক্ষণ মুসলমান না হইত, ততক্ষণ তিনি তাহার উপর অকথ্য নিষ্ঠুর ভাবে উৎপীড়ন করিতেন। সেই উৎপীড়নে বহু লোকের জীবন শেষ হইত। এক কালাপাহাড় কর্ত্তৃক হিন্দুদের যত অনিষ্ট হইয়াছে, অন্য সমস্ত মুসলমানের অত্যাচার একত্র করিলেও তত হইবে না।

ইহার পর কালাপাহাড় ভাদুড়িয়া ও সাঁতোড়ে হিন্দু ধর্ম্ম বিনাশার্থ চলিলেন। ভাদুড়িয়ার রাজা কালাচাঁদের জননী ও পত্নীদ্বয়কে নিজ বাড়ীতে আনাইয়া রাখিলেন। কালাপাহাড় সেই সংবাদ জানিতে পারিয়া আর পূর্ব্বদিকে গেলেন না। তদ্দ্বারা ভাদুড়িয়া, সাঁতোড়, পূর্ব্ববঙ্গ এবং বকদ্বীপের পূর্ব্বাংশ কালাপাহাড়ের অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইল।

তৃতীয় উদ্যমে কালাপাহাড় কামরূপ ও আসাম দেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন। পথিমধ্যে তিনি দিনাজপুর (দিনরাজপুর), রঙ্গপুর ও কোচবেহারের কতক অংশে ঘোর অত্যাচার করিয়া বহুলোককে মুসলমান করিয়াছিলেন। হিন্দুদের প্রতি তাঁহার অসহনীয় উৎপীড়ন দর্শনে মুসলমানদের মনেও দয়া

হইত। অনেক হিন্দুকে মুসলমানেরা গোপন করিয়া কালাপাহাড়ের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিয়াছিল।

আসাম দেশ উড়িষ্যার ন্যায় একটি স্বাধীন পরাক্রান্ত হিন্দুরাজ্য ছিল। মুসলমানেরা বারংবার চেষ্টা করিয়াও এই দেশ জয় করিতে পারে নাই। কিন্তু কালাপাহাড় কামরূপ ও আসামের পশ্চিমভাগ অধিকার করিয়া অত্যাচারের একশেষ করিয়াছিলেন। আসাম দেশ জঙ্গলময় এবং অতীব দুর্গম ছিল। কালাপাহাড় আসামের পূর্ব্বভাগে যান নাই। আসামরাজ সেই দিকে প্রচ্ছন্ন ছিলেন। কালাপাহাড় বাঙ্গালায় প্রত্যাগমন করিলেই আসামীরা মুসলমানদিগকে সমস্ত আসাম হইতে তাড়াইয়া স্বদেশ উদ্ধার করিল। কিন্তু কামরূপে কালাপাহাড় যেরূপ নিষ্ঠুর অত্যাচার করিয়াছিলেন, তাহা তথাকার লোকে এখনও ভুলিতে পারে নাই।

এই সময়ে বেলোল লোদী দিল্লীর সম্রাট্ ছিলেন এবং বার্বাক শাহ জৌনপুরের সম্রাট্ ছিলেন। সমস্ত অযোধ্যা, প্রয়াগ ও কাশী জৌনপুরের অধীন ছিল। জৌনপুরের সম্রাট্ দিল্লীপতির প্রায় তুল্যকক্ষ ছিলেন। উভয় সম্রাটের মধ্যে চব্বিশ বৎসর যাবৎ ঘোরতর যুদ্ধ চলিতেছিল। কেহই অপরকে নিরস্ত করিতে পারিতেছিলেন না। বার্বাক শাহ কালাপাহাড়ের অতুল বিক্রম শুনিয়া তাঁহাকে নিজ সেনাপতি হইতে নিমন্ত্রণ করিলেন। কালাপাহাড়কে মাতৃভক্ত জানিয়া তিনি তাঁহাকে ভাগিনেয় বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন। আর কালাপাহাড়কে পাঠাইবার জন্য তিনি গৌড় বাদশাহকেও অনুরোধপত্র পাঠাইয়াছিলেন। সেই নিমন্ত্রণ স্বীকার করিয়া কালাপাহাড় অল্প মাত্র যোদ্ধা সহ নৌকাপথে জৌনপুর চলিলেন। কাশী, গয়া, অযোধ্যা, প্রয়াগ ও বৃন্দাবনে হিন্দুধর্ম্ম লোপ করা তাঁহার এই নিমন্ত্রণ স্বীকারের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।

এ দিকে বেলোল লোদী সেই সংবাদ পাইয়া অতিশয় ব্যস্ত হইলেন এবং কালাপাহাড় যাহাতে জৌনপুরে না যাইতে পারে, তাহার উপায় করিতে চেষ্টা করিলেন। মীর আবুল হোসেন নামক একজন অতি চতুর সৈয়দ বেলোলের মন্ত্রী ছিলেন। দিল্লীপতি তাঁহাকে এক সহস্র অশ্বারোহী সহ কালাপাহাড়কে বাধা দিতে পাঠাইলেন এবং আদেশ দিলেন যে, "কালাপাহাড়কে ধৃত করিয়া আনিতে হইবে, নতুবা বিনাশ করিতে হইবে; যেন সে কোন মতে জৌনপুরে

না যাইতে পারে, তাহাই করিতে হইবে।" মন্ত্রিবর সসৈন্যে গিয়া বক্সারের নিকট কালাপাহাড়ের নৌকা দেখিতে পাইলেন। চতুর সৈয়দ কালাপাহাড়কে নৌকায় গিয়া আপনাকে বার্বাক শাহের অনুচর প্রকাশে বিনীত ভাবে কহিলেন, "হুজুরের জলপথে যাইতে দীর্ঘকাল লাগিবে। ওদিকে বার্বাক শাহ নিতান্ত বিপদে পড়িয়াছেন। আমাদের অনুরোধ যে, আপনি অশ্বারোহণে শীঘ্র চলুন। আপনার অনুচরগণ ধীরে ধীরে নৌকাপথে যাউক। আপনার সেবার জন্য এক সহস্র লোক আসিয়াছে। পথিমধ্যে আপনার কোন বিষয়ে কোন কষ্ট হইবে না। আপনি যখন যাহা চাহিবেন, আমরা তখনই তাহা যোটাইয়া দিব।" বার্বাক শাহের কয়েকজন লোকও কালাপাহাড়ের নৌকায় ছিল। তাহারা কিংবা কালাপাহাড় নিজে সৈয়দের চাতুরী বুঝিতে পারিলেন না। কালাপাহাড় আটজন লোক মাত্র লইয়া অশ্বারোহণ করিলেন। রাত্রিকালে অশ্বারোহিগণ সরাই মধ্যে কালাপাহাড়কে আক্রমণ করিয়া বন্দী করিল এবং তাঁহার সঙ্গী আটজনকে হত্যা করিল।

কালাপাহাড় বন্দীভাবে দিল্লীতে আনীত হইলে, দিল্লীশ্বর তাঁহাকে অতি সম্মানপূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন। তিনি তাঁহার বন্ধন মুক্ত করিয়া নিজ সিংহাসনের পার্শ্বে বসাইলেন এবং তাঁহাকে পিতা বলিয়া সম্বোধন করিলেন। কিছুদিন পরে নিজ কন্যার সহ কালাপাহাড়ের বিবাহ দিলেন। এইরূপে দুই বৎসরে কালাপাহাড়কে সম্পূর্ণ বশীভূত করিলেন। তাহার পর কালাপাহাড়কে সেনাপতি করিয়া বেলোল জৌনপুর আক্রমণে চলিলেন। কালাপাহাড় বিপক্ষে আসিয়াছেন শুনিয়াই জৌনপুরী সেনার সাহস ভঙ্গ হইল। এবারে বার্বাক শাহ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত ও নিহত হইলেন। সমস্ত জৌনপুর সাম্রাজ্য দিল্লীর সম্রাটের অধীন হইল। কালাপাহাড়ের বীরত্ব সমস্ত ভারতবর্ষে বিঘোষিত হইল এবং সর্ব্বত্র হিন্দুদিগের হৃৎকম্প উপস্থিত হইল।

জৌনপুর রাজ্য মধ্যে বহুসংখ্যক তীর্থস্থান ছিল, তন্মধ্যে কাশীধাম সর্ব্বপ্রধান। এজন্য কালাপাহাড় সর্ব্বাগ্রে কাশীধামে হিন্দুধর্ম্ম লোপের প্রয়াসী হইলেন। বলা বাহুল্য যে তিনি শ্রীক্ষেত্রে ও কামরূপে যেরূপ অত্যাচার করিয়াছিলেন, কাশীতেও তাহাই করিতে লাগিলেন।

কালাপাহাড়ের এক মাতুলানী কাশীধামে ছিলেন। কালাপাহাড় তাহা

জানিতেন না। অত্যাচার উপলক্ষে একজন যবন তাঁহাকে বলাৎকার করিল। তিনি রোদন করিতে করিতে কালাপাহাড়ের নিকট গিয়া আত্মপরিচয় দিয়া বহু তিরস্কার করিলেন এবং সেই খানেই আত্মহত্যা করিলেন। কালাপাহাড় তদ্দর্শনে স্তম্ভিত হইয়া অমনি অত্যাচার ক্ষান্তি জন্য আদেশ দিলেন। কালাপাহাড়ের অসাধারণ তেজস্বিতা ছিল। তাঁহার আদেশ মাত্র অত্যাচার শান্তি হইল। তাহাতেই কেদারেশ্বর শিবলিঙ্গ রক্ষা পাইল। কাশীধামে কেবল কেদারেশ্বরই একমাত্র অনাদিলিঙ্গ এখন পর্য্যন্ত বর্ত্তমান আছে। আর সমস্ত লিঙ্গ ও বিগ্রহই কালাপাহাড়ের পরে স্থাপিত।

সেই দিবস রাত্রিতে কালাপাহাড় সুরক্ষিত গৃহে শয়ন করিয়াছিলেন, কিন্তু পরদিন আর তাঁহাকে দেখা গেল না। তদবধি আর তাঁহার কোন অনুসন্ধান পাওয়া যায় নাই। তাঁহার অনুদ্দেশ হইবার কারণ কি, তৎসম্বন্ধে নানাপ্রকার বিভিন্ন প্রবাদ জনসমাজে প্রচলিত আছে। কেহ বলে, তিনি মনের অনুতাপে সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন। কেহ বলে, তিনি গোপনে গঙ্গায় ডুবিয়া মরিয়াছিলেন। মতান্তরে কেহ বলে, কাশীর পাণ্ডারা তাঁহাকে অচেতন অবস্থায় হরণ করিয়া গোপনে হত্যা করিয়া মাটিতে শব পুতিয়া ফেলিয়াছিল। অন্যে বলে, বেলোল লোদী তাঁহার বিক্রম দর্শনে ভীত হইয়া গুপ্তভাবে তাঁহাকে হত্যা করিয়াছিলেন। আবার কেহ বলে যে, তিনি মহাদেবের অংশ ছিলেন এবং বিশ্বেশ্বরে লীন হইয়াছিলেন। এই সকল প্রবাদের স্থির মীমাংসা করা এক্ষণে অসম্ভব। সার কথা যে, কাশীতে অত্যাচারের তৃতীয় দিবস রাত্রিতে তিনি অনুদ্দেশ হইয়াছিলেন। তিনি একাদশ বৎসর হিন্দুধর্ম্মনাশে ব্রতী ছিলেন। বেলোল লোদীর কন্যার গর্ভে ফতেমা নামে তাঁহার এক কন্যা হইয়াছিল। সেই কন্যাই তাঁহার একমাত্র সন্তান।

কালাপাহাড় নিজ সমকালে অদ্বিতীয় বীর ছিলেন, ইহা হিন্দু মুসলমান সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। অথচ তিনি অমিশ্রিত বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের সন্তান এবং বাঙ্গালা দেশেই শিক্ষিত ও বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন। বীরত্ব জাতিবিশেষের বা দেশবিশেষের জন্য নির্দ্দিষ্ট শক্তি নহে। সর্ব্বপ্রকার শক্তিই কেবল শিক্ষা ও অভ্যাস হইতে উৎপন্ন হয় এবং সুযোগ দ্বারা পরিস্ফুট হয়। জুলিয়স সিজর, তৈমুরলঙ্গ এবং হজরৎ মহম্মদের বাল্যকালে বীরত্বের কিছু মাত্র

আভাস ছিল না। কিন্তু তাঁহারা শেষে বিবিধ ঘটনার সুযোগে মহাবীর হইয়া উঠিয়াছিলেন। কালাপাহাড়, নাদির শাহ এবং নেপোলিয়ন বোনাপার্টির বাল্যাবধি কিছু কিছু বীরত্বের লক্ষণ ছিল বটে, কিন্তু ঘটনাস্রোতেই সেই শক্তি পরিস্ফুট হইয়াছিল। পৃথিবীতে বহুসহস্র লোক ইহাঁদের অপেক্ষাও সমধিক ক্ষমতাশালী ছিল; কিন্তু সুযোগ অভাবে তাহাদের সেই ক্ষমতা প্রকাশিত হয় নাই। যদি দুলারী বিবি কালাচাঁদের রূপে বিমুগ্ধ না হইতেন, তবে কালাচাঁদ অপ্রসিদ্ধ ভাবেই বোধ হয় ইহলোক পরিত্যাগ করিতেন। পৃথিবীতে যিনি যখন মান্য গণ্য বড় লোক হইয়াছেন, তখনই দেখা যায় যে, তাঁহার ভাগ্য-ক্রমে এমন সমস্ত ঘটনাবলী উপস্থিত হইয়াছিল, যাহার সঙ্কর্ষণে তিনি উচ্চ পদে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। তদ্দ্বারাই তাঁহার সুখ্যাতি বা কুখ্যাতি চিরপ্রসিদ্ধ হইয়াছিল। একটাকিয়া ভাদুড়ী বংশের প্রধান খ্যাতি এই যে, উদয়নাচার্য্যের তুল্য পণ্ডিত, গণেশের তুল্য রাজা, কালাপাহাড়ের তুল্য বীর এবং মধুখাঁর তুল্য বিষয়বোদ্ধা লোক বাঙ্গালা দেশে আর কোন বংশে কেহ হয় নাই। আমাদের বিবেচনা হয় যে, তাঁহারা যেরূপ সুযোগ পাইয়াছিলেন, সেইরূপ সুযোগ পাইলে আরও অনেক লোক তদ্রূপ বা তদধিক বিখ্যাত বড় লোক হইতে পারিত। খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করিতে নিজের ক্ষমতা আবশ্যক বটে, কিন্তু সেই ক্ষমতা সুযোগ ব্যতীত প্রকাশ হয় না। অতএব সুযোগই প্রসিদ্ধির প্রধান কারণ, সন্দেহ নাই।

তারিখ-ই-খাঁজেহান লোদী, তারিখ-ই-শেরশাহী প্রভৃতি পারসী ইতিহাস এবং রাজসাহী অঞ্চলের কিম্বদন্তী অবলম্বনে কালাপাহাড়ের জীবনচরিত লেখা হইল। তারিখ-ই-শেরশাহী মতে কালাপাহাড় বিলোল লোদীর নিকট অযোধ্যা জাগীর পান। ইতিহাস প্রসিদ্ধ কালাপাহাড়ের পরবর্ত্তী কালে যে কোন হিন্দু বড়লোক হিন্দুধর্ম্মের প্রতি অত্যাচার করিত তাহাকেই লোকে কালাপাহাড় বলিত। এখনও যে সকল জমিদার অনেক দেবত্র ব্রহ্মত্র জব্দ করে, তাহাকে লোকে কালাপাহাড় বলে।

অনুপনারায়ণের সময়ে বাঙ্গালা ভাষার বিশেষ উন্নতি সাধন হয়। অনুপের রাজত্বের পূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষার রচনা কদাচিৎ দৃষ্ট হয়, তখন কেবল সংস্কৃত ভাষার ও পারসী ভাষার বিশেষ আলোচনা হইত, বঙ্গভাষায় পুস্তকাদি লেখা

রাখালী চাকরীতে নিযুক্ত হইয়া, তিন বৎসর মধ্যে তাহার স্বামী হইয়াছিলেন। যখন মুসলমানেরা নানা দেশ জয় করিয়া ধনবান্ হইল, নানা দেশের বিদ্যা শিক্ষা করিয়া অনেক লোক বিদ্বান্ হইল, তখন তাহাদের মধ্যে অনেকে বংশানুক্রমে বড়লোক হইল। অমনি তাহাদের কুলাভিমান উৎপন্ন হইল। কন্যার যাবজ্জীবন বিবাহ না হইলেও আমীর ও সৈয়দগণ নীচ কুলে তাহাদের বিবাহ দিত না। কিন্তু পুরুষের বিবাহে তদ্রূপ বিচার ছিল না। বেশ্যা কিংবা মেথরাণীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে তাহারা কিছুমাত্র লজ্জা বোধ করিত না।

সৈয়দ হোসেন শাহের পূর্ব্বপুরুষ সুবুদ্ধি খাঁর চাকর ছিলেন।* মধুখাঁর কর্ত্তৃত্বসময়ে সৈয়দ আলি গৌড়বাদশাহের ফৌজদারী কর্ম্ম পাইয়াছিলেন। তৎপুত্র সৈয়দ হোসেন হাব্‌সী বাদশাহের সেনাপতি হইয়াছিলেন। তিনি বিদ্রোহদমনের ব্যপদেশে সৈন্য লইয়া গিয়া বিদ্রোহীদের সহ মিলিত হইয়াছিলেন। সাঁতোড় ও ভাতুড়িয়ার রাজারাও সৈয়দ হোসেনের সাহায্য করিতে লাগিলেন। এইরূপে প্রবল হইয়া সৈয়দ হোসেন হাব্‌সীদিগকে পরাজয় করিয়া গৌড়ে বাদশাহ হইলেন। তিনি বহুসংখ্যক হাব্‌সীর প্রাণবধ করিলেন। অবশিষ্টেরা দাক্ষিণাত্যে পলায়ন করিল। হাব্‌সী রাজত্বে যে সমস্ত হিন্দু ও মুসলমান জমিদার বিদ্রোহী হইয়াছিল, তাহারা সহজেই সৈয়দের বশ্যতা স্বীকার করিল।

সৈয়দ হোসেন অতি উগ্রস্বভাব এবং স্বেচ্ছাচারী ছিলেন। কিন্তু বুদ্ধিমান, সদাশয় ও কার্য্যদক্ষ লোক ছিলেন। পাঠান-রাজত্বে কোন শৃঙ্খলা ছিল না। রাজধানী হইতে দূরবর্ত্তী স্থানে যে যাহা করুক, নবাব ও গৌড়বাদশাহগণ

---

* হোসেন শাহের জন্মভূমি সম্বন্ধে বিভিন্ন মত দৃষ্ট হয়। ডাক্তার বুকনান্ কৃত রঙ্গপুরের বিবরণ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, হোসেন শাহ রঙ্গপুরের বোদা বিভাগের দেবনগরে জন্মগ্রহণ করেন। ঐতিহাসিক গোলাম হোসেন বলেন, "হোসেন শাহের জন্মভূমি মক্কা অথবা তেরমুজ, তথা হইতে ঘটনাক্রমে বঙ্গদেশে আগমন করিয়া রাঢ় ভূমির অন্তঃর্গত চাঁদপুর গ্রামে বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন।" চাঁদপুর মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গীপুর উপবিভাগে। মুর্শিদাবাদ জেলায় এখন ও জনপ্রবাদ প্রচলিত আছে যে, হোসেন শাহ বাল্যকালে চাঁদপুরের এক ব্রাহ্মণ গৃহস্থের রাখাল ছিলেন। কিন্তু সৈয়দ বংশীয়েরা রাখালী করা অতি মানহানিকর কার্য্য মনে করিতেন। হইতে পারে, হোসেন শাহ নামে অন্য কোন লোক ছিল এবং নামের ঐক্য থাকাতে এইরূপ গোলযোগ হইয়াছে।

তদ্বিষয়ে কোনই তদন্ত করিতেন না। দূরবর্ত্তী জমিদারেরা রাজস্ব দিলেই নবাব ও গৌড়বাদশাহগণ তৃপ্ত থাকিতেন। তাঁহাদের দোষ গুণের ফলাফল কেবল নিকটবর্ত্তী স্থানেই অনুভূত হইত। মধু খাঁর শাসন সময়ে তিনি সমস্ত সাম্রাজ্য সুশাসনের জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং কিয়ৎ পরিমাণে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। সেই সকল নিয়মাবলী সৈয়দ হোসেন কার্য্যে পরিণত করিলেন। তিনি সমস্ত জমিদারগণের নিকট কবুলীয়ৎ লইয়া তাহাদিগকে পাট্টা দিয়াছিলেন। সেই সকল পাট্টায় তাহাদের কি কি কর্ত্তব্য তাহা লেখা থাকিত। অধিকন্তু তিনি সর্ব্বদা অনুসন্ধান রাখিতেন এবং জমিদারগণকে নিজ হুকুম মত কার্য্য করিতে বাধ্য করিতেন। মদ খাওয়া এবং জুয়া খেলা তাঁহার রাজত্বে সম্পূর্ণ তিরোহিত হইয়াছিল। চোর ডাকাইত এবং ঠগগণ তাঁহার ভয়ে সর্ব্বদা শঙ্কিত থাকিত। লোকে বলে, তাঁহার ভয়ে বাঘে ছাগে একঘাটে জল খাইত অথচ কেহ কাহারও মুখের প্রতি দৃষ্টি করিতে সাহস পাইত না। তিনি আপনাকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলিয়া জ্ঞান করিতেন। তিনি প্রজা ও ভৃত্যদিগকে বাধ্য করিয়া প্রণাম গ্রহণ করিতেন। তিনি কাহারও কথার বাধ্য ছিলেন না। তজ্জন্য তাঁহার কর্ম্মচারীদের কোন প্রাধান্য ছিল না ; কাজেই তাহাদিগকে কেহ প্রচুর উৎকোচ দিত না। তাঁহার আহার ও পরিচ্ছদ অতি সামান্য ছিল। তিনি নৃত্য, গীত, বাদ্য, চাটুকারী, তামাসা ভালবাসিতেন না। তিনি গোঁড়া মুসলমান ছিলেন। তিনি হিন্দুদের প্রতি বিশেষ কোন অত্যাচার করেন নাই। তাঁহার সময়ে অনেক হিন্দুও প্রধান প্রধান রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। পুরন্দর খাঁ তাঁহার প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। বৈষ্ণবাচার্য্য সনাতন ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রূপ গোস্বামী বিশিষ্ট রাজকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। হোসেন শাহ জেলায় জেলায় শাসন কার্য্য নির্ব্বাহ জন্য উপযুক্ত কর্ম্মচারী প্রেরণ করিতেন। পূর্ব্ববর্ত্তী বাদশাহগণের রাজত্ব সময়ে যে সকল বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইত, তাঁহার এই সুব্যবস্থায় তাহা বিদূরিত হয়, এবং সকলেই শান্তিতে কালযাপন করে। তিনি বহুসংখ্যক মস্‌জীদ, পান্থনিবাস (সরাই) ও শড়ক প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। তিনি পারসী ও আরবী ভাষা শিক্ষার জন্য বহু বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি অতি সহজেই ক্রুদ্ধ হইতেন এবং ক্ষুদ্র অপরাধে কঠিন দণ্ড করিতেন। তাঁহার স্ত্রীপুত্রও তাঁহার নিকট কথা বলিতে ভয় পাইত। ফলতঃ যে সকল লোক তাঁহার

নিকটস্থ ছিল তাহারা তাঁহাকে ভালবাসিত না। অথচ দূরস্থ প্রজা ও ভৃত্যগণ তাঁহার গুণ গান করিত। তাঁহার সময়ে বার জন প্রধান জমিদার বাঙ্গলা দেশে ছিল। তাহাদিগকে বারভুঁইয়া বলিত। সেই বারভুঁইয়ারা পুর্ব্বে প্রায় স্বাধীন ছিল। সৈয়দ হোসেন তাহাদের ক্ষমতা সঙ্কুচিত করিয়া তাহাদিগকে সম্পূর্ণ আজ্ঞাকারী করিয়াছিলেন। কিন্তু বোধ হয় চন্দ্রদ্বীপের রাজাকে তত দূর আয়ত্ত করিতে পারেন নাই।

সৈয়দ হোসেন শাহের চারি পত্নীর গর্ভজাত বহু কন্যা হইয়াছিল। তন্মধ্যে দুইটি কন্যার বয়স বিংশতি বৎসরের অধিক হইয়াছিল, অথচ সমকক্ষ পাত্র না পাওয়ায় তাহাদের বিবাহ দিতে না পারিয়া তিনি চিন্তিত ছিলেন। জাগীর-দারেরা প্রতিবৎসর নিতান্ত পক্ষে একবার বাদশাহের নিকট গিয়া তাঁহাকে বন্দনা করিতে বাধ্য ছিলেন। সেই নিয়মানুসারে একটাকিয়ার রাজা মদন খাঁ নিজের দুই পুত্র কন্দর্প ও কামদেব খাঁকে সঙ্গে লইয়া বাদশাহের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। সম্রাট্ দেখিলেন, মদনের পুত্রদ্বয় অতি সুন্দর, বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্ এবং যুবা পুরুষ। তাহারা কুলীন ব্রাহ্মণ এবং রাজপুত্র সুতরাং সর্ব্বাংশেই তাঁহার কন্যার যোগ্যপাত্র। তিনি অমনি মদনকে সপুত্রক আটক করিয়া বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। মদন অতি বিনীতভাবে কহিলেন, "ধর্ম্মাবতার! আপনি আমাদের রাজা এবং রক্ষক, আমি আপনকার একান্ত অনুগত এবং হিতার্থী ভৃত্য। আমার প্রতি অত্যাচার করা হুজুরের পদবীর অযোগ্য।" বাদশাহ চতুরতা পূর্ব্বক কহিলেন, "খাঁ সাহেব! আমি একটাকিয়ার রাজবংশীয়দিগকে অতিশয় ভালবাসি এবং মান্য করি। তোমরা যেমন হিন্দুর গুরু ব্রাহ্মণ, আমরা তেমনি মুসলমানগণের গুরু সৈয়দ। তোমাদের কন্যা যেমন অপর হিন্দু বিবাহ করিতে পারে না, তেমনি আমাদের কন্যা কোন অপর মুসলমানে বিবাহ করিতে পারে না। তোমাকে অতীব সম্ভ্রান্ত জানিয়াই তোমার পুত্রসহ আমি কন্যার বিবাহ দিতে ইচ্ছা করি। কোনরূপ অত্যাচার করা অভিপ্রায় নহে। আমি তোমার পুত্রগণকে মুসলমান হইতে বলি না। বরং পত্নীই পতির ধর্ম্ম অনুসরণ করে, ইহাই জগতের সাধারণ রীতি। তুমি যদি আমার কন্যাদিগকে স্বজাতিতে মিলাইয়া লইতে চাও, তাহাতেও আমি সম্মত আছি। নতুবা তোমার পুত্রেরা আমার ধর্ম্ম গ্রহণ করুক, আমি তাহাদিগকে স্বজাতিতে মিলাইয়া লইব। এই উভয়

প্রস্তাব মধ্যে যেটি তোমার বাঞ্ছিত হয়, আমি তাহাই স্বীকার করিব। কিন্তু যদি তুমি উভয়ই অস্বীকার কর, তবে আমি বলপূর্ব্বক তোমাকে বাধ্য করিব।" মদন বাদশাহের উগ্র স্বভাব জানিতেন। তিনি দেখিলেন বাদশাহের উভয় প্রস্তাব অস্বীকার করিলে বহুলোকের প্রাণনাশ ও জাতিনাশ হইবে। আর মুসলমানীকে নিজ জাতিতে মিলাইবার কোন উপায়ও নাই। অগত্যা তিনি দুই পুত্রের মায়া ত্যাগ করিলেন। তাহারা মুসলমান হইয়া শাহজাদীদ্বয়কে বিবাহ করিল।

এইরূপে বলপূর্ব্বক ধৃত জামাতারা কন্যার প্রতি অনুরক্ত হইবে কি না তদ্বিষয়ে বাদশাহের অতিশয় সন্দেহ ছিল। তিনি তাহাদিগকে বশীভূত করিবার জন্য প্রচুর সম্পত্তি এবং রাজকীয় উচ্চ পদ দিয়াছিলেন। বাদশাহের কন্যারা অতি সুন্দরী ছিল। সম্রাট্ দেখিলেন কন্যার ও জামাতার বেশ প্রণয় হইয়াছে এবং তাহারা সুখী হইয়াছে। সেই জামাতারা বিদ্বান্ ও কার্য্যদক্ষ লোক। বাদশাহ তাহাদিগকে যখন যে কার্য্যে নিযুক্ত করিতেন, তাহারা সেই কার্য্যই সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিয়া প্রশংসিত হইত। ইহাতে বাদশাহের উৎসাহ বৃদ্ধি হইল। তিনি পরিভ্রমণচ্ছলে সাতগড়ায় উপস্থিত হইয়া মদনের পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্র আরও এগার জনকে ধরিয়া আনিয়া মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন, এবং তাহাদের সহ নিজের অবশিষ্ট সমস্ত কন্যার বিবাহ দিলেন। মদনের চতুর্থ পুত্র রতিকান্তের দৃষ্টিশক্তি কম ছিল। সে রাত্রিতে একেবারেই দেখিতে পাইত না। বাদশাহ কেবল তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। তাহারই দ্বারা মদনের বংশরক্ষা হইয়াছিল। সম্রাট্ রহস্য করিয়া মদনকে বলিতেন, "বুঝেছ বিহাই! যে অন্ধ, সেই হিন্দু থাকুক; যাহার চক্ষু আছে, তাহার মুসলমান হওয়াই উচিত।"

এই অবধি পথ পড়িল। ইহার পর অনেক নবাব ও বাদশাহ একটাকিয়ার যুবক ধরিয়া তৎসহ কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন। ঘটকদের পুস্তকে ২৯ জন একটাকিয়ার, মুসলমান রাজকুমারী বিবাহ করিয়া জাতিভ্রষ্ট হওয়া জানা যায়। তজ্জন্য একটাকিয়ারা হিন্দু ও মুসলমানের কুলীন বলিয়া খ্যাত হইয়াছিলেন। প্রথম যখন কন্দর্প ও কামদেব মুসলমান হইয়া শাহজাদীদ্বয়কে বিবাহ করিয়াছিল, তখন দেশব্যাপী অখ্যাতি এবং আন্দোলন হইয়াছিল। তাহার পর পুনঃ পুনঃ ঐরূপ ঘটনা হওয়ায় তাহা অভ্যস্ত হইল। তখন আর বেশী কিছু আন্দোলন বা আক্ষেপের কারণ হইত না। মুসলমান রাজকুমারীরা প্রায়শঃ অতি সুন্দরী

হইত। যে সকল একটাকিয়া রাজকুমার তাহাদিগকে বিবাহ করিত, তাহারা মুসলমান সমাজে বিলক্ষণ সম্ভ্রম পাইত, প্রচুর সম্পত্তি এবং রাজকীয় উচ্চপদ পাইত। সুতরাং জাতিপাত জন্য বিশেষ দুঃখিত হইত না। বরং অনেকে তাহা সুখকর জ্ঞান করিত। তাহাদের হিন্দু জ্ঞাতি কুটুম্বেরা প্রথম প্রথম তাহাদের সহ কোনরূপ আত্মীয়তা করিত না; কিন্তু অভ্যস্ত হওয়ার পর পরস্পর আত্মীয়তা থাকিয়া যাইত এবং পরস্পর সাহায্যও করিত। জাতিভ্রষ্ট একটাকিয়ারা হিন্দুর উত্তরাধিকারী হইত না এবং তজ্জন্য চেষ্টাও করিত না।

সর্ব্বত্রই মুসলমানেরা কোন বিধর্ম্মীকে স্বধর্ম্মে আনিতে পারিলে মহা পুণ্য জ্ঞান করে। ভারতবর্ষীয় মুসলমানেরা কোন ব্রাহ্মণকে মুসলমান করিতে পারিলে, সমধিক পুণ্য জ্ঞান করিত। একটাকিয়াদের ন্যায় সঙ্গতিপন্ন সম্ভ্রান্ত কুলীন ব্রাহ্মণকে মুসলমান করা বাঙ্গালার নবাব ও বাদশাহগণ অতীব গৌরবের বিষয় বোধ করিতেন। মুসলমান আমীরেরা সচরাচর নিজের ভ্রাতুষ্পুত্র, ভাগিনেয় সহ কন্যার বিবাহ দিত। তাহা না যুটিলেই একটাকিয়ার যুবক ধরিয়া তাহাকে মুসলমান করিত এবং তৎসহ কন্যার বিবাহ দিত। মুসলমানেরা অনেক হিন্দুর কন্যা হরণ করিত; একটাকিয়াদের মুসলমান শাখা হইতে অনেক কন্যা নবাব ও বাদশাহগণ বিবাহ করিয়াছেন। কিন্তু একটাকিয়াদের হিন্দুশাখা হইতে কখন কোন কন্যা মুসলমান কর্ত্তৃক হৃত হয় নাই। একটাকিয়ারা ধনী ছিল, তাহাদের অঙ্গনাগণ অন্তঃপুরে গুপ্ত থাকিত। মুসলমানেরা তাহাদের বিষয় কিছুই জানিতে পারিত না। ইহাই তাহাদের ধর্ম্মরক্ষার কারণ বলিয়া অনুমিত হয়। পরন্তু একটাকিয়ারা অতিশয় প্রবল লোক ছিল, তাহাদের ঘর হইতে রমণী হরণ করা সহজ ছিল না, ইহাই দ্বিতীয় কারণ বোধ হয়।

এই সময়ে বাঙ্গালা দেশে কতকগুলি প্রসিদ্ধ ঘটনা হইয়াছিল, যাহার ফলাফল অদ্যাপি কিয়ৎপরিমাণে বাঙ্গালা দেশে দেখা যায়। হিন্দুসমাজে শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব, সৌর ও গাণপত্য এই পাঁচ প্রকার উপাসনা প্রসিদ্ধ। তন্মধ্যে শৈব, সৌর এবং গাণপত্য মতের উপাসক বাঙ্গালা দেশে ছিল না। বৈষ্ণবদিগের সংখ্যাও অতি কম ছিল। প্রায় সমস্ত বাঙ্গালীই শাক্ত মতের উপাসক ছিল। কিন্তু সাময়িক প্রয়োজনানুসারে অনুপের সময় হইতেই বৈষ্ণব মত প্রবল হইয়া উঠে।

হিন্দুসমাজ অতি বিশৃঙ্খল ও আত্মঘাতী হইয়া উঠিয়াছিল। কথায় কথায় হিন্দুর জাতিপাত হইত এবং সহস্র প্রায়শ্চিত্ত করিলেও আর সেই পতিত ব্যক্তি সমাজে গৃহীত হইত না। মনুষ্য সামাজিক জীব, সমাজ হইতে পৃথক হইয়া একাকী থাকিতে পারে না। সুতরাং হিন্দুসমাজ হইতে পরিত্যক্ত লোকেরা মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া সেই সমাজে মিলিত হইতে বাধ্য হইত। কর্ম্ম দ্বারা লোকের পাপপুণ্য, এবং অবস্থার উন্নতি বা অবনতি হইতে পারে বটে, কিন্তু জাতি পরিবর্ত্তন হইতে পারে না। কেননা জন্ম দ্বারাই জাতিত্ব হয়, কর্ম্ম দ্বারা জাতি হয় না। কর্ম্মজ পাপ সমস্তই প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা খণ্ডন হইতে পারে এবং শাস্ত্রে তাহার যথোচিত বিধানও আছে; কিন্তু সেই শাস্ত্রীয় বিধান তৎকালীয় হিন্দুসমাজে মান্য হইত না। তজ্জন্য বহুলোক মুসলমান হইতে বা দেশান্তরী হইতে বাধ্য হইত। সম্রাট্‌ যদুনারায়ণ নিজেও সেই জন্যই মুসলমান হইয়াছিলেন। হিন্দু সমাজের সেই কষ্ট নিবারণ জন্যই শ্রীচৈতন্য প্রভুর বৈষ্ণব-মত সহজে প্রবল হইয়া উঠিল। বৈষ্ণব-মতে তিনবার হরিবোল বলিলেই অতি সহজে সর্ব্বপাপ খণ্ডন হইত, এমন কি যবনাদি বিধর্ম্মীও কয়েকবার 'হরিবোল' বলিয়া পরম সাধু-বৈষ্ণব হইতে পারিত এবং অনেক মুসলমান সেই উপায়ে হিন্দু বৈষ্ণব হইয়াছিল, কেহ কেহ বা গোস্বামী গুরু পর্য্যন্তও হইয়াছিল। তন্মধ্যে ব্রহ্ম-হরিদাসই সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ।

নিমাই পণ্ডিত তাৎকালিক বৈষ্ণবদিগের প্রধান গুরু এবং অনেকের নিকট নারায়ণের অবতার বলিয়া পূজিত। তিনি ইংরাজী ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারী রাত্রি প্রায় ১১টার সময় চন্দ্রগ্রহণ কালীন নবদ্বীপধামে পণ্ডিত জগন্নাথ মিশ্রের ঔরসে তৎপত্নী শচীদেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার কোন সন্তান হইবার পূর্ব্বেই তিনি অল্পবয়সে সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার কোন বংশধর নাই। তিনি সন্ন্যাসী হইলে তাঁহার নাম কৃষ্ণচৈতন্য বা চৈতন্য প্রভু হইয়াছিল। জগাই ও মাধাই তাঁহার প্রিয় শিষ্য ছিল। তাহারাও সন্ন্যাসী হইয়াছিল। তাহাদেরও বংশ নাই।

নিত্যানন্দ বা নিতাই প্রভু রাঢ়ী ব্রাহ্মণের সন্তান। বাল্যকালেই সন্ন্যাস-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া পরে সংসারী হইয়াছিলেন। খড়দহের গোস্বামীরাই তাঁহার বংশধর। সন্ন্যাসী হইয়া পরে সংসারী হওয়ায় ইহাদের বীরভদ্রী দোষ আছে।

শান্তিপুরের অদ্বৈত গোস্বামী বা অদ্বৈত প্রভু কখন সন্ন্যাসী হন নাই। তিনি সংসারে থাকিয়াই পরম বৈষ্ণব ছিলেন। শান্তিপুর ও উথলীর গোস্বামীরা সেই অদ্বৈত প্রভুর সন্তান এবং বৈষ্ণবদিগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুরু। ইহারা বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ।

ঘনশ্যাম আচার্য্য, মাধব আচার্য্যের পুত্র। তিনি অদ্বৈত প্রভুর ভাগিনেয় এবং প্রিয় শিষ্য ছিলেন। অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ একমতাবলম্বী বলিয়া পরস্পরের পরম বন্ধু ছিলেন। অদ্বৈত ঘনশ্যামকে সঙ্গে লইয়া নিত্যানন্দের বাড়ীতে দেখা করিতে গিয়াছিলেন। নিত্যানন্দের গঙ্গা নাম্নী এক কন্যা ছিল। নিতাই সেই কন্যা ঘনশ্যামের সহ বিবাহ দিতে অদ্বৈতের সম্মতি চাহিলেন। অদ্বৈত কহিলেন, "মাধবাচার্য্যের সম্মতি ব্যতীত এরূপ সম্বন্ধ হইতে পারে না।" তখন নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত উভয়ে গিয়া মাধবাচার্য্যের সম্মতি চাহিলেন। মাধব নিজে বৈষ্ণব ছিলেন। তিনি প্রভুদ্বয়ের নিকট প্রণত হইয়া কহিলেন, "যদি সামাজিক বাধা না হয়, তবে আপনাদের আদেশ আমার শিরোধার্য্য।" তখন অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ বহুসংখ্যক রাঢ়ী ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ও কুলীন কুলজ্ঞদের পাতি ও লিখিত সম্মতি লইয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই মত দিয়াছিলেন যে, "রাঢ়ী বারেন্দ্রে বিবাহ হইলে, কোন দোষ হয় না।" তদনুসারে ঘনশ্যামের সহ গঙ্গার প্রকাশ্যরূপে বিবাহ হইয়াছিল। শ্রেণীবিভাগের পর ইহাই বিভিন্নশ্রেণীর শ্রোত্রিয় মধ্যে একমাত্র প্রকাশ্য বিবাহ। প্রয়োজন বশে কোন কোন রাঢ়ী ব্রাহ্মণ আপনাকে বারেন্দ্র বলিয়া পরিচয় দিয়া প্রকৃত বারেন্দ্র সহ বিবাহে আদান প্রদান করিয়াছে, কোথাও বা কোন বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ আপনাকে রাঢ়ী পরিচয় দিয়া রাঢ়ী ব্রাহ্মণ সহ ঐরূপ আদান প্রদান করিয়াছে। তাহার পর প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ পাইলে কিছুদিন দলাদলি চলিত; শেষে ক্রমশঃ দলাদলি মিটিয়া যাইত। এইরূপ দৃষ্টান্ত অনেক পাওয়া যায়। কিন্তু একপক্ষ রাঢ়ী, অন্যপক্ষ বারেন্দ্র, ইহা স্পষ্ট প্রকাশ করিয়া গঙ্গার সহ ঘনশ্যামের যেরূপ বিবাহ হইয়াছিল, তাদৃশ বিবাহ আর পূর্ব্বে বা পরে হয় নাই।

শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবে বঙ্গসাহিত্যেও এক প্রবল বন্যা আসিয়াছিল। এই সময়ে গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, বলরামদাস প্রভৃতি বহুতর বৈষ্ণব কবি মধুর পদাবলীর দ্বারা বঙ্গভাষা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। প্রায় অধিকাংশ কবিতাই শ্রীগৌরাঙ্গের জীবন সম্বন্ধীয়। সে সময়ের কবিদিগের সহজ সরল ভাষায়, ভাব

বিকাশ আজও সাহিত্য জগতে অতুলনীয়*

হোসেনশাহ ৯২৭ হিজরীতে পরলোক গমন করিলে তৎপুত্র নশরৎ শাহ বাদশাহ হন। নশরৎ শাহের সময়েই বাবর ইব্রাহিম লোদীকে বিনাশ করিয়া দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন। বহুসংখ্যক বিশিষ্ট আফগান নশরৎ শাহের আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইব্রাহিম লোদীর কন্যা তদীয় খুল্লতাত মাহমুদের সঙ্গে বঙ্গদেশে আসেন। নশরৎ সকলকেই সসম্মানে গ্রহণ করিয়া ইব্রাহিমের কন্যাকে বিবাহ করেন। পরে হিজরী ৯৩৫ সালে বাবর জৌনপুরে উপনীত হইয়া তৎ-পার্শ্ববর্ত্তী স্থান সমূহ স্বীয় অধিকারভুক্ত করিলেন এবং তৎপরে বঙ্গদেশ আক্রমণ করিতে সঙ্কল্প করিলে নশরৎ শাহ তাঁহার সহিত সন্ধি সংস্থাপন করেন।

নশরৎ শাহ ১৩ বৎসর রাজত্ব করিয়া হিজরী ৯৪০ সালে নিহত হন। তাঁহার মৃত্যুর পর সরদারগণ তাঁহার পুত্র ফিরোজ শাহকে বঙ্গের সিংহাসন প্রদান করিল; কিন্তু তিনমাস অতীত না হইতেই তাঁহার পিতৃব্য মাহমুদ শাহ তাঁহাকে হত্যা করিয়া সিংহাসন অধিকার করিলেন। ইতিমধ্যে সাসারামের জাগীরদার শের শাহ প্রবল হইয়া গৌড় অধিকার করিবার জন্য অতিশয় যত্নপরায়ণ ছিলেন। শের শাহের পুত্র জালাল খাঁ ৯৪৪ হিজরীতে গৌড় আক্রমণ করিল। মাহমুদ শাহ যুদ্ধ করিতে অসমর্থ হইয়া পলায়ন করিলেন। এমন সময়ে শের শাহ স্বয়ং মাহমুদের পশ্চাদনুসরণ করিলেন। অগত্যা মাহমুদ শাহ তাঁহার সহিত যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন, এবং যুদ্ধে আহত হইয়া পুনরায় পলায়ন করিলেন। শের শাহও নির্ব্বিবাদে গৌড়নগরে উপনীত হইয়া বঙ্গদেশ অধিকার করিলেন। তাহার পর শের শাহ ভাদুড়িয়া আক্রমণ করিলেন। তৎকালীন ভদুড়ীয়ার রাজা অনুভ্রনারায়ণ যুদ্ধ না করিয়া তাঁহার শরণাগত হইলেন। শের শাহ তাঁহাকে ভাদুড়িয়া এবং সাবেক বাজুচতুষ্টয়ের জন্য পূর্ব্ব নিয়মে নর্মা এবং মালগুজারী দিতে এবং সমস্ত অতিরিক্ত পরগণা ছাড়িয়া দিতে বলিলেন। অনুজ তাহাতে

* এই সকল পদাবলী সম্বন্ধে শ্রদ্ধাস্পদ রমেশ চন্দ্র দত্ত "Literature of Bengal" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—"They are always sweet and often display a vivid fancy and considerable depth of feeling.......The admirer of modern Bengali literature will be surprised at the sweetness and beauty that pervade these old compositions."

সম্মত হইলেন। শের মোগল সম্রাট্ হুমায়ুনের সহ যুদ্ধে অনুজের সাহায্য চাহিলেন। অনুজ নিজ জ্যেষ্ঠপুত্র মুকুন্দনারায়ণের অধীনে পাঁচ হাজার সৈন্য এবং নগদ পাঁচ লক্ষ টাকা দিলেন। ইহাতে শের শাহ সন্তুষ্ট হইয়া অনুজকে একটাকিয়া রাজা স্বীকার করিয়া সনন্দ দিলেন। এই সনন্দ এখনও বিদ্যমান আছে।

তদবধি কুমার মুকুন্দনারায়ণ খাঁ শের শাহের আদিষ্ট কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। শের শাহ দিল্লীর সম্রাট্ হইলে মুকুন্দ বিদায় প্রার্থনা করিলেন। শের দেখিলেন বাহুবল ভিন্ন দিল্লী সাম্রাজ্যে তাঁহার অন্য কোন দাবী নাই; হুমায়ুন তখনও ভারতবর্ষেই আছেন; সহজেই আবার প্রবল হইয়া উঠিতে পারেন। মুকুন্দ বুদ্ধিমান্ বীরপুরুষ এবং গৌড়বাদশাহের বংশজাত। এ সময় তাহাকে ছাড়িয়া দিলে সে দেশে গিয়া বাঙ্গালাদেশ পুনরায় দখল করিতে চেষ্টা করিতে পারে। এজন্য তিনি মুকুন্দকে বিদায় দিলেন না। কিন্তু প্রকৃত অভিপ্রায় গোপন করিয়া কহিলেন, "খাঁ সাহেব! আমি তোমাকে যতদূর বিশ্বাস করি, অন্য কাহাকেও ততদূর বিশ্বাস করিতে পারি না। তুমি আমার দক্ষিণ হস্ত। আমার সাম্রাজ্য এখনও নির্ব্বিঘ্ন হয় নাই। হুমায়ুন এখনও ভারতবর্ষেই ঘুরিতেছে। এ সময় তোমার মত সহায় আমার নিতান্তই আবশ্যক। তোমার বাড়ী অতি দূরবর্ত্তী। তুমি একবার বাড়ী গেলে পুনরায় আমার সাহায্যের জন্য আসা সহজ ব্যাপার নহে। এজন্য আমার অনুরোধ যে, তুমি আর কিছু দিন থাকিয়া আমার উপকার কর। তাহার পর ধনে মানে সম্পন্ন হইয়া দেশে যাইও।" শের এইরূপ কপট স্নেহ প্রকাশ করিয়া মুকুন্দকে আরও পাঁচ বৎসর আটক রাখিয়াছিলেন।

শের শাহ যোধপুরের রাজার সহ যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তাহাতে মুকুন্দ ক্ষতবিক্ষত হইয়া বহুকষ্টে শের শাহের প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন। শের অতি যত্নপূর্ব্বক মুকুন্দের সুচিকিৎসা করাইলেন। মুকুন্দ আরাম হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার দক্ষিণ পদখানি প্রায় অবশ হইয়া গেল। তখন শের শাহ বিবেচনা করিলেন, "এখন হুমায়ুন দেশত্যাগী হইয়াছে। আমার রাজ্য নিরুপদ্রব হইয়াছে এবং মুকুন্দও অকর্ম্মণ্য হইয়াছে। সুতরাং এখন মুকুন্দকে ছাড়িয়া দিতে কোন ভয় নাই।" তিনি মুকুন্দকে প্রচুর ধন ও সম্ভ্রান্ত খেলাত দিলেন। তিনি অনুজের নিকট হইতে যে সকল পরগণা খাস করিয়া লইয়াছিলেন, তাহা

পুনরায় মুকুন্দকে জমিদারী স্বত্বে বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া নৌকাপথে তাঁহাকে দেশে পাঠাইয়া দিলেন। মুকুন্দ দেশে আসিয়া কেবল চারি বৎসর জীবিত ছিলেন। তিনি একটি শিশুপুত্র রাখিয়া পিতৃবর্ত্তমানেই গতায়ু হইলেন।

সম্রাট্ শের শাহ সর্ব্বপ্রথমে চিঠি চলাচল জন্য ভারতবর্ষে ডাকঘর স্থাপন করিয়াছিলেন। সেই সকল ডাকঘর কেবল সহরে এবং থানায় থানায় ছিল। অশ্বারোহী বাহকগণ এক থানা হইতে চিঠির পুলিন্দা অন্য থানায় পৌছাইত। টিকিট ছিল না, সমস্ত চিঠি ব্যারিং যাইত। চিঠির ওজন অনুসারে মাশুল কম বেশী হইত না। স্থানের দূরত্ব অনুসারে যত থানা দিয়া বাহিত হইত (থানা প্রতি আধআনা) তত আধ আনা মাশুল লাগিত। প্রত্যেক থানায় একজন করিয়া ডাক মুন্সী এবং একজন বরকন্দাজ থাকিত। বাদশাহী চিঠি, সরকারী কর্ম্মচারীদিগের চিঠি এবং জমিদারদের চিঠিমাত্র বিলি হইত। তাহার মাশুল লাগিত না। জমিদারেরা ডাক খরচা বলিয়া একটি টেক্স দিত। তাহা দ্বারা ডাকঘরের খরচা, মুন্সী ও বরকন্দাজের বেতন ও রাস্তা ঘাটের মেরামতী খরচ চলিত। অপর লোকের চিঠি বিলি হইত না। তাহা এক বৎসর পর্য্যন্ত ডাকঘরে থাকিত। লোকে ডাকঘরে তদন্ত করিয়া মাশুল দিয়া চিঠি লইয়া যাইত। এক বৎসর পর্য্যন্ত কেহ চিঠি না লইলে তাহা দগ্ধ করা হইত।

হওয়ায় সম্মান বৃদ্ধি হইত। ভাণ্ডারী শব্দ হইতে ভাণ্ডারনবিস শব্দ সম্মানকর ছিল। রাজার খুড়া রামদেব খাঁ নিজেই খাজাঞ্চী ছিলেন।

নাবালক রাজার অভিভাবক হইবামাত্র স্বরূপের সৌভাগ্য প্রতীয়মান হইল। বহু লোক এখন তাহার অনুগ্রহের জন্য নানারূপ উপসর্পণা করিতে লাগিল। স্বরূপ সকলের সহ ভদ্রতা করিতেন, কিন্তু নিজ কর্ত্তব্য সাধন ভুলিতেন না। কোন ষড়যন্ত্র সহজে না হয় এই অভিপ্রায়ে স্বরূপ নানাদেশীয় নানাজাতীয় মোট আট জন লোক রাজার শরীররক্ষকরূপে নিযুক্ত করিয়া নিজ পুত্র লালা রামচন্দ্র সরকারকে তাহাদের পরিচালক করিলেন। উত্তরপশ্চিম প্রদেশে সঙ্গতিপন্ন শূদ্র ও বৈশ্যদিগকে "লালা" বলে। বেহার প্রদেশে কেবল কায়স্থদিগকে লালা বলে। যেমন কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ লেখা পড়া জানুক বা না জানুক সকলেরই উপাধি পণ্ডিত এবং বাঙ্গালা দেশের অম্বষ্ঠ চিকিৎসাশাস্ত্র কিছুমাত্র না জানিলেও তাহার বৈদ্য উপাধি হয়, সেইরূপ বেহারে লালা শব্দ কায়স্থের জাতিবাচক হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গালা দেশে কায়স্থের মধ্যে যাহারা পারসী-শিক্ষিত, তাহাদেরই লালা উপাধি হইত। কায়স্থ ভিন্ন অন্য জাতীয় লোক পারসী পড়িলে লালা উপাধি হইত না। এখন বাঙ্গালা দেশে পারসীর চর্চ্চা না থাকায় লালা উপাধি অপ্রচলিত হইয়াছে। লালা উপাধি পূর্ব্বে অতি সম্ভ্রান্ত উপাধি ছিল। তখন বাবু উপাধি ছিল না। লালা রামচন্দ্র সরকার পরীক্ষা না করিয়া কোন বস্তু রাজাকে খাইতে দিতেন না। রাজার জন্য খাদ্য প্রস্তুত হইলে সর্ব্বাগ্রে তাহার কিয়দংশ পাচককে কিংবা তাহার পুত্রকে খাইতে দিতেন। রাজার জন্য পাণ, রাম লালা নিজ ঘর হইতে তৈয়ার করিয়া আনিতেন। রাজার শয়নঘরে স্বরূপ নিজে কিংবা রাম লালা শয়ন করিতেন। অন্য কাহাকেও থাকিতে দিতেন না। রাম লালা নিজেই রাজাকে বাঙ্গালা ও পারসী শিক্ষা দিতেন। তাঁহারই তত্ত্বাবধানে সিপাহীরা রাজাকে অশ্ব চালনা এবং অস্ত্র শিক্ষা দিত। পণ্ডিতেরা তাঁহাকে ধর্ম্মশাস্ত্র শিক্ষা দিতেন। রাজার খুল্লতাতগণ, গুরু, পুরোহিত এবং রাম লালা পরামর্শ করিয়া প্রথমে এক কুলীনকন্যা সহ, পরে দুইটি সিদ্ধ শ্রোত্রিয়ের কন্যা সহ রাজার বিবাহ দিলেন। ষোল বৎসর উত্তীর্ণ হইলে রাজা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেন, তখন যাগ যজ্ঞ করিয়া রাজার অভিষেক-ক্রিয়া সম্পাদিত হইল। রাণী সুধামণি এই সময়ে তপস্বিনী বেশে দেশে আসিয়াছিলেন, পুত্রের বিবাহ ও অভিষেক সমাপ্ত হইলে

পুনরায় কাশীবাসে গেলেন। বড় ঘরের কথা কেহ মুখ ফুটিয়া বলিতে পারে না, অথচ কাহারও অজ্ঞাত থাকে না। রাণী স্বর্ণামণির কাশীবাসের প্রকৃত কারণ অনেকেই অবগত হইয়াছিল।

রাজা জগৎনারায়ণ সর্ব্বাগ্রে স্বরূপ সরকারের বিশ্বস্ততার পুরস্কার করিলেন। সাতগড়ার দক্ষিণ পাড়ায় দালান, পুষ্করিণী এবং বাগানযুক্ত এক বাড়ী তৈয়ারী করিয়া স্বরূপের বাসের জন্য দিলেন। আর তারাস নামক একখানি গ্রাম কম জমায় মক্‌ররী মৌরসী তালুক করিয়া স্বরূপ সরকারকে দিলেন। বৃদ্ধ স্বরূপ কর্ম্ম করিতে অক্ষম হইলে তাহার পুত্র রাম লালকে জমানবিসী কর্ম্ম দিয়া স্বরূপকে অবসর দিলেন। পূর্ব্বে কেবল ব্রাহ্মণেরাই নিষ্কর ভূমি ভোগ করিতে পারিত। তাহার পর মুসলমান পীর মোল্লা প্রভৃতিও নিষ্কর জমি পাইতেছিল। ধর্ম্ম-ব্যবসায়ী লোক ভিন্ন অন্যে নিষ্কর ভূমি ভোগ করিলে নির্ব্বংশ হয় বলিয়া সর্ব্ব-সাধারণের বিশ্বাস ছিল। অন্য লোকের উপর রাজার অনুগ্রহ হইলে কম জমায় জমি মক্‌ররী করিয়া দেওয়া হইত। সেই জন্য স্বরূপকে তাহাই দেওয়া হইল। এই অবধি বাস্তবিক স্বরূপের দাসত্বমুক্তি হইল। কিন্তু স্বরূপ কিংবা তদ্বংশীয়-দিগকে রাজারা কখন স্পষ্টরূপে দাসত্বমুক্ত করেন নাই। আর তাহারাও কখন দাসত্ব হইতে অব্যাহতি পাইতে প্রার্থনা করে নাই অথবা তাদৃশ প্রার্থনা প্রয়োজনীয় বোধ করে নাই।

এই সময়ে সলিমান কেরাণী বাঙ্গালা ও বেহারের সম্রাট্ ছিলেন। তাঁহার রাজত্ব সময়ে দিল্লীতে পুনঃ পুনঃ রাজবিপ্লব হইয়া অবশেষে পাঠান সাম্রাজ্য সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইল। মোগল জাতীয় আকবর শাহ দিল্লীর সম্রাট্ হইলেন। মোগলেরা সংখ্যায় অতি অল্প ছিল। ভারতবর্ষীয় অন্যান্য মুসলমানদিগের সহ তাহাদের সদ্ভাব ছিল না, এজন্য তাহারা হিন্দুদিগকে স্বপক্ষ করিতে চেষ্টা করিয়া-ছিল। পাঠান কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হিন্দুর অধিকাংশই মোগলদের সহায় হইয়া-ছিলেন। বিশেষতঃ আম্বের ও যোধপুরের রাজপুত রাজগণ মোগল সম্রাট্‌দিগের সহ কুটুম্বিতা করিয়া প্রাণপণে তাঁহাদের হিত চেষ্টা করিতেন। তাহাতেই মোগল সম্রাটেরা পাঠান ও উজ্‌বকদিগকে পরাজয় করিয়া "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা" হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

রাজা জগৎনারায়ণের সময়ে দ্বিতীয় কালাপাহাড় আবির্ভূত হইয়াছিল। লোকে কালাপাহাড়ের বৃত্তান্ত যেরূপ বলিয়া থাকে তাহাতে বোধ হয় যেন কালাপাহাড় কেবল একজন মাত্র ছিল। কিন্তু সময়ের প্রতি লক্ষ্য করিলে তাহা সম্পূর্ণ অসম্ভব হইয়া পড়ে। কেননা দিল্লীর সম্রাট্ বিলোল লোদী গৌড় বাদশাহ সলিমান কেরাণীর ৬০ বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী লোক। একজন কালাপাহাড় প্রথমে সলিমান কেরাণীর সৈনাপত্য করিয়া তাহার পর বিলোল লোদীর সেনাপতি হওয়া অসম্ভব। পরন্তু প্রথম কালাপাহাড় অনুদ্দিশ্য হওয়ার কালে তাঁহার বয়স ৩৪ বৎসর মাত্র হইয়াছিল। সুতরাং একই ব্যক্তি দ্বারা উভয় কার্য্য কদাচ হইতে পারে না। বিশ্বকোষ অভিধানেও কালাপাহাড় দুই জন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। দ্বিতীয় কালাপাহাড়ের বৃত্তান্ত সম্পূর্ণ বলিবার উপায় নাই। তাহার পূর্ব্ব নাম কি ছিল এবং শিক্ষা কত দূর হইয়াছিল এবং তাহার পিতার নাম কি ছিল কিছুই জানা যায় না। কেবল জানা যায় যে সে এক জন রাঢ়ী ব্রাহ্মণের জ্যেষ্ঠ পুত্র, তাহার বাটী বর্দ্ধমান জেলার কাটোয়ার নিকট ছিল। সে একটি মুসলমান রমণীর প্রেমে মুগ্ধ হইয়া তাহার প্রবর্ত্তনায় মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া উক্ত রমণীকে বিবাহ করিয়াছিল। হিন্দুরা তজ্জন্য তাহাকে নিন্দা ও ঘৃণা করায় সে অতিশয় হিন্দুবিদ্বেষী হইয়াছিল। সে পরিচিত লোক মধ্যে থাকিতে না পারিয়া গৌড় নগরে গিয়া গৌড় বাদশাহের সৈনিক কর্ম্মে নিযুক্ত হয়।/

প্রথম কালাপাহাড় যে উড়িষ্যা জয় করিয়াছিলেন সেই বিজয় দীর্ঘ কাল স্থায়ী হয় নাই। উড়িয়ারা গঙ্গবংশীয় * আর একজনকে রাজা করিয়া দেশের কতক অংশের স্বাধীনতা উদ্ধার করিয়াছিল। তাহার পর ত্রৈলঙ্গরাজ গজপতিবংশীয় মুকুন্দদেব গঙ্গবংশীয়দিগকে পরাজয় ও নিজের অধীন করিয়া অতিশয় পরাক্রান্ত হইয়াছিলেন। তিনি সমস্ত উড়িষ্যা হইতে মুসলমানগণকে নিষ্কাশিত করিয়া বাঙ্গালার দক্ষিণ ভাগে কিছু দূর পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছিলেন। তখন গৌড় বাদশাহ দ্বিতীয় কালাপাহাড়ের অধীনে একদল সেনা উড়িষ্যা বিজয়ের

* অনেকে গঙ্গাবংশ বলেন কিন্তু চোড়গঙ্গদেব নাম হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে গঙ্গবংশ প্রকৃত নাম। চোড়গঙ্গদেবের প্রপৌত্র অনঙ্গ ভীমদেবের সময়ে জগন্নাথ দেবের মন্দির বর্ত্তমান আকারে পরিণত হয়। প্রতাপ রুদ্রদেবের রাজত্বকালে (১৫০৪—১৫৩২ খৃষ্টাব্দে) চৈতন্যদেব উড়িষ্যা দেশে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করেন।

জন্য পাঠাইলেন। এবারে ঘোরতর যুদ্ধের পর মুকুন্দদেব নিহত হইলেন। তাঁহার সেনাগণ পলায়ন করিল। কালাপাহাড় সমস্ত উড়িষ্যা দখল করিতে করিতে জগন্নাথ ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। প্রথম কালাপাহাড়ের আক্রমণকালে পাণ্ডারা জগন্নাথ বিগ্রহ চিল্কা হ্রদে ডুবাইয়া রক্ষা করিয়াছিল। এবারও তদ্রূপ গোপন করিল। কিন্তু দ্বিতীয় কালাপাহাড় তাহা জানিতে পারিয়া তথা হইতে বিগ্রহ উঠাইলেন এবং ত্রিবেণীতে লইয়া গিয়া সেই বিগ্রহ অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিলেন। এক জন ভক্ত জীবন নিরপেক্ষ হইয়া অগ্নিকুণ্ড মধ্যে প্রবেশ করিল এবং অর্দ্ধ দগ্ধ বিগ্রহ লইয়া গঙ্গাজলে পড়িয়া দেহ ত্যাগ করিল। বিগ্রহ জলের তলে স্রোতবেগে দক্ষিণ দিকে যাইতে লাগিল। দ্বিতীয় কালাপাহাড় বহু চেষ্টা করিয়াও আর ঐ বিগ্রহ ধরিতে পারিলেন না। সন্ধ্যার পর গোবিন্দ দাস নামক এক বৈরাগী গঙ্গা হইতে বিগ্রহ উঠাইয়া নিজ বাটীতে গোপন করিয়া রাখিল। উড়িয়া মাদলী পঞ্জি মতে এই ঘটনা ১৪৮১ শকাব্দে * হইয়াছিল।

এদিকে উড়িয়ারা গজপতিবংশীয় আর এক ব্যক্তিকে রাজা বলিয়া স্বাধীনতা রক্ষার চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহারা আর সম্মুখ যুদ্ধ না করিয়া মুসলমানদিগকে বিবিধপ্রকারে উৎপাত করিতে লাগিল। প্রায় দশ বৎসর কাল সেই ঔৎপাতিক যুদ্ধ চলিয়াছিল। ইতিমধ্যে ১৫৬৪ খৃঃ অব্দে সলিমান কেরাণী গৌড় বাদশাহ হইয়াছিলেন। তিনি দেখিলেন যে ঈদৃশ ঔৎপাতিক যুদ্ধ সুদীর্ঘ কাল চলিলে তাহাতে উভয় পক্ষেরই ক্ষতি। এজন্য তিনি নব নির্ব্বাচিত রাজার সহিত সন্ধি করিলেন। সেই সন্ধি মতে জেলা ক্ষুরদা উক্ত রাজার থাকিল অবশিষ্ট সমস্ত উড়িষ্যা পাঠানদের অধীন হইল। অধিকন্তু ক্ষুরদার রাজা গৌড় বাদশাহের অধীনতা স্বীকার করিয়া বার্ষিক ৫০০০৲ টাকা নালবন্দি দিতে বাধ্য হইলেন। ১৫৬৮ খ্রীঃ অব্দে এই সন্ধি হয়। তদবধি উড়িষ্যার স্বাধীনতা শেষ হইল।

সন্ধির পর ক্ষুরদার রাজা গোবিন্দ দাসের নিকট হইতে অর্দ্ধ দগ্ধ বিগ্রহ লইয়া তন্মধ্য হইতে বিষ্ণু পঞ্জর বাহির করত নিম কাষ্ঠে নির্ম্মিত নূতন বিগ্রহ মধ্যে সেই বিষ্ণু পঞ্জর ভরিয়া তাহাই জগন্নাথ দেবের মন্দিরে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। সেই বিগ্রহই এখনও বিদ্যমান আছে। আর গজপতিবংশীয়েরাই ধারাবাহিক রূপে এপর্য্যন্ত ক্ষুরদার রাজা আছেন। কিন্তু ইংরেজের অধীনে তাঁহাদের

* কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে এই ঘটনা ১৫৬৭ খৃষ্টাব্দে সংঘটিত হয়।

এখন রাজকীয় শক্তি কিছুই নাই। অপর সাধারণ জমিদারের ন্যায় তিনিও একজন জমিদার হইয়াছেন।

দ্বিতীয় কালাপাহাড়ও প্রথম কালাপাহাড়ের ন্যায় সুন্দরাকৃতি ও বলবান্ পুরুষ ছিলেন। উভয়েই ব্রাহ্মণ সন্তান কিন্তু মুসলমান হইয়াছিলেন এবং মুসলমানী বিবাহ করিয়াছিলেন। উভয়েই ঘোরতর হিন্দুবিদ্বেষী হইয়াছিলেন এবং হিন্দুধর্ম্মের অনিষ্ট করিয়াছিলেন। এইজন্যই এই দ্বিতীয় অত্যাচারীর কালাপাহাড় উপাধি হইয়াছিল। এখনও যে কোন হিন্দু সন্তান হিন্দুদের প্রতি এবং হিন্দু ধর্ম্মের প্রতি অত্যাচার করে লোকে তাহাকে কালাপাহাড় বলে। তজ্জন্য কালাপাহাড় কেবল একজন মাত্র ছিল বলিয়া অনুমান করা ভ্রম মাত্র। দ্বিতীয় কালাপাহাড় কামরূপ * ও কাশী প্রভৃতি দূরবর্ত্তী দেশে যান নাই। স্বদেশে তিনি হিন্দুবিদ্বেষ বশতঃ কি কি কার্য্য করিয়াছিলেন তাহার বিবরণ পাওয়া যায় না। কেবল রিয়াজ-উস্-সালাতিন নামক পুস্তকে যৎকিঞ্চিৎ যাহা আছে তদতিরিক্ত কিছুই পাওয়া যায় না। এজন্য বোধ হয় যে তিনি প্রথম কালাপাহাড়ের সদৃশ ভয়ঙ্কর হিন্দুপীড়ক ছিলেন না। তিনি সলিমান কেরাণী ও তৎপরে তৎপুত্র দাউদ খাঁর সেনাপতি ছিলেন। ইনি দাউদ খাঁর পরাজয়ের পর, বিহারের শাসন কর্ত্তা মজাঃফর খাঁর সেনাপতি মাসুম খাঁর সহিত রোটাস দুর্গ আক্রমণ সময়ে হত হন।

রামলীলা কৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে গদ্য পদ্য গান বাঙ্গালা দেশে কত আছে তাহা গণনা করিয়া শেষ করা যায় না। কিন্তু স্বদেশীয় বড় লোক সম্বন্ধীয় কোন প্রকার লিখিত বৃত্তান্ত বাঙ্গালা দেশে নাই। রাজপুতানার ইতিহাস তথাকার ভাটেরা রক্ষা করিয়াছিল। টড্ সাহেব তাহাই সংগ্রহ করিয়া রাজস্থানের ইতিহাস লিখিয়াছেন। বাঙ্গালাদেশেও ভাট ছিল এবং এখনও আছে। কিন্তু তাহারা যথোচিত আদৃত বা পুরস্কৃত না হওয়ায় দেশের ইতিহাস রক্ষা করে নাই। রাজা কংশরাম এবং রাজা গণেশের বৃত্তান্ত যেমন মিশ্রিত করিয়া মুসলমান ইতিবেত্তাগণ দুই জনকে একজন বলিয়াছেন ঠিক

* উড়িষ্যা বিজয়ের পর (হিঃ ৯৭৭) সলিমান কেরাণী কোচবিহার ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থান সমূহ আক্রমণ করিয়াছিলেন। এই সময়ে দ্বিতীয় কালাপাহাড় তাঁহার সঙ্গে ছিল কি না তদ্বিষয়ে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

সেইরূপেই দুইজন কালাপাহাড়কে একজন করিয়া ফেলিয়াছেন।

কালাপাহাড়ের উপদ্রবে বহুসংখ্যক বাঙ্গালী হিন্দু জমিদার ধর্ম্মরক্ষার্থ ধন-সম্পত্তি পরিত্যাগ করিয়া গুপ্তভাবে স্থানে স্থানে ছিলেন। হিন্দুর প্রতি মোগল সম্রাট্ আকবরের অনুগ্রহ শুনিয়া অনেকে দিল্লী গিয়া আকবরের চাকরীতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং তাঁহারা সর্ব্বদা আকবরকে বাঙ্গালা দেশ জয়ের জন্য উত্তেজিত করিতেন। এই সকল লোকের মধ্যে তাহিরপুরের জমিদার কংসনারায়ণ রায়, সিন্দুরীর জমিদার ঠাকুর কালিদাস রায়, সাঁতোড়ের রাজকুমার গদাধর সান্যাল এবং দিনাজপুরের রাজভ্রাতা গোপীকান্ত রায় বিশেষ সম্ভ্রান্ত ছিলেন। বাঙ্গালাদেশ অধিকার করিতে আকবরের নিজেরও ইচ্ছা ছিল। তাহার উপর ঐ সকল ব্যক্তির উত্তেজনায় সেই ইচ্ছা অধিক বলবতী হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তী পাঠান ও উজ্‌বকদের বিদ্রোহ এবং চিতোরের মহারাণার সহ বিবাদ হেতু আকবর বহুদিন পর্য্যন্ত বাঙ্গালাদেশ আক্রমণে অবসর পান নাই। এদিকে গৌড় বাদশাহ সলিমান নিজের প্রচুর ধনবল ও সৈন্যবল সত্ত্বেও সর্ব্বদা আকবর শাহের আনুগত্য করিতেন এবং উপঢৌকন পাঠাইতেন। তজ্জন্য তাঁহাকে আক্রমণ করিতে আকবরের চক্ষুলজ্জা হইত। খৃঃ ১৫৭২ সালে সলিমান বাদশাহের মৃত্যু হইল। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র দাউদ খাঁ গৌড় বাদশাহ হইলেন। তিনি নিজবিভূতিগর্ব্বিত হইয়া নিজ পাঠান অমাত্যগণের পরামর্শে মোগল সম্রাটের বিপক্ষ হইলেন। আকবর স্বয়ং সসৈন্যে দাউদের সহ যুদ্ধে চলিলেন। উপরি উক্ত চারিজন বাঙ্গালী সম্ভ্রান্ত লোক মোগলদিগের অপরিচিত পথের পথপ্রদর্শক হইলেন। দাউদ নিজে অত্যাচারী ছিলেন না; কিন্তু তাঁহার পিতার আমলে যে সকল অত্যাচার হইয়াছিল, তজ্জন্য সমস্ত হিন্দুই পাঠানদিগের প্রতি অসন্তুষ্ট ছিল। তাহারা কেবল ভয় প্রযুক্তই বিদ্রোহী হয় নাই। পাঠান সৈন্য হাজিপুরের নিকট একটী যুদ্ধে পরাজিত হইবামাত্র সমস্ত বাঙ্গালী হিন্দুরা পাঠানদিগের বিপক্ষ হইয়া উঠিল। ভাদুড়িয়ার রাজা এবং চন্দনার বঙ্গজ কায়স্থ রাজবংশীয় বিক্রমাদিত্য * ভিন্ন কোন হিন্দু বড় মানুষ পাঠানদের পক্ষে থাকিলেন না। দাউদ

* ইনি বিখ্যাত রাজা প্রতাপাদিত্যের পিতা। ইহার প্রকৃত নাম শ্রীহরি। ইঁহাকে সলিমন কেরাণী "বিক্রমাদিত্য" আখ্যা দেন।

তদ্দর্শনে ভীত হইয়া একবারে উড়িষ্যা পলায়ন করিলেন। বাঙ্গলা ও বেহার দিল্লী-সাম্রাজ্যভুক্ত হইল। এই অবধি বাঙ্গালাদেশে পাঠান রাজত্ব শেষ হইল।

দাউদ খাঁ পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলে মোগল সেনাপতি কটক পর্য্যন্ত তাঁহার অনুসরণ করিলেন। শেষে দাউদ খাঁ আত্মসমর্পণ করিলেন এবং মোগল সম্রাটের অনুগ্রহে উড়িষ্যা রাজ্য জাগীর পাইলেন। বাঙ্গালা বেহার মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত হইলে সেনাপতি মুনিম খাঁ শুবাদার পদে নিযুক্ত হইলেন। সেই সময়ে গৌড়ে ভয়ঙ্কর মড়ক উপস্থিত হইল। স্থানের সিক্ততা, জলের অস্বাস্থ্যকারিতা, অথবা বায়ুর দুষিতাবস্থা বশতঃ এইরূপ ঘটিল। সহস্র সহস্র লোক মরিতে লাগিল। মৃতাবশিষ্টেরা সমুদয় মৃতদেহের সৎকার করিতে না পারিয়া মৃতদেহ নদীতে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। মুনিম খাঁরও মৃত্যু হইল। মুনিম খাঁর মৃত্যু হইলে দাউদ পুনরায় বঙ্গদেশ আক্রমণ করেন, কিন্তু যুদ্ধে পরাজিত ও বন্দী হইয়া মোগল সম্রাটের নিকট আনীত হইলেন, এবং বিদ্রোহাপরাধে তাঁহার প্রাণদণ্ড হইল। এই ঘটনা হিজরী ৯৮৪ (খৃষ্টাব্দ ১৫৭৫) সালে ঘটিয়াছিল।

পাঠান রাজত্বে রীতিমত শাসনপ্রণালী ছিল না। মধুসূদন খাঁ, সৈয়দ হোসেন শাহ এবং সের শাহ দেবী। জমিদারদিগকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিয়াছিলেন এবং রীতিমত মালগুজারী দিতে বাধ্য করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু জরীপ জমাবন্দি করেন নাই। অন্যান্য সম্রাট বা নবাবদের সময়ে কোনই শৃঙ্খলা ছিল না। জমিদারেরা স্বেচ্ছামত আপন জমিদারী শাসন করিত, পার্শ্বস্থ জমিদার সহ সন্ধি বিগ্রহ করিত। সম্রাটকে রাজস্ব দিত, এই মাত্র সম্বন্ধ ছিল। সেই রাজস্ব বাকি পড়িলে সম্রাট জমিদারের বিরুদ্ধ সৈন্য পাঠাইতেন। রাজস্ব বৃদ্ধি করিতে হইলে ধনবান্ জমিদারদিগের উপর আন্দাজী জমা বেশী ধরা হইত।

পাঠান সর্দ্দারেরা অধিকাংশই লেখা পড়া জানিত না। তাহাদের কর্ম্মচারিগণকে সময়ে সময়ে অনেক অপমান সহ্য করিতে হইত, কিন্তু তাহাদের প্রচুর অর্থলাভ হইত। প্রায়শঃ শূদ্রেরাই পারসী পড়িয়া তাহাদের চাকরী করিত। সেই শূদ্রদের নামের শেষে "লাল" শব্দ থাকিত; যথা মানিকলাল, মোহনলাল, কিষণলাল, প্যারীলাল ইত্যাদি। এইজন্য পাঠানেরা তাহাদিগকে "লালা লোক" বলিত। তাহারা আপনাদিগকে "কায়েত" বলিত এবং যাহারা জাতিতে কায়স্থ নহে, তাহারাও

অর্থব্যয় করিয়া ক্রমে ক্রমে কায়স্থ জাতিতে মিলিত হইত। পাঠানেরা সুন্দরী রমণী দেখিলেই হরণ করিতে চেষ্টা করিত। তাহারা অতিব্যয়ী ছিল, তজ্জন্য ধনীর ধনও হরণ করিত। বিশেষতঃ তাহাদের শূদ্র কর্ম্মচারীরা অর্থশোষণে একান্ত ব্রতী ছিল। পাঠান সর্দ্দারগণের আবাসের নিকটে কোন ধনী বা ভদ্রলোক বাস করিত না। দূরবাসী লোকেরাও ধন এবং সুন্দরী রমণী সংগোপনে রাখিত। পাঠানদিগের শূদ্র কর্ম্মচারীরাও নিজবাড়ী ও পরিবার দূরে রাখিত। পশ্চিম প্রদেশে পাঠানদিগকে "যম রাজা" এবং তাহাদের শূদ্র কর্ম্মচারীদিগকে "চিত্রগুপ্ত" বলিত। তাহা হইতেই পশ্চিমা কায়েতেরা আপনাদিগকে চিত্রগুপ্তের সন্তান বলে। বাঙ্গালী কায়েতদের অত্যাচার বোধ হয় কম ছিল। তাহাদের চিত্রগুপ্ত উপাধি ছিল না। বাঙ্গালী কায়েতেরা পূর্ব্বে কখনও আপনাদিগকে চিত্রগুপ্তের সন্তান বলিয়া পরিচয় দিত না। বাস্তবিক চিত্রগুপ্ত কোন ব্যক্তি নহে। মনের গুপ্ত পাপকে রূপক অলঙ্কারে চিত্রগুপ্ত বলে।

পাঠান রাজত্বে বিদ্যার চর্চ্চা কম হইয়াছিল। উৎপীড়ন ও দস্যুভয়ে শিল্প বাণিজ্যের অবনতি ঘটিয়াছিল। মূর্খতাজনিত কুসংস্কার অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তখন প্রায় সকল লোকেই অস্ত্র রাখিত এবং তাহা চালাইতে জানিত। লোকেরা অপেক্ষাকৃত সাহসী, বলবান্, পরিশ্রমী ও সুষ্ঠকায় ছিল। দেব দ্বিজ গুরুজনের প্রতি ভক্তি খুব বেশী ছিল। খাদ্যদ্রব্যের পারিপাট্য প্রচুর হ্রাস হইয়া ছিল কিন্তু লোকের আহার প্রচুর বেশী ছিল। সমস্ত দ্রব্য শস্তা ছিল। যে ব্যক্তি মাসে ২৲ দুই টাকা অর্জ্জন করিত, তাহার পরিবার প্রতিপালনে কোন কষ্ট হইত না। তখন পয়সা, আধুলি, সিকি, দুয়ানী ছিল না। টাকা ভাঙ্গাইলে এক বোঝা কড়ী পাওয়া যাইত, তাহা দ্বারাই সাধারণ সমস্ত দ্রব্যাদি ক্রয় করা চলিত। সেলাইকরা অঙ্গ-বস্ত্র এবং জুতার ব্যবহার হিন্দুদিগের মধ্যে অতি কম ছিল। তখন স্ত্রীলোকের উপর অতিশয় উৎপীড়ন ছিল। বৃদ্ধাদিগের সুখ ও সম্মান বরং এখন অপেক্ষা তখন ভাল ছিল। কিন্তু বৌদিগের কষ্ট ও অপমান অত্যধিক ছিল। বৌদের পিতা মাতা এবং ভ্রাতাদিগকেও বহু কষ্ট ও অপমান সহ্য করিতে হইত। সেই জন্যই এই সময় হইতে শ্যালক, শালী, শ্বশুর, প্রভৃতি শব্দ গালি বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। তখন রাজবিদ্রোহ এবং ডাকাতি বীরপুরুষের কার্য্য বলিয়া গণ্য ছিল। চুরি, ছুঁচামি, ঠগামি তখন অতি ঘৃণিত কার্য্য বলিয়া গণ্য হইত।

বাঙ্গালা বেহার ও উড়িষ্যা মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত হইলে ১৫৮০ খৃষ্টাব্দে রাজা তোড়রমল্ল দেওয়ান হইলেন। তাঁহারা ভাদুড়ীদিগকে পাঠানের পক্ষীয় জানিয়া জগৎনারায়ণের ক্ষমতা হ্রাস করিতে মনস্থ করিলেন। তাঁহারা একটাকিয়ার জমিদারী সাত পরগণা মধ্যে পাঁচ পরগণা জব্দ করিয়া তাহা সাঁতোড়ের রাজাকে দিয়াছিলেন। বৃহৎ পরগণা রামবাজু ভাঙ্গিয়া কালীগাঁও এবং কুশুম্বী নাম দিয়া দুই পরগণা করিলেন। তন্মধ্যে কালীগাঁও পরগণা খাস করিলেন। কেবল প্রতাপবাজু ও কুশুম্বী এই দেড় পরগণা মাত্র জগৎনারায়ণের থাকিল। কিন্তু তাহারও মালগুজারী প্রায় দ্বিগুণ হইল। আর জাগীর ভাদুড়িয়ার নজরানা এক টাকা এখন মালগুজারী স্বরূপ হইল। কিন্তু সেই টাকা দাখিলের পূর্ব্বে এক হাজার টাকা নর্ম্মা বা নজরানা দিবার হুকুম হইল। এই রূপে একটাকিয়ার বার্ষিক মুনাফা সাড়ে ছয় লক্ষ টাকার স্থলে কেবল দুই লক্ষ টাকা মাত্র থাকিল। তদবধি ভাদুড়ীদের ক্ষমতা ও মুনাফা সাঁতোড়ের রাজার অপেক্ষা অনেক কম হইল।

রাজা জগৎনারায়ণ মন্ত্রিগণ সহ পরামর্শ করিয়া সম্রাটের নিকট অতিবাদ* করিলেন। সেই অতিবাদে তিনি তিনটি বিষয়ে আপত্তি করিয়াছিলেন; যথা—

১। চাকলে ভাদুড়িয়া এ অধীনের বহুকালীন পুরুষানুক্রমিক নিষ্কর জাগীর আমরা কেবল গৌড়বাদশাহের অধীনতা স্বীকারে একটাকা নর্ম্মা দিতাম। দেওয়ান রাজা তোড়রমল্ল সেই জাগীরে মালগুজারী ধার্য্য করিয়া পুনরায় যে এক হাজার টাকা নর্ম্মা ধার্য্য করিয়াছেন তাহা অন্যায়।

২। আমরা আপদ বিপদে সাহায্য করার অঙ্গীকারে গৌড়বাদশাহের অধীনে জাগীর ভোগ করিতাম। হুজুরের সহ দাউদ শাহের যুদ্ধকালে আমি দাউদ

* উপরিতন বিচারকের নিকট নালিশের নাম অধিবাদ এবং সর্ব্বপ্রধান বিচারকের নিকট নালিশের নাম অতিবাদ। আপীল ও খাস আপীল হইতে অধিবাদ এবং অতিবাদ বিভিন্ন। নালীশ না করিয়া একবারে অধিবাদ হইতে পারিত এবং নালিশ ও অধিবাদ না করিয়া একবারে অতিবাদ করা যাইতে পারিত। উপরিস্থ হাকীম নিজ বিবেচনা মত সাক্ষ্য প্রমাণাদি লইতেন, উপযুক্ত তদন্ত করিতেন এবং তদনুসারে বিচার করিতেন। আপীলে যেমন নিম্ন আদালতের লিখিত নথী দৃষ্টে বিচার হয়, অধিবাদে তাহা হইত না। সুতরাং আপীল ও খাস আপীল শব্দের স্থলে অধিবাদ এবং অতিবাদ ব্যবহার করা যাইতে পারে না।

শাহের পক্ষে থাকিয়া নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়াছি। এখন হুজুরের কোন শত্রু উপস্থিত হইলে আমি অবশ্যই হুজুরের পক্ষেই থাকিব। দাউদের স্বপক্ষতা হেতু দেওয়ানজী যে আমার সাড়ে পাঁচ পরগণা জমিদারী জব্দ করিয়াছেন, তাহা অন্যায় হইয়াছে।

৩। এখন আমার যে দেড় পরগণা জমিদারী বহাল আছে, তাহার মালগুজারী অত্যন্ত অধিক হইয়াছে। তাহা চালান অধীনের অসাধ্য।

সেই অভিবাদ সমর্থনার্থ রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র কুমার চন্দ্রনারায়ণ খাঁ ভেট লইয়া আগরা রাজধানীতে গেলেন। তাঁহার সাহায্যার্থে লালা রামচন্দ্র সরকার এবং একজন সুযোগ্য মুসলমান মৌলবীও প্রেরিত হইল।

সম্রাট্ আক্‌বর সেই অভিবাদ শুনিয়া রাজা তোড়রমল্লের নিকট সবিস্তার কৈফিয়ত তলপ করিলেন। সেই কৈফিয়ত আসা সাপেক্ষে চন্দ্রনারায়ণ আগরাতে থাকিলেন। মধ্যে একবার মথুরা বৃন্দাবন গিয়া তীর্থ করিয়া আসিলেন। সময়ে সময়ে বাদশাহের সহিত সাক্ষাৎ করিতে থাকিলেন। তাঁহার আকৃতি প্রকৃতি কথাবার্ত্তায় তিনি যে সুশিক্ষিত এবং উচ্চবংশজাত, তাহা আক্‌বর বুঝিতে পারিলেন। কুমারের আনুযাত্রিক লালা ও মৌলবীর নিকট সম্রাট্ তাঁহার সম্পূর্ণ পরিচয় পাইলেন।

অন্যান্য দিগ্বিজয়ী জাতি হইতে তাতার জাতির রীতি সম্পূর্ণ বিপরীত। অন্যান্য জাতীয় লোক কোন দেশ জয় করিলে তথায় স্বকীয় ধর্ম্ম, ভাষা, রীতি-নীতি প্রচলিত করিতে চেষ্টা করে। কিন্তু তাতার জাতি কোন দেশ জয় করিলে নিজেরাই সেই দেশের ধর্ম্ম, ভাষা এবং আচার ব্যবহার গ্রহণ করে। মোগলেরা আগে মুসলমান রাজ্য জয় করিয়া মুসলমান হইয়াছিল, তাহার পরে ভারতবর্ষে আসিয়াছিল। এইজন্য তাহারা সম্পূর্ণ হিন্দু ব্যবহার অনুকরণ করে নাই। তথাপি মোগল সম্রাটদিগের ব্যবহার মুসলমান অপেক্ষা হিন্দু রাজনীতির অধিক অনুযায়ী ছিল। আক্‌বরের অধিকাংশ বেগমগুলি ক্ষত্রিয়রাজকন্যা। তাহারা প্রায় হিন্দু ব্যবহারেই থাকিত। সম্রাট্ হিন্দুর মধ্যে হিন্দু, মুসলমানের মধ্যে মুসলমান ছিলেন। তিনি মধ্যে মধ্যে খৃষ্টধর্ম্মের উপদেশও শুনিতেন। সকল ধর্ম্মের প্রতিই তাঁহার বাহ্য ভক্তি ছিল, কিন্তু কোন ধর্ম্মেই তাঁহার প্রকৃত আস্থা ছিল ছিল না। তিনি চন্দ্রনারায়ণের অভিজাত্যের পরিচয় তাঁহাকে আটক করত

নিজের এক কন্যার সহ তাঁহার বিবাহ দিয়া তাঁহাকে মুলতানের শুবাদার নিযুক্ত করিলেন। জাতিপাত হওয়ায় চন্দ্রনারায়ণ আর দেশে আসেন নাই। তাঁহার পরবর্ত্তী বিবরণ জানা যায় না।

বহুদিন পর রাজা তোড়রমল্ল কৈফিয়ৎ পাঠাইলেন। তিনি লিখিলেন যে—

১। যে ব্যক্তি বিবাদের একপক্ষকে আশ্রয় করে, তাহার আশ্রয় জয়ী হইলে আশ্রিতের লাভ হয় এবং পরাজয় হইলেই আশ্রিতের দণ্ড হয়। জগৎনারায়ণ ঠাকুরের পিতামহ শের শাহের পক্ষে থাকিয়া স্বর্গীয় হুমায়ুন বাদশাহের সহ যুদ্ধ করিয়াছিলেন। শের শাহ জয়ী হওয়ায় ঠাকুরেরা পুরস্কারও পাইয়াছিলেন। এখন ঠাকুরদের আশ্রয় দাউদ শাহ পরাজিত হইয়াছেন। আমরা উচিত রূপেই জগৎ ঠাকুরের কতক সম্পত্তি জব্দ করিয়াছি। সম্পত্তি নূতন উৎপন্ন হয় না। একজনের ক্ষতি ব্যতীত অন্যের লাভ হইতে পারে না। বাঙ্গালা দেশের যে সকল লোক আমাদের সাহায্য করিয়াছে, তাহাদিগকে সমুচিত পুরস্কার দেওয়া আবশ্যক। এইজন্য বিপক্ষপক্ষীয়দের কতক সম্পত্তি জব্দ করিয়া তাহাই স্বপক্ষদিগকে দেওয়া হইয়াছে।

২। নবাব সম্‌সুদ্দীন দিল্লীর বাদশাহের বিদ্রোহী হইয়া স্বাধীন হইয়াছিলেন। জগৎ ঠাকুরের পূর্ব্বপুরুষ ঠাকুর সুবুদ্ধিরাম সেই বিদ্রোহী নবাবের সাহায্য করিয়া জাগীর পাইয়াছিলেন। এখন বাঙ্গালা মুলুক পুনরায় দিল্লী সাম্রাজ্যভুক্ত হওয়ায় সেই জাগীর জব্দ হওয়াই উচিত। নবাব নাজিমের ইচ্ছা ছিল যে, জাগীর জব্দ করিয়া জমিদারী রূপে বন্দোবস্ত করা হয়। কিন্তু ব্রাহ্মণ ঠাকুর অতি পুরাতন আমীর এবং তাঁহার অধীনে হিন্দু মুসলমান সকলেই তুষ্ট আছে। আমি তাহা দেখিয়া ঠাকুরের জাগীর স্থিরতর রাখিয়াছি। তাঁহার যে একহাজার টাকা মাত্র নর্ম্মা ধার্য্য হইয়াছে, তজ্জন্য অধিবাদ না করিয়া ধন্যবাদ করাই তাঁহার উচিত।

৩। হিন্দু শাস্ত্র ও ব্যবহার মতে জমিদারেরা মোট রাজস্বের ১/৪ ৪/০ ভাগ পাইত। আমিও প্রায় তদ্রূপই দিয়াছি অর্থাৎ হাল বন্দোবস্তে সমস্ত জমিদারের উপরই সুমার জমার (মোট সংস্থার) দুই তৃতীয়াংশ মালগুজারী ধার্য্য করিয়াছি এবং ১/৩ ভাগ তাহাদের খরচ ও মুনাফা বাবত দিয়াছি। জগৎ ঠাকুরের উপরও তাহাই ধার্য্য হইয়াছে। তাঁহার জমিদারীতে কিছুমাত্র বেশী মালগুজারী ধরা

হয় নাই। ফলতঃ আমি ঠাকুর সাহেবের প্রতি অনুগ্রহ ভিন্ন কোন নিগ্রহ করি নাই। তবে কি না, আমি সরকারী চাকর; মালিকের ষোল আনা ঠিক রাখিয়া কাজ করিতে হইয়াছে। ঠাকুর জগৎনারায়ণ এখন আপনকার বৈবাহিক। তৎপ্রতি অনুগ্রহ করা হুজুরালির উচিত বটে। আমরাও তাহাতে তুষ্ট হইব।

আক্‌বর সেই কৈফিয়ত দৃষ্টে জগৎনারায়ণের প্রথম দুই আপত্তি সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিলেন। তৃতীয় আপত্তি সম্বন্ধে লিখিলেন যে, অন্যান্য জমিদারগণ অপেক্ষা একটাকিয়া ঠাকুরদের সম্মান অনেক বেশী। তাঁহাদের মালগুজারী অন্যান্য জমিদারগণ সহ তুল্য হইতে পারে না। তাঁহাদের মালগুজারী সুমার জমার নিস্পী অর্থাৎ অৰ্দ্ধেক হারে ধার্য্য করা যায়। এই হুকুমানুসারে জগৎ-নারায়ণের মালগুজারী বার্ষিক ছয় হাজার টাকা কমিল।

রাজা জগৎনারায়ণের তিন পত্নী এবং বহু উপপত্নী ছিল। এক স্ত্রীকে ভাল বাসিলে যে, অন্য কাহাকেও ভালবাসা যায় না, ইহা নিতান্ত অযৌক্তিক বিলাতী মত মাত্র। য়ুরোপীয়েরা যখন পশুর ন্যায় অসভ্য ছিল, তখনও তাহাদের বহুবিবাহের রীতি ছিল না। অথচ এশিয়া খণ্ডে চিরকালই বহু-বিবাহ প্রচলিত আছে। রাজা তাঁহার সমস্ত পত্নী ও উপপত্নী এবং তাহাদের সন্তানদিগকে ভাল বাসিতেন। তদ্ভিন্ন তাঁহার ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগিনী, জ্ঞাতি, কুটুম্ব সকলকেই আন্তরিক ভাল বাসিতেন এবং সকলকে লইয়া সাংসারিক সুখ ভোগ করিতেন। অথচ সেই বহু পরিবারের মধ্যে কোন বিবাদ ঝগড়া হইত না।

জগৎনারায়ণ বৃদ্ধকালে কানসাট গিয়া গঙ্গাবাস করিয়াছিলেন। তাঁহার পাটরাণীর গর্ভজাত জ্যেষ্ঠপুত্র চন্দ্রনারায়ণের জাতিপাত হইয়াছিল। পাট-রাণীর উপেন্দ্রনারায়ণ নামে একটি পুত্র শেষে হইয়াছিল। রাজার গঙ্গাযাত্রা-কালে উপেন্দ্রের বয়স দেড় বৎসর মাত্র। মধ্যম রাণীর কোন পুত্রসন্তান ছিল না। কনিষ্ঠা রাণীর পুত্র মহেন্দ্রনারায়ণ খাঁ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। জগৎনারায়ণ মহেন্দ্রের উপর সমস্ত ভার দিয়া তের বৎসর কাল জপ তপে গঙ্গাতীরে বাস করিয়াছিলেন। হিন্দুদের উইল করিবার রীতি ছিল না। বরং উইল বা তৎসদৃশ অন্য উপায়ে শাস্ত্রমত উত্তরাধিকারীর স্বত্বের কোনরূপ ব্যতি-ক্রম করা ধৰ্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্য বলিয়া গণ্য হইত। শাস্ত্রমত যাহার যাহা প্রাপ্য, মুমূর্ষু ধনীর তাহাতে কোন পরিবর্ত্তন করিতে অধিকার ছিল না। রাজ্য অবিভাজ্য

সম্পত্তি ছিল। সুতরাং জগৎনারায়ণের গঙ্গাপ্রাপ্তি হইলে মহেন্দ্রনারায়ণ একাকী সমস্ত রাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন।

জগৎনারায়ণের রাজত্বকাল বাঙ্গালা দেশের ইতিহাসে অতীব প্রসিদ্ধ। এই সময়ে বাঙ্গালা বেহার পুনরায় দিল্লীর সম্রাটের অধীন হইয়াছিল। এবং পাঠান রাজত্ব বিলুপ্ত হইয়া মোগল সাম্রাজ্য আরম্ভ হইয়াছিল। এই সময়ে বাঙ্গালার প্রসিদ্ধ রাজধানী গৌড়নগর মহামারীতে উৎসন্ন হইয়াছিল। এই সময়েই বাঙ্গালা দেশে জগদ্বিখ্যাত দুর্গোৎসব প্রচারিত হইয়াছিল। তাহার সঙ্গে সঙ্গে বাসন্তী পূজাও আরম্ভ হইয়াছিল। আর এই সময়ে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদের কৌলীন্য প্রথার সংস্করণ হইয়াছিল। এই সময়ে তাহিরপুরের রাজা কংসনারায়ণ রায় বাঙ্গালী হিন্দুসমাজের নেতা হইয়াছিলেন। এই সময়েই রাজা তোড়রমল্ল সমস্ত বাঙ্গালা ও বেহার জরিপ করিয়া রীতিমত জমাবন্দী করিয়াছিলেন।

রাজা কংসনারায়ণ, মনুসংহিতার টীকাকারক প্রসিদ্ধ পণ্ডিত কল্লূক ভট্টের সন্তান। তাঁহার পিতামহ উদয়নারায়ণ, সম্রাট্ গণেশ খাঁর শ্যালক এবং সাহায্যকারী ছিলেন, তিনিই প্রথম "রাজা" উপাধি প্রাপ্ত হন। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র জীবন রায়, গৌড় বাদশাহ যদুনারায়ণ খাঁর দেওয়ান ছিলেন। জীবনের ভ্রাতুষ্পুত্র কংসনারায়ণ, গৌড় বাদশাহ সলিমানের অধীনে ফৌজদার ছিলেন। কালাপাহাড়ের দৌরাত্ম-সময়ে তিনি কর্ম্মত্যাগ করিয়া ছদ্মবেশে গুপ্ত ছিলেন। যখন দাউদ খাঁ মোগল সম্রাট্ আকবরের সহ বিবাদ উপস্থিত করিলেন, তখন কংসনারায়ণ, সম্রাট্ আকবরের চোপদারী কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। মোগল সেনা বাঙ্গালা দেশ আক্রমণ করিতে আসিলে, তিনি সেই সেনার পথপ্রদর্শক এবং প্রধান মন্ত্রী হইয়াছিলেন। দেওয়ান তোড়রমল্ল বাঙ্গালা দেশের বন্দোবস্ত শেষ করিবার পূর্ব্বেই দিল্লীতে আহূত হইলে, কংসনারায়ণ "রাজা" উপাধিপ্রাপ্ত হইয়া শুবে বাঙ্গালা বেহারের দেওয়ান নিযুক্ত হইয়াছিলেন। শুবাদার মুনিম খাঁ মহামারীতে গতাসু হইলে, রাজা কংস-নারায়ণ প্রায় দুই বৎসর কাল দেওয়ানী ও শুবাদারী উভয় কার্য্যই নির্ব্বাহ করিয়া-ছিলেন। যখন সম্রাট্ আকবর তাঁহাকে শুবাদারী পদে স্থায়ীরূপে নিযুক্ত না করিয়া বাঙ্গালা ও বেহারের পৃথক পৃথক শুবাদার নিযুক্ত করিলেন এবং কংস-নারায়ণকে কেবল শুবে বাঙ্গালার দেওয়ানী করিতে আদেশ দিলেন, তখন

তিনি চাকরী ত্যাগ করিয়া নিজ জমিদারী শাসন এবং সামাজিক উন্নতি সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। রাজা কংসনারায়ণ একটি মহাযজ্ঞ করিতে উৎসুক হইয়া বাঙ্গালা দেশের সমস্ত প্রধান পণ্ডিতগণকে আহ্বান করিয়া তাঁহাদের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। বাসুদেবপুরের ভট্টাচার্য্যগণ বংশানুক্রমে তাহিরপুরের রাজাদের পুরোহিত ছিলেন। সেই পুরোহিতগোষ্ঠীর মধ্যে রমেশ শাস্ত্রী তৎকালে বাঙ্গালা বেহারের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান পণ্ডিত ছিলেন। তিনি কহিলেন, "বিশ্বজিৎ, রাজসূয়, অশ্বমেধ ও গোমেধ এই চারিটি মহাযজ্ঞ নামে কথিত। বিশ্বজিৎ এবং রাজসূয় কেবল সার্ব্বভৌম সম্রাটেরা করিতে পারেন। তুমি বাদশাহের অধীন নৃপতি; ঐ দুই যজ্ঞ তোমার সাধ্যাতীত। অশ্বমেধ, গোমেধ কলিতে নিষিদ্ধ। অপিচ এই যজ্ঞচতুষ্টয় ক্ষত্রিয়ের জন্যই প্রসিদ্ধ, উহা ব্রাহ্মণের পক্ষে শোভনীয় নহে। তোমার পক্ষে দুর্গোৎসব ভিন্ন অন্য কোন মহাযজ্ঞ উপযুক্ত নাই। সত্যযুগে সুরথ রাজা আদ্যাশক্তির অর্চ্চনা করিয়া চতুর্ব্বর্গ ফল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ত্রেতাযুগে স্বয়ং ভগবান্ রামচন্দ্র রাবণবধের জন্য অকালে সেই পূজা করিয়াছিলেন। তাহার ফলশ্রুতি মধ্যে উক্ত আছে, যে কেহ রামচন্দ্রের বিধানে ভক্তিভাবে দুর্গোৎসব করিবে, সে সর্ব্বযজ্ঞের ফল লাভ করিবে। এই যজ্ঞ, সকল যুগে সকল জাতীয় লোকেই করিতে পারে এবং এই এক যজ্ঞেই সকল যজ্ঞের ফল হয়। অতএব আমার বিবেচনায় তোমার এই যজ্ঞ কর্ত্তব্য।" সমাগত সমস্ত পণ্ডিতগণ তন্মতে সম্মতি দিলেন। তদনুসারে রাজা কংসনারায়ণ সাড়ে আট লক্ষ টাকা ব্যয়ে রাজসিক বিধানে দুর্গোৎসব করিলেন।

যদিও মার্কণ্ডেয় পুরাণে দুর্গোৎসবের কতক বৃত্তান্ত আছে বটে, কিন্তু সমগ্র বিধান কোন প্রাচীন গ্রন্থে নাই। আধুনিক দুর্গোৎসবপদ্ধতি রমেশ শাস্ত্রীপ্রণীত। যৎকালে সমুদায় দ্রব্য শস্তা ছিল, সেই সময়ে সাড়ে আটলক্ষ টাকা ব্যয়ে এই মহাযজ্ঞ প্রথম অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। সেই যজ্ঞের ধূমধাম, আনন্দ ও উৎসাহ দৃষ্টে সকলেই মোহিত হইয়াছিল। রাজা কংসনারায়ণের পুণ্য ও প্রতিষ্ঠা রাঢ়ে বঙ্গে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। রাজা জগৎনারায়ণ তদ্দৃষ্টে ঈর্ষাপরবশ হইয়া কংসনারায়ণকে অপাকরণ জন্য নয় লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া সুরথ রাজার বিধানে বাসন্তী দুর্গোৎসব করিলেন। কিন্তু বাসন্তী পূজা শারদীয়া পূজার ন্যায় প্রতিষ্ঠা লাভ করিল না। জগৎনারায়ণ নিজ পুরোহিতকে তাহার

কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, পুরোহিত কহিলেন, "রাজা কংসনারায়ণ ধর্ম্মার্থে শারদীয়া পূজা করিয়াছেন আর তুমি ঈর্ষা ও অহঙ্কার বশে বাসন্তী পূজা করিয়াছ; এই জন্য তাঁহার প্রতিষ্ঠা বেশী এবং তোমার প্রতিষ্ঠা কম হইয়াছে।"

জগৎনারায়ণ লজ্জিত হইয়া তদবধি উভয় পূজাই যথাকালে করিতে লাগিলেন। সাঁতোড়ের রাজা এবং অন্যান্য হিন্দু বড় লোকেরা দেখাদেখি শারদীয় দুর্গোৎসব আরম্ভ করিলেন। কেহ কেহ বাসন্তী পূজাও আরম্ভ করিলেন। সম্রাট শাহ জেহান বাঙ্গালা দেশে শারদীয়া পূজা দৃষ্টে মোহিত হইয়াছিলেন এবং নিজব্যয়ে ব্রাহ্মণ দ্বারা মহা আড়ম্বরে দুর্গোৎসব করিতেন। তৎপুত্র ঔরংজেব অতিশয় গোঁড়া মুসলমান ছিলেন। তিনি দুর্গোৎসব রহিত করিয়া সেই ব্যয়ে মুসলমানদের প্রধান পর্ব্ব মহরমে প্রচুর ধূমধাম করিতে লাগিলেন এবং নিজের যাবতীয় হিন্দু মুসলমান কর্ম্মচারিগণকে মহাসমারোহে মহরম করিতে আদেশ দিলেন। সেই আদেশ প্রতিপালিতও হইয়াছিল। কিন্তু মহরম আনন্দের ব্যাপার নহে। ইমাম হাসন ও হোসেনের অকালে বিনাশ জন্য শোক প্রকাশ করাই মহরমের উদ্দেশ্য। তাহাতে ধূমধাম সমারোহ করা প্রকৃত পক্ষে মুসলমান ধর্ম্মের বিরুদ্ধ কার্য্য। গোঁড়ামীতে অনেক সময়েই মূল উদ্দেশ্য হারাইয়া যায়। ঔরংজেবের পক্ষেও তাহাই হইয়াছিল। যাহা হউক, বাদশাহ এবং নবাবদিগের যত্ন ও অসাধারণ ব্যয় সত্ত্বেও মহরম পর্ব্ব কোন ক্রমে দুর্গোৎসবের তুল্য হইতে পারিল না।

বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদের কুলমর্য্যাদা সংশোধন রাজা কংসনারায়ণের দ্বিতীয় প্রসিদ্ধ কার্য্য। উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ী তাঁহার প্রথম পক্ষের পুত্র উমাপতি, শ্যামাপতি প্রভৃতি ছয় জনকে ত্যাগ করিয়া নিয়ম করিয়াছিলেন যে, সেই ছয়জন কৌলীন্যমর্য্যাদা-ভ্রষ্ট হইবে। আর যে কোন কুলীন তাহাদের সহ আদান প্রদান ও আহার ব্যবহার করিবে, তাহারাও পতিত হইবে। আবার তাদৃশ পতিত কুলীন সহ যাহারা কোন প্রকার সংস্রব করিবে, তাহারাও ভ্রষ্ট হইবে। পরবর্ত্তী কালে মধু মৈত্রের পুত্রেরাও পিতৃদ্রোহ অপরাধে ধৈ বাগছি কর্ত্তৃক ঐরূপ কৌলীন্যভ্রষ্ট হইয়াছিল এবং তাহাদের সহ সংস্রবেও অন্য কুলীনের কুলপাত হইবার নিয়ম হইয়াছিল। সেই পতিত কুলীনেরা কপটভাবে সংস্রব করিয়া বহুসংখ্যক কুলীনকে নিজ দলভুক্ত করিয়া বিলক্ষণ প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। এই কপট কুলীনদিগকে কাপকুলীন কিংবা সংক্ষেপে কাপ বলিত। রাজা কংসনারায়ণের

সময়ে কাপের সংখ্যা বিশুদ্ধ কুলীন অপেক্ষা অনেক বেশী হইয়াছিল। রাজার পুরোহিত বাসুদেবপুরের ভট্টাচার্য্যেরাও কাপ হইয়াছিলেন। কাপের প্রাবল্যে বিশুদ্ধ কুলীন নিঃশেষ হইবার উপক্রম হইয়াছিল। তজ্জন্য বিশুদ্ধ কুলীনেরা রাজা কংসনারায়ণকে ব্যবস্থা সংশোধন করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। রাজা নিজে সিদ্ধ-শ্রোত্রিয় মধ্যে শ্রেষ্ঠ অস্তাচল নামে খ্যাত ছিলেন।

রাজা কংসনারায়ণ সমস্ত কুলজ্ঞদিগকে, সমস্ত গাঁইকর্ত্তা কুলীনদিগকে এবং বহুসংখ্যক কুলীন, কাপ-কুলীন ও সিদ্ধ-শ্রোত্রিয়দিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিলেন। পরে তাঁহাদের নিকট উদয়নাচার্য্য ও ধৈ (ধ্যানরাম) বাগছির কৃত ব্যবস্থা সংশোধনের প্রয়োজন ব্যাখ্যা করিলেন। উক্ত দুই ব্যবস্থার কঠোরতা সকলেই অনুভব করিতেছিলেন; সুতরাং সকলেই আগ্রহের সহিত রাজার পোষকতা করিলেন। তখন রাজা কংসনারায়ণ নিয়ম করিলেন যে, (১) কাপ-কুলীনেরা বিশুদ্ধ কুলীন ও সিদ্ধ-শ্রোত্রিয়ের মধ্যবর্ত্তী হইবেন। (২) কাপ ও কুলীনের মধ্যে পুত্র কন্যার বিবাহ উপলক্ষে কুশবারি দ্বারা মর্য্যাদা পরিবর্ত্তন করিলেই কুলীন ভঙ্গ হইয়া কাপ হইবেন অথবা কুলীনের পুত্র কাপে দত্তক দিলে কুলীন ভঙ্গ হইয়া কাপ হইবেন। কাপের সহ আহার ব্যবহার বা অন্য কোন সংস্রবে কুলভঙ্গ হইবে না। (৩) সিদ্ধ-শ্রোত্রিয়েরা কাপে কন্যা না দিয়া পঠী পরিবর্ত্তন করিতে পারিবে না। (৪) সাধ্য ও কষ্ট শ্রোত্রিয়েরা অগ্রে কাপে বিবাহ না দিয়া কুলীনে বিবাহ দিতে পারিবেন না। (৫) কুলীন ও কাপগণ শ্রোত্রিয়ের কন্যা গ্রহণ করিতে পারিবেন, কিন্তু শ্রোত্রিয়ে কন্যা দিলে অমনি কুলভঙ্গ হইয়া শ্রোত্রিয় হইবেন। (৬) কুলীন ও কাপগণ কোন কুলীন বা কাপের বন্ধুহীনা কন্যা বিবাহ করিতে পারিবেন না; তাদৃশী কন্যা কেবল শ্রোত্রিয়ের গ্রাহ্য। (৭) কুলীন ও কাপের বিবাহে যেমন মর্য্যাদা পরিবর্ত্তন করিয়া সমীকরণ বা করণ করিতে হয়, শ্রোত্রিয়ের সমীকরণ করিতে হইবে না।

রাজার উক্ত ব্যবস্থা সভাস্থ সকলেই স্বীকার করিলেন। রাজা তাঁহার নিজের তিন কন্যা কাপে বিবাহ দিয়া তদুপলক্ষে কুলীন, কাপ ও শ্রোত্রিয়দিগকে একত্র ভোজন করাইলেন। তদবধি তাহিরপুরের রাজার সম্মান সাঁতোড় ও ভাদুড়িয়ার রাজাদের তুল্য হইল।

রাজা কংসনারায়ণের সময়েই বঙ্গ সাহিত্যের বিশেষ উন্নতি হয়। এই

সময়ে প্রসিদ্ধ কবি কৃত্তিবাস পণ্ডিতের আবির্ভাব হয়। ১৪৩০ শকে নদীয়া জেলার ফুলিয়া গ্রামে মুখুটী ব্রাহ্মণের ঘরে কৃত্তিবাসের জন্ম হয়। কথিত আছে কৃত্তিবাস রাজপণ্ডিত হইবার জন্য কংসনারায়ণের রাজসভার দ্বারে উপস্থিত হইলেন, দ্বাররক্ষকের দ্বারা স্বরচিত পাঁচটী শ্লোক রাজার নিকট প্রেরণ করিলেন। রাজা এই শ্লোক পাঠ করিয়া অত্যন্ত প্রীত হইয়া তাঁহাকে রাজদরবারে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। রাজসমীপে যাইয়া কৃত্তিবাস আরও সাতটী শ্লোক পাঠ করিলেন। সভায় তাঁহার পাণ্ডিত্যের ভূয়সী প্রশংসা হইল। রাজাদেশে রাজকর্ম্মচারী তাঁহার মস্তকে চন্দনের ছড়া ছিটাইলেন। রাজা তাঁহাকে পট্টবস্ত্র পুরস্কার করিলেন। পরে তাঁহাকে ভাষাকাব্যে রামায়ণ রচনার আদেশ করেন। ১৪৬০ শকে রামায়ণ রচিত হয়। কৃত্তিবাসের পরবর্ত্তী কবি মুকুন্দরাম। বর্দ্ধমান জেলার দামুন্যা গ্রামে সম্ভবতঃ ১৪৭০ শকাব্দে মুকুন্দরামের জন্ম হয়। ইঁহারা রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ। তিনি পারসী এবং সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের চণ্ডী সম্ভবতঃ ১৫২০ শকাব্দে রচিত হয়। কি মানব চরিত্র অঙ্কণে, কি করুণ রসের উদ্দীপনে, কি নিসর্গ বর্ণনে, মুকুন্দরাম সর্ব্ব বিষয়েই, চণ্ডীকাব্যে অসামান্য প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। তিনি আপন সাময়িক আচার ব্যবহার যেরূপ বর্ণন করিয়াছেন, এবং প্রাচীন সমাজের যেরূপ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর আলেখ্য আঁকিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার চণ্ডী কেবল কাব্যাংশে নহে, ঐতিহাসিক হিসাবেও অতি উপাদেয় গ্রন্থ।

রাজা জগৎনারায়ণের শেষাবস্থায় অম্বরের (জয়পুরের) রাজা মানসিংহ বাঙ্গালার শুবেদার হইয়া আসিয়াছিলেন। ইহার পূর্ব্বে বা পরে কখন কোন হিন্দু বাঙ্গালার শুবেদার হইতে পারেন নাই। রাজা কংসনারায়ণ কিছুদিন শুবেদারের কাজ চালাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি শুবেদাররূপে নিযুক্ত হন নাই।

নবম অধ্যায়।

তোড়রমল্লের বন্দোবস্ত।—কায়স্থ জাতির ইতিহাস।—রাজা মানসিংহ।

রাজা তোড়রমল্ল পঞ্জাবী ক্ষেত্রি বা ক্ষত্রিয় ছিলেন। তিনি দিল্লীতে সামান্যরূপ বাণিজ্য ব্যবসায় করিতেন। আকবরের নাবালকী সময়ে নবাব খানখানান বের্হাম খাঁ খাদ্যদ্রব্যে বিষ দিয়া আকবরকে অপহত্যা করিতে উদ্যোগ করিয়াছিলেন। বের্হামের এক দাসী তোড়রমল্লের উপপত্নী ছিল। তোড়র সেই দাসীর যোগে সেই চক্রান্ত জানিয়া আকবরের জননী নিয়ামত বেগমকে সংবাদ দিয়াছিলেন। তদন্তে চক্রান্ত ধরা পড়িল, সুতরাং সম্রাটের প্রাণরক্ষা হইল। ইহাতেই তোড়রমল্লের উন্নতি হইল এবং আকবরের হিন্দুপ্রীতি সঞ্চার হইল। তিনি হিন্দুদের প্রতি যতই অধিকতর বিশ্বাস করিতে লাগিলেন, ততই বেশী উপকার পাইতে লাগিলেন। তাঁহার মুসলমান জ্ঞাতিকুটুম্বেরা বিদ্রোহী হইলেও আকবর হিন্দুদের সহায়তায় রক্ষা পাইয়াছিলেন। আকবরের হিন্দুয়ানী, মুসলমানী ও খৃষ্টানী বহু পত্নী ও উপপত্নী ছিল, কিন্তু আকবর কখন হিন্দু বেগমের ঘরে ভিন্ন অন্যের ঘরে নিদ্রা যাইতে সাহসী হইতেন না। ইহাই মোগলরাজত্বে হিন্দুদিগের উন্নতির কারণ। রাজা তোড়রমল্ল আকবরের দেওয়ান হইয়া ঠিক হিন্দুরীতিক্রমে জরিপ জমাবন্দী করিয়াছিলেন এবং হিন্দু রাজ্যশাসনপ্রণালী অধিকাংশ মোগল দরবারে প্রচলিত করিয়াছিলেন। তৎকৃত বন্দোবস্তের বিস্তৃত বিবরণ যাহা পাওয়া যায়, তাহা এই যে—

(১) অম্বর, যোধপুর প্রভৃতি প্রদেশীয় মহারাজগণ—যাঁহারা মোগল সম্রাটের অধীন ছিলেন, রাজা তোড়রমল্ল তাঁহাদিগকে বশী রাজা গণ্য করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহাদের রাজ্যের জরিপ জমাবন্দি না করিয়া কেবল তাঁহাদের উপর একটি নির্দ্দিষ্ট কর ধার্য্য করিয়াছিলেন, অধিকন্তু তাঁহারা সম্রাটের আবশ্যক মতে কোন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ সেনা সহ সম্রাটের আদিষ্ট যুদ্ধকার্য্যে সাহায্য করিতে বাধ্য ছিলেন। যিনি যে পরিমাণ সৈন্য দিতে বাধ্য ছিলেন, তিনি সেই পরিমাণ সেনার মনসবদার উপাধি পাইতেন।

(২) অপর জমিদারগণকে তোড়রমল্ল করদ রাজা গণ্য করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহাদের জমিদারী জরিপ করিয়া বিভিন্ন প্রকার জমির পৃথক্ পৃথক্ পরিমাণ নিরূপণ করিয়াছিলেন। সেই সময়ে যেরূপ "হাত" জরিপে ব্যবহৃত হইয়াছিল, তাহার দৈর্ঘ্য ইংরেজী ২২½ইঞ্চি।* সেই হাতের ১০০ হাত দীর্ঘ এবং ১০০ হাত প্রস্থ ভূমিকে কুলা, কুড়া বা বিঘা বলা যাইত। দীর্ঘে বেশী প্রস্থে কম হইলেও যদি মোট পরিমাণে ১০,০০০ বর্গহস্ত হইত, তাহাও এক কুড়া বলিয়া গণ্য হইত। এক কুড়ার ১/২০ বিশ ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ ৫০০ বর্গ হস্তে এক বিশোয়া হইত। আবার তাহার ১/২০ অংশে অর্থাৎ ২৫ বর্গহস্তে এক ধুল বা ধুর হইত। এক হাত দীর্ঘ এক হাত প্রস্থ জমিকে অর্থাৎ এক বর্গহস্ত ভূমিকে এক কৌণী ধরা হইত। থাক বস্তার নিয়মে জরিপ করিয়া নক্শা তৈয়ারি করা হইয়াছিল এবং তাহার চিঠাপৈঠা তৈয়ারি করা হইয়াছিল। সেই চিঠাপৈঠাতে জমিদারের প্রত্যেক প্রজার কি প্রকারের কত পরিমাণ জমি আছে, তাহা লিখিত হইয়াছিল। বিল, পুষ্করিণী, দীঘী, ইন্দারাগুলি জলা জমি বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। নদী ও বৃহৎ হ্রদগুলি জলকর নামে অভিহিত হইত।

(৩) ভারতবর্ষীয় জমিতে সাধারণতঃ দুই বৎসর ভাল রূপ শস্য হয়। তৃতীয় বর্ষে শস্য কিছু কম হয় এবং চতুর্থ বর্ষে অত্যন্ত কম হয়। ফলতঃ সকল বৎসরে শস্য সমান হয় না। গড় পড়তায় চারি বৎসরের লভ্য একুন করিয়া তাহার ¼ চতুর্থাংশ রাজা তোড়রমল্ল প্রত্যেক কৃষিক্ষেত্রের বার্ষিক লভ্য ধরিয়াছিলেন। সেই লভ্যের ⅙ ষষ্ঠাংশ তিনি প্রজার দেয় রাজস্ব ধার্য্য করিয়াছিলেন। জলকর, ফলকর, বনকর ও ধনকরের পাঁচ বৎসরের লভ্যের ⅕ পঞ্চমাংশ বার্ষিক লভ্য ধরিয়া তাহার ⅙ ষষ্ঠাংশ রাজস্ব ধার্য্য করিয়াছিলেন। শিল্পী, বণিক্, দালাল, মহাজন, গোপ, চিত্রকর, বেশ্যা, গায়ক প্রভৃতি ব্যবসায়ীদিগের লভ্যের নাম ধনকর। এইরূপ রাজস্ব যাহা জমিদার মোট আদায় করিবেন, তাহার নাম সুমার জমা (মোট সংস্থা)। হিন্দু শাস্ত্রমত করদ রাজারা মোট সংস্থার ৭/২৮ ভাগ পাইতেন। রাজা তোড়রমল্ল সেই স্থলে সুমার জমার ⅓ তৃতীয়াংশ জমিদারের প্রাপ্য নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। বাকি ⅔ ভাগ সম্রাটের প্রাপ্য ছিল।

* সেই ২২½ ইঞ্চি হাতই তখন প্রচলিত ছিল। তদ্দারা প্রতিপন্ন হয় যে, তখন মনুষ্যদের আকৃতি বৃহৎ ছিল।

(৪) জমিদারের অধীনে যে সকল তালুকদার ছিল, তাহারা উপরি উক্ত নিয়মে নিজ প্রজার নিকট যাহা আদায় করিবে, তাহার ⅓ তৃতীয়াংশ তাহারা পাইবে। অবশিষ্ট ⅔ অংশ জমিদারকে দিবে। আবার জমিদার সেই টাকার ⅓ তৃতীয়াংশ নিজে পাইবেন, বাকি ⅓ ভাগ অর্থাৎ তালুকদারী জমির সুমার জমার $\frac{8}{9}$ ভাগ সম্রাটের প্রাপ্য ছিল।

ইংরেজ ঐতিহাসিকগণ প্রজার সহ দেওয়ান তোড়রমল্লের বন্দোবস্ত দেখিয়া অনুমান করেন যে, আক্‌বরের সময়ে জমিদার তালুকদার প্রভৃতি মধ্যবর্ত্তী ভূম্যধিকারী ছিল না। কিন্তু তাহা ভুল। আক্‌বর ও অন্যান্য মুসলমান সম্রাটের আমলে সমস্ত দেশই জমিদার ও তালুকদারগণ কর্ত্তৃক শাসিত হইত। সম্রাট্‌দের খাস দখলী কোন ভূমি ছিল না। তোড়রমল্ল যে প্রজা সহ রাজস্ব ধার্য্য করিয়াছিলেন, জমিদারগণের সংস্থা নিরূপণ করাই তাহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। অধিকন্তু জমিদার ও তালুকদারগণ প্রজার নিকট অতিরিক্ত খাজনা না লইতে পারে, ইহাও অন্যতর অভিপ্রায় ছিল। রাজা তোড়রমল্ল যেমন জমিদার, প্রজা এবং সম্রাটের হিতকর বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, পরবর্ত্তী কেহই তদ্রূপ করিতে পারেন নাই। এমন কি, আধুনিক ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট বারংবার প্রজা ভূম্যধিকারী সম্বন্ধীয় আইন সংশোধন করিয়াও ততদুর উৎকৃষ্ট বন্দোবস্ত করিতে সমর্থ হন নাই। এখন বহুব্যয় করিয়া মকদ্দমা করতঃ প্রজা ও জমিদার সর্ব্বস্বান্ত হয়, অথচ যথোচিত সুফল লাভ করিতে পারে না। তোড়রমল্ল-কৃত বন্দোবস্তে অতি সহজে বিনা ব্যয়ে সম্রাট্, জমিদার এবং প্রজার উচিত স্বার্থ রক্ষা হইত।

ইংরেজ ইতিবৃত্তবেত্তারা আরও বলেন যে, মোগল সাম্রাজ্যে জমিদারেরা কেবল করসংগ্রাহক কর্ম্মচারী মাত্র ছিল। ইংরেজের আমলে লর্ড কর্ণওয়ালিস্ সাহেব জমিদারদিগকে মালিকী স্বত্ব দিয়াছেন। তাহাও ভুল। জমিদারেরা পূর্ব্বেও পুরুষানুক্রমিক ভূম্যধিকারী ছিলেন বরং তাঁহাদের ক্ষমতা অনেক বেশী ছিল। তখন শান্তিরক্ষার ভার জমিদারের উপর ছিল এবং তাঁহাদের বিচারাধিকার ছিল। তৎকালে তাঁহারা সর্ব্বাংশেই করদ রাজা ছিলেন। কিন্তু জমি দান বিক্রয়াদি দ্বারা হস্তান্তর করিবার স্পষ্ট ক্ষমতা জমিদার বা প্রজার ছিল না। কেননা জমিদারগণের যে সকল ক্ষমতা ছিল, তাহাতে হস্তান্তর করিতে ক্ষমতা দেওয়া যাইতে পারে না। আবার প্রজাদিগকে জমি হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা

দিলে তাহারা মহাজন কিংবা বিপক্ষ জমিদারের নিকট জমি বিক্রয় করিয়া অনেক অনিষ্ট ঘটাইতে পারিত। এই জন্য হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা স্পষ্টরূপে কাহাকেও প্রদত্ত হইত না। অথচ যেখানে কোন আপত্তির কারণ না থাকিত, সেখানে প্রজা-জমি হস্তান্তর করিলে জমিদারগণ গ্রহীতাকে প্রজারূপে স্বীকার করিয়া লইতেন। তেমনই জমিদার নিজ জমিদারী অন্য কোন সুযোগ্য লোককে দিলে, নবাব ও সম্রাট্‌গণ গ্রহীতাকে জমিদার বলিয়া সনন্দ দিতেন। এইরূপে নির্দ্দোষ হস্তান্তর প্রচলিত ছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট জমিদারগণের রাজকীয় ক্ষমতা সমস্তই হরণ করিয়াছেন, সুতরাং জমিদারী সমস্ত বা আংশিক হস্তান্তর করিতে কোন বাধা দেওয়া আবশ্যক হয় না। শুবে বাঙ্গালা ও বেহারের বন্দোবস্ত সম্পূর্ণ শেষ হইবার পূর্ব্বেই রাজা তোড়রমল্ল দিল্লীতে আহূত হইয়াছিলেন। নায়েব দেওয়ান রাজা কংসনারায়ণ রায় বন্দোবস্ত শেষ করিয়া চিঠাপৈঠা এবং নক্‌সা সম্রাটের নিকট পাঠাইয়াছিলেন। তাহাতে শুবে বাঙ্গালার রাজস্ব ৬৭,০০,০০০ সাতষট্টি লক্ষ এবং শুবে বেহারের রাজস্ব ৪০,০০,০০০ চল্লিশ লক্ষ, মোট এক কোটি সাত লক্ষ টাকা সম্রাটের বার্ষিক প্রাপ্য হইয়াছিল। সম্রাট তুষ্ট হইয়া রাজা কংসনারায়ণকে খেলাত ও দেওয়ানী সনন্দ দিয়াছিলেন।

* * * *

ভগবান্ পরশুরাম তৎকাল-জীবিত সমস্ত ক্ষত্রিয়দিগকে বিনষ্ট বা জাতিভ্রষ্ট করিয়া পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া করিয়াছিলেন। তখন সমস্ত মহর্ষিগণ তাঁহাকে ক্রোধ পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করিলেন। ভৃগুরাম কহিলেন, "বহুসংখ্যক ক্ষত্রিয় পত্নী এখন গর্ভবতী আছে। স্ত্রীবধ-পাপাশঙ্কায় আমি তাহাদের গর্ভস্থ সন্তান নষ্ট করিতে পারি নাই। তাহাদের সন্তান জন্মিলে সমস্ত পুত্রসন্তান নষ্ট করিয়া তাহার পর আমি ক্রোধ পরিত্যাগ করিব। এক্ষণে ক্রোধ ত্যাগ করিলে, নব-প্রসূত ক্ষত্রপুত্রগণ দ্বারা ক্ষত্রিয় বংশ বিদ্যমান থাকিবে, সুতরাং আমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইবে।" ঋষিগণ কহিলেন, "আপনি বহুল ক্ষত্রিয়গণকে জাতিচ্যুত করিয়া জীবন রক্ষা করিয়াছেন। গর্ভস্থ ক্ষত্রিয়সন্তানদিগকে তদ্রূপ শূদ্রত্বে পাতিত করিয়া তাহাদের প্রাণ রক্ষা করুন এবং ক্রোধাগ্নি ত্যাগ করুন।" পরশুরাম সম্মত হইলেন। তখন ভৃগুরাম ঋষিগণ সহকারে বিধান করিলেন যে, "বর্ত্তমান

গর্ভবতী ক্ষত্রপত্নীদের যে সন্তান হইবে, তাহারা শূদ্র হইবে। আর বিধবা ক্ষত্র-পত্নীদের গর্ভে ব্রাহ্মণের ঔরসে যে সন্তান হইবে, তাহারাই ক্ষত্রিয় জাতি গণ্য হইবে। তদনুসারে সেই গুর্ব্বিণী ক্ষত্রিয়াদের সন্তানেরা শূদ্র হইল। তাহারা গর্ভে ছিল, এইজন্য তাহারা কায়স্থ (কায়+স্থা+ড) জাতি নামে অভিহিত হইল। কায়স্থেরা বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় সন্তান, আর তাহারা যে পাপে পতিত হইয়াছিল, তাহা তাহাদের স্বকৃত নহে। এইজন্য তাহারা সকল শূদ্র হইতে শ্রেষ্ঠ গণ্য হইত।

জাতিমালায় কায়স্থজাতির এই ইতিহাস পাওয়া যায়। অন্য কোন সংস্কৃত পুস্তকে এই কায়স্থ জাতির কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। কিন্তু "কায়স্থ" শব্দটী বহু গ্রন্থে অন্যান্য অর্থে ব্যবহৃত দেখা যায়। কায়স্থ শব্দের মূলার্থ "শরীর-স্থিত"। চিকিৎসা শাস্ত্রে এবং গীতাতে সর্ব্বত্রই এই মূলার্থে কায়স্থ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

যথা,— (১) কায়স্থং নিগূঢ়ব্যাধিং (শরীরস্থিত গুপ্তরোগ)।

(২) কায়স্থাঃ কৃমিনিকরাঃ—(শরীরস্থিত চর্ম্মকৃমিসমূহ)।

গীতাতে (৩) কায়স্থোঽপি ন কায়স্থঃ—(শরীরের মধ্যে থাকিয়াও শরীরের অংশ নহে)।

হিন্দু রাজাদিগের গুপ্ত মন্ত্রী বা গুপ্তচরদিগকেও কায়স্থ বলা যাইত। তাহারা যে রাজার চাকর, তাহা কেহ জানিতে পারিত না। তাহারা রাজ্য মধ্যে চোর, দস্যু এবং রাজবিপক্ষ লোকদের কার্য্য, গতিবিধি এবং গুপ্তস্থান অনুসন্ধান করিত। এই অর্থে রাজতরঙ্গিণী ও রাজনীতিতে অনেক স্থলে "কায়স্থ" শব্দ দেখা যায়। তাহা কেবল চাকরীর উপাধি মাত্র, কোন জাতিবিশেষ-বোধক নহে। কাশ্মীরে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্যজাতীয় লোকের বসতি ছিল না। রাজতর-ঙ্গিণীর কথিত কায়স্থ পদবীর লোকেরা সকলেই জাতিতে ব্রাহ্মণ।

আধুনিক কায়স্থেরা আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় প্রতিপাদন করিবার জন্য নানাবিধ কৃত্রিম শ্লোক প্রস্তুত করিয়া তাহা পুরাণাদি গ্রন্থে ভরতি করিয়া মুদ্রিত করিয়া থাকে। অনেক স্থলে যথার্থ শ্লোকের মিথ্যা অর্থ করিয়া প্রচার করিতে চেষ্টা করে। তাহা ত্যাগ করিলে দেখা যায় যে, কায়স্থ জাতির কোন উল্লেখ জাতি-মালা ভিন্ন অন্য কোন পুরাতন পুস্তকে নাই। তাহা হইতে অনুমান হয় যে, হিন্দু রাজত্বকালে কায়স্থজাতি কুত্রাপি প্রতিভা পায় নাই। বরং অনেকে অনুমান করেন যে, কায়স্থ জাতি অন্যান্য শূদ্রগণ সহ মিলিত হইয়া পৃথক্ অস্তিত্বশূন্য

হইয়াছিল। কিন্তু আমরা এই মতটি যুক্তিসঙ্গত বোধ করি না। কারণ, যাহার আসল নাই, তাহার নকল হইতে পারে না। সুতরাং প্রকৃত কায়স্থজাতি না থাকিলে কদাচ কৃত্রিম কায়স্থ হইত না। প্রাচীন গ্রন্থাদিতে শ্রেণী উল্লেখের রীতি ছিল না তজ্জন্য প্রাচীন গ্রন্থে কেবল শূদ্র শব্দ দেখা যায়। তাহারা কায়স্থ, কি অন্য জাতীয় শূদ্র তাহা প্রকাশ নাই। পাঠান রাজত্বেই বোধ হয় বর্ত্তমান কায়স্থজাতির উৎপত্তি বা উন্নতি হইয়াছে। সেই উন্নতির কারণ যতদূর জানা যায় তাহা এই যে, মুসলমান রাজত্ব স্থাপিত হইলে পারসী, আরবী প্রভৃতি যাবনিক ভাষা রাজভাষা হইল। উচ্চজাতীয় হিন্দুরা বহুদিন পর্য্যন্ত সেই যাবনিক ভাষা পাঠ করিত না। সেই সুযোগে কতকগুলি শূদ্র পারসী পড়িয়া পাঠানদিগের চাকরী লইয়াছিল। তাহারা অজ্ঞ পাঠানদিগকে ঠকাইয়া এবং প্রজাপীড়ন, উৎকোচ গ্রহণাদি উপায়ে প্রচুর উপার্জ্জন করিত। তাহারা আপনাদিগকে কায়েত বলিয়া পরিচয় দিত। কায়েত শব্দ বোধ হয় কায়স্থ শব্দেরই অপভ্রংশ। কিন্তু কায়েত শব্দ কোন জাতিবিশেষে আবদ্ধ ছিল না। যে কোন জাতীয় হউক, সমস্ত শিক্ষিত শূদ্রই কায়েত উপাধিতে অধিকারী ছিল। ইহাদের নামের শেষে প্রায়ই "লাল" শব্দ যুক্ত থাকিত, এইজন্য পাঠানেরা ইহাদিগকে লালা লোক বলিত। সেই কায়েত বা লালাগণ কিছু অর্থব্যয় করিয়া কোন পুরাতন কায়স্থ পরিবার সহ দুই একটি বিবাহ আদান প্রদান করিলেই, তাহারা কায়স্থ বলিয়া গণ্য হইত।

পশ্চিম ভারতের কায়েতদিগের দেখাদেখি বাঙ্গালা দেশের উন্নত শূদ্রেরাও কায়েত উপাধি ধারণ করিয়াছিল। কিন্তু তাহারা পূর্ব্বে আপনাদিগকে চিত্রগুপ্তের সন্তান বলিত না। যে সকল পশ্চিমা শূদ্র শ্রোত্রিয়দের সেবক রূপে আসিয়া বাঙ্গালাদেশে বাস করিয়াছিল, তাহাদের সন্তানেরা অধিকাংশই কায়েত উপাধি ধারণ করিল। তদ্ভিন্ন নানা শ্রেণীর শূদ্রগণ মধ্যে যাহারা বিদ্যায় বা সঙ্গতিতে উন্নতিলাভ করিয়াছে, তাহারাই কায়স্থ জাতিতে প্রবেশ করিয়াছে। এই রূপে অধিকাংশ উন্নত শূদ্র কায়স্থ হওয়ায় কাজেই অন্যান্য শূদ্রগণ অপেক্ষা কায়স্থজাতির বিদ্যা, বুদ্ধি এবং অবস্থা সমুন্নত হইয়াছে। এখানে ইহা প্রকাশ করা আবশ্যক যে, শ্রোত্রিয়দের সেবক ও নাবিকরূপে যে সকল শূদ্র কানোজ হইতে বাঙ্গালা দেশে আসিয়াছিল, তাহারা কায়স্থ ছিল কি না, তাহা কুত্রাপি প্রকাশ নাই। সমস্ত কুলশাস্ত্রে তাহাদিগকে কেবল শূদ্র বলিয়া উক্তি আছে। কোন্

শ্রেণীর শূদ্র তাহা ব্যক্ত নাই। কেননা প্রাচীনকালে কোন জাতির শ্রেণীর উল্লেখ করিয়া লিখিবার রীতি ছিল না। কোন ব্রাহ্মণেরও কুত্রাপি "কোন্ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ" তাহা প্রকাশ নাই। তজ্জন্য ব্রাহ্মণদের অনুচরদিগকেও কেবল শূদ্র বলিয়া লেখা হইয়াছে। সেই উক্তি হইতে, তাহারা কায়স্থ ছিল কিনা, ইহা নিরুপণ করা যায় না।

কানোজীয় ব্রাহ্মণেরা বাঙ্গালা দেশের শূদ্রগণ অপেক্ষা আপনাদের অনুচর পশ্চিমা শূদ্রদিগকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিতেন। তাঁহাদের অনুকরণে গৌড়ের বৈদ্য রাজারাও সেই পশ্চিমা শূদ্রদিগকে অপর শূদ্রাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পদ দিয়াছিলেন। বঙ্গ-দেশের বৌদ্ধরাজা ধর্ম্মপাল, হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া শূদ্র শ্রেণীতে গণ্য হইয়াছিলেন। তৎপুত্র দেবপাল পশ্চিমা শূদ্রদিগকে সমধিক সম্ভ্রান্ত দেখিয়া তাহাদের দলে প্রবেশ করিতে ইচ্ছুক হইলেন। তিনি গৌড় নগর হইতে কয়েকটি পশ্চিমা শূদ্র আনিয়া বঙ্গদেশে স্থাপন করিয়াছিলেন। আবার তাহাদের ঘরে নিজ পুত্র কন্যার বিবাহ দিয়া তাহাদের সমাজে মিলিত হইয়াছিলেন। তিনি তাহাদিগকে উচ্চ রাজকীয় চাকরী এবং সম্পত্তি দিয়া তাহাদের সম্মান বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। আধুনিক বঙ্গজ কায়স্থগণ তাহাদেরই সন্তান বলিয়া পরিচিত। ইহাই বাঙ্গালী কায়স্থদের প্রথম উন্নতি।

সম্রাট্ বল্লাল সেন কতিপয় পশ্চিমা শূদ্রকে রাজকীয় পদ দিয়াছিলেন। দত্ত-গোষ্ঠীর একজনকে সেনাপতি করিয়াছিলেন। পরে কুলমর্য্যাদা স্থাপন সময়ে ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যের পরেই পশ্চিমা শূদ্রগণকে স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহাই বাঙ্গালী কায়স্থদের উন্নতির দ্বিতীয় সিঁড়ি।

* * * *

রাজা মানসিংহ রাজপুতনার অন্তর্গত অম্বর রাজ্যের রাজা ছিলেন। ইঁহারা সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয় এবং ভগবান্ রামচন্দ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র কুশের সন্তান বলিয়া পরিচিত (কাছোয়া বা কুশাবহ বংশ)। এই বংশীয় রাজারা মোগল সম্রাট্দিগের নিতান্ত অনুগত এবং অনুগৃহীত ছিলেন। ইঁহাদের সুন্দরী কন্যা প্রায় সমস্তই বাদশাহের ঘরে বিবাহ দিতেন এবং ইঁহারা বংশানুক্রমে বাদশাহের সেনাপতি ছিলেন। এই বংশীয় রাজারা এবং যোধপুরের রাথোর বংশীয় রাজারা সময়ে সময়ে বাদশাহের অধীনে শুবাদারী করিতেন। সেবাই

জয়সিংহ বা দ্বিতীয় জয়সিংহের সময়ে জয়পুর নগর নির্ম্মিত হইলে, তাহাতেই রাজধানী হইয়াছে। তদবধি এই রাজ্যটি জয়পুর রাজ্য নামে খ্যাত হইয়াছে।

হিঃ ৯৯৭ সালে মানসিংহ বঙ্গদেশে উপস্থিত হন। উড়িষ্যায় পাঠানদিগকে দমন, বেণীরায়ের দস্যুতা নিবারণ, কোচবিহারের মহারাজের সহ সন্ধিস্থাপন এবং যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্যকে দমন এই চারিটী মানসিংহের বাঙ্গালা দেশে প্রধান কার্য্য।

বাঙ্গালা দেশের অধিকাংশ পাঠান দাউদ খাঁর সহ উড়িষ্যায় গিয়া বাস করিয়াছিল। তাহারা সুযোগ পাইলেই বাঙ্গালাদেশ অধিকার করিতে চেষ্টা করিত। রাজা মানসিংহ বারংবার পাঠানদিগকে পরাস্ত করিয়া, তাহাদিগকে মোগল সম্রাটের অধীনতা স্বীকারে বাধ্য করিয়াছিলেন। এই সময় হইতে প্রায় দুই শত বৎসর বাঙ্গালা দিল্লীর সম্রাটের অধীন ছিল এবং তাঁহাদের প্রেরিত এক এক জন শুবাদার বাঙ্গালা শাসন করিতেন। অনেক সময়ে রাজকুমারেরা বাঙ্গালার শুবাদার হইয়া আসিতেন।

বেণীরায়ের ডাকাইতী নিবারণ মানসিংহের দ্বিতীয় কার্য্য। বেণীমাধব রায় একজন কুলীন বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ ছিলেন। বোধ হয় সংস্কৃত ভাষাতেও তাঁহার পাণ্ডিত্য ছিল। সেই জন্যই পরে তাঁহার "পণ্ডিত ডাকাইত" নাম হইয়াছিল। তাঁহার এক পত্নী পরম সুন্দরী ছিল। একজন মুসলমান সর্দ্দার সেই সুন্দরী অপহরণ করায়, বেণীরায় সংসার ত্যাগ করিয়া দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন। তিনি নানাজাতীয় কতকগুলি হিন্দু চেলা যোটাইয়া একদল ডাকাইত বা সৈন্য প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তিনি চলনবিল মধ্যে একটি দ্বীপে সেই দল লইয়া বাস করিতেন। এই স্থলে তিনি "যবনমর্দ্দিনী" নামে এক কালীমূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি নানা দেশ হইতে মুসলমান ধরিয়া আনিয়া সেই কালীর সম্মুখে বলিদান করতঃ তাহাদের দেহ চলনবিলে ফেলিয়া দিতেন। কেবল নিহত যবনগণের মস্তকগুলি তিনি পুঞ্জ করিয়া রাখিতেন। তাঁহার বাসদ্বীপকে অদ্যাপি "পণ্ডিত ডাকাইতের ভিটা" বলে। মুসলমানেরা ঐ স্থানকে "সয়তানের ভিটা" বলিত। পূর্ব্বে শ্যামা রামা যেরূপ দৌরাত্ম্য করিত, মুসলমানদের উপর বেণীরায়ের দৌরাত্ম্য তদপেক্ষা বেশী ভিন্ন কম ছিল না। শ্যামা রামা প্রকৃত ডাকাইত ছিল, বেণীরায় তদ্রূপ অর্থলিপ্সু ডাকাইত ছিলেন না। হিন্দুদের

প্রতি তাঁহার বিশেষ অত্যাচার ছিল বলিয়া বোধ হয় না। কোন হিন্দু জমিদার কখন বেণীরায়কে দমনের জন্য চেষ্টা করেন নাই। দরিদ্র হিন্দুর তিনি কখন কোন অনিষ্ট করেন নাই, বরং অনেক সময়ে তাহাদের উপকার করিতেন। ধনী হিন্দুদের তিনি ধন হরণ করিতেন বটে, কিন্তু অনাবশ্যক প্রাণ হরণ করিতেন না। তিনি কখন গৃহদাহ প্রভৃতি অনর্থক অনিষ্ট করিতেন না। তিনি কোন স্ত্রীলোক বা বালক হরণ করিতেন না। এমন কি, স্ত্রীলোকের ও বালকের গায়ে মূল্যবান্ অলঙ্কার দেখিয়াও তাহা অপহরণ করিতেন না। তিনি স্পষ্ট বলিতেন যে, "আমি হিন্দু ধনীদিগের নিকট সাহায্য লই মাত্র। কিন্তু সাহায্য নাম করিয়া প্রকাশ্যরূপে লইলে সাহায্যকারীগণ মুসলমান কর্ত্তৃক দণ্ডিত হইবে, এই ভয়ে আমি লুঠ করিয়া লইয়া থাকি।" বেণীরায়ের আবির্ভাব দেখিয়া, বাড়ীর সম্মুখে কিছু অর্থ, খাদ্য ও বস্ত্র রাখিয়া দিলে বেণীরায়ের দল আর সেই গৃহস্থের বাড়ীতে প্রবেশ করিত না। তজ্জন্য হিন্দুরা বেণীরায়ের আগমনে বিশেষ ভীত হইত না। কথিত আছে যে, রাজীব শাহার বাড়ী বিবাহ হইতেছিল, এমন সময়ে বেণীরায় সদলে উপস্থিত হইলেন। রাজীব সকলকে অভয় দিয়া একাকী বেণীরায়ের নিকট গিয়া প্রণাম করিয়া গলবস্ত্র কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিল, "বাবা ঠাকুর! আপনকার প্রণামী অগ্রেই পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছি।" বেণীরায় সেই প্রণামী লইয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া চলিয়া আসিলেন; বিবাহকার্য্যের কোনই বিঘ্ন হইল না। বেণীরায় সাঁতোড়ের সান্যালদিগের কুটুম্ব ছিলেন। তজ্জন্য সাঁতোড়ের সান্যাল ও কায়েতগণ বহুসংখ্যক তাঁহার দলে যোগ দিয়াছিল। তন্মধ্যে যুগলকিশোর সান্যাল এবং কায়স্থ চণ্ডীপ্রসাদ রায় সর্ব্বপ্রধান।

মানসিংহ যখন পদ্মার দক্ষিণ পারে যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার ভ্রাতা ঠাকুর ভানুসিংহ বেণীরায়ের বিনাশার্থ সসৈন্যে সাঁতোড়ে উপস্থিত হইলেন। সাঁতোড়, ভাতুড়িয়া ও নিকটবর্ত্তী অন্যান্য পরগণার জমিদারগণ তলপ মত তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। সমস্ত জমিদারই হিন্দু ছিলেন। তাঁহারা কহিলেন, "বেণীরায়কে সদ্ভাবে বশীভূত করাই সহজ এবং হিতকর। বলপূর্ব্বক বিনাশ করিতে চেষ্টা করিলে বহুলোকের অনিষ্ট হইবে এবং উদ্দেশ্য সহসা সফল হইবে না।" বেণীরায়ের বৃত্তান্ত শুনিয়া ভানুসিংহের ভক্তি হইল। তিনি তাঁহাকে সদ্ভাবে বশ করাই সংকল্প করিলেন। ঠাকুর ভানুসিংহ দূত দ্বারা বেণীরায়কে

জানাইলেন যে, "পাঠান রাজত্বসময়ে মুসলমানেরা বহু অত্যাচার করিয়াছে। আপনিও তদনুরূপ প্রতিফল দিয়াছেন। এখন মোগল সাম্রাজ্য স্থাপিত হইয়াছে। ইহারা হিন্দুদিগের প্রতি সম্পূর্ণ অনুকূল। তীর্থরাজ প্রয়াগে মুকুন্দরাম ব্রহ্মচারী তপস্যা করিতেন। হঠাৎ তাঁহার মনে বিষয়বাসনা উদ্রেক হওয়ায় তিনি আত্মগ্লানিতে গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গমে কামনা-কুণ্ডে আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনিই জন্মান্তরে সম্রাট্ আক্‌বররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার সাম্রাজ্যে মুসলমানগণ আর হিন্দুর প্রতি অত্যাচার করিতে পারে না। বরং মুসলমান অপেক্ষা এখন হিন্দুদেরই প্রাধান্য হইতেছে। তাঁহার সহ আপনকার শক্রতা করা অনুচিত। বিশেষতঃ আপনি সুপণ্ডিত কুলীন ব্রাহ্মণ। আপনি সহজেই বুঝিতে পারেন যে, একজন মুসলমানের অপরাধে অন্যান্য মুসলমানদিগকে হিংসা করা ধর্ম্মবিরুদ্ধ। আপনি ব্রাহ্মণ গুরু, আমি ক্ষত্রিয়। আমি সহসা আপনকার অনিষ্ট করিতে চাই না। আপনি শান্তি গ্রহণ করিলে, আমি আপনাকে সমুচিত পুরস্কার দিতে সম্মত আছি।" বেণীরায় সন্ধি করিতে সম্মত হইলেন। ভানুসিংহ বেণীরায়কে এক পরগণা জমিদারী রূপে এবং ১২০০/ বিঘা জমি তাঁহার কালীদেবীর দেবত্র রূপে দিতে স্বীকার করিয়া রাজা মানসিংহের দ্বারা সম্রাটের সনন্দ আনাইয়া দিলেন। বেণীরায় তদবধি শান্ত হইয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিলেন। বেণীরায়ের অনুরোধে ভানুসিংহ যুগলকিশোর সান্যালকে এবং চণ্ডীপ্রসাদ রায়কেও জমিদারী দিয়াছিলেন আর চণ্ডীরায়কে নবাবী দর্বারে পেস্কার নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

বেণীরায় নিঃসন্তান মৃত হইলে, তাঁহার প্রধান চেলা যুগলকিশোর সান্যাল সেই সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইলেন। তাঁহার সন্তানেরাই জেলা বগুড়ার সেরপুরের সান্যাল নামে অদ্যাপি জমিদারী ভোগ করিতেছেন। যবনমর্দ্দিনী কালীমূর্ত্তিও সেরপুরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। পরে ভূমিকম্পে সেই মূর্ত্তি নষ্ট হইয়াছে। বেণীরায়ের দ্বিতীয় শিষ্য চণ্ডীপ্রসাদ রায়ও জমিদারী পাইয়া পাবনা জেলার অন্তর্গত পোতাজিয়া গ্রামে বাস করিয়াছিলেন। তাঁহারই সন্তানেরা পোতাজিয়ার রায়। ইহারাই বারেন্দ্র কায়স্থ মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন জমিদার এবং সম্মানিত। যুগলকিশোর ও চণ্ডীপ্রসাদকে পাঠানেরা "কাল্ জোগ্‌লা" ও "কাল্ চণ্ডিয়া" বলিত। আর যে সকল কুলীন ব্রাহ্মণ বেণীরায়ের দলে ছিলেন, তাঁহারা এবং তৎসংসৃষ্ট কুলীনেরা "বেণীপঠীর কুলীন" নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের

সন্তানেরা অদ্যাপি বেণীপঠীর কুলীন নামেই পরিচিত। পণ্ডিত ডাকাইত ও তাঁহার চেলাদিগের বীরত্ব, চতুরতা, দয়া এবং প্রতিহিংসা-প্রকাশক বহু গল্প এখনও রাজসাহী, পাবনা এবং বগুড়া জেলায় শুনিতে পাওয়া যায়। তাহার সহ তুলনায় ইংরেজী "রবিন হুডের কার্য্য কলাপ" তুচ্ছ হইয়া পড়ে। সেই সকল গল্প সংগ্রহ করিলে একখানি বৃহৎ পুস্তক হইতে পারে। এখন বাঙ্গালীরা যেমন ঐক্য-হীন, পূর্ব্বে বোধ হয় তদ্রূপ ছিল না। বেণীরায়ের পত্নী অপহৃত হইলে, বহুলোক তাঁহার দলভুক্ত হইয়া প্রতিহিংসাব্রতী হইয়াছিল; তাহাদিগকে দমন করা নবাব এবং সম্রাটের পক্ষেও কঠিন কার্য্য ছিল। তখনকার জমিদারগণ কোন বিপদে পড়িলে তাঁহাদের প্রজাগণ প্রাণপণে সাহায্য করিত। তখন কোন ব্যক্তির বিপদ্ শুনিবামাত্র তাহার জ্ঞাতি কুটুম্বগণ তাহার সহায়তা জন্য বিনা প্রার্থনায় অগ্রসর হইত। বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের বিপদে পার্শ্ববর্ত্তী সমস্ত হিন্দুই উদ্ধারার্থ সাহায্য করিত। এখন ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে জাতীয় ঐক্য স্থাপন জন্য দীর্ঘ দীর্ঘ বক্তৃতা হয় বটে, কিন্তু কার্য্যতঃ কিছুই হয় না।

কোচবেহারের মহারাজের সহ সন্ধিস্থাপন রাজা মানসিংহের তৃতীয় কার্য্য। ঠাকুর ভানুসিংহ সদ্ভাবে এই কার্য্য সাধন জন্য দুইজন বাঙ্গালী ব্রাহ্মণকে কোচবেহারে দূতরূপে পাঠাইয়াছিলেন এবং নিজে দিনাজপুর পর্য্যন্ত সসৈন্যে অগ্রসর হইয়াছিলেন। কিছুদিন পর রাজা মানসিংহও তথায় উপস্থিত হইলেন। দিনাজপুরের নবাব তাঁহাদের রসদ ও অপর আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি যোগাইতেছিলেন। কোচবেহারাধিপতি মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণ সেই বিপ্র দূতদ্বয়ের পরামর্শে রাজা মানসিংহের শরণাগত হইলেন এবং নিজ ভগিনী পদ্মেশ্বরীকে রাজা মানসিংহের সহ বিবাহ দিলেন। মানসিংহ কোচবেহার রাজ্যের সীমা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন এবং বার্ষিক ৮০,০০০৲ আশী হাজার নারায়ণী টাকা (এই টাকার মূল্য ৷৵০ আনা ছিল) নালবন্দি বা নর্ম্মা দিয়া নিরুপদ্রবে কোচবেহার রাজ্য ভোগ করিতে লক্ষ্মীনারায়ণকে অনুমতি দিলেন। এইরূপে পদ্মার উত্তর পারে দুই কার্য্য বিনা রক্তপাতেই সুসম্পন্ন হইল।

আকবর শাহের সময়ে যশোহরের জমীদার প্রতাপাদিত্য স্বাধীন হইতে চেষ্টা করিয়া আরাকান হইতে হাব্‌রীদিগকে (পর্ত্তুগীজ) আনিয়া আপনার গোলন্দাজ সৈন্য মধ্যে নিযুক্ত করত রূপনারায়ণ নদ হইতে নোয়াখালী পর্য্যন্ত সমুদ্র

উপকূলবর্ত্তী সমুদয় স্থান অধিকার করিয়া লন।* সম্রাট্ অনেকবার সৈন্য প্রেরণ করেন কিন্তু প্রতিবারেই তাহারা প্রতাপাদিত্য কর্ত্তৃক পরাজিত হয়। অবশেষে সম্রাট্ জাহাঁগীর মানসিংহকে দ্বিতীয়বার বঙ্গে প্রেরণ করেন। মানসিংহ যমুনা ও ইচ্ছামতীর সঙ্গমস্থলে প্রতাপাদিত্যকে পরাজয় করেন এবং তাঁহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া দিল্লী লইয়া যান। পথিমধ্যে কাশীধামে বন্দীকৃত রাজা প্রতাপাদিত্যের মৃত্যু হইয়াছিল। তাঁহার মৃত দেহ ঘৃতভাণ্ড ভরিয়া তাহাই লইয়া মানসিংহ জাহাঁগীরের নিকট গিয়া নিজ কার্য্যসমূহের নিকাশ দিয়াছিলেন। মানসিংহ যশোহর হইতে যে শীলাদেবী অম্বরে লইয়া গিয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপি অম্বরেই আছে। দেবীর পুরোহিত চারিজন বৈদিক ব্রাহ্মণ সপরিবারে অম্বরে বাস করিয়াছিলেন। তাঁহাদের বংশধরগণ এখনও তথায় পুরোহিতরূপে বিদ্যমান আছে।

রাজা মানসিংহ দিনাজপুরের নবাব প্রাণনাথ রায়কে, তাঁহার শাসিত প্রদেশের করদ রাজা স্বীকার করিয়া রাজা উপাধি দিয়াছিলেন। তাঁহার বার্ষিক কর ৬০,০০০৲ টাকা ধার্য্য করিয়াছিলেন। কোচবেহারের মহারাজ রাজা প্রাণনাথের সহ পাগড়ী বদল করিয়া বন্ধুত্ব করিয়াছিলেন। মানসিংহের ক্ষত্রিয়া পত্নীর গর্ভসম্ভূত পুত্র জগৎ সিংহের বংশ বিলুপ্ত হইয়াছে। কোচবেহারের রাজকুমারী পদ্মেশ্বরীর গর্ভে মানসিংহের যে পুত্র হইয়াছিল, তাহার সন্তানেরাই এখন জয়পুরে রাজত্ব করিতেছে।

* স্পেন ও পর্টুগালকে একত্রে হাইবোর্ণিয়া বলে। ইংরেজীতে আইবেরিয়ান উপদ্বীপ (Iberian Peninsula) বলে। মুসলমানেরা উহাকে হাব্রিয়া বলিত এবং তাহার অধিবাসী দিগকে হাবরী বলিত।

দশম অধ্যায়।

বঙ্গদেশের পার্শ্ববর্ত্তী ও মধ্যবর্ত্তী চতুর্ব্বিংশতি রাজ্যের ইতিহাস।—বঙ্গভাষা, বঙ্গসাহিত্যাদির ইতিহাস।—মুসলমান রাজত্বে সংবাদপত্র।

পাঠান রাজত্বের অবসান কালে এবং বঙ্গদেশে মোগল সাম্রাজ্যের অভ্যুত্থান সময়ে বাঙ্গালা দেশের পার্শ্ববর্ত্তী বার জন রাজা এবং অভ্যন্তরে বার জন করদ রাজা বা বারভূঁইয়া ছিলেন। তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত নিম্নেপ্রদত্ত হইল।

১। মণিপুর—

এই রাজ্য অতি প্রাচীন। ইহার রাজারা চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় ছিলেন। এই বংশীয় শেষ রাজা চিত্রসেনের পুত্র ছিল না। তাঁহার একমাত্র কন্যা চিত্রাঙ্গদাকে মধ্যম পাণ্ডব অর্জ্জুন বিবাহ করিয়াছিলেন। তৎপুত্র বভ্রুবাহন মাতামহের উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। সেই বংশই অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। এই রাজারা মগধের বৌদ্ধ সম্রাট্‌দের অধীন ছিলেন এবং বল্লাল সেনের করদ বশী রাজা ছিলেন। এখন ইংরেজের অধীন হইয়াছেন। এই বংশ কথনই বিশেষ পরাক্রান্ত বা কোন বিষয়ে বিশেষ প্রসিদ্ধ হয় নাই।

২। ত্রিপুরা রাজ্য—

ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্ব্ব পার হইতে ব্রহ্মদেশের জঙ্গল পর্য্যন্ত এই রাজ্য বিস্তৃত ছিল। এই রাজ্যে চন্দ্রবংশীয়েরা বহুকাল হইতে রাজত্ব করিতেছিলেন। মগধরাজ চন্দ্রগুপ্ত ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিম দিকে কাশীধাম পর্য্যন্ত সমস্ত স্থানে ক্ষত্রিয়কুল নষ্ট করিয়াছিলেন, কিন্তু উক্ত নদের পূর্ব্ববর্ত্তী দেশে ক্ষত্ররাজ্য বিদ্যমান ছিল। ত্রিপুরার রাজা পাণ্ডবদের রাজসূয় যজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন। এই রাজবংশ সময়ে সময়ে বিলক্ষণ পরাক্রান্ত হইয়াছিল। এই রাজারা বারংবার পাঠান, মোগল, মগ ও আরাকানরাজের সহ যুদ্ধ করিয়াছেন। সময়ে সময়ে তাঁহাদের রাজত্ব আসাম হইতে বঙ্গোপসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। কমলাপুরে (কমিল্লা) এই রাজ্যের রাজধানী ছিল। শাহজাদা সুজার নবাবী সময়ে কমলাপুর

মোগলেরা দখল করায় আগরতলায় রাজধানী হইয়াছে। প্রায় দেড় শত বৎসর হইল গোপীপ্রসাদ বর্ম্মা নামক রাজমন্ত্রী বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া সেই রাজবংশ ধ্বংস করতঃ স্বয়ং রাজা হইয়াছিলেন। এখন সেই গোপীপ্রসাদের বংশই রাজা আছেন। গোপীপ্রসাদের বংশীয়েরা কখনও প্রতিভাশালী হন নাই। ইঁহারা ত্রিপুরা রাজ্যের কিয়দংশ ইংরেজের অধীনে বশী রাজা রূপে ভোগ করেন। আর কতক স্থান জমিদারী স্বত্বে দখল করেন। রাজতালিকা নামক গ্রন্থে এই রাজ্যের ধারাবাহিক ইতিহাস আছে। রাজতরঙ্গিণী নামক কাশ্মীরের ইতিহাস এবং রাজতালিকা নামক ত্রিপুরার ইতিহাস দৃষ্টে জানা যায় যে, ইতিহাস লিখিবার রীতি হিন্দুদের মধ্যে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল না।

৩। শ্রীহট্ট রাজ্য—

অতি প্রাচীন কাল হইতে এই রাজ্যে সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয় রাজারা রাজত্ব করিতেছিলেন। এই বংশীয় অতিরথ নামক রাজা বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ করায় প্রজারা বিদ্রোহী হইয়া পার্শ্ববর্ত্তী রাজাদের সাহায্যে তাঁহাকে তাড়াইয়া দিয়াছিল। তিনি শ্যাম দেশে গিয়া রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার বংশধরগণ এখনও শ্যাম দেশে রাজত্ব করিতেছে। প্রজারা অতিরথের কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুরথকে রাজা করিয়াছিল। তদ্বংশীয়েরা বহুদিন শ্রীহট্টে রাজত্ব করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা সময়ে সময়ে ত্রিপুরার রাজাকে এবং আসামের রাজাকে কর দিতে বাধ্য হইতেন। এই বংশের শেষ রাজা দিগিন্দ্র দেবের কোন সন্তান ছিল না। অদ্বৈত গোস্বামীর বংশজাত দ্বারকানাথ গোস্বামী রাজার গুরু ছিলেন। রাজা অন্তিম কালে নিজ রাজ্য গুরুকে দান করিয়াছিলেন। গোঁসাই রাজা হইয়া অনেকগুলি বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বাঙ্গালা দেশ হইতে লইয়া গিয়া এই রাজ্যে স্থাপন করিয়াছিলেন। মৈমনসিংহ জেলার যে অংশ ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব্ব দিকে আছে, সেই অংশও পূর্ব্বে শ্রীহট্ট রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। অনুমান হয় যে, গোঁসাই রাজা হইবার পূর্ব্বে এই রাজ্যে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের বসতি ছিল না। দ্বারকানাথের পর তৎপুত্র শ্যামসুন্দর গোস্বামী রাজা হইয়া শাক্তদিগের উপর ঘোর উৎপীড়ন করিয়াছিলেন। সেই সময়ে শাহ জেহান দিল্লীর সম্রাট্ ছিলেন এবং তৎপুত্র সুজা বাঙ্গালার সুবেদার ছিলেন। কতিপয় শাক্ত ব্রাহ্মণ গিয়া সুজার নিকট শ্যামসুন্দরের

বিরুদ্ধে নালিশ করায় সুজা শ্রীহট্ট রাজ্য জয় করিয়া শুবে বাঙ্গালার সামিল করিয়াছিলেন। সুজা সেই সময়ে ত্রিপুরা রাজ্যের পশ্চিমাংশ—যাহা এখন জেলা কমিল্লার অন্তর্গত—তাহাও দখল করিয়া বাঙ্গালা দেশের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন। এই নবাধিকৃত প্রদেশ হইতে বার্ষিক চৌদ্দ লক্ষ টাকা সুজার আয় হইত। শ্যামসুন্দর রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া, ঢাকা জেলার অন্তর্গত উথুলি গ্রামে বাস করিয়াছিলেন। তদ্বংশীয়েরা উথুলির গোঁসাই নামে পরিচিত। বোধ হয়, ধর্ম্মবিদ্বেষ জনিত অত্যাচার মোগল অপেক্ষা গোস্বামীদের অনেক বেশী ছিল।

৪। জয়ন্তীরাজ্য—

এই রাজ্যে খসিয়া নামক অসভ্য অনার্য্য জাতির বসতি ছিল। এই রাজ্য কখন সভ্য বা পরাক্রান্ত হয় নাই। এই রাজ্য অনেক সময়েই ত্রিপুরা রাজ্যের অধীন ও করদ ছিল। ইহাতে রীতিমত শাসনপ্রণালী ছিল না। স্থানে স্থানে যে সকল সামন্ত বা সর্দ্দার ছিল, তাহারাই প্রায় স্বাধীন ভাবে থাকিত। এখন এই রাজ্য ইংরেজের অধীন হইয়া কতক সভ্য হইতেছে।

৫। অচ রাজ্য—

এই রাজ্যে "নাগ" জাতীয় অনার্য্য জাতির বসতি ছিল। অদ্যাপি তাহাদিগকে "নাগা" বলে। চিরস্থির বস্তুর নাম "নগ" (ন গচ্ছতি ইতি নগ)। এই শব্দে আকাশ, পর্ব্বত ও বৃক্ষ বুঝায়। আবার সেই নগ সম্বন্ধীয় সমস্ত পদার্থকেই 'নাগ' বলা যায়। নাগ শব্দে স্থির-বায়ু, হস্তী, মহাসর্প এবং পার্ব্বত্য লোক বুঝায়। সংস্কৃত ভাষায় এমন অনেক শব্দ আছে, যাহা অনেক বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। অন্যান্য ভাষাতেও এইরূপ শব্দ অপ্রাপ্য নহে। সেই সকল শব্দের সাবধানে অর্থ না করিলেই অনর্থক ভ্রম জন্মে। "পৃথিবী অনন্ত নাগের উপর আছে" এই কথার প্রকৃত অর্থ এই যে, পৃথিবী অসীম স্থির-বায়ুর উপর আছে; "উলপী নাগকন্যা" এই বাক্যের অর্থ এই যে "উলপী নাগ বা নাগা উপাধিধারী লোকের কন্যা"। এই সকল স্থলে নাগ শব্দে সর্প বা হস্তী বলিয়া অর্থ করা অনুচিত। অচ রাজ্য কখন রীতিমত সুশাসিত রাজ্য ছিল না। এই নাগরাজের কন্যা উলপীকে মধ্যম পাণ্ডব অর্জ্জুন বিবাহ করিয়াছিলেন। নাগেরা সুযোগ পাইলেই পার্শ্ববর্ত্তী স্থান লুঠ করিত। আবার পার্শ্ববর্ত্তী

বিধান হিন্দু শাস্ত্রে নাই। সুতরাং তাহা এখানে হয় না এবং কোন স্থানেই কোন কালে হয় নাই।

ভারতবর্ষে এবং আফগানিস্তানে এখন যত মুসলমান আছে, ইহাদের অন্যূন চৌদ্দ আনা অংশই হিন্দুসন্তান। তাহারা নানা কারণে বাধ্য হইয়া একবার মুসলমান হইয়াছিল। পুনরায় সনাতন ধর্ম্মে আসিতে না পারিয়া অগত্যা মুসলমান হইয়া রহিয়াছে। তাহাদের দ্বারা হিন্দুদের বহুল অনিষ্ট হইয়াছে এবং হইতেছে। পেশোয়ারের নিকটবাসী গোক্ষুর জাতি তিন শত বৎসর যাবৎ স্বধর্ম্ম রক্ষার্থ মুসলমান সহ যুদ্ধ করিয়াছে। পরে মহম্মদ গোরী তাহাদিগকে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণে বাধ্য করিয়াছিলেন। তাহারা সেই আক্রোশে পরে গোরীকে হত্যা করিয়াছিল। কিন্তু পুনরায় হিন্দু হইতে না পারিয়া অগত্যা তাহারা মুসলমান হইয়া রহিয়াছে। ইহাদিগকে এখন "কাক্কর" বলে। কাক্কর শব্দটি গোক্ষুর শব্দেরই অপভ্রংশ। আফগানিস্তান ও বেলুচিস্তান পূর্ব্বে ভারতবর্ষেরই অংশ ছিল। তথায় এখনও অনেক লোক হিন্দু আছে। যাহারা মুসলমান হইয়াছে, তাহাদিগকে পাঠান বলে। তাহারাও হিন্দুসন্তান। চিত্রল* (চৈত্ররথ), বাল্‌থ† (বাহ্লীক), কাবুল (কুভা), হিরাবতী (হিরাত), খান্দার (গান্ধার), শিবি (সিবি), শাল্ব (বেলুচিস্তান), গজনী (গজনীর) প্রভৃতি সমস্তই হিন্দুরাজ্য ছিল। আসামের ন্যায় ব্যবস্থা না থাকাতেই আফগানিস্তান, বেলুচিস্তান এবং ভারতবর্ষ মুসলমান-পূর্ণ হইয়াছে এবং পরাধীনতার প্রধান কারণ হইয়াছে। আসামে পুনরায় স্বধর্ম্ম গ্রহণের নিয়ম থাকায় তথায় মুসলমান রাজ্য স্থায়ী হয় নাই। কালাপাহাড় আসাম জয় করিয়াছিলেন, মীরজুম্লা‡ আসাম জয় করিয়াছিলেন; তাঁহারা বহু

* চিত্রল প্রদেশ পুরাতন গন্ধর্ব্বদেশ। চিত্ররথ গন্ধর্ব্বের রাজধানী চৈত্ররথ নগরই বর্ত্তমান চিত্রল।

† উত্তর কুরুবর্ষের রাজধানী বাহ্লীক নগরই বাল্‌থ বা বালিখ নামে পরিচিত হইতেছে।

‡ মীরজুম্লা পারস্যের অন্তর্গত ইস্পাহানের নিকটবর্ত্তী একটী পল্লীগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রথমে একজন রত্নব্যবসায়ী ছিলেন। এই ব্যবসায় উপলক্ষে তিনি গোলকুণ্ডায় উপস্থিত হন এবং রাজার শুভদৃষ্টিতে পতিত হইয়া রাজকার্য্য লাভ করেন। পরে তিনি গোলকুণ্ডা রাজ্যে সর্ব্বপ্রধান সেনাপতি হন। কোন কারণে গোলকুণ্ডাধিপতির অপ্রিয়ভাজন হওয়ায় তিনি আওরঙ্গজেবের শরণাপন্ন হন। ইহার পর মীরজুম্লা বাদশাহ শাহজেহানের সাক্ষাৎকার

লোককে বলপূর্ব্বক মুসলমানও করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা ফিরিবামাত্র আসাম আবার স্বাধীন হইয়াছিল এবং পতিত হিন্দুরা পুনরায় হিন্দু হইয়াছিল। আসাম কিছু দিন কোচবেহারাধিপতির করদ হইয়াছিল। তদ্ভিন্ন বরাবর প্রপন্ন ছিল। অবশেষে ব্রহ্মদেশের রাজা আসাম অধিকার করিলে, আসামরাজ ইংরেজের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ইংরেজেরা মগদিগকে কামরূপ হইতে তাড়াইয়া তাহা নিজ অধিকারভুক্ত করিয়াছেন এবং আসামরাজকে বৃত্তিভোগী করিয়াছেন। আসামের পূর্ব্বভাগ ব্রহ্মরাজ্যেরই অধীন ছিল। এখন তাহাও ইংরেজ-রাজ্যভুক্ত হইয়াছে।

৭। কোচবেহার—

এখন যাহাকে তিব্বত বলে, ইহার প্রাচীন নাম ভূতবর্ষ বা কিম্পুরুষবর্ষ। তাহার উত্তরে কৈলাস পর্ব্বত, পূর্ব্বে চীন, দক্ষিণে হিমাচল এবং পশ্চিমে গন্ধর্ব্ববর্ষ বা চিত্রল। মানস সরোবর হইতে ইহার মধ্য দিয়া ব্রহ্মপুত্র নদ পূর্ব্ব-মুখে প্রবাহিত হইয়া অবশেষে দক্ষিণমুখ হইয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছে। চীন দেশের একাক্ষরী ভাষায় বিদেশীয় শব্দ লেখা দুষ্কর। ভূতবর্ষ চীনের অধীন হইলে চীন ভাষায় নামগুলি বিকৃত হইয়া ভূতবর্ষের নাম ভোট, কৈলাসের নাম কিউন্‌লন্ এবং ব্রহ্মপুত্র নদের নাম সামপু হইয়াছে। তিব্ব-তের অধিপতি বা মহাগুরুকে বৌদ্ধেরা দলই লামা অর্থাৎ মহাযোগী বলে। যেমন কাশীর রাজা বলিলে মহাদেবকে বুঝায় আবার রামনগরের রাজাকেও বুঝায়, তেমনি ভূতপতি বলিতে মহাদেব এবং দলই লামা উভয়কেই বুঝায়। সেই ভূতপতি (মহাদেব বা দলই লামা) নিজ রাজ্যের দক্ষিণ প্রান্ত পরিদর্শন করিতে আসিয়া চিক্‌না পাহাড়ে হরিয়া ম্যাচের দুই পত্নী হীরা ও জিরাকে পরম সুন্দরী দৃষ্টে নিজের সেবাদাসী করিয়াছিলেন। তাহাতে হীরার গর্ভে বিশু সিংহ এবং জিরার গর্ভে ইশু সিংহ নামক দুই পুত্র হয়। ভূতরাজ সেই দুই পুত্রকে নিজ রাজ্যের দক্ষিণ প্রান্তে রাজত্ব দিয়াছিলেন। কোচবেহারের মহারাজ এবং জলপাইগুড়ীর রায়কত

লাভ করেন এবং তাঁহাকে বহু ধনরত্ন উপঢৌকন প্রদান করেন। কথিত আছে, মীর শাহ জেহানকে পৃথিবীখ্যাত কোহিনূর রত্ন উপহার দেন। শাহ জেহানও প্রীত হইয়া তাঁহাকে উচ্চ রাজকার্য্যে নিযুক্ত করেন।

সেই বিশুসিংহের বংশীয় আর বিজনী ও সিডলীর রাজারা ইশুসিংহের বংশধর, তন্মধ্যে কোচবেহারের মহারাজগণই বিশেষ পরাক্রান্ত এবং প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন।

৮। ভিতরগড়—

চিক্‌না পাহাড়ের দক্ষিণে কমটাপুরে নীলধ্বজবংশীয় রাজবংশী জাতীয় রাজাদের রাজত্ব ছিল। তাহার দক্ষিণ-পশ্চিমে ভিতরগড়ে ভবচন্দ্র রাজার বংশধরেরা রাজত্ব করিতেন। ভবচন্দ্র নামক পাগলা রাজা ও তাঁহার মন্ত্রী গবচন্দ্রের গল্প প্রায় সমস্ত বাঙ্গালা দেশেই শুনা যায়। জলপাইগুড়ীর সাড়ে পাঁচ ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিমে ভিতরগড়ে তাহার বাস ছিল। ভিতরগড় ও বাহিরগড়ের প্রাচীর পরিখা এবং অভ্যন্তরস্থ পুষ্করিণী দৃষ্টে স্পষ্ট জানা যায় যে, ঐ রাজ্য বিলক্ষণ বিস্তৃত ও বিভবশালী ছিল। এই রাজারাও রাজবংশী ছিলেন।

৯। শিববংশী—

বিশু সিংহ ও ইশু সিংহ এবং তাঁহাদের উত্তরাধিকারিগণ দেখিলেন, তাঁহাদের পার্শ্ববর্ত্তী সমস্ত রাজা এবং প্রধান লোকেরাই রাজবংশী অর্থাৎ কোচ। সুতরাং তাঁহারা সেই কোচদিগের প্রধান লোক সহ কুটুম্বিতা করিয়া তাহাদের সমাজে মিলিত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা আপনাদিগকে শিববংশী বলিয়া পরিচয় দেন এবং রাজবংশী বা কোচ বলিলে অপমান বোধ করেন। অথচ কোচ সহ বিবাহ আদান প্রদানে বা আহার বিহারে কোন অপমান জ্ঞান করেন না। ক্ষত্রিয়দের সহ বিবাহ আদান প্রদানও কোচবেহারের মহারাজাদের দেখা যায়। ইঁহাদের কোন কোন আচার ব্যবহার ঠিক ক্ষত্রিয়ের সদৃশ আবার আর কতকগুলি ব্যবহার অন্ত্যজ জাতির তুল্য।

১০। কমটাপুর—

এক সময়ে এই রাজ্য বিলক্ষণ প্রবল হইয়াছিল। ভূটান, আসাম, মোরঙ্গ এবং উত্তর বাঙ্গালার কিয়দংশ সময়ে সময়ে কোচবেহারের অধিকৃত হইত। পূর্ব্বে এই সমস্ত স্থান বেহার প্রদেশের অংশ বলিয়া গণ্য ছিল। এই জন্য বেহারের যে অংশ মুসলমানদের অধিকৃত, তাহার নাম শুবে বেহার বা মোগলান বেহার। আর যে অংশ কোচ রাজার অধিকৃত তাহার নাম কোচবেহার। এই রাজ্যেও আসামের ন্যায় কেবল রাজবংশী ও ব্রাহ্মণ এই দুই জাতি ছিল।

খ্যান, কৈবর্ত্ত, হাড়ী, বেলদার প্রভৃতি জাতীয় লোক স্থানে স্থানে অল্পই দেখা যায়। এখানেও হিন্দু বলিলেই রাজবংশী বুঝায়। কিন্তু এখানে মুসলমান-দিগকে হিন্দু করিয়া লইবার প্রথা ছিল না। নবাব মীরজুম্লা এই দেশ জয় করিয়া কতকগুলি রাজবংশীকে মুসলমান করিয়াছিলেন। তদবধি তাহারা নস্য উপাধিধারী মুসলমান হইয়া আছে। কিন্তু তাহারা মুসলমান ধর্ম্মের মর্ম্ম কিছুই জানিত না এবং তাহাদের আচার ব্যবহার সমস্তই রাজবংশীদের ন্যায় ছিল। রেল হওয়ার পর এখানকার মুসলমানেরা কিয়ৎ পরিমাণে যাবনিক ব্যবহার গ্রহণ করিতেছে। কামটাপুর ও ভিতরগড় রাজ্য কোচবেহার-রাজ্যভুক্ত হইয়াছে। এই বংশীয় জলপাইগুড়ীর রায়কত এবং সিডলীর চৌধুরীরা এখন ইংরেজ রাজ্যের অধীনে জমিদার হইয়াছেন। কোচবেহার ও বিজনীর মহারাজগণ কতক ভূমি করদ রাজা রূপে আর কতক ভূমি জমিদাররূপে ভোগ করিতেছেন।

১১। জাজপুর—

উড়িষ্যার উত্তরাংশ এবং রাঢ়দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ লইয়া এই রাজ্য সংগঠিত ছিল। এখানকার রাজারা ক্ষত্রিয় ছিলেন, তাঁহারা বল্লালসেনের বশী রাজা ছিলেন। তাঁহারা বাঙ্গালার নবাব ও গৌড় বাদশাহের সহ বহু যুদ্ধ করিয়াছিলেন। অবশেষে উড়িষ্যার রাজারা এই রাজ্যের রাজধানী সহ অধিকাংশ দখল করিয়াছিলেন। রাজা সুধীর সিংহ অবশিষ্ট রাজ্য রক্ষার জন্য গৌড় বাদ-শাহের অধীনতা স্বীকার করিয়া বর্দ্ধমানে রাজধানী করিয়াছিলেন। কিন্তু অল্প দিন পরেই বর্দ্ধমানরাজ অত্যন্ত ঋণগ্রস্থ হইয়া সমস্ত রাজ্য বিক্রয় করিতে বাধ্য হন। বর্দ্ধমানের বর্ত্তমান মহারাজের পূর্ব্বপুরুষ লালজী রায় তাহা ক্রয় করিয়াছিলেন। পুরাতন রাজবংশের কোন বংশধর এখন দেখা যায় না। পুরা-তন রাজধানী বর্দ্ধমানও এখন জনশূন্য হইয়াছে। এখন যে বর্দ্ধমান নগর আছে, তাহার পূর্ব্ব নাম গোহাট। বর্দ্ধমান রাজ্য লালজী খরিদ করা অবধি গোহাটের নামই বর্দ্ধমান হইছে।

১২। আরাকান—

আরাকানে বাঙ্গালা ভাষা প্রচলিত নাই এবং এখানকার রাজাকে বাঙ্গালী বলা যায় না। তাঁহাদের দ্বারা বাঙ্গালী সমাজের কোন হিতাহিত হয় নাই।

ভাব গোপন করিয়া শোভা সিংহের দুষ্ট প্রস্তাবে সম্পূর্ণ সম্মতি দিলেন। পরে সুযোগ মত শোভাকে হত্যা করিয়া স্বয়ং আত্মহত্যা করিলেন। পাঠানদিগের নায়ক রহিম খাঁ বর্দ্ধমান রাজ্য দখল করিয়া ক্রমে রাজ্য বিস্তার করিতে লাগিল। অল্পকাল পরেই পাঠানেরা পরাজিত হইয়া উড়িষ্যায় পলায়ন করিল। কৃষ্ণরামের পুত্র পুনরায় বর্দ্ধমানে রাজা হইলেন। তিনি আরও বহু জমিদারী ক্রয় করিয়াছিলেন। তাঁহারা করদ রাজা বলিয়া সনন্দ পাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু মুর্শিদকুলী খাঁ তাঁহাদের মালগুজারী বৃদ্ধি করিয়াছিলেন এবং ক্ষমতা হ্রাস করিয়াছিলেন। তথাপি তখনও তাঁহাদের গড়খাই ছিল, সৈন্য ছিল এবং বিচারাধিকার ছিল। ইংরেজাধিকারের পর লর্ড কর্ণোয়ালিস বর্দ্ধমানের মহারাজের ও অন্যান্য সমস্ত রাজা মহারাজের রাজস্ব অতিমাত্র বৃদ্ধি করিয়াছিলেন এবং সর্ব্ব-প্রকার ক্ষমতা রহিত করিয়াছেন। তদবধি এখানকার মহারাজও সাধারণ জমিদার হইয়াছেন। তাঁহার রাজাধিরাজ মহারাজ উপাধি আছে বটে, কিন্তু সাধারণ জমিদার অপেক্ষা ক্ষমতা কিছুমাত্র বেশী নাই। এই বংশে এগার পুরুষ বরাবর দত্তকপুত্র দ্বারা বংশরক্ষা হইতেছে। তজ্জন্য সম্পত্তি ভাগ হয় নাই এবং সম্পত্তি বৃদ্ধি ভিন্ন হ্রাস হয় না।

৪। তাহিরপুর—তাহিরপুরের রাজারা নন্দনাবাসি-গাঁই সিদ্ধশ্রোত্রিয় বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ। মনুসংহিতার সর্ব্বোৎকৃষ্ট টীকাকারক কল্লূক ভট্ট এই রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষ। এই বংশীয় উদয়নারায়ণ রায় গৌড়বাদশাহ গণেশের শ্যালক ছিলেন। তিনিই প্রথম রাজা উপাধি পাইয়াছিলেন। রাজা জীবন রায়, সম্রাট্ যদুনারায়ণের দেওয়ান ছিলেন। রাজা কংশনারায়ণের বৃত্তান্ত পূর্ব্বেই বলা হই-য়াছে। শরীকী বিভাগ হওয়ায় এই বংশীয় রাজাদের প্রত্যেক অংশ ক্ষুদ্র হইয়াছে। অনেক শরীকের অংশ বিক্রীত হইয়াছে। কোন কোন শরীকের অংশ দৌহিত্রে পাইয়াছে। মূল রাজবংশের সম্পত্তি অতি অল্পই আছে। এই রাজ্য পূর্ব্বে মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত ছিল, এখন রাজসাহী জেলার অন্তর্গত হইয়াছে।

৫। পুঁঠিয়া—গৌড়ে বাদশাহের সেনার রসদ যোগাইবার জন্য ঠাকুর কমলাকান্ত বাগছি একটি পরগণা চাকরাণ পাইয়াছিলেন। তজ্জন্য সেই পরগণার

নাম লস্করপুর। কমল ঠাকুরের বাড়ী ঐ পরগণা মধ্যে পুঁঠিয়া গ্রামে পূর্ব্বাবধি ছিল। ইনি সাধু বাগছির সন্তান এবং অতি মান্য কুলীন ছিলেন। সম্পত্তি প্রাপ্তির পর তদ্বংশীয়দের চরিত্রে নানারূপ দোষ জন্মিল। সুরাপান ও লাম্পট্য হেতু অনেক কুকার্য্য অনুষ্ঠিত হইল। রাজা রামচন্দ্র রায়, তাঁহার বন্ধু সাঁতোড়ের ধেনুয়া-রামকৃষ্ণ, মধুরায়, ডাকুরায় ও অরবিন্দ রায় মত্ত অবস্থায় কালী-পূজা উপলক্ষে মহিষের পরিবর্ত্তে গরু বলি দিয়াছিলেন। সেই জন্য তিরস্কার করায় পুরোহিতকে এবং রাজার জননীকেও হত্যা করিয়াছিল। এই সকল মহা-পাপ করা হেতু তাঁহারা পাঁচুড়িয়া অর্থাৎ পঞ্চমহাপাতকী * নামে ঘৃণিত হইয়া-ছিলেন। মধু, ডাকু, অরবিন্দ সমাজচ্যুত হইয়া দেশত্যাগী হইল, এবং মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল। রামকৃষ্ণ স্বহস্তে ধেনু বধ করিয়াছিলেন, সেই জন্যই তাঁহার নাম 'ধেনুয়া'রামকৃষ্ণ হইয়াছিল। তিনি দেশত্যাগী হইলেন। রাজা রামচন্দ্রঠাকুর নানারূপ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া ব্রাহ্মণসমাজে গৃহীত হইলেন বটে, কিন্তু অতিশয় হেয় থাকিলেন। ইহাকেই লোকে "সাধুর ভরা তল" বলে। এই পুরাতন রাজবংশের বহু শরীক হওয়ায় অনেক শরীকের সম্পত্তি ক্ষুদ্র হইয়াছে, কাহারও বা সম্পত্তি বিক্রীত হইয়াছে। আবার বড় বড় শরীকগণ নূতন সম্পত্তি ক্রয় করিয়া সঙ্গতি বর্দ্ধিত করিয়াছেন। পাঁচ-আনীর শরীকের 'মহারাজ' এবং চারি-আনীর 'রাজা' উপাধি আছে। অপর ক্ষুদ্র অংশীদিগকেও স্থানীয় লোকে রাজা বলে বটে, কিন্তু গবর্ণমেণ্টে ঠাকুর উপাধি।

৬। সিন্দুরী—পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, ভীম ওঝা, সম্রাট্ বল্লাল সেনের পুরোহিত ছিলেন। গৌড় নগরের নিকট কালিয়া গ্রামে তাঁহার বসতি ছিল। বল্লালের হড্ডিকা সংস্রব ঘটিলে তিনি কালিয়া গ্রাম ত্যাগ করিয়া বর্ত্তমান পাবনা জেলার পূর্ব্বদক্ষিণঅংশে ছাতক নামক গ্রামে বসতি করিয়াছিলেন। তাঁহার সন্তানেরা কালিয়াই গোষ্ঠী নামে খ্যাত। তিনি যখন পূর্ব্ববঙ্গে বাড়ী করিয়া-ছিলেন, তখন পূর্ব্ববঙ্গে আর কোন শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ ছিল না। এজন্য তদ্বংশীয়েরা বাঙ্গাল ওঝা নামে পরিচিত হইতেন। ভীমের পৌত্র অনন্তরাম বাঙ্গাল ওঝা, রাজা লক্ষ্মণ সেনের গুরু ছিলেন। তিনি সিন্দুর ও শাখিনী এই দুই পরগণা নিষ্কর-

---

* পুঁটিয়ার রাজারা বলেন যে তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ উক্ত মহাপাপ করেন নাই। কেবল পাপীদের সহ কুটুম্বিতা করিয়া তাঁহারা পাঁচুড়িয়া হইয়াছেন।

রূপে গুরুদক্ষিণা পাইয়া বহুসংখ্যক বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ এইস্থানে স্থাপন করিয়াছিলেন। তদ্‌বংশীয়দের তুল্য পুরাতন জমিদার বাঙ্গালা দেশে আর দেখা যায় না। পাঠান রাজ্যারম্ভে ইঁহারা রায় উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। গৌড় বাদশাহদিগের সময়ে বসন্ত রায় আট পরগণার রাজা হইয়াছিলেন। ইঁহারা কুলীন ব্রাহ্মণ এবং সমৃদ্ধ রাজা ছিলেন। মুসলমান রাজধানী হইতে বহুদূরবর্ত্তী থাকায় আপন চত্বরে তাঁহাদের স্বাধীন রাজার ন্যায় সর্ব্ববিষয়ে প্রাধান্য ছিল। বসন্ত রায়ের পুত্র রাজীব রায়, গয়াতীর্থ হইতে প্রত্যাগমনকালে রাঢ়দেশ হইতে শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নামক একজন রাঢ়ীয় কুলীন ব্রাহ্মণকে তাহার মাতা ও ভগিনীদ্বয়সহ সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিয়াছিলেন। শিবচন্দ্রের দুইটি ভগিনী পরম সুন্দরী ছিল। রাজা সেই শিবচন্দ্রের "চট্টোপাধ্যায়" উপাধি স্থলে "মৈত্র" উপাধি করিলেন। তাঁহার দুই ভগিনীকে স্বয়ং বিবাহ করিলেন। সেই পরিচয়ে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের ঘরে শিবচন্দ্রের বিবাহ দিলেন এবং তাঁহাকে একটি গ্রাম তালুক করিয়া দিলেন। তাঁহারই সন্তানেরা শিবপুরের মৈত্র নামে খ্যাত। শিবচন্দ্র, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের পরিচয় কিছুই জানিতেন না। তজ্জন্য ঘটকগণ এবং ভট্টগণ বিদ্রূপ করিয়া কবিতা বাঁধিয়াছিল। *

শিবচন্দ্রের বিবাহ সময়ে অনেকে আপত্তি করায় রাজীব রায় কহিলেন, "কাশ্যপগোত্র কুলীন ব্রাহ্মণ রাঢ়ী হইলেই চাটুর্য্যে হয়, বারেন্দ্র হইলেই মৈত্র হয়। শিবচন্দ্রকে যখন বারেন্দ্র করা হইল, তখন ইহার মৈত্র উপাধি হওয়াই উচিত।" তাঁহার কথায় ফটিক দত্ত নামক একটি কায়স্থ কর্ম্মচারী কহিল, "মহারাজের এ হুকুম সাফ বোধ হয় না।" রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, "আমি সাফ করিতে পারি না, তুমি ধোবা হইয়া সমস্ত সাফ কর।"† তিনি ফটিককে ধরিয়া ধোবার সহ আহার ব্যবহার করাইয়া ধোবা জাতিতে অবনত করিলেন। তদ্দৃষ্টে ভয়

* ঘটকের কবিতা—"খাটখুটু ঠাকুরটি গলায় রুদ্রাক্ষমালা, গাঁই গোত্র কিছু নাই রাজীব রায়ের শালা।"

ভট্ট কবিতা—"গঙ্গাপারের মৈত্র ঠাকুর গলায় রুদ্রাক্ষমালা, পরিচয় মধ্যে কেবল রাজীব রায়ের শালা।"

† ভট্ট কবিতা—"জাতির কর্ত্তা রাজীব রায় মুলুকের শুবা, তাঁর হুকুম তুচ্ছ ক'রে দত্ত হ'লেন ধোবা।"

পাইয়া আর কেহ কোন আপত্তি করিল না"।

গঙ্গারাম মৈত্র নামক একজন কুলীন ব্রাহ্মণ পরম বৈষ্ণব ছিলেন। তিনি একটি মুসলমান-কন্যাকে বৈষ্ণবী করিয়া নিজের সেবাদাসী করিয়াছিলেন। তাহার ভ্রাতা আবদুলকেও তিনি বৈষ্ণব করিয়া লইয়াছিলেন। তিনি তাহাদের নাম ভূষণা ও রূপদয়াল রাখিয়াছিলেন। তাহারা তাঁহার ঘরেই থাকিত। তিনি তাহাদের স্পৃষ্ট অন্ন গ্রহণ করেন নাই, কিন্তু জল গ্রহণ করিতেন। মুসলমান কাজী এই বৃত্তান্ত জানিয়া রূপদয়ালকে হরিমন্ত্র ত্যাগ করিতে বলিলেন। রূপদয়াল কহিল, "মনুষ্যের ভাষা বিভিন্ন, কিন্তু ঈশ্বর এক। যে আল্লা, সেই হরি।" কাজী কহিল, "তবে তুমি আল্লা না বলিয়া হরি বল কেন?" রূপদয়াল কহিল, "আমি পারসী আরবী জানি না; সমস্ত কথাই যখন বাঙ্গালা ভাষায় বলি, তখন ঈশ্বরের নাম বলিলেও হরি বলাই উচিৎ। যে ব্যক্তি সমস্ত কথাই পারসী আরবীতে বলে তাহার পক্ষে ঈশ্বরকেও আল্লা বলা কর্ত্তব্য।" কাজী তর্কে পরাস্ত হইয়া, আবদুলকে হরিমন্ত্র ত্যাগে জিদ করিলেন। আবদুল সম্মত হইল না দেখিয়া, কাজী তাহার প্রাণদণ্ড করিলেন। ভূষণা ভ্রাতৃশোকে জলে ডুবিয়া মরিল। গঙ্গারাম উদাসীন হইয়া বৃন্দাবন গেলেন।

আট বৎসর পর গঙ্গারাম দেশে আসিয়া সংসারী হইতে ইচ্ছুক হইলেন। কিন্তু তাঁহাকে কোন ব্রাহ্মণ, সমাজে গ্রহণ করিতে সম্মত হইল না। গঙ্গারাম, রাজীব রায়ের শরণাগত হইলেন। রাজীব রায় বহু ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করিয়া আনিলেন এবং সভা করিয়া কহিলেন, "এই গঙ্গারাম মৈত্র, ভূষণা ও রূপদয়ালসহ যেরূপ ব্যবহার করিয়াছে, অদ্বৈতপ্রভু ও নিত্যানন্দ প্রভুও হরিদাসের সহিত ঠিক তদ্রূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন। হরিদাস যেরূপ হরিভক্ত ছিল, রূপদয়ালও ঠিক সেইরূপ ছিল। যখন অদ্বৈত ও নিত্যানন্দের সন্তান সুব্রাহ্মণ আছে, তখন গঙ্গারামকে সমাজে গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য। আর জন্ম দ্বারাই জাতি হয়। কর্ম্ম দ্বারা কেবল পাপ পুণ্য হয় মাত্র। কর্ম্মজ পাপ প্রায়শ্চিত্ত করিলেই খণ্ডন হয়। গঙ্গারাম প্রায়শ্চিত্ত করিলে আপনারা তাহাকে সমাজে গ্রহণ করুন।" অধিকাংশ শাক্ত ব্রাহ্মণেরা রাজার অনুরোধ স্বীকার করিল না। তাহারা কহিল,—

"কেন ভাই গঙ্গারাম, আগে কলি হেন কাম,
কেন খালি ভূষণার পানী?

ঘরে দিলি আব্‌ড়ুলে ভাত, হাড়ীতে বা ছোঁয় পাত,
তোরে কিসে ফিরে কুলে আনি।"

বৈষ্ণবগণ গঙ্গারামকে প্রায়শ্চিত্তান্তে সমাজে গ্রহণ করিতে সম্মত হইল। গঙ্গারাম প্রায়শ্চিত্ত করিয়া ছাতিয়ান গ্রামনিবাসী কবিভূষণ চৌধুরীর কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার সহ সংস্রব-বিশিষ্ট কুলীনেরাই "ভূষণা পঠীর" কুলীন। উপরি উক্ত তিনটি উদাহরণ দ্বারাই সিন্দূরীর রাজাদের সামাজিক প্রাধান্য স্পষ্ট জানা যায়। কিন্তু নবাব বা বাদশাহের দর্বারে তাঁহাদের বিশিষ্ট সম্মান ছিল না। একমাত্র নাথাই ফৌজদার ভিন্ন আর কেহ কোন বাদশাহী পদবী প্রাপ্ত হন নাই।

রাজা দেবীদাস, নামান্তরে ঠাকুর কুশলী, কুলীন ভঙ্গে কাপ হইয়াছিলেন। তিনি দ্বিতীয় কালাপাহাড়ের সমকালবর্ত্তী লোক। তিনি গৌড়বাদশাহের ক্রোধ-ভাজন হইয়াছিলেন। কি জন্য সেই আক্রোশ হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে নানাপ্রকার কল্পিত গল্প আছে, তাহা উদ্ধৃত করা নিষ্প্রয়োজন। বাদশাহ উমরু নামক সেনাপতির অধীনে এক দল সেনা ছাতক আক্রমণ —

[illegible] এবং তৎ[illegible]

করিয়া পৈতৃক রাজত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ছাতকে রাণীদের অপমৃত্যু হেতু কালিদাস সেখানে বাস না করিয়া বাগ নামক স্থানে বাস করিয়াছিলেন। তদ্বংশীয়েরা অদ্যাপি সেখানে বাস করিতেছে। ছাতক নগর ঘোর জঙ্গল হইয়াছে। কালিদাসের বংশধরগণ এখন বাগের রায় নামেই পরিচিত।

হরুঠাকুর (হরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী) রাজসরকারের পূজারী ব্রাহ্মণ ছিল। সে কাশ্যপগোত্রীয় কষ্টশ্রোত্রিয় রাঢ়ী ব্রাহ্মণ ছিল। ঠাকুর কার্ত্তিক রায়ের ছয় মাস বয়স্ক একটি শিশুপুত্র ছিল। রাণীরা বিষপানের পূর্ব্বে হরুঠাকুরকে ডাকিয়া সেই শিশুর প্রতিপালনের ভার তাহার উপর অর্পণ করিয়াছিলেন এবং তজ্জন্য প্রচুর টাকা এবং অলঙ্কার হরুঠাকুরকে দিয়াছিলেন। হরুঠাকুর সেই শিশুকে নিজ পুত্র বলিয়া রক্ষা করিয়াছিল এবং তাহার নাম ভবানীপ্রসাদ রাখিয়াছিল। হরুঠাকুরের জ্যেষ্ঠপুত্ররূপেই ভবানীপ্রসাদের উপনয়ন হইয়াছিল এবং রাঢ়ী ব্রাহ্মণের কন্যার সহ তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। হরুঠাকুর মৃত্যুকালে ভবানী-প্রসাদের প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে নিজের শ্রাদ্ধাদি করিতে ... নী ... শুনিয়া অমনি জমিদার হইতে ব্যগ্র হই-

হইয়াছে, তখন তুমি কাশ্যপগোত্রীয় রাঢ়ী ব্রাহ্মণরূপেই গণ্য।" সেই ব্যবস্থা মতেই অভিষেকাদি যজ্ঞ হইল। সেই রাজা ভবানীপ্রসাদের সন্তানগণ জেলা ঢাকার অন্তর্গত জমিদার—রোয়াইলের রায় ও মহাদেবপুরের রায়। ইঁহারা রাজা ভবানীর বংশ বলিয়া পরিচিত। এই বংশের উপলক্ষেই লোকে "হারায়ে মারায়ে কাশ্যপগোত্র" বলে। প্রকৃত পক্ষে ইঁহারা বাৎস্যগোত্রীয় বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ ছিলেন। এখন কাশ্যপগোত্রীয় রাঢ়ী ব্রাহ্মণ হইয়াছেন।

বারেন্দ্র ঘটকেরা এই বংশের সম্বন্ধে বলেন, "রাজা দেবীদাসের পুত্র ঠাকুর কার্ত্তিক রায়, তৎপুত্র রাজা ভবানীপ্রসাদ রায় রাঢ়ী।" আবার রাঢ়ীয় কুলজ্ঞেরা রাজা ভবানীপ্রসাদ ও তাঁহার বংশধরগণের কুলমর্য্যাদা প্রকাশ করেন, কিন্তু ভবানীপ্রসাদের পিতৃকুলের বা মাতামহকুলের কোন বৃত্তান্ত তাঁহাদের পুথিতে নাই। ভট্ট কবিগণ ঠাকুর কুশলীর বংশ সম্বন্ধে গান করেন যে—

"এক ঘর ভাঙ্গিয়া তার হ'লো সাত বাড়ী।
তিন ঘর বারেন্দ্র তার দুই ঘর রাঢ়ী।
দুই ঘর মুসলমান, নষ্ট অন্য জন।
বসন্ত রায়ের বংশ বঙ্গের ভূষণ॥"

অন্যান্য রাজবংশের বংশবৃদ্ধি অতি কম। প্রায়শঃ দত্তক পুত্র দ্বারা বংশ-রক্ষা করিতে হইয়াছে। কিন্তু কালিয়াই গোষ্ঠীর বংশ ধারাবাহিকরূপে বৃদ্ধি হইয়াছে। এখনও কালিয়াই গোষ্ঠীর জমিদারী প্রচুর আছে। কিন্তু বহু গোষ্ঠী অন্য খুব বড় জমিদার কেহই নাই।

৭। শুশুং—সোমেশ্বর নামে একটি বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ তপস্বী, শুশুং-দুর্গাপুরে এক কালীমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া অর্চ্চনা করিতেন। তাঁহার সেই বিগ্রহের নিকট পূজা দিয়া অনেক লোকের কঠিন ব্যারাম আরাম হওয়ায় পার্শ্ববর্ত্তী লোকেরা তাঁহাকে গুরু বলিয়া মানিত। তাঁহার পুত্র সেই সকল শিষ্যদের সাহায্যে পার্শ্ববর্ত্তী স্থান অধিকার করিয়া রাজা হইয়াছিলেন। সেই সময়ে গারো, কুকি, খসিয়া প্রভৃতি অসভ্য জাতিরা বাঙ্গালাদেশের সীমান্ত প্রদেশে উৎপাত করিত। শুশুঙের রাজার দ্বারা সেই উৎপাত নিবারণ হইতে পারিবে বিবেচনায়, বাঙ্গালার নবাব তাঁহাকে রাজা উপাধি দিয়া তাঁহার রাজত্ব, ক্ষমতা ও সম্মান বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। তদবধি এই বংশের করদ রাজত্ব বহুদিন পর্য্যন্ত চলিতেছিল।

ইংরেজ কোম্পানির অধিকার সময়ে লর্ড কর্ণোয়ালিস্ ইঁহাদের জঙ্গলময় রাজ্য রীতিমত জরিপ করিতে পারেন নাই। তজ্জন্য ইঁহাদের লভ্য কিংবা ক্ষমতার বিশেষ হানি হয় নাই। প্রায় ৪০ বৎসর হইল ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট ইঁহাদের অধিকৃত পর্ব্বত ও জঙ্গল খাস করিয়া লইয়াছেন এবং হাতী ধরিয়া বিক্রয় করিবার ক্ষমতা রহিত করিয়াছেন। তদবধি ইঁহাদের মুনাফা অল্প হইয়াছে এবং ইঁহারা সাধারণ জমিদারের তুল্য হইয়াছেন। সোমেশ্বর প্রথমে কোন্ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাহা ঠিক বলা যায় না। কিন্তু রাজা হওয়া অবধি বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ সহ বিবাহ আদান প্রদানে বারেন্দ্র শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণরূপে গণ্য হইয়াছেন। ধনবানের কুলমর্য্যাদা সহজেই বৃদ্ধি হয়। ইঁহারা বহু কুলকার্য্য করিয়া অতি শ্রেষ্ঠ সিদ্ধশ্রোত্রিয় হইয়াছেন। কুলশাস্ত্রে এই বংশ উদয়াচল এবং আটপঠী কুলীনের নায়ক বলিয়া খ্যাত।

৮। বাহিরবন্দ—পূর্ব্বে বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ ও কায়স্থেরা যেমন বুদ্ধিমান্, তেমনি বীর্য্যবান্ বলিয়া গণ্য ছিল। কাঁকিনার রাজারা বারেন্দ্র কায়স্থ। তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ কোচবেহার রাজ্যের প্রধান সেনাপতি ছিলেন। আর ভুবন সিংহ নামক একজন উত্তররাঢ়ী কায়স্থ, আসাম রাজ্যের প্রধান সেনাপতি হইয়াছিল। রাঙ্গামাটিয়া গৌরীপুর ভুবন সিংহের চাকরান বা করদ রাজত্ব ছিল। * আসাম ও কোচবেহারের সৈন্যগণ বারংবার বাঙ্গালা দেশের উত্তরপূর্ব্ব

* আসামের নিকট উত্তররাঢ়ী কায়স্থ ছিল না। পূর্ব্বে দূরদেশে বিবাহ আদান প্রদান দুঃসাধ্য ছিল। বিশেষতঃ আসামরাজের সহ বাঙ্গালার নবাব ও বাদশাহের বিবাদ ছিল। এই জন্য ভুবন সিংহের বংশীয়েরা আসামের কলতা-কায়েত সমাজে মিলিয়াছেন। এই বংশ এখন গৌরীপুরের রাজা। এই বৃত্তান্ত পূর্ব্বে গৌরীপুর হইতেই সংগৃহীত হইয়াছিল। এক্ষণে তথাকার রাজবংশের অন্যরূপ ইতিহাস রাজবাড়ীতে পাওয়া যায়। তাহা এই যে, সনাতন লালা নামক একজন মিথিলা দেশীয় দরিদ্র কায়স্থ চাকরীর চেষ্টায় আসিয়া রাঙ্গামাটিয়াতে বাস করিয়াছিলেন। এই স্থান আসাম রাজ্য ও মোগল রাজ্যের সীমান্ত স্থান। এই স্থান আসামী ও কোচদের দৌরাত্ম্য হইতে রক্ষার জন্য সনাতনের বংশীয়েরা দিল্লীর বাদশাহের নিকট বহু জমি 'আল্‌তাম গাঃ' রূপ প্রাপ্ত হন এবং আট পরগণা জমিদারী পাইয়াছিলেন। তাঁহারা বড়ুয়া উপাধি ধারণ করিয়াছেন বটে কিন্তু আসামী কায়েত সহ বিবাহ আদান-প্রদান করেন নাই। তাঁহারা বরাবর পশ্চিমা কায়েত সহ বিবাহাদি করেন।

সীমান্ত প্রদেশ লুঠপাট করিত। তাহাদের দৌরাত্ম্য নিবারণ জন্য গৌড় বাদশাহ, জগৎ রায় নামক একজন শ্রোত্রিয় বারেন্দ্র ব্রাহ্মণকে বাহিরবন্দ,ভিতর-বন্দ, পাতিলাদহ ও স্বরূপপুর এই চারি পরগণার করদ রাজা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। আসামী সেনাপতি বিষ্ণুদেব বড়ুয়া বাহিরবন্দ আক্রমণ করিতে আসিলে, জগৎ রায় দুই বিপ্রদূত সহ তামার টাটে পাঁচটি হরীতকী আশীর্ব্বাদী পাঠাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, "আততায়ী নিবারণ উদ্দেশ্য ভিন্ন ব্রাহ্মণের সহ যুদ্ধ করিতে কোন হিন্দুর অধিকার আছে কি না?" আসামী পণ্ডিতেরা কহিলেন, "গৌড় বাদশাহ মুসলমান, এই রাজ্য তাঁহারই অধিকৃত। ব্রাহ্মণ জগৎ রায় তাঁহার চাকর মাত্র; সুতরাং তাহা লুণ্ঠনে দোষ নাই।" বাঙ্গালী পণ্ডিতেরা কহিলেন, "জগৎ রায় চাকর নহেন। তিনি বংশানুক্রমে ভোগ দখলের স্বত্বাধিকারী রাজা। গৌড়ের মুসলমান বাদশাহ রাজার নিকট নির্দ্দিষ্ট রাজস্ব পান মাত্র। লাভ লোক্‌সান জন্য ফলভাগী রাজা জগৎ রায় ব্রাহ্মণ। সুতরাং এই রাজ্য লুণ্ঠন করিলে ব্রহ্মস্ব হরণ করা হইবে।" আসামী পণ্ডিতেরা বাঙ্গালী পণ্ডিত সহ তর্কে পরাস্ত হইলেন। বিষ্ণুদেব সসৈন্যে ফিরিয়া গেলেন। সেই মীমাংসা শুনিয়া কোচবেহারের রাজাও বাহিরবন্দ আক্রমণ করেন নাই।

ইংরেজ রাজ্যারম্ভের পর বাহিরবন্দ রাজ্য ও রাজবংশ বিলুপ্ত হইয়াছে। এই রাজ্যের শেষ মালিক রাণী সত্যবতীর নিকট হইতে বলিহারের রাজা ভিতর-বন্দ পরগণা পাইয়াছেন। বাহিরবন্দ পরগণা কাশীমবাজারের রাজা পাইয়াছেন। পাতিলাদহ কলিকাতার প্রসন্নকুমার ঠাকুরের এবং স্বরূপপুর রাণী রাসমণির জমি-দারী ভুক্ত হইয়াছে।

৯। চন্দ্রদ্বীপ—বল্লালের কায়স্থজাতীয়া এক উপপত্নী-জাত পুত্র কালুরায়কে তিনি চন্দ্রদ্বীপে করদ রাজা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। পাঠান কর্ত্তৃক বৈদ্যরাজপাট নির্ম্মূল হইলেও কালুরায়ের সন্তানেরা চন্দ্রদ্বীপে রাজত্ব করিতে-ছিল। তাহারা যবন-রাজধানী গৌড় নগর হইতে বহুদূরে ছিল। এজন্য তাহারা পাঠানদিগের সম্পূর্ণ অধীন ও আয়ত্ত হয় নাই। তাহারা কখন নবাবকে কিছু কিছু কর দিত, কখন বা দিত না। নিজ চত্বরে তাহারা সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিল। কিন্তু কখন নিজনামে মুদ্রা ছাপিত না। এই রাজবংশীয়েরা অতিশয় বিদ্যোৎসাহী ও দাতা ছিলেন। তাঁহারা বহুসংখ্যক পণ্ডিত ব্রাহ্মণ প্রতিপালন

করিতেন। বাক্‌লা চন্দ্রদ্বীপে এখনও বহুল ব্রাহ্মণ পণ্ডিত দেখা যায়। চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশই তাহার আদি কারণ। কালুরায় ও তদ্বংশীয়েরা বঙ্গজ কায়স্থ-শ্রেণীভুক্ত হইয়াছিলেন। কায়স্থ জাতির মধ্যে ইহারাই প্রথম রাজা, এজন্য ইহারা কায়স্থ সমাজে বিশেষ মান্য ছিলেন।

চন্দ্রদ্বীপের রাজা দনুজদমন রায় নিঃসন্তান গতাসু হইলে তাঁহার ভাগিনেয় (মতান্তরে তাঁহার দৌহিত্র) পরমানন্দ বসু উত্তরাধিকারী হইয়া 'রায়' উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরমানন্দ মুখ্যিরাজ কুলীন কায়স্থ-সন্তান এবং তাঁহার মাতামহকুল বাঙ্গালা দেশের সম্রাট্‌-বংশজাত। এই জন্য পরমানন্দের বংশীয়েরা সকল কায়স্থের অগ্রগণ্য সমাজপতি ছিল। এই বংশীয় রাজা রামচন্দ্র রায়ের সহ রাজা প্রতাপাদিত্য কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন। এই বংশীয় কতিপয় ব্যক্তি এখন মাধবপাশা গ্রামে বাস করিতেছেন। কিন্তু তাঁহাদের কোন জমিদারী নাই।

১০। যশোহর—বর্ত্তমান জেলা ফরিদপুরের মহকুমা গোয়ালন্দ মধ্যে চন্দনা নামক একটি পদ্মার শাখানদী আছে। তাহার ধারে চন্দনা নামক একটি সমৃদ্ধ গ্রাম ছিল। সেই গ্রামের নাম হইতেই চন্দনা নদীর নামকরণ হইয়াছে। চন্দনার গুহগোষ্ঠী সাঁতোড়ের রাজাদের প্রজা ও কর্ম্মচারী ছিলেন। এই বংশীয় রামচন্দ্র গুহকে সাঁতোড়রাজ গোপালচন্দ্র (চাঁদ গোপাল) খাস বিশ্বাস বা সদর নায়েব নিযুক্ত করিয়া গৌড়ে পাঠাইয়াছিলেন। তাহাতে রামচন্দ্র গৌড় বাদশাহের নিকট পরিচিত ও প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। তৎপুত্র ভবানন্দ মজুমদার। তাঁহার পুত্র রাজা ভীকাম রায়, রায় বিক্রমাদিত্য ও বসন্ত রায় গৌড়বাদশাহের সরকারে অতি সম্রান্ত রাজকীয় মর্য্যাদা লাভ করিয়াছিলেন। ভীকাম রায় তিন পরগণার রাজা হইলেও তাঁহার বাড়ী সাঁতোড়ের জমিদারী মধ্যে চন্দনা গ্রামে ছিল। গৌড় বাদশাহ সলিমান চন্দনা তালুক ভীকাম রায়কে জমিদারী স্বত্বে দিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। কিন্তু ভীকাম রায় প্রতিপালক ব্রাহ্মণ সাঁতোড়ের রাজার ক্ষতি করিয়া নিজ স্বার্থ সিদ্ধি করিতে সম্মত হন নাই। প্রতাপাদিত্য এই বংশজাত। এই গুহবংশ এবং দিনাজপুরের রাজবংশ প্রায় সমকালীন উন্নত হইয়াছিল। বাঙ্গালী কায়স্থ মধ্যে গুহবংশ, চন্দ্রদ্বীপের ও দিনাজপুরের রাজবংশ সর্ব্বাপেক্ষা বনিয়াদি। তন্মধ্যে

প্রথম দুইটি বিলুপ্ত হইয়াছে। সেই জন্য দিনাজপুরের রাজবংশই কায়স্থ জাতি মধ্যে এক্ষণে সর্ব্বাপেক্ষা সম্ভ্রান্ত। রায় বিক্রমাদিত্য দাউদ খাঁর মন্ত্রী ছিলেন এবং সম্রাট্ আকবরের সহ যুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন। যখন সমস্ত বাঙ্গালা ও বেহার মোগল-সম্রাটের হস্তগত প্রায় হইল, তখন বিক্রমাদিত্যের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভীকাম রায়* ও কনিষ্ঠ বসন্ত রায় দণ্ডিত হইবার ভয়ে, স্বস্থান পরিত্যাগ করিয়া সুন্দরবনে আশ্রয় লইয়াছিলেন। তাঁহারা যে স্থানে গিয়া বাস করিয়াছিলেন, সেই স্থানের নাম "যশোহর" হইয়াছিল। † সেই যশোহরের নাম হইতেই আধুনিক জেলা যশোরের নাম হইয়াছে। সেই পুরাতন যশোহর এখন জঙ্গলাবৃত। বর্ত্তমান যশোর নগরের পূর্ব্বনাম কশ্‌বা। ভীকাম রায়, বসন্ত রায় এং বিক্রমাদিত্যের শিশু পুত্র প্রতাপাদিত্য কিছুদিন গুপ্তভাবে সেই জঙ্গল-বেষ্টিত যশোহরে বাস করিয়া মোগল রাজ্যের অবস্থা দেখিতে লাগিলেন। যখন তাঁহারা দেখিলেন যে, মোগলেরা কোন অত্যাচার করিল না অথবা বিক্রমাদিত্যের পরিবারবর্গের কোন অনুসন্ধান করিল না, তখন তাঁহারা সাহস পাইয়া আত্ম-প্রকাশ করিলেন। গৌড় নগর যখন মহামারীতে বিধ্বস্ত প্রায় হইল এবং শুবেদার মুনিম খাঁ বিনষ্ট হইলেন, ভীকাম রায় সেই গোলযোগের সময়ে নিজ রাজ্য বিস্তার করিতে লাগিলেন। তখন অর্থ দ্বারা জমিদারী ক্রয় করিবার রীতি ছিল না। গুহবংশীয়েরা বাহুবলে তিন চারি পরগণা দখল করিলেন। ভীকাম রায় ও বসন্ত রায় উভয়েই বিদ্বান্ ও বীর পুরুষ ছিলেন। প্রতাপাদিত্য তাঁহাদের অপেক্ষাও সমধিক বীরত্ব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কিন্তু প্রতাপাদিত্যের বিদ্যা অতি অল্প ছিল এবং তিনি নিতান্ত মাতাল ও দুর্ব্বৃত্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি যুদ্ধকালে যেমন বীর ছিলেন, অন্য সময়ে তেমনি মাতাল ও লম্পট ছিলেন। কিন্তু ভীকাম রায়ের জীবমানে তাঁহার দোষ ও গুণ তত বেশী প্রকাশ হয় নাই।

কমল খোজা নামক একজন প্রহরী প্রতাপের ধূমঘাটের প্রাসাদের সিংহদ্বারে থাকিতেন। প্রবাদ আছে, ধূমঘাটের নিকটে মাঠের মধ্যে একটী জঙ্গলে রাত্রি দুই

---

* হিন্দী ভাষায় ভীষ্ম শব্দের অপভ্রংশে ভীখম বলে। বোধ হয় ভীকাম শব্দটি ভীষ্ম শব্দেরই অপভ্রংশ।

† লোকে ইঁহাদিগকে সাগর দ্বীপের রাজা বলিত।

প্রহরের সময়ে আলো হইয়া উঠিত। কমল খোজা তাহা দেখিয়া বহু অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু কোন কারণ নির্ণয় করিতে পারিলেন না। সেই জঙ্গলে রাখাল বালকেরা গরু চরাইত। একদিন তাহারা সেই স্থানে একটী ঢিপীর উপর ক্রীড়াচ্ছলে কেহ কালী সাজিল, কেহ পুরোহিত হইয়া পূজা করিল, কেহ পাঁঠা সাজিল, একজন তাহার হাত পা ধরিল, অন্য বালক বলিদান ছলে একগাছা হোগলা দিয়া তাহার গলায় আঘাত করিল। হোগলার আঘাতে গলা দ্বিখণ্ড হইয়া গেল, বালকেরা ভয়ে পলায়ন করিল। কমল খোজা এই সংবাদ পাইয়া প্রতাপাদিত্যের নিকট সেই আলো ও এই আশ্চর্য্য মৃত্যুর কথা জ্ঞাপন করিলেন। প্রতাপ সেই মৃতদেহ সিন্ধুকে বদ্ধ করিয়া রাত্রিতে কমল খোজাকে সঙ্গে লইয়া বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। ঢিপীর নিকট উপস্থিত হইয়াই উভয়ে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। দৈবাদেশ পাইলেন,—"এই ঢিপী খনন করিয়া যে মূর্ত্তি পাইবে, তাহাই তোমার ইষ্টদেবতা। আর সেই রাখাল মরে নাই, সে আপনার জননীর নিকট ঘুমাইয়া আছে।"

রাজা সজ্ঞান হইয়াই গৃহে প্রস্থান করিলেন। প্রথমেই সিন্ধুক খুলিয়া দেখিলেন তাহাতে মৃতদেহ নাই। অনুসন্ধানে জানিলেন, রাখাল বালক মরে নাই, তাহার জননীর নিকট ঘুমাইতেছিল। পরদিন প্রাতঃকালে প্রতাপাদিত্য জঙ্গলের ভিতরের ঢিপী খনন করিতে লোক লাগাইলেন। কিঞ্চিৎ খনন করিলেই একটী শিলাময়ী মূর্ত্তির গলদেশ পর্য্যন্ত বাহির হইল। তখন দেবী আকাশবাণী দ্বারা এই প্রত্যাদেশ করিলেন যে, "আর খনন করিও না। এই খানে মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া আমার পূজা কর।" রাজাও আদেশানুরূপ কার্য্য করিলেন। এইরূপে তিনি শিলাদেবীর বিগ্রহ আবিষ্কার করেন। তিনি সেই শিলাদেবীর সম্মুখে নরবলি দিতেন।

প্রতাপাদিত্যের যখন সাতাইশ বৎসর বয়স, তখন তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত ভীকাম রায়ের নিঃসন্তানাবস্থায় পরলোক হইল। প্রতাপাদিত্য তখন স্বয়ং রাজগদী দাবী করিলেন। বসন্ত রায় কহিলেন, "ভ্রাতা বিদ্যমানে ভ্রাতৃপুত্র দায়াদ হয় না, সুতরাং প্রতাপ আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পুত্র হইলেও রাজগদী তাহার প্রাপ্য নহে, আমার প্রাপ্য।" এই উপলক্ষে উভয়ের মনান্তর হইল। কিন্তু প্রকাশ্য কোন বিবাদ হইল না। তখনও উভয়েই একান্নে এক বাড়ীতেই

ছিলেন। প্রতাপ একদিবস রাত্রিতে কতিপয় দুষ্ট অনুচর সহ খুড়ার প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে সবংশে নিপাত করিলেন। কেবল বসন্ত রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র কাঁচুরায়কে প্রতাপাদিত্যের পত্নী রক্ষা করিয়া তাহার মাতুলালয়ে পাঠাইয়াছিলেন।

প্রতাপাদিত্য সমস্ত সম্পত্তির একমাত্র কর্ত্তা হইয়া দিগ্বিজয়ে ব্রতী হইলেন। তিনি পদ্মা, মেঘনা ও সমুদ্র পর্য্যন্ত সমস্ত জমিদারগণকে নিজের অধীন ও করপ্রদ করিয়াছিলেন। পালে পালে হিন্দু ও মুসলমানগণ তাঁহার সহ যোগ দিতে লাগিল। প্রতাপ যদি সচ্চরিত্র হইতেন, তবে বোধ হয় স্বাধীন রাজা হইয়া থাকিতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহার চরিত্রদোষে সমস্ত সদ্বংশজাত সৎ লোকেরা তাঁহার পক্ষ ত্যাগ করিতে লাগিল। সমস্ত ব্রাহ্মণ ও কায়স্থেরা গুপ্ত-ভাবে তাঁহার বিপক্ষ হইল। এমন কি, তাঁহার নিজের স্ত্রীপুত্রও তাঁহার মঙ্গল কামনা করিতেন না। প্রতাপ অতিশয় দাতা ছিলেন। অর্থলোভে অতি, নীচজাতীয় নীচ প্রকৃতির লোকেরা তাঁহার একান্ত অনুগত ছিল। তাহাদের সাহায্যে তিনি ব্যাঘ্রের ন্যায় রাজত্ব করিতেন। তিনি "সুন্দর বনের বাঘ" নামেই প্রসিদ্ধ। তিনি অতীব তেজস্বী ছিলেন। তিনি যাহাকে যাহা আদেশ করিতেন, সে তৎক্ষণাৎ তাহাই করিতে বাধ্য হইত। মনে মনে তাঁহার প্রতি লোকের যত কেন অশ্রদ্ধা থাকুক না, কার্য্যতঃ কেহ তাঁহার কোন কথায় প্রতিবাদ করিত না এবং তাঁহার কোন কার্য্যে বাধা দিত না। লোক-পরি-চালকের পক্ষে এইটি সর্ব্বপ্রধান গুণ। এই গুণ-বিশিষ্ট লোকের অন্য সহস্র দোষ থাকিলেও তাহারা যুদ্ধে ও সামাজিক বিবাদে জয়ী হইয়া থাকে। প্রতাপাদিত্যেরও তাহাই হইয়াছিল। প্রতাপ "সার্ব্বভৌম মহারাজ" উপাধি গ্রহণ করিয়া নিজ নামে মুদ্রা ছাপিয়াছিলেন। তিনি ক্রমে তিন দল মোগল সেনা পরাজয় করিয়া আঠার বৎসর কাল স্বাধীন ছিলেন।

প্রতাপের পদাতিক সৈন্যগণ "ঢালী" সৈন্য নামে অভিহিত হইত। এই ঢালী সৈন্যের সহায়তার জন্য "অযুত তুরঙ্গসাতি" এবং "ষোড়শ হলকাহাতি" ছিল। পদাতিক, অশ্বারোহী এবং গোলন্দাজ এই ত্রিতয় সংযোগে উত্তম বাহিনী প্রস্তুত হইয়া থাকে। পদাতিককে রক্ষা এবং শত্রুকে আক্রমণ করিবার পক্ষে অশ্বারোহী বিশেষ কার্য্যকর হইয়া থাকে। যুদ্ধের প্রাক্কালে, যুদ্ধের

মধ্য সময়ে অথবা যুদ্ধের অবসান সময়ে অশ্বারোহীর সাহায্যে সম্পূর্ণ জয়লাভ হইয়া থাকে। অপর পক্ষে পরাজয়ের পর প্রত্যাগমনকালে শত্রুসৈন্যের আক্রমণ হইতে সৈন্যগণকে রক্ষা করিবার পক্ষে অশ্বারোহী সৈন্য একমাত্র আশ্রয়স্থল হইয়া থাকে। প্রতাপাদিত্য বঙ্গীয় সৈন্যকে অজেয় করিবার জন্য উপযুক্ত পরিমাণে অশ্বারোহী সৈন্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন। মহারাজের তোপ-খানা হস্তীর দ্বারা বাহিত হইত। কবিচূড়ামণি ভারতচন্দ্র বলেন, প্রতাপের "ষোড়শ হলকাহাতি" ছিল। ১৫টা হাতিতে একটী হলকা হয়। ২৪০ টা হাতী মহারাজ প্রতাপাদিত্যের তোপখানা এবং যুদ্ধোপযোগী দ্রব্যসম্ভার বহন করিয়া লইয়া যাইত।

সেকালে বঙ্গদেশে অতি সুন্দর সুন্দর সমুদ্রগামী জাহাজ প্রস্তুত হইত। প্রতাপ পর্টুগীজদিগের সাহায্যে জাহাজ সকল অধিকতর সুন্দররূপে নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। এই সকল রণতরী বায়ুর অনুকূলে বা প্রতিকূলে উভয়দিকে অনায়াসে পালভরে গমনাগমন করিত। এই নদ-নদী-বহুল বঙ্গদেশে প্রতাপ এই সকল রণতরী ও সৈন্য লইয়া যখন মোগলদিগকে অকস্মাৎ আক্রমণ করিতেন, তখন তাঁহার গতিরোধ করা তাহাদিগের সাধ্যাতীত হইত।

প্রতাপের সৈন্যগণ তীর, ধনুক, শড়্কী, বন্দুক ব্যতীত আরও দুইটী জিনিস ব্যবহার করিত। কুঠার ও কোদাল প্রত্যেক পদাতিকে সঙ্গে লইতে হইত। যুদ্ধযাত্রাকালে এই কুঠার কুঠীর নির্ম্মাণ ও কাষ্ঠ সংগ্রহ প্রভৃতি পক্ষে সহায়তা করিত। কোদাল সাহায্যে আত্মরক্ষা করিয়া যুদ্ধ করিবার জন্য পরিখা ও গর্ত্তাদি খননে বিশেষ উপযোগী হইত। যুদ্ধের ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, পরাজিত সৈন্য রাত্রির সুযোগে শিবিরের চতুর্দ্দিকে গড়খাই করিয়া আত্মরক্ষাপূর্ব্বক সুযোগক্রমে বিজয়ী শত্রুসৈন্যকে আক্রমণ করিয়া জয়লাভ করিয়াছে।

মহারাজ প্রতাপাদিত্য ও তাঁহার সেনানীগণ যথায় জয় ধ্রুব সিদ্ধান্ত করিতেন তথায় তাঁহারা বিপুল পরাক্রমে শত্রুসৈন্য আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে দলিত ও মথিত করিতেন। যখন তাঁহারা দেখিতেন শত্রুসৈন্যের সাহায্যের জন্য নূতন সেনাদল আগমন করিতেছে তখন তাঁহারা শত্রুসৈন্যের মিলন হইবার পূর্ব্বেই তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া যুদ্ধ করিতেন। শত্রুসেনানী-গণ পরস্পর মতভেদ জনিত কলহে প্রবৃত্ত হইলে, মহারাজ প্রতাপাদিত্য ও

তাঁহার সেনানীগণ ক্ষণবিলম্ব না করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হইতেন অথবা শত্রুসেনানী মারাত্মক ভ্রমে পতিত হইলে তাহাদিগকে ভ্রমশোধনের অবকাশ প্রদান না করিয়া তাঁহারা শত্রুগণকে আক্রমণ করিতেন। তাঁহারা হঠকারিতার সহিত কখন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেন না। প্রতাপ প্রথম প্রথম নিজের সৈন্যের অল্পতা জনিত অভাব ক্ষিপ্রগতি দ্বারা দূর করিতেন। ব্যূহরচনা দ্বারা গোলন্দাজের এবং স্থান নির্ব্বাচন করিয়া অশ্বারোহীর অভাব মোচন করিতেন। তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টির কাছে শত্রুদের দুর্ব্বলতা ব্যক্ত হইয়া পড়িত। গুপ্তচর নিয়োগ জয়লাভের একটী প্রধান কারণ। মোগলদিগের সময় গুপ্তচর সকল রাজ্যের দূরতর প্রদেশের ক্ষুদ্রগ্রামে অবস্থান করিয়া সমস্ত সংবাদ সম্রাট সমীপে প্রেরণ করিত। প্রতাপেরও গুপ্তচর সকল ছায়ার ন্যায় অনুসরণ করিয়া সমস্ত কথা তাঁহার নিকট প্রেরণ করিত। এই সকল কার্য্য অতি সুশৃঙ্খলার সহিত সাধিত হইত।

প্রতাপ যখন "মহারাজ" উপাধি গ্রহণ করেন, তখন তিনি পুরোহিতকে বলিলেন, "আমি দেশের রাজা, আমি কাহারও দাস নহি। আমার যজ্ঞ-সংকল্পকালে 'প্রতাপাদিত্য দেবস্য' বলিয়া সংকল্প করাইতে হইবে।" কোন ব্রাহ্মণ তাহাতে সম্মত না হওয়ায় প্রতাপ সমস্ত সমাগত ব্রাহ্মণদিগকে স্নানাহার বর্জ্জিত করিয়া দুই দিন আটক রাখিয়াছিলেন। তাঁহার মাতা, পত্নী, জ্ঞাতি, কুটুম্বগণ প্রতিবাদ করায় তিনি তাহাদিগকে বেত্রাঘাত করিয়া তাড়াইয়া দিলেন। তৃতীয় দিন একজন বৈদিক ব্রাহ্মণ, দেবস্য বা দাসস্য না বলিয়া "রায়স্য" বলিয়া প্রতাপের সংকল্প দিতে চাহিল। প্রতাপ তাহাতেই সম্মত হইয়া রুদ্ধ বিপ্রগণকে মুক্তি দিলেন। এই অবধি তিনি বৈদিক ব্রাহ্মণের ভক্ত হইয়াছিলেন। তিনি কোন শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণকে কোন বৃত্তি বা ব্রহ্মত্র দিতেন না।

প্রতাপাদিত্য সদভিপ্রায়ে চন্দ্রদ্বীপের রামচন্দ্র রায়ের সহ কন্যার বিবাহ দেন নাই। তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে, বিবাহের রাত্রে বাসর ঘরেই জামাতাকে হত্যা করিয়া তাহার রাজ্য আত্মসাৎ করিবেন এবং নিজেই কায়স্থ সমাজের সমাজপতি হইবেন। প্রতাপের পত্নী স্বামীর দুরভিসন্ধি জানিতে পারিয়া জামাতাকে রমণীবেশে পলায়নের সুবিধা করিয়া দিয়াছিলেন। প্রতাপ ঘাতুকগণ সহ বাসর ঘরে গিয়া জামাতাকে না দেখিয়া, কন্যার চক্রান্তে জামাতা পলাইয়াছে মনে করিয়া, সেই কন্যাকে হত্যা করিয়াছিলেন।

প্রতাপ নিজ সহোদরা ভগিনীর সপত্নী দয়াময়ী দাসীকে পরম সুন্দরী নবযুবতী বিধবা দেখিয়া তাহাকে বলাৎকার করিয়াছিলেন এবং তাহাকে নিকা করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। পুরোহিত মন্ত্র পড়াইতে অস্বীকার করায়, প্রতাপ ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, "তোমরা সংকল্প দিতে বল কায়স্থেরা শূদ্র, কিন্তু বিবাহ দিতে ব্রাহ্মণের ব্যবস্থা কায়স্থে খাটাইতে চাও কেন? বিধবাবিবাহ এবং ভগিনীর সতীনকে বিবাহ করা শূদ্রের পক্ষে নিষিদ্ধ নহে। এই বিবাহ তোমায় অবশ্যই দিতে হইবে, নতুবা তোমাকে কুকুরের কাণ চাটাইব।" প্রতাপ পুরোহিতকে আটক রাখিলেন। তাঁহার জ্ঞাতি কুটুম্ব সকলেই অসন্তুষ্ট হইল, কিন্তু ভয়ে কেহ প্রকাশ্যে প্রতিবাদ করিতে পারিল না। এদিকে দয়াময়ী লোকগঞ্জনা সহ্য করিতে না পারিয়া আত্ম-হত্যা করিল। কাজেই পুরোহিত মুক্তি পাইলেন। কিন্তু দয়াময়ীকে যাহারা নিন্দা করিয়াছিল, প্রতাপ তাহাদিগকে কঠিন দণ্ড দিয়াছিলেন। এই সকল কার্য্য দ্বারা প্রতাপাদিত্য সমস্ত সৎ লোকের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন।

প্রতাপ প্রথমে সকলের প্রিয়পাত্র ছিলেন, পরে নানারূপ অত্যাচার ও কদাচার দ্বারা সমস্ত সজ্জনের অপ্রিয়, সুতরাং দেবতারও অপ্রিয় হইয়াছিলেন। কতকগুলি বাগ্‌দি, চণ্ডাল ও নিম্ন শ্রেণীর মুসলমান তাঁহার একান্ত অনুগত ছিল। প্রতাপ তাহাদের সাহায্যে নিজ বাহুবলে সকলকে বাধ্য রাখিয়াছিলেন।

এদিকে কাঁচু রায় বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া সম্রাট্ জাহঁগীরের নিকট প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে অভিবাদ করিলেন। সম্রাট্ প্রতাপাদিত্যকে দমন করিবার নিমিত্ত রাজা মানসিংহকে বাঙ্গালায় পাঠাইলেন। মানসিংহ দূত দ্বারা প্রস্তাব করিলেন যে, "প্রতাপ অর্দ্ধরাজত্ব কাঁচুরায়কে ছাড়িয়া দেন এবং সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করিয়া জমিদার রূপে অর্দ্ধরাজ্য ভোগ করেন।" প্রতাপ সেই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করায় যুদ্ধ হইল। প্রবাদ আছে, মানসিংহের সহ যুদ্ধের সময়ে প্রতাপ শঙ্কটে পড়িয়া শিলাদেবীর নিকট স্তব করিয়াছিলেন; কিন্তু দেবী তাহা শুনিলেন না, রুষ্ট হইয়া মুখ ফিরাইলেন।*

* শিলাদেবীর মুখ বামদিকে একটু বক্র আছে। ভারতচন্দ্রও লিখিয়াছেন—

"অভয়া যশোরেশ্বরী।
পাপেতে ফিরিয়া, বসিলা রুষিয়া,
তাহারে অকৃপা করি।"

প্রতাপাদিত্য অসাধারণ বিক্রমে যুদ্ধ করিয়াও পরাস্ত হইলেন। অমনি সমস্ত সম্ভ্রান্ত লোকেরা কাঁচুরায়ের সহ যোগ দিল। অবশিষ্ট নীচ জাতীয় লোকেরা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পলায়ন করিল। প্রতাপ সুন্দরবন মধ্যে পলায়ন করিলেন। উদয়পুরের রাণা প্রতাপ সিংহের ন্যায়, বঙ্গের প্রতাপও দীর্ঘকাল যুদ্ধ চালাইয়া অবশেষে নিজরাজ্য উদ্ধার করিতে পরিতেন; কিন্তু রাণাদিগের অনুচরেরা যেরূপ একান্ত রাজভক্ত ছিল, প্রতাপের দুশ্চরিত্রতা হেতু তদীয় অনুচরেরা তাঁহার তেমন ভক্ত ছিল না। বরং তাঁহার জ্ঞাতি শত্রুরা তাঁহাকে বন্দী করিয়া দিল। রাজা মানসিংহ প্রতাপকে লৌহ পিঞ্জরে বদ্ধ করিয়া দিল্লী লইয়া যাইতেছিলেন; পথিমধ্যে ৪৯ বৎসর বয়সে প্রতাপাদিত্য নীরলীলা সংবরণ করিলেন।

মানসিংহ প্রতাপাদিত্যের সমগ্র রাজত্ব কাঁচু রায়কে দেন নাই। ভীকাম রায়ের মৃত্যুকালে তাঁহাদের যে জমিদারী ও যে মালগুজারী ছিল, তাহাই কাঁচু রায়কে দিয়াছিলেন। স্বদেশে যাইবার সময়ে মানসিংহ যশোহরের শিলাদেবীকে লইয়া গিয়া অম্বরে প্রতিষ্ঠিত করেন। সেই শিলাদেবী এখনও বিদ্যমান আছে। দেবীর সেবার জন্য মানসিংহ দশঘর পূজারীও লইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। এখনও তাঁহাদের বংশধরেরা শিলাদেবীর পূজা করিতেছেন। মানসিংহ শিলাদেবীকে লইয়া আসিলে কাঁচু রায় আর একটী প্রতিমা নির্ম্মাণ করাইয়া যশোহরে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ধূমঘাটের দেবালয়ে আজও সেই প্রতিমা বর্ত্তমান আছে।

যশোহরের যুদ্ধ সময়ে ভবানন্দ মজুমদার নামক একজন রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ রাজা মানসিংহের রসদ যোগাইয়া বাগোয়ান পরগণার জমিদারী পুরস্কার পাইয়াছিলেন। নদীয়ার রাজবংশ তাঁহারই সন্তান। বাঙ্গালাদেশে সংস্কৃত বিদ্যার উন্নতি সাধনে এই রাজবংশ অতি প্রসিদ্ধ। *

১১। দিনাজপুর—রঙ্গপুর জেলায় বর্দ্ধনকুঠীর রাজারা অতি পুরাতন জমিদার। ইঁহারা বারেন্দ্র কায়স্থ। কিন্তু ইঁহাদের রাজোপাধি মুসলমান বা

* প্রতাপাদিত্য নাটকে ভবানন্দ মজুমদারকে প্রতাপাদিত্যের দেওয়ান এবং বিশ্বাসঘাতক বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা। এরূপ জঘন্য মিথ্যা বর্ণনা দ্বারা নবদ্বীপের প্রসিদ্ধ রাজবংশের কলঙ্ক করা অতীব দূষ্য।

ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট জানিত নহে। ইঁহাদের প্রচুর সম্পত্তি বা বিক্রম ছিল না। ইঁহাদের কোন প্রসিদ্ধ কীর্ত্তি নাই, এজন্য ইঁহাদিগকে বারভূঁইয়া মধ্যে গণ্য করা হয় না। দেবকীনন্দন ঘোষ নামে একজন উত্তররাঢ়ী কুলীন কায়স্থ, এই বর্দ্ধন-কুঠীর রাজার চাকরী করিতেন। তাঁহার পুত্র হরিরাম, নামান্তরে দিনরাজ ঘোষ কল্যাণী নামে একটি যুবতীকে বিবাহ করিয়া গৌড়বাদশাহ গণেশনারায়ণ খাঁর প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। কল্যাণীর উৎপত্তি সম্বন্ধে তিনটি বিভিন্ন বিবরণ পাওয়া যায়।

(১) কল্যাণী এক সন্ন্যাসীর পালিতা কন্যা। তাহার পূর্ব্বপুরুষের কোন বৃত্তান্ত জানা যায় না। সন্ন্যাসীর অনুরোধে সম্রাট্ গণেশ, দিনরাজকে কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। দিনরাজ স্বীয় গুণে সম্রাটের প্রিয়পাত্র এবং উন্নত পদস্থ হইয়াছিলেন।

(২) কল্যাণী, সম্রাট্ গণেশ খাঁর দাসীগর্ভজাতা কন্যা। গণেশ তাহাকে হরিরামের সহিত বিবাহ দিয়া, দিনরাজ ঘোষ নাম দিয়া উচ্চ রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

(৩) কল্যাণী বর্দ্ধনকুঠীর রাজা আজাবলের কন্যা। তাহাকে বিবাহ করিয়া হরিরাম বর্দ্ধনকুঠীর জমিদারীর সাত আনা অংশ পাইয়াছিলেন। তাহার পর গৌড়বাদশাহের চাকরী করিয়া উন্নত হন।

কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে, কল্যাণীর কল্যাণেই দিনরাজের উন্নতির সোপান হইয়াছিল। তিনি ক্রমে ক্রমে সম্রাট্ যদুনারায়ণ খাঁর পেস্কার হইয়াছিলেন। যদু মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করিলে দিনরাজ কর্ম্ম এস্তাফা দিলেন। যদু কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বিনীতভাবে কহিলেন, "মহারাজ যত দিন ব্রাহ্মণ গুরু ছিলেন, তত দিন আমি হুজুরকে দেবতা জ্ঞানে সেবা করিয়াছি। এখন আপনি স্পর্শ করিলে আমার অন্নজল নষ্ট হইবে। সে কথা আমি বলিতে পারিব না। সুতরাং আমার দূরে থাকাই উচিত।" যদু সেই কথা শুনিয়া লজ্জিত হইয়া কহিলেন, "তোমার মত বিশ্বস্ত ও সুযোগ্য লোককে আমি ত্যাগ করিতে পারি না। তুমি দূরে থাকিতে চাও, আমি তাহাই করিতেছি। আমি তোমাকে উত্তর বাঙ্গালার নবাব নিযুক্ত করিলাম। তুমি নবাব ও সেনাপতি হইয়া পার্ব্বত্য জাতির উৎপাত হইতে সেই দিক্ রক্ষা কর।" এই নবাবী প্রাপ্তি

অবধি দিনরাজের ঘোষ উপাধি লুপ্ত হইয়া রায় উপাধি হইল। দিনরাজ যেখানে গিয়া বাস করিয়াছিলেন, তাহারই নাম "দিনরাজপুর" হইয়াছিল। উত্তর বাঙ্গালার লোক শব্দের আদ্য "র"কার উচ্চারণ করে না। এজন্য তাহারা ঐ স্থানকে দিন-আজ-পুর বলিত। তাহা হইতেই দিনাজপুর জেলার নাম হইয়াছে। সেই স্থান বর্ত্তমান দিনাজপুর সহর হইতে প্রায় দশ ক্রোশ উত্তরে ছিল।

দিনরাজের পর তৎপুত্র শুকদেব রায় নবাব হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি সর্ব্বদা বিপদ্‌গ্রস্ত ছিলেন, তজ্জন্য সুখী হইতে পারেন নাই। কোচবেহারের মহারাজ অতি প্রবল হইয়া বারংবার দিনাজপুর রাজ্য লুঠ করিয়াছিলেন। অবশেষে রাজধানী দিনাজপুর লুঠ করিয়া অগ্নি দ্বারা ভস্মীভূত করিয়াছিলেন। কালাপাহাড়ের ভয়ে শুকদেব জঙ্গল মধ্যে লুক্কায়িত থাকিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাঁহার বৃদ্ধ বয়সে মোগলেরা বাঙ্গালাদেশ অধিকার করিলে, মোগল ও উজ্‌বক সর্দ্দারেরা দিনাজপুর প্রদেশের দক্ষিণভাগে বহুদূর পর্য্যন্ত আপনাদের জাগীরভুক্ত করিয়া লইয়াছিল। ফলতঃ শুকদেবের অধিকৃত স্থান অল্প ছিল, শত্রু অনেক ছিল, সুতরাং অবস্থা মন্দ ছিল।

তদভাবে তৎপুত্র প্রাণনাথ রায় কোন সনন্দ না লইয়া স্বকৃত নবাব হইলেন। তিনি ভাগ্যবান্ লোক ছিলেন। তিনি সৈন্য বৃদ্ধি করিয়া কোচদিগকে পরাজয় করিয়া নিজ এলাকার উত্তর ভাগ পুনরায় অধিকার করিয়াছিলেন। মোগল ও উজ্‌বক সর্দ্দারগণ বিদ্রোহ অপরাধে জাগীর হইতে বিচ্যুত হইলে, প্রাণনাথ, কতক পরগণা শুকদেবের সনন্দ ক্রমে, কতক বা বলপূর্ব্বক নিজ এলাকাভুক্ত করিয়াছিলেন। জেলা দিনাজপুর সম্পূর্ণ, এবং রঙ্গপুর, বগুড়া, রাজসাহী, মালদহ ও পূর্ণিয়া এই পাঁচ জেলার কতক অংশ তাঁহার শাসনাধীন ছিল। তিনি নবলক্ষের রাজা বলিয়া বিখ্যাত অর্থাৎ তাঁহার বার্ষিক মুনাফা নয় লক্ষ টাকা ছিল। যখন সমস্ত জিনিষ শস্তা ছিল, যে সময়ে কোচবেহারের মহারাজের মোট রাজস্ব সাড়ে তিন লক্ষ টাকা ছিল, সেই সময়ে প্রাণনাথ রায়ের নয় লক্ষ টাকা লভ্য থাকায় বোধ হয় তিনিই তখন বাঙ্গালা দেশের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান জমিদার ছিলেন।

নবাব প্রাণনাথ রায় যে স্থানে কোচসেনা পরাজয় করিয়াছিলেন, সেই স্থানেই রাজধানী করিয়াছিলেন। সেই স্থানের নাম তিনি "বিজয়নগর"

রাখিয়াছিলেন। কিন্তু দিনাজপুরের নবাবের বসতি জন্য ঐ স্থানের নামই দিনাজপুর হইয়াছিল। তাহাই বর্ত্তমান দিনাজপুর সহর। পুরাতন দিনাজপুর কান্তনগরের নিকটে ছিল।

কোচদিগের সহ প্রাণনাথের বিবাদ সর্ব্বদা চলিতেছিল। তজ্জন্য বোধ হয় সৈনিক ব্যয়ও প্রচুর পড়িত। রাজা মানসিংহ সহ কোচবেহারাধিপতির যুদ্ধোদ্যম হইলে নবাব প্রাণনাথ রায়, ঠাকুর ভানুসিংহের ও রাজা মানসিংহের সমস্ত রসদ যোগাইয়াছিলেন এবং সৈন্য দ্বারাও সাহায্য করিয়াছিলেন। পরে যখন মহা-রাজ লক্ষ্মীনারায়ণ সহ মানসিংহের সন্ধি ও কুটুম্বিতা হইল, তখন রাজা মানসিংহ প্রাণনাথকে তাঁহার শাসনাধীন স্থানের করদ রাজা বলিয়া সনন্দ দিলেন এবং কোচবেহারাধিপতির সহ রাজা প্রাণনাথের পাগড়ী বদল করাইয়া উভয়ের বন্ধুতা করাইয়া দিলেন। তদবধি দিনাজপুর ও কোচবেহারের রাজবংশে বরাবর বন্ধুতা চলিয়া আসিতেছে। এই সন্ধি হওয়ার পর রাজা প্রাণনাথের আর কোন প্রবল শত্রু থাকিল না। সুতরাং তিনি দান বিতরণ, জলাশয় খনন ও দেবমন্দির নির্ম্মাণ প্রভৃতি বহু সৎকর্ম্মে প্রচুর ব্যয় করিয়াও যথেষ্ট টাকা সংস্থান করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

প্রাণনাথ রায়ই সর্ব্বপ্রথমে ভূমিতে বংশানুক্রমিক স্বত্ববান্ রাজা বলিয়া সনন্দ পাইয়াছিলেন। তাঁহার পিতা পিতামহ কেবল নবাব অর্থাৎ অস্থায়ী শাসন-কর্ত্তা মাত্র ছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় দিনাজপুরের ইতিহাসে হরিরাম ঘোষের নবাবী প্রাপ্তি অবধিই তাঁহাকে ও তৎপুত্র শুকদেব রায়কে রাজা বলিয়া লিখিত হইয়াছে। কোন হিন্দু বড় লোক উজির, দেওয়ান্, নবাব বা ফৌজদার নিযুক্ত হইলে তাঁহাকে রাজা বলিবার রীতি ছিল। আর বৃহৎ জমিদার—যাঁহার গবর্ণমেণ্টে রাজা উপাধি নাই, তাঁহাকেও রাজা বলিবার রীতি ছিল।* বোধ হয় সেই রীতি-ক্রমেই সংস্কৃত ইতিহাসে প্রাণনাথের পূর্ব্ববর্ত্তী নবাবদিগকেও রাজা বলিয়া লেখা

* রাজারা ভূমিতে স্বত্ববান মালিক আর নবাবেরা বেতনভোগী অস্থায়ী চাকর মাত্র। এজন্য 'নবাব' উপাধি হইতে 'রাজা' উপাধি বরাবর সমধিক সম্মানিত ছিল। মোগল সম্রাজ্যের শেষ ভাগে নবাবেরা প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন হইলেন, কিন্তু তাঁহাদের উপাধি নবাবই থাকিল। তখন অনেক রাজা সেই নবাবদের অধীন থাকায় নবাব উপাধি রাজা উপাধি অপেক্ষা উচ্চতর হইল।

হইয়াছে। কিন্তু তাঁহারা বাদশাহী সনন্দ প্রাপ্ত রাজা ছিলেন না। মানসিংহ জাহাঁগীর বাদশাহের নিকট যে কৈফিয়ৎ দিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি স্পষ্ট জানাইয়াছেন যে, রাজস্ব বৃদ্ধি ও সুশাসন জন্য দিনাজপুরের নবাবকে সেই প্রদেশের রাজা নির্ব্বাচন করা হইয়াছে। প্রাণনাথের রাজত্ব গঙ্গার ধার হইতে কোচবেহার পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং মালগুজারী একলক্ষ টাকা মাত্র ছিল।

প্রাণনাথ রায়ের পুত্র রাজা রামনাথ রায় অতি ভাগ্যবান্ লোক ছিলেন। তিনি জঙ্গল মধ্যে প্রচুর টাকা পাইয়া সম্পত্তি আরো বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। সম্রাট্ জাহাঁগীর ও শাহজেহান, মানসিংহ কৃত বন্দোবস্তে কোন আপত্তি করেন নাই। ঔরংজীব সম্রাট্ হইয়া রাজা রামনাথকে দিল্লীতে তলপ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার রাজত্ব প্রাপ্তির কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। রাজা কহিলেন, "দিনাজপুর প্রদেশের অবস্থা অতিমন্দ। তাহা হইতে লক্ষ টাকা মালগুজারী কদাচ শুবাদারের নিকট ইর্শাল হইত না। শুবাদার আমাকে স্থায়ী স্বত্ব দিয়া মালগুজারী অতিশয় বেশী করিয়াছেন, তাহা দেওয়া আমার পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর হইয়াছে।" যে সকল কারণে রামনাথের আয় বৃদ্ধি ও ব্যয় কম হইয়াছিল, সম্রাট্ তাহা জানিতে পারিলেন না। তিনি আমদানী বহিতে দেখিলেন যে, মানসিংহ কৃত বন্দোবস্তের পূর্ব্বে দিনাজপুর প্রদেশ হইতে কখন ত্রিশ হাজার টাকার বেশী ইর্শাল হয় নাই। সুতরাং এই বন্দোবস্তই লাভজনক জানিয়া সম্রাট্ তাহাই স্থির রাখিলেন এবং সনন্দ ও খেলাত দিয়া রামনাথকে বিদায় করিলেন। রামনাথ দিল্লী যাওয়া কালে পথিমধ্যে বৃন্দাবনে মানস করিয়াছিলেন যে, নিজের রাজত্ব স্থায়ী থাকিলে তিনি বৃন্দাবনের মন্দির অপেক্ষা উত্তম মন্দিরে রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ স্থাপন করিবেন। সেই প্রতিজ্ঞা মত রাজা রামনাথ রায়, মন্দির সমাপ্ত করিয়া বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই বাঙ্গালী মন্দির এই রাজবংশের একটি মহাকীর্ত্তি এবং বাঙ্গালী শিল্পের একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। সন ১৩০৩ সালের ভূমিকম্পে এই মন্দির স্থানে স্থানে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

দেওয়ান মুর্শিদকুলী খাঁ রাজা রামনাথের মালগুজারী বৃদ্ধি ও ক্ষমতা হ্রাস করিয়াছিলেন। মালগুজারী বাকীর জন্য রাজার ভ্রাতা কুমার রাধানাথ রায়কে ধরিয়া মুসলমান ধর্ম্মগ্রহণে বাধ্য করিয়াছিলেন। তিনি মুসলমান হইলে বাকী রাজস্ব মাফ হইল এবং তিনি পুর্ণিয়া জেলার অন্তর্গত সূর্য্যপুর পরগণা জমিদারী

রূপে পাইলেন। কৃষ্ণগঞ্জের মুসলমান রাজারা সেই রাধানাথ রায়ের বংশধর।

রাজা রামনাথের পুত্র বৈদ্যনাথের সহ নাটোরের প্রথম রাজা রামজীবনের বিবাদ ঘটিয়াছিল। কিন্তু রামজীবনের ভ্রাতা রঘুনন্দন সহ রাজা বৈদ্যনাথের বন্ধুতা হওয়ায় বিবাদ মীমাংসা হইয়াছিল। রাজা বৈদ্যনাথের সহ পুনরায় কোচবেহারের মহারাজার বন্ধুতা হইয়াছিল। বৈদ্যনাথের রাজত্বকালে নবাব মীরকাশীম, রাজার মালগুজারী বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। পরিশেষে লর্ড কর্ণওয়ালিস্ রাজস্ব অত্যন্ত বৃদ্ধি করেন এবং সর্ব্বপ্রকার ক্ষমতা রহিত করেন। তদবধি দিনাজপুরের রাজা সাধারণ জমিদার-শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন।

রাজা বৈদ্যনাথের পুত্র রাজা রাধাকান্ত নিতান্ত নির্ব্বোধ ছিলেন, তজ্জন্য লোকে তাঁহাকে "গাধাকান্ত" বলিত। তাঁহারই সময়ে একটি পরগণা ভিন্ন সমস্ত জমিদারী নীলাম হইয়াছিল। গাধাকান্ত ঘরে বাহিরে সর্ব্বজন কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়া সংসার ত্যাগ করতঃ গঙ্গাবাস করিতে গিয়াছিলেন। তৎপুত্র গোবিন্দনাথ নাবালক থাকায় সুযোগ্য অভিভাবকেরা বিবিধ উপায়ে অধিকাংশ সম্পত্তি পুনরায় উদ্ধার করিয়াছিলেন। তাহাই এ পর্য্যন্ত আছে। তিন ঘর বুনিয়াদি কায়স্থ রাজবংশ মধ্যে চন্দ্রদ্বীপের ও চন্দনার (যশোহরের) রাজবংশ বিলুপ্ত হইয়াছে। একমাত্র দিনাজপুর রাজবংশই বিদ্যমান আছে, তজ্জন্য কায়স্থ সমাজে এই রাজবংশের সম্মান সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

১২। রাজসাহী—কেদারেশ্বর মুখটি নামক একজন বংশজ রাঢ়ী ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব মতাবলম্বী ছিলেন। তাঁহার পুত্র লালা রামগোবিন্দ, গৌড় বাদশাহের খাসমুন্সী হইয়া রাঢ়দেশে রাজসাহীদিগর নামে চারি পরগণা একত্র করিয়া একচাকলারূপে পাইয়াছিলেন। তাঁহার রাজা উপাধি হইয়াছিল। সাঁওতাল, ধাঙ্গড় ও চুহাড়দিগের আক্রমণ নিবারণ জন্য ইঁহাদের সৈন্য রাখিতে হইত, এজন্য ইঁহাদের বৃহৎ জমিদারীর রাজস্ব অতি কম ছিল। এই রাজবংশ ধনবান্ এবং পরাক্রান্ত ছিল। ইঁহাদের স্থাপিত কালীমন্দির দৃষ্টে অনুমান হয় যে রাজা হওয়ার পর ইঁহারা সর্ব্বথা বৈষ্ণব ছিলেন না। কালাপাহাড়ের দৌরাত্ম্যে ইঁহারা জঙ্গলে পলাইয়াছিলেন। মোগল রাজ্যারম্ভে ইঁহারা পুনরায় পূর্ব্ব জমিদারী পাইয়াছিলেন। ইঁহারা আপনাদিগকে রাঢ়ী ব্রাহ্মণ বলিতেন। কিন্তু

এই বার ভূঁইয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনটি মুসলমান সর্দ্দারের উল্লেখ দেখা যায়; যথা,—(১) ডুমরাই, (২) ভাওয়াল, (৩) আটিয়া। তাঁহাদের বিবরণ এই যে,—

(১) ডুমরাই।—নবাব তোগবলবেগ পূর্ব্ববঙ্গ অধিকার করিলে, নাজিরুদ্দীন গিলজীকে পূর্ব্বদক্ষিণ বাঙ্গালার শরীক নিযুক্ত করিয়া ডুমরাই ও নথিলা এই দুই পরগণা জাগীর দিয়াছিলেন। এই বংশীয়েরা বহুকাল যশোর ও ফরিদপুরের কতক অংশে জাগীরদার ও জমিদাররূপে প্রভুত্ব করিয়াছিলেন। অবশেষে ইঁহাদের সমস্ত সম্পত্তি সীতারাম রায় দখল করিয়াছিলেন।

(২) ভাওয়াল।—বৈদ্য রাজবংশ নিঃশেষ সময়েই ফজলগাজী নামক এক জন মুসলমান সর্দ্দার ভাওয়াল পরগণা জাগীর পাইয়াছিল। এই বংশীয়েরা অতিশয় গোঁড়া মুসলমান ছিল এবং প্রায় কেহই লেখা পড়া জানিত না। জয়দেবপুরের রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষগণ ইহাদের বংশানুক্রমে দেওয়ান ছিলেন। সুযোগ্য মুসলমান না পাওয়ায় ইহারা অগত্যা হিন্দু কর্ম্মচারী রাখিয়াছিল। মোগল অধিকারে ইহাদের জাগীরে রাজস্ব ধার্য্য হওয়ায় ইহারা জমিদার হইয়াছিল। মুর্শিদকুলী খাঁর আমলে বাকি রাজস্ব জন্য ইহাদের জমিদারী নীলাম হওয়ায়, জয়দেবপুরের রাজাদের পূর্ব্বপুরুষ তাহা খরিদ করিয়া "রায়" উপাধি গ্রহণ করেন। এই পরগণায় অধিকাংশ জঙ্গল ছিল। ক্রমে ক্রমে অধিকাংশ জঙ্গল পরিষ্কৃত হইয়া বসতি হওয়ায় এবং কাষ্ঠের মূল্য বৃদ্ধি হওয়ায় এই পরগণার মুনাফা অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে। তজ্জন্য এখানকার জমিদার ক্রমশঃ রাজা উপাধি পাইয়াছেন। নীলকরদের সহ রীতিমত যুদ্ধ করিয়া এই রাজবংশ

... দ্বারা বিশ্বাসদের বহু প্রত্য... ...র ২... ...রা এ...

বিশ্বাস করিয়া কচুয়াকে পারসী পড়িতে দিল এবং নিজব্যয়ে তাহাকে এবং তাহার জননীকে পালন করিতে লাগিল। কচুয়া পারসী শিখিলে তাহার নাম "কচে আলি" হইল। কচে আলি আটিয়ার ফকীরের চাকরী পাইল। ফকীরের অন্তিম সময়ে সে এবং তাহার মাতা ফকীরের যথাসাধ্য সেবা শুশ্রূষা করায় ফকীর তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি কচে আলি ও তাহার মাতাকে দিয়াছিলেন। কিন্তু বাদশাহী সচিব কচে আলিকে নিষ্কর জাগীর ভোগ করিতে না দিয়া পরগণার উপর মালগুজারী ধার্য্য করিলেন। তদবধি কচে আলি জমিদার হইয়া খাঁ উপাধি ধারণ করিলেন এবং বাথুলির বিশ্বাসদিগকে প্রধান কার্য্যকারক নিযুক্ত করিলেন। মোগল সম্রাট্‌দের অধীনে কচে আলি খাঁর সন্তানেরা ফৌজদার ও মন্‌সবদার ছিলেন এবং আটিয়া পরগণার সীমা প্রচুর বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। মুর্শিদকুলী খাঁর কঠোর মালগুজারী বন্দোবস্তে বাঙ্গালা ও বেহারের প্রায় সমস্ত মুসলমান জমিদারেরই জমিদারী নীলাম হইয়া গিয়াছিল; কিন্তু বাথুলির বিশ্বাসদের প্রযত্নে আটিয়ার জমিদারের সম্পত্তি রক্ষা পাইয়াছিল। দেলদুয়ারের মিঞারা সম্ভ্রান্ত সৈয়দ। তাঁহারা আটিয়ার খাঁদিগের দৌহিত্র সূত্রে এই বৃহৎ পরগণার কিয়দংশ পাইয়া জমিদার হইয়াছেন। ইংরেজ রাজত্বে আটিয়া পরগণার কতকাংশ ঢাকার নবাবদিগের অধিকারভুক্ত হইয়াছে। আর অল্প কিছু অংশ ধনবান্ হিন্দুরা খরিদ করিয়াছেন। পক্ষান্তরে আটিয়ার খাঁ সাহেবেরা অনেক অতিরিক্ত জমিদারী তালুক ইত্যাদি ক্রয় করিয়া সে ক্ষতিপূরণ করিয়াছেন। হিন্দুদের সহ এই বংশীয়দের যতদূর সদ্ভাব আছে এবং

ছিল, অন্য কোন মুসলমান বড়মানুষের সহ হিন্দুদের ততদূর হয় নাই। আর দেলদুয়ারের মিঞাদের তুল্য সম্ভ্রান্ত মুসলমান বাঙ্গালা, বেহার, উড়িষ্যায় আর দেখা যায় না। করটিয়ার মিঞারাই কচে আলি খাঁর পুত্রের বংশধর।

* * * * *

কত দিন হইতে বাঙ্গালা ভাষার সূত্রপাত হইয়াছে, কতদিন হইতে বাঙ্গালা বাঙ্গালীর লিখিত ভাষারূপে গণ্য হইয়াছে, তাহা বলা অসম্ভব। বৈদিক ভাষাই আর্য্যজাতির আদি ভাষা ছিল, পরে সংস্কৃত ভাষার প্রচলন হয়। সমাজ-বিপ্লব ধর্ম্ম-বিপ্লব ও রাষ্ট্র-বিপ্লব প্রভৃতি সমস্ত বিপ্লবই ভারতবর্ষের বুকের উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে। এই সকল বিপ্লবে দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা যেমন পরিবর্ত্তিত হয়, দেশের ভাষাও সেই সঙ্গে প্রভূত পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। সংস্কৃত ভাষা বহুকাল এদেশে প্রভুত্ব বিস্তার করিলেও প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে অকস্মাৎ বৌদ্ধ-বিপ্লবে পালী ভাষার উৎপত্তি হইল। এই সময় হইতে সংস্কৃত ভাষা নিষ্প্রভ হইতে আরম্ভ হয়। তৎপর বৌদ্ধধর্ম্মের অবসানে ও সনাতন ধর্ম্মের পুনরুত্থানে পুনরায় সংস্কৃত ভাষার চর্চ্চা আরব্ধ হয়, কিন্তু পূর্ব্বে নবাগত ভাষাটীর সাহায্যে দেশে যে প্রাকৃত ভাষার স্তর সৃষ্ট হইয়াছিল, তাহা বিলুপ্ত হইল না। এই প্রাকৃত ও সংস্কৃতের মিশ্রণেই গৌড়ীয় ভাষার সৃষ্টি।

শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পর হইতে তৎশিষ্যগণের ভক্তি-প্রবণতায় আধুনিক বঙ্গ-সাহিত্য পরিপুষ্টি লাভ করিতে আরম্ভ করে। তৎপূর্ব্বে এদেশবাসী নরনারী যোগীপাল, মহীপাল, গোপীপাল প্রভৃতির গীত আনন্দের সহিত আলাপ করিত। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে পাল রাজগণের রাজত্বকালে এই গীতের জন্ম হয়। এই সকল গীত ও খনা এবং ডাকের বচন প্রভৃতিই বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রথম কালের রচনা বলিয়া প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের ধারণা যে, ইহা বাঙ্গালা সাহিত্যে আদিম রচনা নহে,—আদিমের নিকটবর্ত্তী মাত্র। ইহারও পূর্ব্বকালে বাঙ্গালা ভাষা রচিত হইয়াছে।

একাল পর্য্যন্ত যে সমুদয় প্রাচীন গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা হইতে রামাই পণ্ডিতের 'শূন্য পুরাণ', চণ্ডীদাসের 'চৈতন্যরূপ প্রাপ্তি', রূপ গোস্বামীর 'কারিকা', কৃষ্ণদাস গোস্বামীর 'রাগময়ীকণা' এবং সহজিয়া সম্প্রদায়ের কতিপয়

গ্রন্থে প্রাচীন বাঙ্গালার গদ্য সাহিত্যের আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। 'শূন্য পুরাণ' বৌদ্ধ প্রভাব কালের পদ্যগদ্যময় গ্রন্থ। ইহার অধিকাংশই পদ্য, সামান্য অংশ মাত্র গদ্য। ইহার পূর্ব্বে কোনও বাঙ্গালী লেখক গদ্য লিখিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন কিনা অবগত হওয়া যায় না।

পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থসমূহ মুসলমান-শাসন-আমলে রচিত হইলেও, তাহাতে একটিও অ-সংস্কৃত বা বৈদেশিক শব্দ প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায় না। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সহজিয়াগণই বাঙ্গালা গদ্যের প্রথম স্রষ্টা। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দী হইতে এই গদ্য রচনার নমুনা পাওয়া গিয়াছে। সহজিয়া সম্প্রদায়ের রোপিত বীজ হইতেই বর্ত্তমান কালের বঙ্গভাষার উৎপত্তি।

মুসলমান রাজত্বকালে ভারতবর্ষে সংবাদপত্রের প্রচলন ছিল। অবশ্য তখন সংবাদপত্র মুদ্রিত হইত না, কিন্তু ইহাতে এখনকার মত অনর্থক সংবাদ না থাকিয়া সমস্ত রাজনৈতিক বিষয়ক সংবাদ হস্তদ্বারা লিখিত হইত এবং তাহা দেশের প্রধান প্রধান রাজকর্ম্মচারীর নিকট প্রেরিত হইত। সমস্ত বিভিন্ন বিভিন্ন প্রদেশের সংবাদ একত্রিত করিয়া সম্রাটের নিকট প্রেরিত হইত, এবং এইরূপ সংবাদ সংগ্রহের জন্য রাজকীয় স্বতন্ত্র বিভাগ ছিল। "কানুন এ-জং" নামক প্রাচীন পারস্য গ্রন্থে উক্ত আছে যে, পানিপথ যুদ্ধে বাবর শাহ্‌ শিবিরে বসিয়া সংবাদপত্র পাঠ করিতে ছিলেন এমন সময়ে হিন্দু রাজারা আসিয়া সন্ধির প্রস্তাব করিয়াছিলেন। আবুল ফজল "আইন-ই-আক্‌বরী" গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন যে, সম্রাট্‌ আক্‌বরের সময় প্রতি মাসে গবর্ণমেণ্ট গেজেটের মত রাজকীয় সমাচার পত্র প্রচলিত ছিল। শাহজেহান আগ্রার মহরম দর্বারে বলিয়াছিলেন, "এলাহাবাদের হিন্দু প্রজাদের মধ্যে বিদ্রোহের লক্ষণ দেখা যাইতেছে ইহা সমাচার পত্রে পাঠ করিয়া বিস্মিত ও বিষাদিত হইলাম।" সম্রাট্‌ ঔরংজেব আরাঙ্গবাদ নামক স্থানে জীবনলীলা সম্বরণ করেন, তাঁহার পীড়ার সমাচার ও বিবরণ দিল্লীর "পয়গম-এ-হিন্দ্‌" নামক পারস্য সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল।

একাদশ অধ্যায়।

রাজা মহেন্দ্রনারায়ণ খাঁ।—উপেন্দ্রনারায়ণ খাঁ।—উপেন্দ্রনারায়ণের বিদ্রোহ ও পরাজয়।—উপেন্দ্রের পণ্ডিতগৃহে অজ্ঞাতবাস।

মহেন্দ্র নারায়ণ রাজা হইতে, জগৎ নারায়ণের পাটরাণী প্রথমতঃ কোন আপত্তি করেন নাই। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে উপেন্দ্র নাবালক জন্যই মহেন্দ্র রাজ্য শাসন করিতেছে; উপেন্দ্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে সেই রাজত্ব পাইবে। তিনি কিছুদিন মধ্যেই জানিতে পারিলেন যে মহেন্দ্র অভিষিক্ত হওয়ায় রাজত্ব তাহারই হইয়াছে। সে নিজে যাবজ্জীবন রাজত্ব করিবে তদ্ভাবে তাহারই সন্তান রাজা হইবে; উপেন্দ্র এবং তাহার সন্তানেরা কেবল ভরণপোষণ জন্য যৎকিঞ্চিৎ আয়মা পাইবে মাত্র। মহেন্দ্রের সচ্চরিত্রতা হেতু পাটরাণী এতদিন তাঁহাকে খুব ভাল বাসিতেন। এখন মহেন্দ্র কর্ত্তৃক নিজ পুত্র রাজ পদে বঞ্চিত হইল জানিয়া মহেন্দ্রের প্রতি তাঁহার বিদ্বেষ হইল। তিনি বিবেচনা করিলেন, আমি পাটরাণী, সুতরাং রাজপাট আমার নিজ সম্পত্তি, আমার পুত্রই আমার স্বত্বে রাজপদ পাইবার যোগ্য; মহেন্দ্র যে রাজত্ব পৈত্রিক বিবেচনা করিয়া নিজের জ্যেষ্ঠত্ব হেতু রাজত্ব গ্রহণ করিয়াছে তাহা নিতান্ত অন্যায়। তাঁহার এই সিদ্ধান্ত বিশুদ্ধ কিনা তাহা বুঝিবার জন্য পাটরাণী নিজ ভ্রাতা দিনমণি সান্যালের মতামত প্রেক্ষী হইলেন। দিনমণি কহিলেন, "কুলশাস্ত্র মতে 'কুলীনো দেবতা স্বয়ং,' দিদি! আপনি কুলীন কন্যা আর মহেন্দ্রের মাতা শ্রোত্রিয় কন্যা। আপনকার সহ তুলনায় ছোট রাণী সর্ব্বাংশেই ছোট। সুতরাং আপনকার পুত্র উপেন্দ্র বয়সে ছোট হইলেও শ্রেষ্ঠ আর মহেন্দ্র বয়সে জ্যেষ্ঠ হইলেও নিকৃষ্ট। মহেন্দ্র যে উপেন্দ্রকে উপেক্ষা করিয়া নিজে রাজা হইয়াছে তাহাতে নিতান্ত অন্যায় পরিবেদন দোষ হইয়াছে। অতএব মহেন্দ্রকে রাজ্যচ্যুত করিয়া উপেন্দ্রকে রাজা করাই কর্ত্তব্য।" এইরূপে যুক্তি বিভিন্ন হইলেও ভ্রাতা ভগিনীর সিদ্ধান্ত ঠিক একই রূপ হইল। তাঁহারা উদ্দেশ্য সাধনে ব্রতী হইলেন।

মহেন্দ্রের দূরবর্ত্তী জ্ঞাতি প্রচণ্ড খাঁ অতি উগ্রস্বভাব ছিলেন। তিনি একজন সামান্য প্রজার শস্য ক্ষেত্র নিজ ঘোড়া দ্বারা অপচয় করাতে অপক্ষপাতী রাজা মহেন্দ্র তাঁহার জরিমানা করিয়া প্রজার ক্ষতিপূরণ করিলেন এবং প্রচণ্ডকে ভবিষ্যতে সাবধান হইতে বলিলেন। প্রচণ্ড বিবেচনা করিলেন, আমি রাজার জ্ঞাতি, সুতরাং প্রজার প্রতি অত্যাচার করিতে আমার অবশ্যই স্বত্ব আছে। আমার জরিমানা করিয়া অপমান করা রাজার পক্ষে নিতান্ত অন্যায় কার্য্য। এরূপ দুষ্ট রাজা থাকিতে আমার মঙ্গল নাই। অতএব তিনি দিনমণির সহকারী হইলেন।

লালা রামচন্দ্র সরকারের পুত্র লালা গোপালচন্দ্র সরকার জমানবিসী কর্ম্ম করিতেন। তিনি প্রজাদের অর্থ শোষণ করিয়া প্রচুর উপার্জ্জন করিতেন। মহেন্দ্র তাদৃশ অর্থ শোষণের প্রতিবন্ধক হওয়ায় গোপালও তাঁহার বিপক্ষ হইলেন। তাঁহারা চারিজনে উপেন্দ্রকে রাজা করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। পাটরাণীর হস্তে প্রচুর অর্থ ছিল। দিনমণি এবং প্রচণ্ড উভয়েই বীরপুরুষ ছিলেন এবং গোপাল বুদ্ধিমান ছিলেন। সুতরাং ধনবল, বাহুবল এবং বুদ্ধিবল একত্র হইল, কেবল জনবলের অভাব থাকিল। তাঁহারা প্রতাপবাজু পরগণায় গিয়া সেনা সংগ্রহ করতঃ যুদ্ধারম্ভ করিতে গোপনে পরামর্শ করিলেন।

পাটরাণী প্রচুর টাকা ও উপেন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া গঙ্গাস্নান উপলক্ষে রাজবাড়ী হইতে বাহির হইয়া নৌকা পথে প্রতাপবাজু পরগণায় উপস্থিত হইলেন। দিনমণি, গোপাল এবং প্রচণ্ড খাঁ অন্য উছিলায় সাতগড়া হইতে বাহির হইয়া তাঁহার সহ মিলিত হইলেন। তৎকালে যুদ্ধ ব্যবসায়ী সিপাহী ও লাঠিয়াল সর্ব্বত্রই সুপ্রাপ্য ছিল। রাণীর টাকায় এবং দিনমণি ও গোপালের চেষ্টায় অল্পদিন মধ্যে ৫০০ সিপাহী সংগৃহীত হইল। প্রতাপবাজুর নায়েব পরাজিত ও হত হইল। একমাস মধ্যে সমস্ত প্রতাপবাজু ও কুসুম্বী পরগণা রাণীর হস্তগত হইল। সেই খানেই নাবালক উপেন্দ্র নারায়ণ খাঁকে রাজ্যাভিষেক করা হইল। মহেন্দ্র সমাচার পাইয়া সসৈন্যে প্রতাপবাজুতে উপস্থিত হইলেন। উভয় পক্ষের মধ্যে প্রকাণ্ড যুদ্ধ হইল। মহেন্দ্রের সুশিক্ষিত সেনার সম্মুখে উপেন্দ্রের নূতন দলবল সর্ব্বাংশেই অপকৃষ্ট ছিল। কিন্তু এসিয়া খণ্ডে সেনাপতির যোগ্যতানুসারেই সৈন্যের ক্ষমতা হ্রাস বৃদ্ধি হয়। দিনমণি

ও প্রচণ্ড খাঁ অতি সাহস পূর্ব্বক যুদ্ধ চালাইতে লাগিলেন। উপেন্দ্র চতুর্দ্দশ বর্ষীয় বালক হইলেও নির্ভীক চিত্তে যুদ্ধ স্থানে উপস্থিত থাকিয়া প্রচণ্ড খাঁর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের বিক্রমে প্রদীপ্ত হইয়া সেই নূতন সেনা মহেন্দ্রের সুশিক্ষিত সেনার সহ সমভাবে যুদ্ধ করিতে লাগিল। এক প্রহর যুদ্ধের পর দিনমণি রণশায়ী হইলেন। অমনি সেনাগণ ভঙ্গ দিয়া পলায়ন আরম্ভ করিল। গোপাল ও প্রচণ্ড খাঁ বহুতর চেষ্টা করিয়াও সম্বরণ করিতে পারিলেন না। তখন আটজন মাত্র অনুচর সহ উপেন্দ্র, গোপাল ও প্রচণ্ড খাঁ দ্রুতগামী নৌকাযোগে পলায়ন করিলেন। তাঁহাদের দলবল হত আহত বা পলায়িত হইয়া সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হইল। পাটরাণী সহ দিনমণির ও গোপালের পরিবারবর্গ মহেন্দ্রের হাতে পড়িল। মহেন্দ্র কোন উৎপীড়ন না করিয়া শান্ত ভাবে সকলকে বশ করিতে লাগিলেন। একমাস মধ্যে প্রতাপবাজু ও কুসুম্ভী সম্পূর্ণ শান্ত এবং নিরাপদ হইলে মহেন্দ্র বন্দীগণ সহ সাতগড়ায় আসিলেন। পদ্মানদীর দক্ষিণ পারে একটাকিয়ার রাজত্ব প্রভুত্ব কিছুই ছিল না। গোপাল, প্রচণ্ড ও উপেন্দ্র নৌকাপথে পদ্মা পার হইয়া কতক নির্ভয় হইলেন। তথাপি যদি কেহ অর্থলোভে তাঁহাদিগকে ধরিয়া মহেন্দ্রের হস্তে সমর্পণ করে এই ভয়ে তাঁহারা প্রচ্ছন্ন ভাবেই চলিতে লাগিলেন।

এই সময়ে জাহাঁগীর দিল্লীর সম্রাট্ ছিলেন। তাঁহার পুত্র শাহজাহান বিদ্রোহী হইয়া বাঙ্গালা ও বেহার অধিকার করিয়া রাজমহলে অবস্থিতি করিতে ছিলেন। উপেন্দ্র অনুচর সহ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সুন্দর বীরমূর্ত্তি দেখিয়া শাহজাহানের চিত্ত তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইল। শাহজাহাঁন তাঁহার পরিচয় লইলেন। অনেকক্ষণ উভয়ের আলাপ হইল। উপেন্দ্রের কুল মর্য্যাদা আদব কায়দা (শিষ্টাচার) সাহস বিদ্যা বুদ্ধি দৃষ্টে শাহজাহান অতিশয় প্রীত হইলেন। তিনি সভাসদগণকে বলিলেন, "আমার পূর্ব্বপুরুষ বাবর ও আকবর যেমন অবস্থা গতিকে অল্প বয়সেই অভিজ্ঞ বীর হইয়াছিলেন, এই বালকের অবস্থাও ঠিক সেইরূপ দেখিতেছি।" তৎপরে উপেন্দ্রকে কহিলেন, "বাপু হে! তোমার আমার সমান দশা; তুমি যেমন বৈমাত্র ভ্রাতার দৌরাত্ম্যে দেশত্যাগী আমিও সেইরূপ বিমাতা ও বৈমাত্র

ভ্রাতার ষড়যন্ত্রে দেশত্যাগী পিতৃদ্রোহী। তোমাকে তোমার পৈত্রিক রাজ্য দেওয়া আমার পক্ষে কঠিন কাজ নয় কিন্তু আমার অবসর নাই। আমার বিমাতা নুরজাহান বেগম বাঙ্গালা দেশে আমার অভ্যুদয় শুনিয়া শাহজাদা পর্বেজ ও সেনাপতি মহাবৎ খাঁর* অধীনে একদল প্রবল সেনা আমার বিরুদ্ধে পাঠাইয়াছেন। আমি সেই নিজ শত্রু নিরাকরণ না করা পর্য্যন্ত তোমার জন্য কোন চেষ্টা করিতে পারি না। আমি তোমাকে নিজ সন্তানের ন্যায় স্নেহ করিব। তুমি আমার জ্যেষ্ঠপুত্র দারা শেকোর সহচর হইয়া রাজনীতি বীরনীতি শিক্ষা কর। দেখ যাউক আমার ভাগ্যেই বা কি হয়, আর তোমার ভাগ্যেই বা কি হয়।" "হুজুরের অনুগ্রহে একান্ত চরিতার্থ হইলাম" বলিয়া উপেন্দ্র নত ভাবে তিনবার কুর্ণিশ করিলেন। প্রতীহারী তাঁহাকে কুমার দারা শেকোর নিকট লইয়া গিয়া পরিচয় করিয়া দিল।

দারা শেকো রাজপুত রাজকুমারীর গর্ভজাত ছিলেন। তিনি বাল্যাবধি অতিশয় হিন্দুপ্রিয় ছিলেন। তিনি মুসলমানধর্ম্ম মানিতেন না এবং মুসলমান-দিগকে বিশ্বাস করিতেন না, ভালও বাসিতেন না। তিনি প্রতীহারী প্রমুখাৎ উপেন্দ্রের পরিচয় এবং শাহজাহানের আদেশ অবগত হইয়া একবারে উপেন্দ্রকে বন্ধু ভাবে গ্রহণ করিলেন। উপেন্দ্র ও গোপাল সর্ব্ব কার্য্যে দারা শেকোর সাহায্য করিতে লাগিলেন। প্রচণ্ড খাঁ শাহজাহানের নিজ অনুচর হইলেন। অল্পকাল মধ্যেই উপেন্দ্রের সাহস বিক্রম বিদ্যা বুদ্ধি শাহজাহানের সমস্ত দলে বিখ্যাত হইল। দারার সঙ্গে সঙ্গে উপেন্দ্র শাহজাহানের অন্তঃ-পুরেও যাইতেন। দারার মাতা উপেন্দ্রকে সন্তান নির্ব্বিশেষে স্নেহ করিতে লাগিলেন। উপেন্দ্র তথায় রাজপুত্রের ন্যায় সুখ ও সম্মানে বাস করিতে লাগিলেন।

কিন্তু তাঁহার সেই সুখ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইল না। কুমার পর্বেজ ও মহাবৎ খাঁ বাদসাহী সেনা সহ অল্পকাল মধ্যেই বক্সরে উপস্থিত হইলেন।

---

* ইংরেজ ঐতিহাসিকগণ মহাবৎ খাঁকে পাঠান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা ভুল। তিনি রাজপুত সন্তান। রাণা প্রতাপ সিংহের ভ্রাতা সাগরজী তাঁহার পিতা। তিনি প্রথমে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া পরে অনুতাপে বিবাহ করেন নাই। টড্ সাহেব কৃত রাজস্থানে এই ভুল নাই।

শাহজাহানও সেনা সহ অগ্রসর হইলেন। শোণ নদের তীরে তুমুল সংগ্রাম হইল। শাহজাহান একান্ত পরাস্ত হইলেন এবং তিন শত মাত্র অনুচর সহ ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিয়া নিস্তার পাইলেন। তাঁহার স্ত্রী পুত্র কন্যা সমস্ত পর্বেজের হাতে পড়িয়া দিল্লীতে প্রেরিত হইল। প্রচণ্ড খাঁ শাহজাহানের অনুগামী হইলেন। উপেন্দ্র ও গোপাল মৃত সেনার মধ্যে শবাকারে পতিত থাকিয়া বিক্ষত শরীরে প্রাণ রক্ষা করিলেন। কিন্তু গোপাল যে জীবিত আছে তাহা উপেন্দ্র জানিলেন না এবং তিনি যে জীবিত আছেন তাহাও গোপাল জানিতে পারিল না।

দিবা অবসান হইল। বাদশাহী সেনা সরিয়া গেল। দিগ্বলয় তমসাচ্ছন্ন হইল। শৃগাল কুকুর শকুনি গৃধিনীগণ মহোল্লাসে মৃত যোদ্ধাদিগের রক্ত মাংসে উদর পূর্ণ করিয়া ভীষণ চীৎকার করিতে লাগিল। উপেন্দ্র সুযোগ বুঝিয়া শবশয্যা হইতে উঠিয়া শোণ নদের জলে নামিলেন। যুদ্ধশ্রমে অতিশয় পিপাসা হইয়াছিল কিন্তু ভয় প্রযুক্ত তৃষ্ণা সহ্য করিয়া এতক্ষণ মৃতবৎ নিস্পন্দ ভাবে পতিত ছিলেন। এখন পেট ভরিয়া জলপান করিলেন। শরীর ধৌত করিলেন। মৃত্তিকা দ্বারা ক্ষত স্থানের রক্ত বন্ধ করিলেন। সৈনিক বেশ ত্যাগ করিয়া ধুতী দ্বিখণ্ড করতঃ তাহা দ্বারা কৌপিন এবং চাদর করিয়া শরীর আবৃত করিলেন। লুণ্ঠনকারীদের ভয়ে তিনি পূর্ব্বেই সমস্ত অলঙ্কার ত্যাগ করিয়াছিলেন কেবল কোমরে একছড়া সোণার বিছা ছিল, তাহাই এখন উপেন্দ্রের একমাত্র সম্বল থাকিল। উপেন্দ্র ক্ষুধায় অত্যন্ত অস্থির হইলেন, অথচ খাদ্য কোথায় পাইবেন তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। শোণ নদে বেশী জল ছিল না, স্রোত মাত্রও ছিল না। তিনি নদ পার হইয়া উত্তর-পূর্ব্ব মুখে গঙ্গাতীরে চলিলেন। অল্প দূরে গিয়া তিনি এক খরবুজার ক্ষেত্র পাইলেন। পেটের জ্বালায় পরস্বাপহরণ জনিত পাপের কথা একবারও মনে উঠিল না। তিনি ছালশুদ্ধ কাঁচা খরবুজা দ্বারা উদর-পূর্ত্তি করিলেন। যে উপেন্দ্রের মুখে ক্ষীর, সর, নবনীতও তুচ্ছ বোধ হইত এখন ক্ষুধার উৎপীড়নে সেই রসনায় কাঁচা খরবুজা অমৃত তুল্য বোধ হইল। রাত্রি প্রায় চারি দণ্ড থাকিতে উপেন্দ্র গঙ্গাতীরে পেঁ ছিলেন।

রাত্রি প্রভাত হইলে উপেন্দ্র গঙ্গাজলে প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া

ওজরা ঘাটে উপস্থিত হইলেন। পাঠার্থী ব্রাহ্মণবটু বলিয়া পরিচয় দেওয়ায় খেয়াপারে পয়সা লাগিল না। এই সময়ে মিথিলা জনকপুরে জগন্নাথ শাস্ত্রী নামে একজন পণ্ডিত প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। নানা চিন্তাকরিয়া উপেন্দ্র তাঁহার ছাত্র হইতে মনস্থ করিয়া পথ জিজ্ঞাসা করিতে করিতে জনকপুর অভিমুখে চলিলেন। পাঠার্থী বিপ্রবালক বলিয়া পরিচয় দেওয়াতে, তিনি যেখানে অতিথি হইলেন সেই খানেই সমাদরে শয়ন ভোজন পাইলেন। তাঁহার সঙ্গে অর্থ, খাদ্য বা শয্যা না থাকা হেতু কোন কষ্ট হইল না। উপেন্দ্র বুঝিলেন ইহাই ব্রহ্মকুলের উচ্চ মর্য্যাদার ফল। যেমন যাজনিক ব্যবসায়ে উপার্জ্জন অল্প তেমনই ইহাতে ব্যয়ও অল্প। তিনি যে শাহজাহানের দলে ছিলেন একথা কাহারও মনে উদয় হইল না। তিনি নির্ব্বিঘ্নে অষ্টম দিবসে জনকপুরে জগন্নাথ পণ্ডিতের গৃহে উপস্থিত হইলেন।

পণ্ডিতজী উপেন্দ্রের চেহারাতে রাজলক্ষণ দেখিয়া বুঝিলেন ছাত্রটি সামান্য লোক নহে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাপু হে, তোমার নাম কি?"

উপেন্দ্র। শ্রীউপেন্দ্র নারায়ণ আচার্য্য।

পণ্ডিত। বাড়ী কোথায়?

উপেন্দ্র। গৌড়দেশে সপ্তদুর্গা। (রাজধানীর নামানুসারে বরেন্দ্রভূমিকে গৌড়দেশও বলিত)।

পণ্ডিত। কোন গোত্র, কাহার সন্তান?

উপেন্দ্র। কাশ্যপ গোত্র, পণ্ডিতপ্রবর উদয় আচার্য্যের সন্তান।

পণ্ডিত। আমাকে কিরূপে জান্‌লে?

উপেন্দ্র। আপনার যশ দিগ্দেশ ব্যাপী, সেই জন্য আপনকার নিকট পাঠার্থী।

নিজের খ্যাতি গৌড়দেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে শুনিয়া জগন্নাথ অতি হৃষ্টচিত্তে পুনরায় কহিলেন, "তোমার কি পর্য্যন্ত পড়া হইয়াছে?"

উপেন্দ্র। আমি বাঙ্গালা পড়িয়াছি। তাহার পর আমার অভিভাবকেরা আমাকে পারসী পড়িতে দিয়াছিলেন। কিন্তু যাবনিক ভাষা পাঠে আমার ইচ্ছা নাই। সেই জন্য আপনার ন্যায় সদ্গুরুর নিকট পবিত্র দেবভাষা শিখিতে

আসিয়াছি। সংস্কৃত এ পর্য্যন্ত আমি কিছুই পড়ি নাই এমন কি দেবনাগর বর্ণমালাও ভালরূপ চিনি না।

পণ্ডিত। তোমার বয়স কি ?

উপেন্দ্র। ষোল বৎসর।

পণ্ডিত। এত বয়সে ক খ শিখিতে আরম্ভ করিয়া কত কাল পড়িবে ?

উপেন্দ্র। বাঙ্গালা এবং সংস্কৃত সদৃশ ভাষা, আমি যখন বাঙ্গালা জানি তখন সংস্কৃত পড়া অনেক সহজ হইবে। আপনকার চরণাশীর্ব্বাদে তিন চারি বৎসর মধ্যে প্রয়োজনীয় সমস্ত বিষয় শিখিতে পারিব।

পণ্ডিত। তুমি অর্থকরী ভাষা ত্যাগ করিয়া পবিত্র ভাষা শিক্ষার জন্য এতদূর আসিয়াছ, ইহাতে বোধ হয় তোমার মনোযোগ বেশী হইবে। যা হউক, অদ্য বিশ্রাম কর ; কল্যাবধি তোমার অধ্যাপন আরম্ভ করিব।

ইংরেজ জাতি বাণিজ্য ব্যবসায়ী। তাঁহাদের সকল কাজই ক্রয় বিক্রয় বাণিজ্য উদ্দেশ্যমূলক। ইংরেজের সকল বিদ্যা বিক্রীত হয়, আদালতে বিচার বিক্রীত হয়, বিবাহে প্রেম বিক্রীত হয়, অর্থ লাভ ভিন্ন কোন কাজ নাই। হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বিদ্যা বিক্রয় ও বিচার বিক্রয় প্রচলিত ছিল না। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা ছাত্রদিগকে থাকিবার স্থান দিতেন, আহার দিতেন এবং সন্তানের ন্যায় প্রতিপালন করিয়া শিক্ষা দিতেন। ছাত্রেরাও অধ্যাপকগণকে পিতৃবৎ ভক্তি করিত এবং তাঁহাদের সাংসারিক কার্য্যে সাহায্য করিত। ধনী লোকেরা অধ্যাপকদিগের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ নিস্কর জমি দিতেন এবং নানা উপলক্ষে অধ্যাপকদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহাদের বিদ্যার পরিচয় লইতেন এবং তাঁহা-দিগকে প্রচুর অর্থদান করিতেন। ব্রাহ্মণপণ্ডিতেরা কোনরূপ বিলাসী ছিলেন না। সুতরাং ঐ রূপে যে প্রতিগ্রহ পাইতেন তদ্দ্বারাই তাঁহাদের সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ হইত। ছাত্রেরা বিনামূল্যের কালী ও বিনামূল্যের কলম দ্বারা বিনামূল্যে তালপত্রে নিজ হস্তে পুস্তক লিখিয়া তাহাই পাঠ করিত, সুতরাং বিদ্যাশিক্ষায় কোন অর্থব্যয় ছিল না। ছাত্রেরাও জ্ঞান উপার্জ্জন জন্য সংস্কৃত পড়িত ; চাকরী করিব, অর্থ লাভ করিব বলিয়া বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিত না। পারসী শিক্ষকদিগকে মুন্‌সী বলিত। মুন্‌সীরা কোন আঢ্য লোকের বেতন ভোগী হইয়া শিক্ষা দিতেন কিন্তু ছাত্রেরা কোন বেতন দিত না। পারসী পুস্তকও

সচরাচর ক্রয় করিতে হইত। পারসী পাঠক ছাত্রেরা গুরুগৃহে বাসা কিংবা আহার পাইত না। সেই সকল ব্যয়ের ভার তাহাদের অভিভাবকেরা বহন করিত। ফলতঃ পারসী অর্থকরী রাজ ভাষা ছিল। যাহারা তাহা পড়িত তাহারা প্রধানতঃ অর্থ উপার্জ্জন উদ্দেশ্যেই পড়িত। পারসী পড়িতে কিছু অর্থও ব্যয় হইত। কিন্তু ইংরেজী পড়ার ব্যয়ের শতাংশের একাংশও পারসী পড়িতে ব্যয় হইত না।

পর দিন জয়দুর্গা স্মরণ করিয়া, গুরু পদে প্রণাম করিয়া উপেন্দ্র সংস্কৃত পাঠারম্ভ করিলেন। তখন বালকদিগকে মাটীতে আঁচড়া করিয়া বর্ণমালা শিক্ষা দেওয়া হইত। উপেন্দ্র এত বয়সে মাটীতে আঁচড়া না লইয়া কলার পাতে বর্ণশিক্ষা আরম্ভ করিলেন দেখিয়া অন্যান্য ছাত্রেরা উপহাস করিতে লাগিলেন। উপেন্দ্র সোণার বিছা একটু কাটিয়া তাহা বিক্রয় করিয়া তেল তামাকের সংস্থা করিলেন। একটু কাঠের ফলক এবং খড়ীমাটী কিনিয়া তাহাতে বর্ণমালা লিখিতে আরম্ভ করিলেন। উপেন্দ্র অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও মেধাবী ছিলেন। তাহার পর একান্ত তদ্‌গত চিত্তে দিবারাত্রি লিখিতে পড়িতে লাগিলেন। এক সপ্তাহে বর্ণমালা, ফলা ও বানান লিখিতে পড়িতে সমর্থ হইলেন। তাহার পরেই কলাপ ব্যাকরণ লিখিতে পড়িতে আরম্ভ করিলেন। হাতে লিখিয়া পুস্তক পড়িতে কিছু কষ্ট হয় বটে কিন্তু তাহাতে মুখস্থ করিবার সাহায্য হয় এবং হাতের লেখা দুরস্ত হয়। উপেন্দ্র কোন কষ্টেই কিছু মাত্র কাতর হইতেন না। সুতরাং অল্প কাল মধ্যেই অনেক বেশী পড়িতে পারিলেন। পণ্ডিতদের চতুষ্পাঠীতে কোন শ্রেণী বিভাগ নাই। যে যত দূর ইচ্ছা ততদূর পড়িতে পারে। অন্যান্য ছাত্র দৈনিক যতদূর পড়িতে পারিত উপেন্দ্র তাহার ত্রিগুণ পড়িতেন। অধিকন্তু তিনি নূতন পুরাতন সমানে স্মরণ রাখিতেন। যে সকল ছাত্র তাঁহাকে উপহাস করিয়াছিলেন তিনি একবৎসর মধ্যেই তাঁহাদের অনেককেই অতিক্রম করিলেন, তাহা দেখিয়া সকলেই চমৎকৃত হইল।

ইতিমধ্যে জগন্নাথের একটি পুত্র সঙ্কটাপন্ন কাতর হইল। পণ্ডিতজীর কোন সঞ্চিত অর্থ ছিল না, তাঁহার পরিবারবর্গেরও কোন মূল্যবান অলঙ্কার ছিল না। সুতরাং তিনি চিকিৎসার ব্যয় নির্ব্বাহ করিবার কোন সদুপায় করিতে পারিলেন না। তাঁহার ব্রাহ্মণী সেই শোচনীয় অবস্থায় পীড়িত শিশু

ক্রোড়ে লইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। উপেন্দ্র আপনার সোণার বিছা খুলিয়া চিকিৎসার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ দিলেন। পণ্ডিতজী সেই বহুমূল্য অলঙ্কার বন্ধক দিয়া টাকা আনিয়া সুবৈদ্য দ্বারা চিকিৎসা করাইতে লাগিলেন। একদিন মেঘান্ধকার রাত্রিতে নদী পার হইয়া দূরবর্ত্তী গ্রাম হইতে ঔষধ আনা আবশ্যক হইল। একে ঝড় বৃষ্টি অন্ধকার তাহাতে পথে বন্য শুকরের ভয়, কেহই ঔষধ আনিবার জন্য যাইতে স্বীকার করে না দেখিয়া পণ্ডিত মহা সঙ্কটে পড়িলেন। উপেন্দ্র অধ্যাপকের বিপদ দেখিয়া অমনি কার্য্যোদ্ধারে প্রস্তুত হইলেন। পণ্ডিতজী তাদৃশ সঙ্কটে পড়িয়াও বিদেশী অনুরক্ত ছাত্রকে বিপদসঙ্কুল পথে যাইতে দিতে সম্মত হইলেন না। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, "আমার পুত্রতো গিয়াছে আবার আর এক ব্রাহ্মণের ছেলেকে আমি এসময়ে নষ্ট করিতে পারি না। বিধাতার যাহা ইচ্ছা তাহাই হইবে। তুমি কেন বাপু! বিদেশে প্রাণ দিবে।" উপেন্দ্র বলিলেন, "আপনার চরণাশীর্ব্বাদে আমার কোন বিপদ হইবে না, আমি একদণ্ড মধ্যেই নিরাপদে ঔষধ লইয়া আসিব।" পণ্ডিত পত্নী তাঁহাকে উৎসাহ দিয়া ঔষধ আনিতে পাঠাইলেন। পণ্ডিতের কোন শত্রু ভয় ছিল না সুতরাং তিনি কোন তীক্ষ্ণ অস্ত্র রাখিতেন না। উপেন্দ্র একখানি কুঠার হস্তে পরশুরামের ন্যায় একাকী বৈদ্য গৃহে চলিলেন। জগন্নাথ সস্ত্রীক তাঁহার মঙ্গলার্থ দুর্গানাম জপ করিতে লাগিলেন। ঈশ্বরানুগ্রহে উপেন্দ্রের পথে কোনই বিপদ হইল না। তিনি সাঁতরাইয়া নদী পার হইলেন এবং অতি ত্রস্ত ঔষধ লইয়া ফিরিয়া আসিলেন। পণ্ডিতের পুত্র রক্ষা পাইল এবং অল্পদিন মধ্যে আরোগ্য লাভ করিল। তদবধি পণ্ডিত-জায়া উপেন্দ্রকে অতিমাত্র স্নেহ করিতে লাগিলেন।

জগন্নাথ পূর্ব্বাবধি উপেন্দ্রকে ছদ্মবেশী বলিয়া অনুমান করিতে ছিলেন, তাঁহার সেই অনুমান ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। উপেন্দ্রের সুন্দর আকৃতি, স্বর্ণবিছা দান, তাঁহার বল বিক্রম সাহস, গুরুভক্তি, অসাধারণ মেধা ও বুদ্ধি দৃষ্টে জগন্নাথ তাঁহাকে দেবতা বলিয়া স্থির করিলেন। তিনি একদিন উপেন্দ্রকে নিভৃতে লইয়া গিয়া হাত ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাপুরে! তুমি আমাকে যখন গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়াছ তখন আমাকে গোপন করিও না, তুমি কে তাহা যথার্থ প্রকাশ কর।" উপেন্দ্র বলিলেন, "আমি আপনকার নিকট মিথ্যা বলি নাই। আমি যে পরিচয় দিয়াছি তাহা সমস্তই সত্য, কেবল

কিঞ্চিৎ বৃত্তান্ত গোপন আছে মাত্র। উদয়ন আচার্য্যের বংশীয় সুবুদ্ধিরাম ভাদুড়ী নবাব সমসুদ্দীনের নিকট এক প্রকাণ্ড জাগীর পাইয়াছিলেন। সুবুদ্ধি-রামের বংশীয়েরা একটাকিয়া রাজা নামে খ্যাত। আমার পিতা একটাকিয়া রাজা ছিলেন। আমার বৈমাত্রভ্রাতা এখন রাজা আছেন। আমি সেই বৈমাত্রেয় সহ বিবাদে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া মনস্থ করিয়াছি যে রাজত্ব প্রভুত্ব জন্য চেষ্টায় ক্ষান্ত হইয়া যাজনিক ব্যবসায় দ্বারা শান্তভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিব।” জগন্নাথ কহিলেন, “তোমার ললাটে স্পষ্ট রাজটীকা জাজ্বল্যমান, তুমি অল্পদিন মধ্যেই রাজা হইবে। তোমায় যাজনিক ব্যবসায় করিতে হইবে না, কিন্তু শাস্ত্র পাঠে সকল অবস্থাতেই উপকার হইবে।”

কিঞ্চিদধিক চারি বৎসর অবিশ্রান্ত পাঠে উপেন্দ্রের মোটামুটি পাণ্ডিত্য হইল। তিনি ব্যাকরণ এবং অলঙ্কার শাস্ত্র সমাপ্ত করিলেন। অমরকোষ অভিধান মুখস্থ করিলেন। মনুসংহিতা এবং প্রায়শ্চিত্ত তত্ত্ব সম্পূর্ণ অধ্যয়ন করিলেন। দশকর্ম্ম পদ্ধতি এবং দশোপনিষৎ পড়িলেন। যজুর্ব্বেদও কিছু পাঠ করিলেন। ন্যায় ও দর্শন শাস্ত্রও কিছু কিছু পড়িলেন। অধিকন্তু বাঙ্গালা দেশে যিনি যত কেন পণ্ডিত হউন্ না, কেহই অনর্গল সংস্কৃত কথাবার্ত্তা বলিতে শিক্ষা করেন না। উপেন্দ্র সংস্কৃতে আলাপ করা অভ্যাস করিলেন। বাঙ্গালা দেশে ন্যায়রত্ন, বিদ্যাভূষণ, তর্কবাগীশ প্রভৃতি পাণ্ডিত্য সূচক যে সকল উপাধি প্রচলিত আছে জনকপুরে তাহা না থাকায় উপেন্দ্র কেবল “পণ্ডিতজী” উপাধি পাইলেন এবং অধ্যাপক ও সতীর্থগণের নিকট বিদায় লইয়া দেশে চলিলেন।

দ্বাদশ অধ্যায়।

উপেন্দ্রনারায়ণের গৃহপ্রত্যাগমন।

উপেন্দ্র দেশে চলিলেন। তাঁহাকে সহজে কেহ চিনিতে না পারে এই উদ্দেশ্যে হিন্দুস্থানী সন্ন্যাসীর বেশ ধরিলেন। সঙ্গে অর্থ সম্বল কিছুই নাই। ভিক্ষা করিতে করিতে গৌড় নগরের পথে ধীরে ধীরে যাইতে লাগিলেন। সুপণ্ডিত সন্ন্যাসী বলিয়া সর্ব্বত্রই আদর পাইলেন। উপেন্দ্র একমাসে গৌড় নগরে উপস্থিত হইলেন। গৌড় আর সে সমৃদ্ধ নগর নাই। মহামারীতে জনশূন্য হইয়াছে। স্থানে স্থানে জঙ্গল হইয়া উঠিয়াছে। কাঁচা বাড়ীগুলি লুপ্ত হইয়া তথায় বিজন অরণ্য হইয়াছে, পুরাতন পাকাবাড়ী ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। সুদৃঢ় নির্ম্মিত পাকা বাড়ীর উপরতালায় পেচক ও চর্ম্মচটিকার আবাস, নীচতালায় শজারু ও শৃগালের বাসস্থান হইয়াছে। যে স্থানে রাজা, নবাব এবং সম্রাটগণ মহা আড়ম্বরে দরবার করিতেন সেই স্থানে এখন বন্য জন্তুর আবাস হইয়াছে। গৌড়ের নগরত্ব গিয়াছে কিন্তু জঙ্গলত্ব সম্পূর্ণ হয় নাই। উপেন্দ্র গৌড়ের অবস্থা দেখিয়া নিজ অবস্থার সহ তুলনা করিতে লাগিলেন। তিনি চিন্তা করিলেন, 'এই গৌড় অবশ্যই এক সময়ে নৈসর্গিক অরণ্য ছিল, পরে মনুষ্যেরা সেই জঙ্গল কাটিয়া তাহার অধিবাসী বন্য জন্তুদিগকে দূরীকৃত করিয়া আপনাদের বাসস্থান করিয়াছিল। আঠার শত বৎসর এখানে সমৃদ্ধ রাজধানী ছিল। আমার পূর্ব্ব পিতামহ গণেশ খাঁ এক সময়ে এখানে প্রবল প্রতাপান্বিত সম্রাট ছিলেন। এখন আমি ভিক্ষুক এবং সেই রাজধানী জঙ্গলে পরিণত। জঙ্গল ভাঙ্গিয়া নগর হইয়াছিল আবার নগর ভাঙ্গিয়া বন্যজন্তু সমাকীর্ণ জঙ্গল হইয়াছে। আমরাও ধন সম্পত্তিহীন ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণের বংশধর। মধ্যে আমার কয়েক জন পূর্ব্বপুরুষ বৈষয়িক উন্নতি প্রলুব্ধ হইয়া চেষ্টা করিয়াছিলেন। সৌভাগ্য তাঁহাদের সহকারী হইয়াছিল। তাঁহারা রাজা মহারাজা এবং সম্রাট পর্য্যন্ত হইয়াছিলেন। আমার ভাগ্য পরিবর্ত্তনে আমি সেই ব্রাহ্মণ পণ্ডিত হইয়াছি। দোলনা স্বভাবতঃ সোজা ঝুলিতেছে। এক দিকে ধাক্কা দেও সেই দিকে

সরিবে। আবার ফিরিয়া পশ্চাৎগামী হইবে। কিয়ৎকাল এই রূপ এদিক ওদিক দুলিয়া আবার পূর্ব্ববৎ সোজা হইয়া স্থির হইবে। ইহাই জগতের চিরন্তন গতি। সেই নৈসর্গিক গতিতেই আমি ও গৌড়নগর মূল অবস্থা প্রাপ্ত হইতেছি।'

গৌড় হইতে উপেন্দ্র দক্ষিণবর্ত্তী পথে সাতগড়া চলিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে তাঁহার মাতা ও মাতুলানী বন্দীভাবে আছেন, গোপালের পরিবার দাসত্বে নিযুক্ত হইয়াছে এবং তাঁহার স্বপক্ষীয় সমস্ত লোকের প্রাণদণ্ড হইয়াছে। তজ্জন্য তিনি স্থির করিলেন, 'আমি গুপ্তভাবে থাকিয়া গোপালের পরিবার ভুক্ত কোন দাস দাসীর সহ আলাপ করিব। গোপাল যে যুদ্ধে হত হইয়াছে তাহা প্রকাশ করিব না। তাহাদের কাছে বলিব গোপাল পদ্মার দক্ষিণ পারে গুপ্তভাবে আছে। আমি নিজ মাতা, মাতুলানী এবং গোপালের পরিবারবর্গের উদ্ধারার্থ আসিয়াছি। এই আশ্বাসে তাহাদিগকে বশ করিয়া সুযোগ মত আত্মপরিজন ও গোপালের পরিজন লইয়া পলায়ন করিব। নির্ব্বিঘ্নস্থানে গিয়া পরে গোপালের মৃত্যু সংবাদ দিব। গোপাল আমার অতি বিশ্বাসী ভৃত্য ছিল। তাহার পরিবারবর্গকে উদ্ধার করা এবং পালন করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। যদি আত্মপরিবার পালন করিতে পারি তবে তাহাদিগকেও পালন করিতে পারিব। কিন্তু গোপালের পরিবারবর্গ আমার এখন সপক্ষ হইবে কি বিপক্ষ হইবে তাহা ঠিক বলা যায় না। পাছে তাহারা আমাকে মহেন্দ্রের নিকট ধরিয়া দেয়। আমার দুরবস্থার সময় কাহাকেও বিশ্বাস করিতে পারি না অথচ কাহাকেও বিশ্বাস না করিলে কাজ চলে না। আমাদের কুলপুরোহিত অতি সৎলোক। তিনি সামান্য পুরস্কার লোভী নহেন।* আমি অগ্রে তাঁহার নিকট যাইব। তাঁহার সহ পরামর্শ করিয়া জননীর বন্দীদশা মোচনের সদুপায় করিব।' এইরূপ মনস্থ করিয়া উপেন্দ্র চলনবিল পার হইয়া ভাদুড়িয়ার প্রান্তদেশে আসিলেন।

উপেন্দ্র ভাদুড়িয়ার যতই তদন্ত করিলেন ততই বুঝিতে পারিলেন যে তাঁহার সমস্ত অনুমানই ভ্রান্তিমূলক। তিনি জানিতে পারিলেন যে মহারাজ মহেন্দ্র নারায়ণ অতি সদাচার ও সুবিচারে রাজ্যশাসন করিতেছেন। তিনি উপেন্দ্রের পক্ষীয় কোন ব্যক্তিকেই কোন কঠিন দণ্ড করেন নাই। উপেন্দ্রের

মাতা মহেন্দ্র কর্ত্তৃক অতীব সম্মানে আছেন। উপেন্দ্রের মাতুলানী সসম্মানে নিজ স্বামী গৃহ খাজুড়িয়াতে আছেন। গোপালের পরিবারবর্গেরও কোন অনিষ্ট হয় নাই। প্রায় তিন বৎসর হইল গোপাল সরকার মহেন্দ্রের শরণাগত হওয়ায় রাজা তাঁহাকে ক্ষমা করিয়া পুনরায় জমানবিসী কর্ম্মে বহাল করিয়াছেন। গোপাল সপরিবারে সুখে আছে। উপেন্দ্র সেই সকল কথায় সম্পূর্ণ নির্ভর করিলেন না। কিন্তু তিনি স্বচক্ষে প্রজাগণকে সুখী দেখিলেন এবং স্বকর্ণে আপামর সর্ব্বসাধারণের নিকট সুযশ শুনিলেন। তদ্দ্বারা মহেন্দ্র যে অতি সৎলোক তাহা উপেন্দ্র নিশ্চয় বুঝিতে পারিলেন। তখন উপেন্দ্রের মনে অতিশয় আত্মগ্লানি হইল। তিনি চিন্তা করিলেন, 'বিধাতার অবিচার নাই। অজ্ঞান শিশু যেমন সুন্দর দেখিয়া জ্বলন্ত অগ্নি ধরিতে যায়, তাহার হিতার্থী আত্মীয়গণ তাহাকে নিবারণ করিলে, সে অতীব অসন্তুষ্ট হইয়া রোদন করে, সেই হিতার্থী আত্মীয়গণকে নিজসুখের প্রতিরোধক শত্রু জ্ঞান করে, অনেক সময়ে নিজ প্রযত্ন বিফল দেখিয়া পরম হিতার্থী পরমেশ্বরকে আমরা সেই রূপ শত্রু জ্ঞান করি। আমরা নিতান্ত অজ্ঞ, ঈশ্বর জ্ঞানময়। কিসে আমাদের প্রকৃত হিত হইবে আমরা তাহা বুঝিতে পারি না, কিন্তু ঈশ্বর তাহা জানেন। ঈশ্বর যাহা করেন তাহা সমস্তই উত্তম এবং তাঁহার উদ্দেশ্য মহত্তম। দুর্দ্দৈব গতিকে আমরা কষ্টে পড়িয়া যে ঈশ্বরের প্রতি বা ভাগ্যের প্রতি দোষারোপ করি তাহা আমাদের মূর্খতা এবং মহাপাপ। আমার এবং মৎপক্ষীয় সচিবগণের অন্তঃকরণ ভাল ছিল না। হিংসা, দ্বেষ, ক্রোধ, লোভ এবং অহঙ্কার আমাদের হৃদয় অধিকার করিয়াছিল। আমরা জয়ী হইলে মহেন্দ্র সপরিবারে কারারুদ্ধ হইতেন। তৎপক্ষীয় ব্রাহ্মণদের সর্ব্বস্বান্ত হইত এবং অন্য লোকের প্রাণদণ্ড হইত। আমি সেই অল্প বয়সেই অতিশয় কামুক ও স্বেচ্ছাচারী হইয়া উঠিয়াছিলাম। সেই অবস্থায় আমি রাজা হইলে কত জনের ধন, প্রাণ, মান নষ্ট হইত, কত কুলবধূর সতীত্ব নষ্ট হইত তাহা বলা যায় না। লোকে আমার অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া হয়ত আমাকে অপহত্যা করিত কিম্বা অতিমাত্র ইন্দ্রিয় সেবনে নানারূপ রোগগ্রস্ত হইয়া আমার অকাল মৃত্যু ঘটিত। ফলতঃ আমি জয়ী হইলে বহুলোকের অনিষ্ট হইত, বংশের কলঙ্ক হইত এবং আমার নিজেরও অনিষ্ট হইত। সেই জন্যই বিধাতা আমাকে পরাজিত এবং

দুরবস্থাপন্ন করিয়া যেমন জগতের উপকার করিয়াছেন তেমনই আমারও উপকার করিয়াছেন। আমি যে পিতৃদ্রোহী শাহজাহানের প্রিয়পাত্র হইয়াছিলাম, তিনি জয়ী হইলেও জগতের অধিকতর অনিষ্ট হইত এবং আমারও অনিষ্ট হইত। আমি তাঁহার অন্তঃপুরে যাইতাম। আমার মন সেই যবন রাজকুমারীদের প্রতি আকৃষ্ট হইতেছিল এবং হাবভাবে আমি বুঝিতেছিলাম যে তাহারাও আমার প্রতি অনুরাগিনী হইতেছিল। শাহজাহান জয়ী হইলে আমি ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়া যবনী বিবাহে বাধ্য হইতাম নতুবা প্রাণদণ্ড হইত। আমি বাদশাহের জামাতা হইলে বৈষয়িক উন্নতি হইত বটে, ভাতুড়িয়া এবং আরও অনেক সম্পত্তি লাভ করিতে পারিতাম বটে, কিন্তু তাহাতে জ্ঞাতি কুটুম্ব এবং প্রজাদের প্রচুর অনিষ্ট হইত। আমার পাপ ও কলঙ্কের সীমা থাকিত না। তাঁহার পরাজয়ে আমার যবন সংসর্গ ত্যাগ হইল। পবিত্র দেবভাষা শিক্ষা হইল। আমি পরিশ্রমী ও কষ্টসহ হইয়াছি, আমার কুপ্রবৃত্তি সমস্ত বশীভূত হইয়াছে। আমি অবিলাসী ও মিতব্যয়ী হইয়াছি। এখন মহেন্দ্রের সুদৃষ্টান্তে দয়া, ক্ষমা ও সদাচার শিক্ষা হইল। মহেন্দ্র পিতার জ্যেষ্ঠপুত্র এবং রাজ্য পৈতৃক সুতরাং তিনি উচিত মতেই রাজা হইয়াছেন। আমরা তাঁহাকে পদচ্যুত করিতে চেষ্টা করিয়া প্রকৃত রাজ বিদ্রোহী হইয়াছিলাম। তথাপি মহেন্দ্র মৎপক্ষীয় বিদ্রোহ অপরাধীদিগকে ক্ষমা করিয়াছেন। মহেন্দ্র সদাশয়, কুলতিলক এবং রাজত্ব করিবার প্রকৃত যোগ্য ব্যক্তি। এই জন্যই পরম জ্ঞানী পরমদয়াল পরমেশ্বর মহেন্দ্রকে সংগ্রামবিজয়ী এবং রাজা করিয়াছেন। হে ভগবন্! তুমিই একমাত্র সত্য, সার এবং একমাত্র হিতৈষী।' বলিতে বলিতে উপেন্দ্রের ভক্তি উদ্বেলিত হইল, দরদর অশ্রু পড়িতে লাগিল। অমনি সেই পথিমধ্যেই উপেন্দ্র গলবস্ত্রে ভূতলে পড়িলেন এবং সষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া স্তুতিপাঠ করিতে লাগিলেন।

হিংসাই হিংস্রকদের প্রধান উৎপীড়ক। হিংসাদ্বেষপরতন্ত্র পাপীরা পরশ্রী কাতর হইয়া সর্ব্বদা যে ঈর্ষানলে দগ্ধ হয় তাহাই তাহাদের পাপের প্রচুর শাস্তি। উপেন্দ্র মৈথিল পণ্ডিতের শান্তি সন্তোষময়ী চতুষ্পাঠীতে সংস্কৃত অধ্যয়ন করিয়া সুশিক্ষায় এবং সৎসংসর্গে লোভের উৎপীড়ন হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু মহেন্দ্রের প্রতি হিংসা দ্বেষ তাঁহার মনে প্রজ্বলিত ছিল। তিনি নিজ জননী এবং স্বজনবর্গের দুরবস্থা চিন্তা করিয়া সর্ব্বদা দুশ্চিন্তাসাগরেমগ্ন

থাকিতেন। এক্ষণে মহেন্দ্রের সদাচার ও আত্মীয়গণের কুশল জানিতে পারিয়া তাঁহার সেই দীর্ঘ কালব্যাপী মনঃকষ্ট অপনীত হইল, জ্যেষ্ঠের প্রতি প্রীতিসঞ্চার হইল; মন পরিষ্কৃত ও প্রফুল্ল হইল। মস্তক হইতে যেন একটা গুরু-ভার নামিয়া গেল; শরীর পাতলা হইল। তিনি বিমল আনন্দ অনুভব করিলেন যেন কোন বহুমূল্য বস্তু লাভ হইল। কিন্তু কি লাভ হইল তখন তাহা বুঝিতে পারিলেন না।

উপেন্দ্র ছদ্মবেশেই সাতগড়ার পশ্চিম দ্বারে উপস্থিত হইলেন। প্রহরী তাঁহাকে চিনিতে পারিল না। উপেন্দ্র নগর মধ্যে গিয়া পুরোহিত বাড়ী যাইবেন কি গোপালের বাড়ী যাইবেন এই চিন্তায় দোদুল্যমান হইলেন। কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিয়া গোপালের বাড়ী যাওয়াই স্থির করিলেন। উপেন্দ্র কষ্টে পড়িয়া অতীব কষ্টসহ হইয়াছিলেন। গ্রীষ্মকাল, মধ্যাহ্ন সময় সেই প্রখর রৌদ্রে ছত্রহীন চিম্‌টা কমণ্ডলু হস্তে অক্ষুব্ধ ভাবে গোপাল সরকারের বাড়ী অভিমুখে চলিলেন। হিন্দু মুসলমানের কাচারী সর্ব্বত্রই সকাল বেলায় হইত। আহারান্তে পরিশ্রম করা রোগের আকর এবং আয়ুক্ষয় কারক। এজন্য লোকে পূর্ব্বাহ্নে কাচারীর কার্য্য শেষ করিয়া মধ্যাহ্নে ঘরে আসিত এবং স্নানাহার করিয়া বিশ্রাম করিত। সেই রীতিক্রমে কাচারীভঙ্গ হওয়ায় গোপাল ক্ষুৎপিপাসায় আকুল ভাবে তাড়া-তাড়ি বাড়ী যাইতেছিলেন। পথে সন্ন্যাসী বেশী উপেন্দ্রের সহ সাক্ষাৎ হইল। উপেন্দ্র গোপালের প্রতি দৃষ্টি করিবামাত্র গোপাল তাঁহাকে চিনিলেন। নিকটে লোক থাকায় গোপাল কোন কথা না বলিয়া ইঙ্গিত করিলেন "আমার বাড়ী চলুন"। উপেন্দ্র মাথা নাড়িয়া সম্মতি প্রকাশ করিলেন। গোপাল পূর্ব্ববৎ ত্রস্ত চলিয়া গেলেন, সন্ন্যাসীও যথাপূর্ব্ব ধীরে ধীরে চির পরিচিত গোপালের বাড়ী অভিমুখে চলিলেন। তাঁহাদের ইঙ্গিত অন্য কেহ লক্ষ্য করিতে পারিল না।

উপেন্দ্র গোপালের বাড়ীর নিকট নিমগাছের নিকট দাঁড়াইলেন। সন্ন্যাসী গৃহ প্রবেশ করিবেন না বলিয়া প্রকাশ করিলেন। গোপাল অভিপ্রায় বুঝিয়া তাঁহাকে বাগান বাড়ীতে স্থান দিলেন। বাঙ্গালী চাকর নিকটে থাকিলে হয়ত তাঁহাকে চিনিয়া ফেলিবে, এজন্য একটি অল্পবুদ্ধি হিন্দুস্থানীকে সন্ন্যাসীর সেবার জন্য নিযুক্ত করিলেন। আহারান্তে গোপাল ধর্ম্মালোচনার

উছিলায় সন্ন্যাসীর নিকট আসিলেন। একটি আদেশ করিয়া হিন্দুস্থানী চাকরটিকে স্থানান্তরে পাঠাইলেন। তখন নিভৃত পাইয়া গোপাল প্রণাম করত বিচ্ছেদ কালের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। উপেন্দ্র সংক্ষেপে আত্মবৃত্ত বর্ণন করিয়া গোপালের অজ্ঞাত কালের ইতিহাস ও বর্ত্তমান অবস্থার প্রশ্ন করিলেন। গোপাল কহিলেন, "আমিও ঠিক ঐরূপ শবমধ্যে লুকাইয়া জীবন রক্ষা করিয়াছিলাম। সন্ধ্যার পর উঠিয়া শোণ নদের জলে শরীর ধৌত করিয়া জলপান করিলাম। তাহার পর আপনাকে অন্বেষণ করিলাম কিন্তু সেই অন্ধকার রাত্রিতে প্রকাণ্ড বিস্তৃত সমরক্ষেত্রে আপনার কোনই অনুসন্ধান করিতে না পারিয়া আপনি বিদ্যমান নাই সিদ্ধান্ত করিলাম। তাহার পর নিজ কর্ত্তব্য চিন্তা করিতে লাগিলাম। ক্ষুধা অত্যন্ত হইয়াছিল কিন্তু সঙ্গে কোন খাদ্য নাই কিম্বা তাহা ক্রয় করিবার যোগ্য মূল্যও নাই। তবে এখন কি খাই, কোথায় যাই, কি করি? আমি ব্রাহ্মণ নহি যে ভিক্ষুক ভাবেও সম্মান পাইব অথচ নীচ জাতিও নহি যে মুটে মজুরের মত কষ্ট করিয়া দেশে যাইব। তবে সদুপায় কি? যদি বিপদের সময় একটা উপায় উদ্ভাবন না করিতে পারি তবে আমি কিসের কায়েত। এই অপবাদকেই সম্পদের হেতু করিতে হইবে। নানারূপ ফন্দী করিতে বসিলাম। একখানা তলোয়ার লইয়া বাহির হইলাম। আধক্রোশ অন্তর গ্রামে গিয়া আহারার্থ একটা বিলাতী কুষ্মাণ্ড, ধোপা বাড়ী হইতে কিছু সাজিমাটী ও রিটা এবং কামার বাড়ী হইতে একখানা ঠুনকী, কয়লা ও শোলা চুরি করিয়া আনিলাম। এই সকল সামান্য জিনিষ কেহ সাবধানে রাখে না। আত্মরক্ষার জন্য ঈদৃশ তুচ্ছ পদার্থ চুরিকরা আমি পাপ কার্য্য বলিয়া জ্ঞান করিলাম না। ঠুনকীতে তলোয়ারের ঘা দিয়া কয়লা ধরাইয়া আলো করিলাম। কুষ্মাণ্ডটি কাটিয়া তাহাদ্বারাই ক্ষুধা নিবৃত্তি করিলাম। মৃত সেনার মধ্য হইতে একটি ভাল পোষাক বাছিয়া লইলাম। রিঠা ও সাজিমাটী দ্বারা তাহা পরিষ্কার করিলাম। প্রভাতে সেই বাদশাহী সৈনিকের পোষাক, চাপরাশ, কোমরবন্ধ, তলোয়ার লইয়া নিকটবর্ত্তী গ্রামে গেলাম। তথায় দুইজন চাকর রাখিলাম, পালকী ভাড়া করিলাম। নিজের ও সেই চাকরদের কয়েকখান কাপড় পালকীতে পাড়িলাম। পালকী যোগে চাকরদের প্রদর্শন মতে দামনিয়া গ্রামে লালা মাতাদীন নামক এক কায়স্থের বাড়ীতে

উপস্থিত হইয়া প্রকাশ করিলাম যে আমি মহাবৎ খাঁর নিযুক্ত বাদশাহী গোয়েন্দা ঐ স্থানীয় কোন্ কোন্ লোক শাহজাহানের দলে ছিল এবং কে কে অর্থদ্বারা, লোকদ্বারা বা রসদদ্বারা তাহার সাহায্য করিয়াছে আমি তাহা নিরূপণ করিব। আমি মাতাদীনের বাড়ীতে বাসা করিলাম এবং নিজ উদ্দেশ্য সাধন বিধায় তাহার সাহায্য প্রার্থনা করিলাম।

"লালা মাতাদীন পূর্ব্বে সরকারী চাকরী করিত, তখন তাহার অবস্থাও ভাল ছিল। এক্ষণে দেনা হইয়া পড়িয়াছিল। সে আমার সঙ্গে নানারূপ আলাপ করিয়া আমি প্রকৃত সরকারী চাকর কি না তাহা পরীক্ষা করিতে লাগিল। আমরা উভয়েই পরস্পরের ভাব বুঝিতে পারিলাম। আমি মাতাদীনকে বলিলাম, ভাই! আমিও কায়েত তুমিও কায়েত, যাহাতে উভয়ের লাভ হয় সেই চেষ্টা করাই উচিত, অনৈক্য হইলে উভয়েরই ক্ষতি। মাতাদীন কহিল, আপনি তাই মানিলেই হয়। যদি খরচা বাদ লভ্যাংশের অর্দ্ধেক আমাকে দিতে স্বীকার করেন তবে আমি আপনকার চাকররূপে কাজ আরম্ভ করি, উভয়েরই বেশ লাভ হইবে। আমি কহিলাম, অর্দ্ধেক নয়, দশ আনা ছয় আনা। সে বলিল, আপনি ফন্দী বাহির করিয়াছেন, আমি চেষ্টা করিয়া তাহা সফল করিয়া দিব, যা হউক আপনি নয় আনা নিন্। আমি সম্মত হইলাম। নয় আনা সাত আনা ভাগ স্থির হইয়া কাজ আরম্ভ হইল। মাতাদীন আমার নিকট ২৫৲ বেতনের চাকরীর এক সনন্দ লইল। নিজ ঘর হইতে তাকিয়া, ছুলিচা প্রভৃতি দিয়া আমার সরঞ্জাম করিয়া দিল। একজন পাচক ব্রাহ্মণও সংগ্রহ করিয়া দিল।

"লালা মাতাদীনের সহিত আমার গুপ্ত বন্ধুত্ব হইল। কিন্তু প্রকাশ্যে সে আমাকে মনিব বলিয়া মান্য করিত। সে গ্রামের চৌকীদার ডাকাইয়া আনিল এবং তাহার সহ যুক্তি করিয়া বিদ্রোহী দলভুক্ত লোকের তালিকা করিতে লাগিল। শাহজাহানের প্রভুত্ব কালে অধিকাংশ লোকই তাঁহার সাহায্য করিতে বাধ্য হইয়াছিল। তাহাদের নাম ধাম প্রভৃতি ঠিকানা মাতাদিন ও চৌকিদার জানিত, কতক আমি নিজেও জানিতাম সুতরাং সহজেই বৃহৎ তালিকা প্রস্তত হইল। আমি স্বকৃত কৃত্রিম গোয়েন্দা, কাহাকেও ধরিতে আমার অধিকার নাই। কেবল ভয় দেখাইয়া টাকা লওয়াই আমাদের উদ্দেশ্য। কাজেই কোন দরিদ্র

লোককে ধরিলাম না। যাহারা খুব বড় লোক, যাহাকে ধরিতে গেলে সনন্দ দেখাইতে হইবে তাহাকেও ধরিলাম না। কাহারও উপর বেশী অত্যাচার করাও আমার অভিপ্রায় ছিল না। মধ্যস্থ অবস্থার অনেক লোক ধরিলাম। আমাদের চোটপাট দেখিয়া আমার ক্ষমতার সম্বন্ধে কেহ কোন সন্দেহ করিল না। ধৃত ব্যক্তিদের কাছে অল্প পরিমাণ টাকা লইয়া সকলকার প্রতিই অনুগ্রহ করিলাম। মাতাদীন সকলকেই বলিল, 'তোমরা আমার প্রতিবাসী আত্মীয় এবং নিতান্ত দয়ার পাত্র। কিন্তু বাদশাহের নিযুক্ত লালা সাহেব বড় কড়া মেজাজের লোক। আমি নিজে কিছু চাই না; তোমরা আমার মারফৎ চুপ করিয়া গোয়েন্দা লালা সাহেবকে কিছু দিলে আমি তাঁহাকে বুঝাইয়া কান্নাকাটি করিয়া তোমাদিগকে রক্ষা করিব।' এই উপায়ে কোন ব্যক্তির উপর বেশী উৎপীড়ন না করিয়াও অনেকের নিকট অল্প অল্প যাহা আদায় করিলাম তদ্দ্বারা মাতাদীনের দেনা শোধ হইয়া কিঞ্চিৎ সঞ্চিত হইল; আমারও দেশে যাইবার বেশ সম্বল হইল। ব্রাহ্মণ ভিক্ষুকদিগকে কিছু কিছু দান খয়রাতও করিলাম। পরে বাঙ্গালা দেশের বিদ্রোহীদের ঠিকানা করিবার ভাণ করিয়া ধূমধামে দেশে রওনা হইলাম। রাজমহলে আসিয়া পালকী ও পশ্চিমা চাকর বিদায় দিলাম। কয়েকজন বাঙ্গালী চাকর লইয়া নৌকাপথে দেশে রওনা হইলাম। পরিজন উদ্ধার করিয়া পদ্মার দক্ষিণ পারে গিয়া বাস করিব ইহা আমার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু দেশে আসিয়া জানিলাম মহারাজ মহেন্দ্রনারায়ণের দয়ায় আমার পরিবার-বর্গ এবং আপনার মাতা মাতুলানী এবং আপনকার পক্ষীয় সমস্ত লোকেই সুখে আছে। তখন আমি মহারাজের শরণাপন্ন হইলাম। তিনি আমাকে ক্ষমা করিয়া পূর্ব্ব চাকরী আবার দিয়াছেন, তিনি আমার নিকট আপনকার বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়াছেন। আমি তাহাতে বলিয়াছি যে প্রতাপবাজুর যুদ্ধের পর কুমার উপেন্দ্র নারায়ণের সহ আমার আর সাক্ষাৎ হয় নাই, সুতরাং তৎপরবর্ত্তী কোন বৃত্তান্ত আমি জানি না।"

সেইদিনই বৈকালে গোপাল পাটরাণীর নিকট উপেন্দ্রের শুভাগমন সমাচার অতি সঙ্গোপনে দিলেন। পাটরাণী আনন্দে অধীরা হইয়া সাক্ষাৎ করিতে চাহিলেন। গোপাল কহিলেন, "কুমার বাহাদুরও আপনাকে দর্শন করিতে একান্ত উৎসুক। সন্ধ্যার সময় আপনি রঙ্গমহলের পাছের দরজা

খুলিয়া দোতালায় বসিয়া থাকিবেন। সেই স্থান সরদেওয়ালের অতি নিকট। তাহার অল্প দূরেই একটা দোল বেদী আছে। বেদীর দুই দিক বৃক্ষে ঢাকা। আমি কুমার বাহাদুরকে সেই দোল বেদীর উপরে আনিব, তথায় আপনি স্পষ্ট দেখিতে পাইবেন, কেবল কথাবার্ত্তা হইবে না। কুমারের এখন দাড়ী গোঁপ হইয়াছে, তিনি সন্ন্যাসী বেশে আসিয়াছেন কেহ সহজে তাঁহাকে চিনিতে পারিবে না। তাঁহার সহিত সাক্ষাতের এই এক মাত্র উপায়, অন্য কোন সদুপায় দেখা যায় না।" পাটরাণী কহিলেন, "রঙ্গমহলে মহেন্দ্রের উপপত্নীরা থাকে সেখানে আমার যাওয়া ভাল হয় না। বিশেষতঃ হঠাৎ যদি মহেন্দ্র সেখানে আসে তবে বড়ই লজ্জার বিষয় হইবে। আবার তাহার কারণ অনুসন্ধানও হইবে। বরং উপেন্দ্রের প্রকাশ হওয়াই ভাল। মহেন্দ্র যেরূপ ভাল মানুষ তাহাতে কোন ভয় নাই। সে উপেন্দ্রকে বেশ সুখে রাখিবে।" গোপাল কহিলেন, "না না! সে বড় কঠিন কথা। আমরা আজ চারি দিন হইল খবর পাইয়াছি যে জাহাঁগীর বাদশাহের মৃত্যু হইলে শাহজাহান বাদশাহ হইয়াছেন তিনি তাঁহার পূর্ব্বের পরম শত্রু মহাবৎ খাঁকে ক্ষমা করিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা উচ্চপদ দিয়াছেন। নুরজাহান বেগমকেও খুব সম্মান করিয়াছেন* অথচ বৈমাত্র ভাই শাহরিয়ারের প্রাণদণ্ড করিয়াছেন। মহারাজ মহেন্দ্র নারায়ণও তাহাই করিতে পারেন। স্ত্রীলোক, অমাত্য, ভৃত্য ও প্রজাগণকে ক্ষমা করা সহজ কথা। তাহাতে ভবিষ্যতে কোন ভয় নাই বরং তাহাতে পুণ্য ও প্রতিষ্ঠা আছে। কিন্তু বৈমাত্রেয় ভাই রাজপদের প্রতিদ্বন্দ্বী তাহাকে ক্ষমা করিতে অনেক ভয় অনেক বাধা। ফলতঃ খুব ভালরূপে না বুঝিয়া কুমারকে প্রকাশ হইতে দেওয়া হইবে না। আপনি কাহার নিকট কিছু ব্যক্ত করিবেন না। আপনি যদি রঙ্গমহলে গিয়া কুমারের সহ দেখা করিতে চান আমি তাহার উপায় করিতে পারি। মহারাজের তিনটী উপপত্নী সর্ব্বদা পরস্পর ঝগড়া করে। আমি পরামর্শ দিয়া সেই বিবাদ মীমাংসার জন্য আপনাকে মধ্যস্থ করাইব। তাহারা অনুরোধ করিয়া পায় ধরিয়া আপনাকে লইয়া যাইবে। আপনি তাহাদের সমস্ত কথা শুনিয়া তাহাদিগকে নীচতালায় নামাইয়া দিয়া বিচার বিবেচনার উছিলায়

---

* শাহজাহানের সিংহাসনারোহণের পূর্ব্বেই নুরজাহান বন্দিনী হইয়াছিলেন। শাহজাহান তাঁহার ভরণপোষণের জন্য রাজকোষ হইতে বার্ষিক পঁচিশ লক্ষ টাকা বৃত্তি প্রদান করিতেন।

রঙ্গমহলের ছাদে একাকিনী পাছের দরজা খুলিয়া বসিবেন। কুমার সাহেবের সহ দেখা হইবে। তাহার পর, সেই উপপত্নীদের সম্বন্ধে যা হয় একটা হুকুম দিয়া আসিবেন। এদিকে নকিব দ্বারা মহারাজকে আমি জানাইব যে, বাইজীদের অনুরোধে পাটরাণী মাতা তাহাদের বিবাদ মিটাইতে অদ্য বৈকালে রঙ্গমহলে যাইবেন, আপনি সাবধান হইবেন। মহারাজ এ সংবাদ পাইলে আজ বৈকালে বা রাত্রে সে দিকেও যাইবেন না।" পাটরাণী কহিলেন, "গোপাল! আমি বরাবর তোমাকে বুদ্ধিমান বলিয়া জানি, তুমি এখন যাহা বলিলে তাহা তোমার যোগ্য কথা, খুব ভালকথা। এখন বাবা, তোমার উপায় তুমিই চেষ্টা ক'রে যাহাতে উপেনকে এতকাল পর একবার দেখিতে পাই তাই কর।" গোপাল 'যে আজ্ঞা' বলিয়া প্রণাম করত কার্য্য সাধন জন্য প্রস্থান করিল।

মেয়েলী বিবাদের বিচার করা বড়ই কঠিন কর্ম্ম। কেহই রীতিমত আদ্যন্ত বৃত্তান্ত বলে না। মধ্য হইতে দুই চারি কথা বলিয়াই অন্য পক্ষকে গালি দিতে আরম্ভ করে। অমনি প্রতিপক্ষও গালি দেয়। তখন তুমুল বাগ্‌যুদ্ধ হইতে থাকে, তার পর চুলাচুলি মারামারিও হয়। মধ্যস্থ অপ্রস্তুত হইয়া উভয়কে ছাড়াইতে পারিলেই কৃতার্থ হন। পাটরাণী নিজে স্ত্রীলোক, তিনি জানিতেন যে মেয়েলী বিবাদের বিচার করা দেবগণেরও অসাধ্য। তাহা তাঁহারও উদ্দেশ্য ছিল না। তিনি রঙ্গমহলে উপস্থিত হইলেই তিন মাগী ঘোর ঝগড়া আরম্ভ করিল। রাণী তাহাদের সেই বিবাদ ক্ষান্ত করার জন্য তিন জনকে তিন দিকে এতদূরে পাঠাইলেন যে একজন অন্যের গালাগালি শুনিতে না পায়। তাহার পর দাসীদের নিকট দুইচারি কথা শুনিয়া লইলেন। পরে দাসীদিগকে বলিলেন, "তোমরা দেখিবে যেন এই তিন বিটী কেহ কাহারো কাছে না যায়, আমি উপর তালায় বসিয়া স্থির চিত্তে বিবেচনা করে যা করা হয় করছি।" রাণী দোতালায় গিয়া সিঁড়ির কপাট বন্দ করিলেন। পাছের কপাট খুলিয়া দোল বেদীর উপরে উপেন্দ্রকে সন্ন্যাসী বেশে দেখিতে পাইলেন। বয়োবৃদ্ধি ও ছদ্মবেশে উপেন্দ্রের যেরূপ চেহারা হইয়াছিল, গোপালের নিকট না শুনিলে, রাণী তাঁহাকে চিনিতে পারিতেন না। উপেন্দ্র জননীকে দেখিয়া প্রণিপাত করিলেন। মহারাণীও বহুকাল পরে পুত্রকে দেখিয়া আনন্দে আশীর্ব্বাদ করিলেন। পরস্পর কথা বলিতে পারিলেন না কিন্তু মনের ভাব মনে অনুভব করিলেন। সন্ধ্যা অতীত হইল

অন্ধকারে দৃষ্টিরোধ হইল। উপেন্দ্র নামিয়া গোপালের বাগানে চলিলেন। রাণী দোতালা হইতে নামিয়া বাঈদিগকে ডাকাইয়া কহিলেন, "আমি বুঝে দেখ্‌লাম দোষ তোমাদের কারোই নিজের নয়, তোমরা সকলে অতি ভাল মানুষ, অন্যে ফোঁশ দিয়া ঝগড়া লাগায়। আমি বলি, তোমরা সে সব কথা শুনো না—যারা ঝগড়া লাগায় তারা তামাসা দ্যাখে, কষ্ট পাও তোমরা; তোমরা একরাজার আশ্রয়ে আছ, খাওয়া পরা, অলঙ্কার কিছুরই দুঃখ নাই, অনর্থক ঝগড়া করে কষ্ট পাও কেন? মহেন্দ্র আমার অতি সুবোধ ছেলে, অতি গম্ভীর—সে কারো খোসামোদে টলে না, কারো মিষ্ট কথায় ভোলে না। বিধাতা যার ভাগ্যে যা লিখেছেন সে তা পাবে—তার কমও হবে না বেশীও হবে না। তবে যদি তিন জন তিন ভগ্নীর মত মিলে মিশে থাকো তবেই সুখ। আমার কথা শোনো, ঝগড়া ছেড়ে যাতে আহ্লাদ আমোদে সুখে থাকৃতে পার তাই করো। উত্তর না দেওয়াই ঝগড়ার জিত। যদি কেহ খামাখাই ঝগড়া করতে আসে, গালাগালি দেয়, তবে আমার কাছে নালিশ করিস্, আমি তাকে একবারে ভাদুড়ী রাজ্যের বাহির করে দিব।" তাঁহার কথায় সকলেই তুষ্ট হইল। তিনি ফিরিয়া আসিলেন তাঁহার প্রকৃত উদ্দেশ্য কেহই বুঝিল না।

রাত্রিতে আবার গোপালের সহ সন্ন্যাসীর ধর্ম্মালোচনা ছলে কথোপকথন হইল। উপেন্দ্র কহিলেন, "অগ্রে জ্যেষ্ঠের মন আমার প্রতি কিরূপ তাহার গূঢ় অনুসন্ধান না জানিলে কর্ত্তব্য স্থির করা যায় না।" গোপাল বলিলেন, "আমি কল্যই তাহা জানিব।"

পরদিন কাচারীতে গোপাল মহেন্দ্রের সহিত নানাকথা উপস্থিত করিলেন। সেই উপলক্ষে মহেন্দ্রের মন পরীক্ষার্থে কহিলেন, "বৈমাত্র ভ্রাতা চিরকালই পরম শত্রু। সম্রাট শাহজাহান বৈমাত্রদের বিসম্বাদে পিতৃদ্রোহী হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এখন শাহরিয়ারের প্রাণদণ্ড করিয়া নিরাপদ হইয়াছেন। অন্যের কথায় কাজ কি, হুজুরের বৈমাত্র উপেন্দ্রের কার্য্য স্মরণ করিলেই বৈমাত্র ভ্রাতা যে কি ভয়ানক শত্রু তাহা সহজে বোধগম্য হয়।" মহেন্দ্র বলিলেন, "সেটা তোমার ভ্রম। যেমন মাটিতে বীজ বুনিলে তদনুরূপ বৃক্ষ ও ফল হয় আবার সেই ফল হইতে নূতন বীজ, নূতন বৃক্ষ, নূতন ফল হইয়া ক্রমেই বৃদ্ধি পায় তেমনি

যে ব্যক্তি যেরূপ কাজ করে তদ্বংশে সেই দৃষ্টান্ত মত কার্য্য ক্রমেই বৃদ্ধি হইতে থাকে। ভ্রাতৃদ্রোহ তৈমুর বংশের চিরকলঙ্ক। সে বংশে সহোদর হউক বা বৈমাত্র হউক সকল ভাইই পরম শত্রু। এখন সেই ভ্রাতৃদ্রোহ হইতে ক্রমে পিতৃ-দ্রোহ উৎপন্ন হইতেছে। যে ঘরে ঝগড়া বিবাদ বরাবর আছে সে ঘরে সতীনে সতীনে, জায়ে ননদে, ভাই বৌয়ে সর্ব্বদাই ঝগড়া হয়। তাহা না থাকিলে শ্বাশুড়ী বা পাড়াপড়সী সহ ঝগড়া হইয়া থাকে। যে ঘরে ঝগড়া নাই তাহাদের সতীনে সতীনেও ঝগড়া বিবাদ হয় না। আমাদের ঘরে কখন ভাই ভাই বিবাদ ছিল না সুতরাং হইতেও পারিত না। উপেন্দ্র অতি শিশু ছিল। তাহার মাতুল তাহাকে কুবুদ্ধি দিয়া গৃহ বিবাদের সূত্রপাত করিলেন। ইহা উপেন্দ্রের দোষ নহে। আমি উপেন্দ্রকে শত্রু মনে করি না। আমার কোন সন্তান হইল না, এখন উপেন্দ্র জীবিত থাকিলে তাহাদ্বারাই পিতৃলোকের জলপিণ্ড বহাল থাকিতে পারে। আমি উপেন্দ্রের জন্য ঘোষণা দিতে চাই। সে আসিলে তাহাকে রাজত্ব দিয়া আমি কাশীবাস করিতে পারি। আমার বয়স বেশী হইয়াছে। এখন বিষয় ত্যাগ করিয়া ঈশ্বর চিন্তাই আমার কর্ত্তব্য। কিন্তু উপেন্দ্র যে জীবিত আছে তাহা আমি আশা করি না। যদি ঘোষণা দিলেও সে না আসে তবে দত্তক পুত্র রাখিয়া বিষয় বাসনা ত্যাগ করিব।” এই বলিয়া মহেন্দ্র অশ্রুপূর্ণ নয়নে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

কাচারী ভঙ্গ হইলে গোপাল বাড়ী আসিয়া উপেন্দ্রের নিকট আনুপূর্ব্বিক সমস্ত কথা বলিলেন এবং মহেন্দ্রের স্নিগ্ধভাব অকৃত্রিম জানিয়া উপেন্দ্রকে প্রকাশ হইতে পরামর্শ দিলেন। কিন্তু উপেন্দ্রের মনে স্বতন্ত্র ভাব উদয় হইল। তিনি কহিলেন, “গোপাল দাদা! তুমি জ্যেষ্ঠের চরিত্র যেরূপ বলিতেছ আমিও তাহাই সত্য বোধ করি। অথথা আমি এখন ছদ্মবেশ ত্যাগ করিয়া তাঁহার শরণ লইতে ইচ্ছা করি না। তাহাতে আমার কাপুরুষতা হয়। যদি আমি কোনরূপ উন্নতি লাভ করিয়া তাহার পর জ্যেষ্ঠের অনুগত হই তবেই আমার পৌরুষ প্রকাশ হয় এবং প্রশংসা হয়। এখন উন্নতির সুবিধাও হইয়াছে। শাহজাহান এখন সম্রাট হইয়াছেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ এবং প্রিয়তম পুত্র দারাশেকো আমাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। এখন শাহজাদা দারার নিকট উপস্থিত হইলে অবশ্য কোন সম্ভ্রান্ত পদ পাইতে পারিব। তখন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আনুগত্য স্বীকার

করিব। অক্ষম ব্যক্তি অনুগত হইলে তাহাকে কেহ বিশেষ বিনীত বা ক্ষমা-পরায়ণ জ্ঞান করে না। আমি যদি ভ্রাতার সহ বিবাদ করিতে সমর্থ হইয়াও তাঁহার অনুগত হই তবেই জ্যেষ্ঠের নিকট আমার আদর হইবে এবং সকল লোকে আমার পূর্ব্ব বিদ্রোহ কেবল শৈশবসুলভ চপলতার এবং কুমন্ত্রীগণের কুপরামর্শের ফল বলিয়া নিশ্চয় করিবে। এখন জানিলাম যে আমাদের পরিবার ও স্বজনগণ সকলেই সুখে আছে সুতরাং আমাদের সে চিন্তা থাকিবে না। এখন এই মহোন্নতির সুযোগ কদাচ অবহেলা করিব না। আমি অবশ্যই দিল্লী যাইব। তুমিও আমার সঙ্গে চল।”

গোপাল ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। উপেন্দ্র চক্ষু বিস্তার করিয়া কহিলেন, “তুমি কি এখন আমাকে তুচ্ছ জ্ঞান কর?” গোপাল নম্রভাবে বলিলেন, “না, আপনি প্রভু আমি দাস, আপনার অবাধ্য হই আমার সাধ্য কি? তবে কোন প্রয়োজন মত সৎপরামর্শ দেওয়া আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। এখানে আপনার জন্য রাজত্ব প্রস্তুত তবে এখন আর দিল্লী গিয়া উন্নতি আবশ্যক বোধ হয় না। যদি দিল্লী যান তবে আগে রাজা হইয়া পরে যাইবেন। দরিদ্র ভাবে না গিয়া আমীরভাবে যাইলে ভাল হইবে।” উপেন্দ্র অমনি হাস্যমুখে কহিলেন, “আমি তো আগেই বলেছি যে আমি দীন হীন অবস্থায় দাদার কাছে গিয়া অনুগ্রহপ্রার্থী হইতে চাহি না। তুমি আমার সঙ্গী হইবে কিনা তাই বল।” গোপাল স্বীকার করিলেন। উপেন্দ্র আবার বলিলেন, “বাদশাহী দরবারে আমার দরিদ্র ভাবে যাওয়া হয় না। পথে দরিদ্র ভাবে যাওয়াই ভাল। পথে বড় মানুষী দেখাইলে কেবল চোর ডাকাতের ভয় হয়। তুমি গয়াশ্রাদ্ধ করিবার উছিলায় দাদার নিকট ছুটী লও। এক হাজার মাত্র টাকা যোটাও। দিল্লীতে গিয়া ভাল বাসা করিয়া, শাহজাদার সঙ্গে দেখা করিব। পাঁচ মোহর নজর দিতে হইবে। একমাস বাসা খরচ করিতে হইবে। বোধ হয় হাজার টাকায় সঙ্কুলান হইতে পারে।” গোপাল “যেআজ্ঞা” বলিয়া বিদায় হইলেন। পাটরাণীর টাকা,অলঙ্কার এবং দ্রব্যজাত যাহা ছিল মহেন্দ্র তাহা আত্মসাৎ করেন নাই সুতরাং গোপাল অতি সহজেই টাকা যোটাইলেন, অধিকন্তু পাঁচখান আকবরী মোহর, একটি হীরকাঙ্গুরী, একছড়া মুক্তার মালাও আনিলেন। তিনি নিজেও তীর্থযাত্রার ভাণ করিয়া মহেন্দ্রের নিকট ছুটী লইলেন এবং শুভক্ষণ দেখিয়া উভয়ে দিল্লী যাত্রা করিলেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

উপেন্দ্রনারায়ণের দিল্লী যাত্রা।—মহেন্দ্রের মৃত্যু।—উপেন্দ্রের গৃহ প্রত্যাগমণ।
—মল্লিক উপাধি।—চেপুয়া প্রচলন।—বাণিজ্য ও দেশীয় উন্নতি।

রাজধর্ম্ম এবং ব্যক্তিগত ধর্ম্ম প্রচুর বিভিন্ন। ভগবান মনু বিভিন্ন অবস্থার লোকের জন্য ভিন্ন ভিন্ন কর্ত্তব্য কর্ম্ম নির্দ্দেশ করিয়াছেন। জগতে সমস্ত লোকের অবস্থা কখন সমান ছিল না, এখনও নাই এবং ভবিষ্যতেও কখন হইবে না। সুতরাং তাহাদের কর্ত্তব্য কর্ম্মও সমান হইতে পারে না। যেরূপ কার্য্য করিয়া একজন সর্ব্বত্র প্রশংসনীয় হয় ঠিক সেইরূপ কার্য্যেই অন্যে নিতান্ত নিন্দনীয় কাপুরুষ মধ্যে গণ্য হয়। অনেকে দৈবগতিকে কৃতকার্য্য হইয়াই প্রশংসনীয় ও পূজ্য হইয়াছেন। রোমের সম্রাট অগষ্টস্, দিল্লীর সম্রাট শের শাহ ও শাহজাহান, মহারাষ্ট্রপতি শিবজী যে উপায়ে রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন তাহা অতি নিন্দনীয়। যদি তাঁহারা জয়ী না হইতেন কিম্বা রাজ্য লাভের অনতিবিলম্বেই লীলাসম্বরণ করিতেন তবে তাঁহারা অতি জঘন্য ঘৃণিত লোক বলিয়া গণ্য হইতেন। কিন্তু তাঁহারা সৌভাগ্যক্রমে যেমন জয়ী হইয়াছিলেন তেমনি দীর্ঘকাল রাজ্য ভোগ করিতে পারিয়াছিলেন। সেই সময়ে তাঁহারা সৌভাগ্যের অতিমাত্র সদ্ব্যবহার দ্বারা সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। তখন তাঁহাদের পূর্ব্বকৃত কুকর্ম্মও সৎকর্ম্ম মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। পক্ষান্তরে দিল্লীর সম্রাট নসিরউদ্দীন অতি সদাশয় তপস্বী ছিলেন। তিনি রাজ্যের একটি পয়সা নিজ ভোগ বিলাসিতার জন্য ব্যয় করিতেন না। *তিনি অতি সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় এবং দয়াশীল ছিলেন। ধ্যান উপাসনা জপতপেই তাঁহার অধিকাংশ সময় ব্যয় হইত। তিনি রাজকার্য্য পর্য্যালোচনার সময় পাইতেন না। তাঁহার কর্ম্মচারীগণ প্রজার উপর অত্যাচার করিত। ফলতঃ তাঁহার রাজত্বে প্রজাগণের

---

* নসিরউদ্দীন পুস্তকের অনুলিপি করিয়া, তল্লব্ধ আয় দ্বারা নিজের জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। তাঁহার একমাত্র রাজ্ঞী ছিল; তাঁহাকে স্বহস্তে সমুদায় গৃহকার্য্য সম্পন্ন করিতে হইত। একদা রন্ধনকালে তাঁহার অঙ্গুলি দগ্ধ হওয়ায়, তিনি একটী দাসীর জন্য স্বামীর নিকট প্রার্থনা করেন। নসিরউদ্দীন তদুত্তরে বলেন, "আমি রাজ্যের রক্ষক মাত্র, সুতরাং রাজস্ব অনর্থক ব্যয় করিতে পারি না।" তাঁহার রাজত্বে প্রজাদিগের বিশেষ কষ্টের কোন স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না।

বিশেষ সুখ ছিল না। পক্ষান্তরে অগষ্টস্, শের, শাহজাহান রাজধর্ম্ম সম্মত সুশাসন দ্বারা নিজ কুকর্ম্ম ও চরিত্রগত দোষ সত্ত্বেও রাজর্ষি বলিয়া যশোভাজন হইয়াছিলেন। তাঁহাদের রাজত্বে রাজ্যের কৃষি বাণিজ্য, শিল্প সাহিত্যের প্রচুর উন্নতি হইয়াছিল এবং প্রজাগণ সুখী ছিল।

উপেন্দ্র সন্ন্যাসীবেশেই সাতগড়া হইতে বাহির হইলেন। গোপালও গেরুয়া বসন ধারণ করিয়া একটি মাত্র ভৃত্য সহ তীর্থ যাত্রা সাজে বাহির হইলেন। নগরের একক্রোশ দূরে পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট স্থানে উভয়ের সাক্ষাৎ হইল। তাঁহারা গয়া, কাশী, অযোধ্যা, প্রয়াগ, বৃন্দাবন আদি তীর্থ করিয়া দিল্লী গমন স্থির করিলেন। ব্যয় সঙ্কুলন ও বিপদাশঙ্কা লাঘব জন্য তাঁহারা পদব্রজে দরিদ্র ভাবে চলিলেন। উপেন্দ্র দুরবস্থায় শিক্ষিত হইয়াছিলেন। তিনি প্রচণ্ড রৌদ্রে বিনা ছত্রে অম্লান বদনে চলিলেন। তাঁহাদের ভৃত্য কালু ভুঁইমালীর মাথায় তলপী থাকায় তাহাকে রৌদ্র তত বেশী লাগিল না। সে সেই বোঝা মাথায় করিয়া তীর্থদর্শন কুতূহলে পরমোল্লাসে যাইতে ছিল। গোপাল মহাবিপদে পড়িলেন। শারীরিক পরিশ্রম করা, বহুদূর পদব্রজে চলা, শীত গ্রীষ্ম রৌদ্র বৃষ্টি সহ্য করা তাঁহার অভ্যাস ছিল না। তাঁহার বয়সও প্রায় পঞ্চাশ বৎসর হইয়াছিল। তিনি দুই ক্রোশ পথ গিয়াই একান্ত শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। শরীরে ঘর্ম্মের স্রোত পড়িতে লাগিল, পায়ে বেদনা হইল এবং তৃষ্ণায় কণ্ঠ শুষ্ক হইল। অথচ রাজকুমার উপেন্দ্র যে কষ্ট করিতেছেন তিনি তাহা সহিতে পারেন না, একথা বলিতেও গোপালের লজ্জা বোধ হইল। তিনি অতি কষ্টে আরো এক ক্রোশ গেলেন। উপেন্দ্র ও কালু কিছুদূর আগে গিয়া দেখেন গোপাল পাছে পড়িয়া আছেন। তাঁহারা বৃক্ষ ছায়ায় অপেক্ষা করেন আবার গোপাল নিকটে আসিলেই চলিতে আরম্ভ করেন। তাঁহাদের কতক বিশ্রাম হয়, বিপন্ন গোপালের বিশ্রাম করিবারও সুবিধা হয় না। বহু কষ্টে তিন ক্রোশ গিয়া গোপাল একবারে অবসন্ন হইয়া পড়িলেন এবং জলপান উচিলায় বৃক্ষতলে বসিয়া পড়িলেন। সঙ্গীদ্বয়ও তাঁহার অনুরোধে বসিল।

অতি পরিশ্রমের পর হঠাৎ জলখাওয়াতে সর্দ্দি গরমী হয়। এজন্য গোপাল কিছুকাল বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। পথশ্রমে তাঁহার বোধ হইল যে তিনি অবশ্যই দশ ক্রোশের কম আসেন নাই। তিনি কালুকে তাঁহার পা টিপিতে

বলিলেন। কালু তামাক্ সাজিয়া দিয়া পা টিপিতে টিপিতে বলিল, "সরকার মশায়! এইটুক আসিতেই এত—আপনি কয় বছরে গয়া যাবেন?" গোপাল বিরক্ত ভাবে বলিলেন, "যে দশ বার ক্রোশ এসেছি এই যথেষ্ট—রোজ যদি এত খানি যেতে পারি তবে বিশ দিনে গয়া পৌঁছিব। কেমন কুমার সাহেব! প্রতিদিন দশ ক্রোশ যাওয়া কম পথ নয়।" উপেন্দ্র বলিলেন, "হাঁ, প্রত্যহ দশ ক্রোশ সমানে চলিতে পারিলেই যথেষ্ট, কিন্তু তুমি প্রথম দিনই এইটুক রাস্তা আসিতে যত কাতর হয়েছ তাতে রোজ যে তুমি পাঁচ ক্রোশ চল্‌তে পার্‌বে তাও আমার ভরসা হয় না।" গোপাল হতাশ্বাস হইয়া বলিলেন, "কুমার সাহেব! তীর্থ আমার মাথায় থাকুক—আমি ফিরে ঘরে যাই, প্রত্যহ এর চেয়ে বেশী চলা আমার সাধ্য নাই। আপনার নব্য বয়স আমি আধ বুড়ো আমাকে বিদায় দিন।" উপেন্দ্র কহিলেন, "দূরবর্ত্তী স্থানে নিজের বিশ্বাসী একজন লোক না থাকিলে ভাল হয় না, তোমাকে ছাড়িতে পারি না, বরং নৌকা বা গাড়ীযোগেই চলা যাবে তবু তোমার যেতেই হবে—বুজেছো গোপাল দা, তুমি বই আমার বিশ্বাসী লোক কেহ নাই।" গোপাল গলবস্ত্রে প্রণাম করিয়া কহিলেন, "আমার বহুদূর হাঁটা অভ্যাস নাই, নতুবা সাধ্যাতক আপনার কার্য্যে এ দাসের কোন ওজর নাই।"

কালু তখনও উপেন্দ্রকে চিনিতে পারে নাই। উভয়ের কথোপকথন শুনিয়া তাহার মনে সন্দেহ হইল। কালু জিজ্ঞাসা করিল, "সরকার মশায়, এ সন্ন্যাসী বাবাজী কে? তাকে আপনি "কুমার সাহেব" বলেন কেন এবং তাকে এত মান্য করেন কেন?" গোপাল বলিলেন, "চুপ, চুপ, সাধু সন্ন্যাসীদিগকে এই রূপই বলিতে হয় এবং এইরূপ মান্যই করিতে হয়। পাছে তোর কথা শুনে রাগ হয় তাইতে বলি আর এরূপ কথা কখন মুখে আনিস্ না।" কালু অমনি চুপ করিল।

উপেন্দ্রের অনুমতি পাইয়া গোপাল নৌকা ভাড়া করিলেন। নৌকায় রাজমহল পর্য্যন্ত গিয়া শেরশাহী সড়ক পাইলেন। তখন তাঁহারা উটের গাড়ী যোগে চলিলেন। গয়া, কাশী, অযোধ্যা, প্রয়াগ, মথুরা, বৃন্দাবন সন্দর্শন ও তীর্থ কার্য্য সমাধা করিয়া একশত দিনে দিল্লীতে উপস্থিত হইলেন। শাহজাহানের সুশাসনে প্রকাশ্য সড়কে দস্যুভয় ছিল না, সুতরাং তাঁহারা পথে কোন বিপদে পড়েন নাই।

উপেন্দ্র দিল্লীতে সুবিধা মত একটি বাসা ভাড়া করিলেন, মোটামুটি সম্ভ্রান্ত লোকের যোগ্য করিয়া সাজ সরঞ্জাম খরিদ করিলেন, সন্ন্যাসী বেশ ত্যাগ করিয়া জামা জোড়া, পাগড়ী, পরিলেন। আলখাল্লার উপর কোমরবন্ধ ও গলায় মুক্তার মালা পরিলেন। তখন কালু চিনিতে পারিয়া গোপালকে কহিল, "সরকার মশায়! এ সন্ন্যাসী বাবাজী কি আমাদের ছোট সাহেব?" গোপাল হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "এখন চিন্‌তে পাল্লি—দেখ্ দেখি পোষাকে মানুষের কত চেহারা বদ্‌লায়।" কালু বহুদিন পরে উপেন্দ্রকে দেখিয়া আহ্লাদে গদগদ হইয়া প্রণাম করিল।

উপেন্দ্র পালকী ভাড়া করিয়া শাহজাদা দারাশেকোর দর্বারে চলিলেন। এক খানা ভাড়াটিয়া এক্কাতে গোপাল তাঁহার সঙ্গে চলিলেন। দারা জানিতেন যে শোণ নদের তীরে তাঁহারা রণশায়ী হইয়াছেন; এখন তাঁহাদিগকে দেখিয়া দারা অতিশয় সমাদরে গ্রহণ করিলেন। দারা এখন বাদশাহের বড় পুত্র, তাঁহার অর্থ ও ক্ষমতা প্রচুর ছিল। তিনি অতি সৎলোক ছিলেন, বিপদ কালের বন্ধু-দিগকে পুরস্কার করিতে তাঁহার ইচ্ছাও ছিল। তাঁহার সুপারিসে শাহজাহান উপেন্দ্রকে ৫০০৲ টাকা বেতনে ফৌজদারী কর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন এবং গোপালকে ১০০৲ টাকা বেতনে উপেন্দ্রের অধীনে মুন্‌সারিমী কর্ম্ম দিলেন।

উপেন্দ্র হীনাবস্থায় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিকট প্রকাশ হইতে লজ্জা বোধ করিয়া-ছিলেন। এখন সম্ভ্রান্ত পদস্থ হইয়া মহেন্দ্রকে সমাচার দেওয়া উচিত বোধ করিলেন। তিনি অতি বিনীত ভাবে ডাকযোগে মহেন্দ্রের নিকট পত্র লিখিলেন,—

"আমার কুমন্ত্রীরা যখন আমাকে আপনকার বিরোধী হইতে পরামর্শ দিয়া ছিলেন তখন অল্পবুদ্ধি ও অনভিজ্ঞতা হেতু আমি কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বুঝিতে না পারিয়া বিদ্রোহী হইয়াছিলাম। ধর্ম্মের সুবিচারে আমি পরাস্ত হইয়া পলায়ন করত শাহজাহানের দলে মিলিয়াছিলাম। আমি পিতৃতুল্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বিদ্রোহী ছিলাম, শাহজাহান প্রকৃতই পিতৃদ্রোহী ছিলেন। শোণ নদের তীরে ঘোর যুদ্ধে শাহজাহানের এবং আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইল। আমি ক্ষত বিক্ষত হইয়া বহু কষ্টে প্রাণ বাঁচাইয়া গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইলাম। তখন আমার মনে অতিশয় অনুশোচনা হইল। রাজ্য, ধন, প্রভুত্ব জন্য প্রলোভনই যে

আমার কুবুদ্ধি ও পাপের হেতু তাহা তখন আমি প্রথম বুঝিতে পারিলাম। আমার রাজসিক বুদ্ধি অন্তর্হিত হইল। আমি লোভ ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণে সংকল্প করিয়া জনকপুর নিবাসী মহোপাধ্যায় জগন্নাথ শাস্ত্রীর টোলে সংস্কৃত অধ্যয়ণ করিলাম। তখন মনস্থ করিলাম যে ৺গয়াধামে গিয়া পিতৃলোকের পিণ্ডদান করত বরেন্দ্রভূমিতে গিয়া আপনকার পদানত হইয়া পূর্ব্বকৃত পাপ ধৌত করিব। তাহার পর যাজনিক ব্যবসায় দ্বারা নিষ্পাপ নির্লোভে জীবিকা নির্ব্বাহ করিব। গয়াধামে গোপাল সরকারের সহ সাক্ষাৎ হইল। তাহার প্রমুখাৎ শাহজাহানের সাম্রাজ্য প্রাপ্তি সংবাদ শুনিয়া আবার লোভে পড়িলাম। শাহজাদা দারা আমাকে বড় ভাল বাসিতেন। আমি ও গোপাল তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে তিনি সুপারিস করিয়া আমাকে দিল্লীতে ফৌজদারী কর্ম্ম দিয়াছেন এবং হাজার সেনার উপর মন্‌সব্‌দারী দিয়াছেন। গোপাল ১০০৲ টাকা বেতনে আমার অধিনে মুন্‌সারিম হইয়াছে। তাহার ভৃত্য কালু ভূঁইমালীও এখানে আছে। খোরাসানে যুদ্ধ যাত্রার জন্য সম্রাট শাহজাদা দারাকে বরণ করিয়াছেন। বোধ হয় তাঁহার সঙ্গে আমারও যাইতে হইবে। জীবন অনিত্য, বিশেষতঃ যুদ্ধার্থীদের জীবনের ক্ষণকালও ভরসা নাই। আমি যদি আপনকার আশীর্ব্বাদে মঙ্গল মত ফিরিয়া আসি তবে শ্রীচরণ দর্শন করিব। নতুবা এই পত্র দ্বারাই এই জন্মের মত বিদায় গ্রহণ করিলাম। আমি লজ্জা ও নির্ব্বেদ বশতঃ এতদিন কোন সমাচার লিখি নাই। আপনি বাৎসল্য গুণে এই নরাধমকে ক্ষমা করিবেন। আমার প্রাণগতিক মঙ্গল জানিবেন। জননী দেবীকে ও অন্যান্য গুরুজনকে আমার মঙ্গল জানাইবেন। গোপাল ও কালুর মঙ্গল সংবাদ তাহাদের বাড়ীতে দিবেন। সতত তথাকার মঙ্গল সংবাদ জানাইয়া চিন্তা দূর করিবেন।”

বাদশাহী আমলে সমস্ত সহরে এবং পরগণার সদর কশ্‌বাতে ডাকঘর ছিল। অশ্বারোহী বরকন্দাজগণ এক ডাকঘর হইতে অন্য ডাকঘরে চিঠি পৌঁছাইত। প্রতি ডাকঘরে একজন ডাকমুনসী ও একটি পেয়দা থাকিত। টিকিট ছিল না, রেজেষ্টরী করা ছিল না। সমস্ত চিঠি বেয়ারিং যাইত। সমস্ত সরকারী চিঠি ও রাজা জমিদারদের চিঠি পেয়দা গিয়া বিলি করিত। অন্যান্য চিঠি বিলি হইত না। লোকে ডাকঘরে তত্ত্ব করিয়া মাশুল দিয়া নিজ নামিক চিঠি লইয়া যাইত।

দূরত্ব অনুসারে মাশুল কমবেশী হইত। জমিদারদিগের বাড়ীতে বিলি হওয়ার জন্য বার্ষিক শুল্ক দিতেন। সেই শুল্কদ্বারা ডাকমুন্সীর বেতন, পেয়দার বেতন এবং ডাকঘর হইতে জমিদারদের বাড়ী যাইবার রাস্তা মেরামত নির্ব্বাহ হইল। জমিদারদের চিঠির কোন মাশুল লাগিত না। ইহাতে জমিদারদের প্রচুর সুবিধা ও সম্মান হইত। এখনও সেই বাদশাহী নিয়মের অনুসরণে ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট জমিদার-দের নিকট ডাক সেস্ লইয়া থাকেন। কিন্তু এখন তাহাতে জমিদারদের কোন লাভ বা সম্মান নাই। কারণ সর্ব্বসাধারণের ন্যায় তাঁহাদের চিঠিতেও মাশুল লাগে এবং সকল চিঠিই সমানে বিলি হয়। মাশুল বাকি থাকায় তখন কোন চিঠি খোয়া যাইত না সুতরাং রেজেষ্টরী করার তুল্য ফল হইত। তখন চিঠির ওজন ধরিয়া মাশুল কম বেশী হইত না। কিন্তু তখন অপর লোকের চিঠি পাইতে অনেক বিলম্ব হইত। বিস্তর চিঠি ডাকঘরেই পড়িয়া থাকিত এবং বৎসরান্তে দগ্ধ হইত। কিন্তু সরকারী চিঠি ও জমিদারদের চিঠি পৌঁছিতে কিছুমাত্র গৌণ বা গোলযোগ হইত না।

মহেন্দ্র বহুকাল পরে উপেন্দ্রের পত্র পাইয়া অতিশয় মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিলেন। তখন তিনি জানিলেন উপেন্দ্র জীবিত আছে, সে যে তাঁহার বিরোধী হইয়াছিল তাহা কেবল কুপরামর্শ ও বালচাপল্য জনিত, উপেন্দ্র কাপুরুষ নহে, সে নিঃসহায়ে কেবল নিজ চেষ্টায় সংস্কৃত পড়িয়া পণ্ডিত হইয়াছে এবং সম্রাটের প্রিয় হইয়া উন্নত পদ পাইয়াছে, সে এখন তাঁহার অনিষ্ট করিতে সমর্থ হইয়াও অনুগত হইতেছে সুতরাং উপেন্দ্র তাঁহার প্রকৃত ভক্ত। এই আলোচনায় তাঁহার হৃদয় আহ্লাদে পরিপূর্ণ হইল। চক্ষে আনন্দাশ্রু পড়িল। তিনি চিঠিখানি বারম্বার পাঠ করিলেন। সমস্ত সভাস্থ লোককে পড়িয়া শুনাইলেন। সমস্ত ঠাকুর বাড়ীতে পূজা ও ভোগ দিতে হুকুম দিলেন। তিনি কাচারী হইতে উঠিয়া নিজে বাড়ীর ভিতর গিয়া উপেন্দ্রের মাতাকে এবং সমস্ত অন্তঃপুরিকাগণকে উপেন্দ্রের পত্র শুনাইলেন। সেই পত্র শুনিয়া সকলেই আহ্লাদিত হইল এবং উভয় ভ্রাতার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে লাগিল। পাটরাণী পুত্রের উন্নতি শুনিয়া পরমানন্দ লাভ করিলেন কিন্তু উপেন্দ্রের সহ যে মধ্যে তাঁহার দেখা হইয়াছিল তাহা প্রকাশ করিলেন না। তিনি মহেন্দ্রকে কহিলেন, "উপেন্দ্র যুদ্ধে যাইবে শুনিয়া আমার মন বড়ই উদ্বিগ্ন হইল।

তাহাকে বহুদিন দেখি নাই তাহাকে বাড়ী আসিতে লিখিয়া পাঠাও। আর তাহার সুপাত্রী ঠিকানা করিয়া বিবাহ দেও।” মহেন্দ্র কহিলেন, “আপনকার যে আজ্ঞা আমারও সেই ইচ্ছা। উপেন্দ্রের সন্তান হইলেই গৌড়বাদশাহের বংশ থাকে।” মহেন্দ্র প্রথমতঃ মনে করিলেন যে তিনি নিজে দিল্লী যাইবেন। পথি মধ্যে গয়া,কাশী,প্রয়াগ,অযোধ্যা,নৈমিষারণ্য,মথুরা,বৃন্দাবন দর্শন করিয়া শেষে উপেন্দ্রকে লইয়া আসিবেন, কিন্তু তিনি উপেন্দ্রের পত্রে দেখিলেন যে উপেন্দ্র যুদ্ধোপলক্ষে খোরাসান যাইবে। তাহার সহ যদি সাক্ষাৎ না হয় তবে সমস্ত পরিশ্রম ও ব্যয় অনর্থক হইবে। এজন্য অগ্রে পত্র লিখিয়া বৃত্তান্ত জানা আবশ্যক বোধ করিলেন।

উপেন্দ্র যে সন্ন্যাসী বেশে সাতগড়ায় আসিয়াছিলেন সে কথা তিনি নিজ চিঠিতে প্রকাশ করেন নাই। পাটরাণীও তদ্বিষয়ক কোন কথা মহেন্দ্রের নিকট বা অন্যের নিকট প্রকাশ করিলেন না। কাজেই মহেন্দ্র তাহা কিছুই জানিতে পারিলেন না। তিনি উপেন্দ্রের পত্রের উত্তরে লিখিলেন যে, “তুমি কেবল মাত্র নিজ চেষ্টায় সংস্কৃত এবং সম্রাট শাহজাহানের প্রিয় পাত্র হইয়া উচ্চপদ লাভ করিয়াছ, ইহাতে আমি আরো আহ্লাদিত হইলাম। চাকরী করিবার দুইটি উদ্দেশ্য, তন্মধ্যে প্রথম উদ্দেশ্য অর্থোপার্জ্জন আর দ্বিতীয় উদ্দেশ্য নিজ কৃতিত্ব প্রদর্শন। তুমি যে পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছ এবং বাদশাহের প্রিয় হইয়া উচ্চপদ লাভ করিয়াছ তাহাতে কৃতিত্ব প্রদর্শন যথেষ্ট হইয়াছে। তোমার অর্থোপার্জ্জনের কোন প্রয়োজন নাই। আমি ক্রমে তিন বিবাহ করিয়াছি কোন সন্তান হয় নাই। আমি এখন বৃদ্ধ হইয়াছি, বৈষয়িক চিন্তাতে আর লিপ্ত থাকিতে ইচ্ছা নাই। আমার ইচ্ছা যে এখন তীর্থবাসী হইয়া জীবনের শেষাংশ ঈশ্বর চিন্তাতে অতিবাহিত করি। আমাদের রাজত্ব বহুপুরুষ যাবৎ চলিতেছে কিন্তু কখন দত্তক পুত্রদ্বারা বংশরক্ষা করিতে হয় নাই। তজ্জন্য দত্তক রাখিতে আমার ইচ্ছা নাই। তুমি আসিলে আমি রাজত্ব তোমাকে দিয়া তীর্থ যাত্রা করিব। আমাদের পৈত্রিক যে সম্পত্তি আছে তাহাই তোমার সুখ ভোগের জন্য যথেষ্ট। অতি লোভী হওয়া ব্রাহ্মণের পক্ষে ধর্ম্ম বিরুদ্ধ। গুরুতর প্রয়োজন ভিন্ন যুদ্ধব্রতী হওয়াও ব্রাহ্মণের পক্ষে দূষ্য। বিশেষতঃ যুদ্ধের প্রতি মুহূর্ত্তে জীবন সংশয়। তোমার অভাব হইলে গৌড়বাদশাহের বংশ লোপ হইবে। অতএব তুমি চাকরী ত্যাগ করিয়া অবিলম্বে দেশে আসিয়া পৈত্রিক রাজত্ব গ্রহণ

কর এবং বিবাহ কর। আর তোমার বিদেশে থাকা অনুচিত। তুমি আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কিন্তু বয়সে সন্তানের তুল্য। তুমি আমার কথা কদাচ লঙ্ঘণ করিও না। আর গাটরাণী মাতারও তাহাই একান্ত ইচ্ছা। তোমার যুদ্ধ যাত্রার কথা শুনিয়া তিনি নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়াছেন এবং তোমাকে অবিলম্বে দেশে আসিতে অনুরোধ করিতেছেন। সেই মাতৃআজ্ঞা পালন তোমার সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। মাতুল মহাশয় তোমাকে রাজপদ দিবার জন্য তোমার শৈশব কালে যে বিবাদ উপস্থিত করিয়াছিলেন তজ্জন্য আমি তোমাকে কিছুমাত্র দোষী জ্ঞান করি নাই। সে সমস্ত অপরাধই মৃত মাতুল দিনমণি সান্যাল মহাশয়ের ছিল, তাহা আমি জানি। তাঁহার পাপের শাস্তি তিনি পাইয়াছেন। অন্য কাহারও কোন অপরাধ নাই তজ্জন্য আমি অন্য কাহারও দণ্ড করি নাই। সেজন্য তোমার কোন লজ্জা কিংবা ভয় করা অনাবশ্যক সুতরাং ক্ষমা প্রার্থনাও অনাবশ্যক। এখানে সকলের মঙ্গল জানিবে এবং গোপাল সরকার ও কালু ভূঁইমালীর পারিবারিক মঙ্গল তাহাদের জানাইবে। অবিলম্বে তোমাদের মঙ্গল সংবাদ লিখিয়া চিন্তা দূর করিবে। আর প্রচণ্ড খাঁ খুড়ামহাশয়ের যদি কোন সংবাদ জান তবে তাহাও আমাকে জানাইবে।”

এই চিঠি পাইবার পূর্ব্বেই শাহজাদা দারা যুদ্ধ যাত্রা করিয়াছিলেন। উপেন্দ্র তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিলেন। গোপাল দিল্লীতে ছিল। চিঠি দিল্লীতে পৌঁছিলে গোপাল ঠিকানা বদ্‌লাইয়া “শাহজাদা দারার লস্কর ছাউনী” বলিয়া ঠিকানা লিখিয়া দিলেন। উপেন্দ্র ছাউনীতে চিঠি পাইয়া তদুত্তরে লিখিলেন যে, “আমি শাহজাদা দারার নিজ সেনার অধ্যক্ষরূপে নিযুক্ত হইয়া অতি সম্মানে আছি। এখন ছুটি চাহিলে ছুটি পাইব না বরং শাহজাদা আমাকে ভীরু বিবেচনায় উচ্চপদ হইতে নিম্নতর পদে অবনত করিবেন। এজন্য যুদ্ধের অবসান পর্য্যন্ত আমার অপেক্ষা করিবেন। যদি যুদ্ধ শেষ পর্য্যন্ত জীবিত থাকি তবে গিয়া শ্রীচরণ দর্শন করিব। প্রচণ্ড খুড়া রোহিলখণ্ডের শুবেদার হইয়াছেন এইরূপ সংবাদ জানি কিন্তু তাঁহার সহ আমার সাক্ষাৎ হয় নাই। গোপাল ও কালু দিল্লীতে আছে।”

ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে তৎকালীন চিঠির মাশুল ওজন অনুযায়ী হইত না, দূরত্ব অনুসারে হইত। বাঙ্গালা দেশ হইতে দিল্লীতে একখানি চিঠি পাঠাইলে তাহার মাশুল কিছু কমবেশি ১।০ একটাকা চারি আনা লাগিত। সেইজন্য মহেন্দ্র

একমাত্র উপেন্দ্রের চিঠিতে এত বিভিন্ন ব্যক্তির সমাচার জানিতে চাহিয়াছিলেন। তৎকালে তদ্রূপই রীতি ছিল। কেননা প্রত্যেক ব্যক্তিকে পৃথক চিঠি পাঠাইলে, মাশুল খুব বেশী লাগিত অথচ এক পত্র বৃহৎ হইলেও মাশুল বেশী হইত না।

দারা বাদক্ষণ পার হইলেই উজ্‌বকদের সহ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। অম্বরের রাজা জগৎসিংহ বাদশাহী সেনার নায়ক ছিলেন; উপেন্দ্র দারার নিজ সেনার নায়ক ছিলেন। দারা সর্ব্বোপরি কর্ত্তা ছিলেন। তিনি যেমন হিন্দুপ্রিয় ছিলেন তেমনই হিন্দুরাও তাহার একান্ত অনুগত ছিল। উজ্‌বক, কাল্‌মক, সেল্‌জাক, কাল্‌শাক প্রভৃতি দুর্দ্দান্ত তার্ত্তার জাতি বারংবার পরাস্ত হইয়া দারার অধীনতা স্বীকার করিল। কেবল সমরখণ্ড ও বোখার দুর্গ ভিন্ন সমস্ত তুরান ও খোরাশান দারার হস্তগত হইল। দারা স্বয়ং সমরখণ্ড অবরোধ করিলেন এবং বোখারা অধিকার জন্য রাজা জগৎসিংহকে পাঠাইলেন।

উজ্‌বক সেনাপতি মির্জা আখর বুঝিলেন যে, দিল্লীপতির রাজপুত সেনা সম্মুখ যুদ্ধে অজেয়। সুতরাং তৈমুর বংশের পুরাতন রাজ্য আবার তাহাদের দখল হওয়া অনিবার্য্য। আখর কোন প্রতিকারের উপায় করিতে না পারিয়া স্বপক্ষীয় অমাত্যগণের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা সম্মুখ যুদ্ধ ত্যাগ করিয়া ঔৎপাতিক যুদ্ধ করিতে পরামর্শ দিল। মীর খাদিম আলি নামক এক জন সৈয়দ বহুদিন ভারতবর্ষে ছিল। সে কহিল যে, "মহামোগল যে তৈমুর সন্তান এবং এই দেশীয় মুসলমান তাহা জানাইতেই তার্ত্তার জাতি সহজে দারার অধীনতা স্বীকার করিতেছে। আপনি ঘোষণা করুন যে তৈমুর সন্তান হিন্দুস্থানে গিয়া আধা কাফের হইয়াছে। তাহারা হিন্দুর কন্যা বিবাহ করে। শাহজাহান বাদশাহ নিজে এবং তাঁহার পুত্র দারা উভয়েই হিন্দুয়াণীর গর্ভজাত। তাহাদের সেনাপতি ও প্রধান প্রধান কার্য্যকারকগণ সকলেই হিন্দু। তুরান মহামোগলের দখল হইলে, তাঁহার হিন্দু কুটুম্বেরা শুবেদার হইবে। তাহাতে প্রকৃতপক্ষে তুরানে হিন্দুদেরই আধিপত্য হইবে। হিন্দুরা অতি নিষ্ঠুর কাফের। তাহারা মুসলমান প্রজা ধরিয়া দেবদেবীর পূজায় বলিদান করিবে। ফলতঃ তাহাতে তুরাণে মুসলমানদের ধর্ম্ম ও ধন প্রাণ রক্ষা হওয়া কঠিন হইবে। এইরূপ ঘোষণা হইলে প্রজারা মহামোগলের বিরোধী হইয়া উঠিবে। আমি

চেষ্টা করিয়া দারার নিজ সেনা মধ্যে মুসলমানদিগকে বিদ্রোহী করিয়া তুলিব। তাহা হইলেই আমাদের মঙ্গল নতুবা আমাদের রক্ষায় আর কোন উপায় নাই।”

মির্জা আথর মন্ত্রীদের পরামর্শ মত দ্বন্দ্ব যুদ্ধ ত্যাগ করিয়া আস্কন্দীগণকে উৎপাত করিতে লাগিলেন। অন্যদিকে খাদিম আলির পরামর্শ মত ঘোষণা করিয়া প্রজাগণকে মোগল সেনার বিরোধী করিয়া তুলিলেন। দারার মুসলমান সেনা কতক বিদ্রোহী হইয়া বিপক্ষে যোগ দিল। যাহাদের হিন্দুস্থানে সম্পত্তি ছিল তাহারা স্পষ্ট বিদ্রোহী হইল না বটে কিন্তু কর্ত্তব্য কার্য্যে প্রচুর শৈথিল্য করিতে লাগিল। দারা নিজ অনুরক্ত হিন্দু সেনার বিক্রমে বহু যুদ্ধে জয়ী হইলেন বটে কিন্তু তুরাণ দখল করিতে অসমর্থ হইলেন। তাঁহার সেনা যেখানে যায় অমনি সেখান হইতে সমস্ত প্রজা পলায়ন করে; তাঁহার সেনা সরিয়া গেলেই তার্ত্তার জাতি সে স্থান আবার অধিকার করিল। দেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল। দারা কাবুল হইতে রসদ আনাইলেন। আথর পথিমধ্যে সেই রসদ লুঠ করিতে চেষ্টা করিলেন কিন্তু পারিলেন না। সমস্ত দেশ উৎসন্ন প্রায় হইল। তখন আথর সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। দারা দেখিলেন তুরাণ অধিকার করা অসাধ্য। সুতরাং তিনিও সম্মত হইলেন। মির্জা আথর দিল্লীপতির অধীনতা স্বীকার করিয়া বার্ষিক পঞ্চাশ হাজার টাকা নালবন্দি দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন; নগদ দুই লক্ষ টাকা এবং তিন শত উৎকৃষ্ট ঘোড়া উপঢৌকন দিলেন। দারা তাহাই লইয়া মানে মানে ফিরিয়া আসিলেন। আথর নালবন্দির টাকা কখনই দেন নাই এবং মহামোগলগণও তাহা আদায়ের চেষ্টা করেন নাই। বাস্তবিক নালবন্দি দিবার চুক্তি কেবল মহামোগলের সম্মান রক্ষার্থেই সন্ধিপত্রে লিখিত হইয়াছিল; তাহা যে প্রকৃত পক্ষে দেওয়া হইবে না, তাহা উভয় পক্ষই বুঝিয়া ছিলেন।

দারা প্রত্যাগমন করিয়া পিতার নিকট জগৎসিংহ ও উপেন্দ্র খাঁর প্রশংসা করিলেন এবং মুসলমান কর্ম্মচারীর নিন্দা করিলেন। মুসলমান সহ তাঁহার পূর্ব্বাবধি অসদ্ভাব ছিল সেই ভাব আরো বর্দ্ধিত হইল। উপেন্দ্র পাঁচ হাজারী মনসবদার উপাধি পাইলেন এবং মালবের শুবেদার নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার সেই সকল সনন্দ এখনও বিদ্যমান আছে।

উপেন্দ্র দিল্লীতে ফিরিয়া আসিবার সংবাদ পাইবামাত্র মহেন্দ্র তাঁহাকে

বাড়ীতে আসিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু উপেন্দ্র এতবড় উচ্চপদ পাইয়া তাহা কিছু দিন ভোগ না করিয়া বাড়ীতে যাইতে সম্মত হইলেন না। তিনি এক বৎসর কাল মালবের শুবেদারী করিয়া ছুটি লইলেন এবং নৌকা পথে গোপাল ও কালুকে সঙ্গে লইয়া দেশে রওনা হইলেন। তিনি নৌকায় যাইতে যাইতে পথে যেখানে কোন ডাকঘর পাইতেন সেখান হইতেই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে চিঠি পাঠাইতেন। অথচ তাঁহার কোন নির্দ্দিষ্ট ঠিকানা না থাকায় তিনি নিজে কাহারও কোন চিঠিপত্র পাইতেন না। দিল্লী আগরা হইতে তাঁহার বাড়ী পর্য্যন্ত সমস্ত রাস্তাতেই নদীর ভাটি। ভাটিয়াল নৌকার ন্যায় সুখের যান তখন আর ছিল না, সুতরাং উপেন্দ্র অতি সুখে অতি দ্রুতবেগে অগ্রসর হইলেন। স্বদেশের এবং স্বজনগণের প্রতিমূর্ত্তি তাঁহার মনে উদিত হইল। তিনি তাহাদের সহ কিরূপ আলাপ ও ব্যবহার করিবেন দিবানিশি তাহাই চিন্তা করিতে করিতে সাতগড়ার ঘাটে উপস্থিত হইলেন। সেই দিনই কিছুকাল পূর্ব্বে মহেন্দ্রের মৃত্যু হইয়াছিল। উপেন্দ্র বিলের ঘাটে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার জ্বলন্ত চিতা দেখিয়া শোকে রোদন করিলেন। তিনি চিতা সংস্কার ও পূরক পিণ্ডদান প্রভৃতি শেষ কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে সন্ন্যাসী বেশে গৃহে গমন করিলেন।

মহেন্দ্র মৃত্যুর পূর্ব্বে পাটরাণী মাতাকে বলিয়াছিলেন যে, "আমি উপেন্দ্রের যে শেষ চিঠি পাইয়াছি তদ্দৃষ্টে বোধ হয় উপেন্দ্র দুই এক দিন মধ্যেই বাড়ীতে পৌছিবে, কিন্তু আমার সহ সাক্ষাৎ হইল না ইহাতে বড়ই দুঃখ থাকিল। আপনি তাহাকে আমার শেষ উপদেশ জানাইবেন যে, সে যেন আর বিদেশে এবং মোগল দর্বারে চাকরী না করে। মোগল রাজবংশে পিতৃদ্রোহ ভ্রাতৃদ্রোহ প্রবল কুপ্রথা। যে সম্রাট হয় সেই নিজ ভ্রাতৃকুল নির্ম্মূল করে। তাহাদের একজনের পক্ষ হইলে অন্যজন দ্বারা সর্ব্বনাশ হইতে পারে। এজন্য বাদশাহী দর্বার হইতে দূরে থাকাই উত্তম। আমাদের নিজ সম্পত্তি যাহা আছে তাহাই যথেষ্ট।" তিনি এই বলিয়া মালখানা ও তোষাখানার চাবি পাটরাণীর হাতে দিয়া চিরবিদায় লইয়াছিলেন। উপেন্দ্র নির্ব্বিবাদে রাজত্ব লাভ করিলেন।

মহেন্দ্র অতি ধার্ম্মিক এবং কার্য্যদক্ষ লোক ছিলেন। তৎকালে উপপত্নী রাখা অপকর্ম্ম মধ্যে গণ্য ছিল না। মহেন্দ্রের তিন পত্নী সত্ত্বেও অনেক উপপত্নী ছিল। বহুস্ত্রী সংযোগে উৎপাদিকা শক্তি নষ্ট হয়। তজ্জন্যই বোধ হয়

মহেন্দ্রের সন্তানাদি হয় নাই। স্ত্রীলোকের যেমন বহুপুরুষ সংযোগে অতিকর্ষণ দোষ হয় এবং উৎপাদিকা শক্তি নষ্ট হয়, পুরুষের ঠিক ততদূর না হউক কতক পরিমাণে সেই দোষ হইয়া থাকে। বিলাসী ধনীদের যে প্রায়শঃ সন্তান হয় না তাহা এই দোষের প্রমাণ বলিয়া অনুমান হয়।

মহেন্দ্রের রাজত্ব সময়ে বাঙ্গালা দেশে বহুবিধ দুর্ঘটনা হেতু দেশ প্রায় অরাজক হইয়াছিল। উড়িষ্যার পাঠান কর্তৃক রাঢ় অঞ্চল বারংবার লুণ্ঠিত হয়। মগ ও পর্টুগিজেরা সন্দীপ দ্বীপে আড্ডা করিয়া পূর্ব্ব-দক্ষিণ বাঙ্গালা লুঠ করিয়া উৎসন্ন করিয়াছিল। চন্দ্রদ্বীপের রাজাদের রাজ্য বাঙ্গালা দেশের মধ্যে অতীব সমৃদ্ধিশালী ছিল। পর্টুগিজদিগকে তৎকালে হাব্‌রী বলিত। সন্দীপস্থিত হাব্‌রীদের দৌরাত্মে সেই চন্দ্রদ্বীপের সোণার রাজত্ব ছারখার হইয়াছিল। চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশীয়েরা পলায়ন করিয়া মাধবপাশা গ্রামে গিয়া বাস করিয়াছিলেন। তদবধি তাঁহাদের রাজত্ব শেষ হইয়াছে। তদ্বংশীয়েরা এখনও দরিদ্র ভাবে মাধবপাশা গ্রামে বাস করিতেছেন। রাণী দুর্গার দীঘী, রাণী কমলার দীঘী এবং একটি ভগ্ন শিব মন্দির ভিন্ন চন্দ্রদ্বীপের পূর্ব্ব সমৃদ্ধির আর কোন চিহ্ন এখন নাই। কোচবেহারের মহারাজ নরনারায়ণ অতিশয় প্রবল হইয়া উঠিয়াছিলেন। ভোটানের দেবরাজ ও ধর্ম্মরাজ কোচ্‌রাজার অধীনতা স্বীকার করিয়া অনুকর দিতেন। আসাম এবং উত্তর বঙ্গ তাঁহার অধীন ও আয়ত্ত হইয়াছিল। পূর্ণিয়া জেলার উত্তর ভাগ, জেলা দিনাজপুর এবং বগুড়া কোচদিগের লুণ্ঠনে শ্রীভ্রষ্ট হইয়াছিল। বাঙ্গালার শুবেদার খানেজাদ খাঁ তাঁহার শাসিত সমস্ত বাঙ্গালা হইতে সম্রাটকে ২২০০০০০ বাইশ লক্ষ টাকার বেশী মাশুলাদি দিতে পারিতেন না। কিন্তু এই সময়ে সাঁতোড় ও ভাদুড়িয়ার বিশেষ কোন অনিষ্ট হয় নাই।

মোগল সম্রাটদের মধ্যে জাহাঁগীরের ন্যায় কাপুরুষ আর কেহই হয় নাই। জাহাঁগীর অত্যাচারী বা নিতান্ত নির্ব্বোধ ছিলেন না। কিন্তু তাঁহার আলস্য ও বিলাসিতা হেতু সাম্রাজ্য বহু দুঃখে পতিত হইয়াছিল। তাঁহার রাজত্বের প্রথমাংশে রাজা মানসিংহ, সেনাপতি মহাবৎ খাঁ এবং বাদশাজাদা শাহজাহানের বিক্রমে সাম্রাজ্য বেশ চলিয়াছিল। কিন্তু সেই সকল বীরের সহ ক্রমে ক্রমে সম্রাটের মনান্তর হওয়াতেই শাসন রজ্জু শিথিল হইল এবং সাম্রাজ্যের রাশি

রাশি অমঙ্গল উপচিত হইয়াছিল।

জাহাঁগীরের আমলে তাঁহার অবৈধ পত্নী নুরজাহান বেগম বুটাদার চেলী, এবং কেতকী ফুলের আতর প্রথম প্রস্তুত করাইয়াছিলেন।

আফগানিস্তানের প্রচলিত পুখ্ত ভাষায় 'মালিক' শব্দের অপভ্রংশে 'মল্লিক' বলে। পাঠান রাজত্বকালে যে সকল রাজপুরুষ জমিদারী বা জাগীর পাইত তাহাদের "মল্লিক" উপাধি হইত। তৎকালে ইহা অতি সম্ভ্রান্ত উপাধি ছিল। পরে কয়েক জন জোলা সঙ্গতিপন্ন হইয়া জাহাঁগীর বাদশাহের নিকট মল্লিক উপাধি প্রার্থনা করিল। যদিও সম্রাট সেই প্রার্থনা গ্রাহ্য করেন নাই তথাপি সেই অবধি মল্লিক উপাধি উপহাসের বাক্য হইল। তজ্জন্য যতদূর পর্য্যন্ত হিন্দীভাষা প্রচলিত ছিল সেই সমস্ত স্থানের লোকেরা মল্লিক উপাধি ত্যাগ করিল। এই কারণে এখন বাঙ্গালা দেশে, দাক্ষিণাত্যে ও আফগানিস্তানে মল্লিক উপাধি দেখা যায় কিন্তু মধ্যবর্ত্তী স্থানে মল্লিক উপাধি নাই। বাঙ্গালা দেশে অনেক ব্রাহ্মণ এখন মল্লিক উপাধি স্থানে মৌলিক শব্দ লেখেন। তাহা অসঙ্গত কেন না মল্লিক শব্দ সংস্কৃত মূলক নহে। যেমন "মেহতর" এবং "প্রামাণিক" শব্দ অতি সম্ভ্রান্ত উপাধি ছিল। পরে হাড়ীদিগকে মেহতর এবং নাপিতদিগকে পরামাণিক বলিতে বলিতে এখন ঐ দুইটি উপাধি অপমান জনক হইয়াছে সেইরূপ হিন্দুস্থানে মল্লিক শব্দ অপমানকর হইয়া উঠিয়াছে।

এ পর্য্যন্ত আধুলি, সিকি, দুআনি বা পয়সা ছিল না। টাকা ভাঙ্গাইলে এক বোঝা কড়ি পাওয়া যাইত। তাহা দ্বারাই ক্রয় বিক্রয় চলিত। নুরজাহান বেগম সেই অসুবিধা দূরীকরণ জন্য সর্ব্ব প্রথমে তামার পয়সা প্রচলিত করেন। সেই তামার পয়সায় কিছুই লেখা থাকিত না; তাহাদের আকৃতি এবং ওজনও ঠিক সমান হইত না। সেই তাম্রখণ্ডগুলিকে ঢেপুয়া বা ঢেপুলি বলিত। একটাকা ভাঙ্গাইলে ষোল গণ্ডা ঢেপুয়া পাওয়া যাইত। আবার এক ঢেপুয়া ভাঙ্গাইলে বিশ গণ্ডা কড়ী পাওয়া যাইত। টাকা রাজকীয় তত্ত্বাবধানে তৈয়ারী হইত। কিন্তু ঢেপুলি যে কেহ ইচ্ছা মত তৈয়ারী করিতে পারিত।

বাঙ্গালা দেশের ঢাকা, পাবনা ও শান্তিপুরের তুলার কাপড়, মুর্শিদাবাদ, মালদহ, রাজশাহী ও বগুড়ার রেশমী কাপড় অতি প্রাচীন কাল হইতেই প্রসিদ্ধ ছিল। মোগল রাজ্যারম্ভে তাহার সমাদর আরো বৃদ্ধি হইয়াছিল।

অধিকন্তু রঙ্গপুর জেলার বড়বাড়ীর তৈয়ারী হাড়ের জিনিস এবং শ্রীহট্টের পাটী এই সময়ে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। বাঙ্গালা দেশ হইতে এই সকল দ্রব্য প্রথমে দিল্লীতে প্রেরিত হইত। তথা হইতে কাবুলে, পারস্যে, তুরাণে, আরবে এবং অন্যান্য দেশে নীত হইয়া সুবর্ণ মূল্যে বিক্রীত হইত। বাঙ্গালা দেশের পাট, তামাক এবং নারিকেলও দিল্লীতে প্রেরিত হইয়া দিগ্‌দেশে রপ্তানি হইত। ঢাকাই সোণা রূপার অলঙ্কার, মুর্শিদাবাদের খাগড়াই কাঁসার জিনিস এবং বাঙ্গালা দেশের গব্য ঘৃত মোগল সম্রাটদের অতি প্রিয় দ্রব্য ছিল।

ন্যায়শাস্ত্রের চর্চ্চায় বাঙ্গালাদেশের ও মিথিলার পণ্ডিতেরা বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। তজ্জন্য "হুজ্যাতে বাঙ্গালা" অর্থাৎ তর্ক বিতর্কে বাঙ্গালা দেশের পণ্ডিতদিগের সর্ব্বত্র সুখ্যাতি হইয়াছিল। পুরাণ এবং তন্ত্র শাস্ত্রেও বাঙ্গালীর প্রাধান্য হইয়াছিল। পক্ষান্তরে বেদ উপনিষদের চর্চ্চা বাঙ্গালাদেশে লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল।

অতি অল্প পরিমাণে লোক লেখা পড়া শিখিত। তাহাদের মধ্যেও বেশী বিদ্যা অতি কম লোকে শিখিত। কিন্তু তখনকার লোকে যাহা শিখিত তাহা সমস্তই তাহাদের ভাবী জীবনের প্রয়োজনীয় বিষয়। (আধুনিক বিদ্যালয় সমূহে যেমন অপ্রয়োজনীয় বিষয় পড়াইয়া বালকদের মস্তিষ্ক অনর্থক ক্ষয় করা হয় পূর্ব্বে তাদৃশ রীতি একবারেই ছিল না। তজ্জন্য তখনকার লোক অপেক্ষাকৃত সবল এবং প্রফুল্লচিত্ত ছিল। তখন সর্ব্বদা দস্যুভয় থাকায় প্রায় সকল লোকেই নিজ ঘরে অস্ত্র শস্ত্র রাখিত এবং অস্ত্র চালনা কিছু কিছু জানিত। শাহজাহান সুশাসন বিষয়ে অদ্বিতীয় সম্রাট ছিলেন। মহেন্দ্রের রাজত্বের শেষভাগে শাহ-জাহান দিল্লীর সম্রাট হইয়া সমস্ত সাম্রাজ্য সুশাসিত করিয়াছিলেন। প্রকাশ্য সড়কে দস্যুভয় একবারেই ছিল না। সমস্ত বহিঃস্থ ও অন্তঃস্থ শত্রু দমন হওয়ায় প্রজাগণের প্রচুর সমৃদ্ধি হইয়াছিল।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

রাজা উপেন্দ্রনারায়ণ খাঁ।

উপেন্দ্র সাতাশ বৎসর বয়সে নির্ব্বিবাদে রাজগদী প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার বাল্যকালীন উগ্র স্বভাব স্মরণ করিয়া অনেকে তাঁহাকে ভয় করিতে লাগিলেন। যে সকল কর্ম্মচারী প্রতাপবাজুর যুদ্ধকালে তাঁহার বিপক্ষ ছিল তাঁহারা কেহ স্থানান্তর যাইতে চেষ্টা করিলেন অন্য কেহ বা লুক্কায়িত থাকিলেন। উপেন্দ্র তাঁহাদিগকে মিষ্টভাবে আহ্বান করিলেন এবং স্ব স্ব পদে স্থায়ী রাখিলেন। মহেন্দ্রের পত্নীদিগকে তিনি জননীর ন্যায় সম্মান করিতেন এবং তাঁহাদের অনুমতি না লইয়া কোন বৃহদ্ব্যাপারে লিপ্ত হইতেন না। তিনি অল্পকাল মধ্যেই সুবিচার ও সদ্ব্যবহারে মহেন্দ্র অপেক্ষাও সুখ্যাতি লাভ করিলেন। মহেন্দ্র অপেক্ষা উপেন্দ্র বিদ্বান্ হইয়াছিলেন; আবার নানা অবস্থায় নানা স্থানে গিয়া অল্প বয়সেই অভিজ্ঞ হইয়াছিলেন। বাল্যকালে তাঁহার যেমন অনেক দোষ ছিল তেমনই অনেক গুণও ছিল। নানা অবস্থায় পড়িয়া এবং সুশিক্ষা লাভ করিয়া তাঁহার সেই সকল দোষ তিরোহিত হইয়াছিল এবং সদ্গুণ সমূহ সমধিক উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। তিনি বাদশাহের চাকরী করিয়া প্রচুর অর্থ লইয়া দেশে আসিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট যে যাহা প্রার্থনা করিত তিনি তন্মধ্যে নির্দ্দোষ প্রার্থনা প্রায় সমস্তই পূরণ করিতেন। ধনবান লোকের সহজেই সুখ্যাতি হয়। উপেন্দ্র যেমন ধনবান তেমনই গুণবান ছিলেন। সুতরাং অল্পকাল মধ্যেই তাঁহার যশোরাশি সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইল।

উপেন্দ্রের দেশে রওনা হইবার সংবাদ পাইয়াই মহেন্দ্র তাঁহার বিবাহের জন্য সুপাত্রী অনুসন্ধান করিয়া, পরগণা সোণাবাজুর রাজা কাশীশ্বর রায়ের কন্যা সৌদামিনী দেবীর সহ সম্বন্ধ ধার্য্য করিয়াছিলেন। উপেন্দ্র রাজা হওয়ার পর সেই বিবাহ সম্পন্ন করিলেন। তাহার পর নানা স্থান হইতে তাঁহার বিবাহের প্রস্তাব আসিতে লাগিল। তৎকালে সঙ্গতিপন্ন লোকের পক্ষে বহুবিবাহ করা এবং উপপত্নী রাখা সর্ব্বত্র প্রচলিত রীতি ছিল। এখানে

আমার প্রতি হুজুরালীর যে অনুগ্রহ পূর্ব্বাপর ছিল তাহা স্থির রাখিবেন এবং আমার পৈত্রিক পদে আমাকে বহাল রাখিয়া সনন্দ প্রদান করিবেন।” তিনি বাঙ্গালার শুবেদারকেও কিছু উপঢৌকন পাঠাইয়া অনুগ্রহ প্রার্থনা করিলেন। সম্রাট শাহজাহান তাঁহাকে একটাকিয়ার রাজা বলিয়া সনন্দ ও খেলাত পাঠাইয়া দিলেন। দেওয়ান মতোড়রল্ল চাকলে ভাতুড়িয়ার উপর যে বার্ষিক দশ হাজার টাকা নর্মা ধার্য্য করিয়াছিলেন সম্রাট তাহা মাফ দিলেন, এবং তাঁহাকে “পাঁচহাজারী মন্‌সবদার” উপাধি দিয়া সম্মান বৃদ্ধি করিলেন। তখন ঢাকাতে বাঙ্গালার রাজধানী ছিল। বাদশাহী সনন্দ ঢাকাতে শুবেদারের নিকট পৌছিলে তিনি তাহা সাতগড়ায় পাঠাইয়া দিলেন এবং বন্ধু ভাবে চিঠি লিখিয়া উপেন্দ্রকে সম্মানিত ও আপ্যায়িত করিলেন।

উপেন্দ্র অতি সবিচারে ও সদাচারে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। সম্রাট শাহজাহান রাজ্যশাসন বিষয়ে আদর্শ নৃপতি ছিলেন। তিনি প্রবল প্রতাপে সমস্ত বহিঃস্থ শত্রু দমন করিয়া সম্রাজ্য নিরাপদ করিয়াছিলেন এবং অভ্যন্তরে শান্তি রক্ষার সুবিধান করিয়া দস্যু তস্করাদি দমন করিয়াছিলেন। তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র সুজা বাঙ্গালা বেহার ও উড়িষ্যার শুবেদার নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার সুশাসন ও সদ্ব্যবহারে সমস্ত প্রজা ভৃত্যগণ ধন্যবাদ করিত। উপেন্দ্র প্রতিবর্ষে এক একবার তাঁহার সহ সাক্ষাৎ করিতেন। সুজা ঢাকা হইতে রাজধানী রাজমহলে সরাইয়া ছিলেন। [খৃঃ ১৬৩৯]

উপেন্দ্রের রাজত্বের নবমবর্ষে তাঁহার একটি কন্যা হইল। তাহার নাম সর্ব্বমঙ্গলা রাখা হইল। সেই সময়ে প্রচণ্ড খাঁ দীর্ঘ প্রবাসের পর দেশে আসিলেন। তাহাতে একটি সামাজিক বিপ্লব উপস্থিত হইল। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে প্রচণ্ড খাঁ শাহজাহানের সঙ্গে সঙ্গে পলায়ন করিয়াছিলেন। শাহজাহানের দুরবস্থা কালে প্রচণ্ড প্রাণপণে তাঁহার উপকারার্থ চেষ্টা করিতেন। তজ্জন্য তিনি তাঁহার অতিমাত্র প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। শাহজাহান সম্রাট হইলে প্রচণ্ড রোহিলখণ্ডের শুবেদার নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সেই স্থানে প্রচণ্ড খাঁ গঙ্গাপ্রসাদ তেওয়ারী নামক এক কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণের কন্যা পার্ব্বতী দেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। সেই পত্নীর গর্ভজাত সন্তানাদি লইয়া পত্নী সহ প্রচণ্ড খাঁ সাতগড়ায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে সমাজে গ্রহণ করিতে

নানারূপ আপত্তি হইতে লাগিল। সাতগড়ার এবং বরেন্দ্রভূমির পণ্ডিতেরা বিধান দিলেন যে, "কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণের কন্যা বিবাহ করা ধর্ম্ম বিরুদ্ধ নহে কিন্তু সামাজিক রীতি বিরুদ্ধ এবং বল্লালী কুলশাস্ত্র বিরুদ্ধ। প্রচণ্ড খাঁকে সপরিবারে সমাজে গ্রহণ করা যায় না। তিনি অনুনয় করিলে একাকী সমাজে গৃহীত হইতে পারেন।" প্রচণ্ড কাহার নিকট নত হইবার লোক নহেন। সুতরাং তিনি বরেন্দ্রভূমিতে সমাজে উঠিতে পারিলেন না। তিনি অর্থব্যয়ে নবদ্বীপের পণ্ডিত ও কুলজ্ঞদিগকে বশীভূত করিলেন। তাঁহারা বিধান দিলেন যে, "কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণের কন্যা বিবাহ করিলে রাঢ়ী ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগের কোন পাতিত্য বা দোষ হয় না। এরূপ বিবাহ ঘটিবার সুযোগ না থাকায় এরূপ বিবাহ হয় না। তজ্জন্য এই কার্য্য সামাজিক রীতি বিরুদ্ধ বলা যায় না। কান্যকুব্জে বল্লালী কৌলীন্য প্রথা প্রচলিত নাই। সুতরাং তাহাদের সহ বিবাহ আদান প্রদানে বঙ্গীয় কুল মর্য্যাদার হ্রাস বৃদ্ধি হইতে পারে না।" নবদ্বীপের পণ্ডিতদিগের সিদ্ধান্ত পদ্মার দক্ষিণ পারে যেরূপ মান্য হইত পদ্মার বাম পারে তদ্রূপ মান্য হইত না। প্রচণ্ড পদ্মার দক্ষিণ পারে গিয়া মেহের-পুরে বাড়ী করিলেন। সে দিকে তিনি সর্ব্বতোভাবে সমাজে গৃহীত হইলেন। যে সকল কুলীন তাঁহার সহ সমন্বয় করিলেন তাঁহারা "রোহিলা পঠীর কুলীন" নামে খ্যাত। এই পঠীর কুলীন পদ্মার দক্ষিণ পারেই বেশী; পদ্মার বাম পারে রোহিলা পঠীর কুলীন ছিল না; এখন কতক হইয়াছে। প্রচণ্ড খাঁ দারার পক্ষ হওয়ায় শাহজাদা সুজা তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি নিঃসাৎ করিয়াছিলেন। প্রচণ্ড খাঁ নিজেও ঔরংজীব সহ যুদ্ধে হত হইয়াছিলেন। তাঁহার বংশ এখন নাই। কিন্তু রোহিলা পঠীর কুলীন ও শ্রোত্রিয় এখনও বিদ্যমান আছে। বাদশাজাদাদিগের বিবাদে উপেন্দ্র কোন পক্ষ না হওয়ায় তাঁহার কোন ক্ষতি বৃদ্ধি হয় নাই। ইহা মহেন্দ্রের অন্তিম উপদেশের সুফল।

উপেন্দ্রের রাজত্ব একুশ বৎসর অতিক্রম করিল। এই সময় মধ্যে উপেন্দ্রের জননী এবং মহেন্দ্রের দুই পত্নী গতাসু হইলেন। উপেন্দ্রের এক কন্যা ভিন্ন অন্য কোন সন্তান হয় নাই। উপেন্দ্র তাহাকে তৎকালপ্রচলিত বাঙ্গালা ভাষা শিখাইয়াছিলেন। রাণী সৌদামিনী সেই কন্যাকেই ভাতুড়ী রাজ্যের উত্তরাধিকারিণী করিতে ইচ্ছুক ছিলেন। উপেন্দ্রের সেই মতে সম্মতি ছিল। মহেন্দ্রের অবশিষ্ট পত্নী রাণী

পবিত্রা আন্তরিক তদ্রূপ ইচ্ছা করিতেন না অথচ কোন প্রতিবাদও করিতেন না। রাজপুরোহিত বাচস্পতি ঠাকুর এই মতের একান্ত বিরোধী ছিলেন। অন্যান্য লোকে স্পষ্ট কোন মতামত প্রকাশ করিত না। সর্ব্বমঙ্গলার বয়স এগার বৎসর উত্তীর্ণ হইল। তাহার বিবাহের জন্য ঘটক ও পুরোহিত লইয়া পরামর্শ চলিতে লাগিল কিন্তু উপেন্দ্রের মনোমত পাত্র কুত্রাপি যুটিল না। রাণীর ইচ্ছা ঘর-জামাই রাখা হয়। রাজার ইচ্ছা পাত্র সুযোগ্য লোক হয় যে ভবিষ্যতে ভাদুড়ী রাজ্য শাসন করিতে পারে। যে পাত্র ঘর-জামাই থাকিতে পারে সে গুণহীন; আর যে গুণবান, সে পাত্র ঘরজামাই থাকিতে সম্মত নয়। কাজেই দীর্ঘকাল ব্যাপী চেষ্টাতেও কোন ফল হইল না। কন্যার দেহে যৌবনের প্রথম লক্ষণ আরম্ভ দেখিয়া রাণী পাত্র নিরূপণের চেষ্টা ও পরামর্শের চূড়ান্ত করিতে অনুরোধ করিলেন। পরদিন শেষ সিদ্ধান্ত করা ধার্য্য হইল।

পরদিন প্রত্যুষেই উপেন্দ্র নিজ পুরোহিত রামধন বাচস্পতিকে ও নিজ কুলজ্ঞ যদুপতি মুকুটমণিকে ডাকাইয়া আনিলেন। নিজেও প্রাতকৃত্য সমাপন করিয়া দরবারী পোষাক পরিধান করিয়া বৈঠকখানায় বসিলেন। উপেন্দ্রের বৈঠকখানা ঠিক মোগলের রীতি অনুযায়ী ছিল। কেবল তাঁহার নহে, তৎকালীন সমুদায় আমীর লোকের বৈঠকখানাই ঐ ধরণের ছিল। হিন্দুরীতি ও ইরাণী রীতি মিশ্রিত করিয়া বৈঠকখানার সজ্জা করিত। রাজ ব্যবহার অনুকরণ করা বড় মানুষের একান্ত অভিলষিত এবং কতক প্রয়োজনীয়ও বটে। তজ্জন্য সমস্ত হিন্দু মুসলমান বড়মানুষেরা সেই মোগলাই বৈঠকখানা অনুকরণ করিয়াছিল। বিশেষ এই যে, মুসলমানের বৈঠকখানা প্রায়ই পশ্চিমমুখী, কদাচিত দক্ষিণমুখী, কিন্তু হিন্দু বড়মানুষের বৈঠকখানা প্রায়শঃ পূর্ব্বমুখী, কখন বা দক্ষিণমুখী। উপেন্দ্রের বৈঠকখানা দক্ষিণমুখী। দক্ষিণমুখী বৈঠকখানা হিন্দু মুসলমান উভয়েরই থাকিত সুতরাং উপেন্দ্রের বৈঠকখানা দেখিয়া সহজে হিন্দুর কি মুসলমানের তাহা অপরিচিত লোকে টের পাইত না। বৈঠকখানার মধ্যস্থলে পশ্চাতের দেউলে লাগা এক তক্তপোষে গদীর উপর আসন পাতা রাজার নিজ আসন। তাহার পশ্চাতে তাকিয়া, দুই পাশে পাশ বালীস। আসনের সম্মুখে এক হাত-বাক্স, দোয়াত, কলমদান ও সহী মোহর। তাহার

দক্ষিণ দিকে এক খানা শতরঞ্চ ও চাদর পাড়া তক্তপোষ, কয়েকটা মোড়া ও জলচৌকী। একখানা জলচৌকীতে কুরসী হুঁকা, পানদান ও পিকদান। অন্য জলচৌকী, তক্তপোষ ও মোড়াতে সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের বসিবার স্থান। রাজার বাম দিকে মেজের উপর চাটাই পাড়া। তাহার উপর শতরঞ্চ ও চাদর পাড়া মুন্‌সীখানা। তাহাতে আমলারা বসিয়া লেখা পড়া করিত। মুন্‌সীখানার দক্ষিণদিকে রাজার বামপার্শ্বে গদী চাদর ও তাকিয়া সংযুক্ত একটি আসন দেওয়ানের জন্য থাকিত। সাধারণ লোক বসিবার জন্য মুন্‌সীখানার সম্মুখে কয়েকটা শপ থাকিত। ইহাই সদর বৈঠকখানা। মোগাল সম্রাটদের যেমন দরবার আম্ ও দরবার খাস্ নামে দুই বৈঠকখানা ছিল, তৎকালীন আমীরদেরও তদ্রূপ দুই দরবার ছিল। আমীরদের গুপ্ত পরামর্শাদি জন্য ক্ষুদ্র দরবারকে বালাখানা বলিত। তথায় সর্ব্বসাধারণের গতিবিধি হইত না। তথায় বাদশাহী খাস দরবারের ন্যায় আমীরদের প্রধান প্রধান কার্য্যকারক এবং নিকট আত্মীয় মাত্র যাইত। বিশেষ কারণে বিশেষ অনু-মতি লইয়া অন্য লোক যাইতে পারিত। সদর বৈঠকখানায় রীতিমত পোষাক পরিয়া যাইতে হইত। বালাখানায় কোন পোষাকের বাঁধাবাঁধি ছিল না।

উপেন্দ্রের বালাখানায় সেদিন সকালে সর্ব্বমঙ্গলার বিবাহের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করিবার জন্য সভা হইল। সে সভাতে লোকের আধিক্য নাই। উপেন্দ্র স্বয়ং, তাঁহার শ্যালক রাজা মহেশ্বর রায়, দেওয়ান গোপীনাথ বাগচি, পুরোহিত রামধন বাচস্পতি ঠাকুর, ঘটক যদুপতি মুকুটমণি এবং গোপাল এই ছয় জন মাত্র সভাসীন। উপেন্দ্র বলিলেন, "আমি চাই যে পাত্রটি দেখ্‌তে সুন্দর হয়, চরিত্র ভাল হয়, বিদ্যা বুদ্ধি থাকে, যে ভবিষ্যতে আমার এই রাজত্ব শাসন সংরক্ষণ কর্‌তে পারে, আর কোন গুরুতর রোগ না থাকে; আমার এবং মেয়ের বাধ্য হয়ে চলে। ঘর-জামাই হয়ে আমার পুত্রের স্থলাভিষিক্ত হয়ে থাকে এই আমার মৎলব। আমার যখন পুত্র নাই, আমার সম্পত্তিই কন্যা ও জামাতাকে দিব, তখন জামাতার নিজ সম্পত্তি দেখিবার প্রয়োজন নাই। আর কুলমর্য্যাদা দেখিবারও প্রয়োজন নাই।" বাচস্পতি ঠাকুর কহিলেন, "এমন পাত্র পাওয়া যায় নাই এবং যাবে ইহাও সম্ভব নয়। ঘর-জামাই অর্থ অন্নদাস। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের ছেলে সেরূপ ঘর-জামাই হয়ে কদাচ

থাকিতে পারে না। তবে নিতান্ত মূর্খ বোকা হলেও বা কতক সম্ভব। যে ছেলেটি দেখ্‌তে সুন্দর, বিদ্যা বুদ্ধি আছে, সে কি কখন ঘরজামাই হয়ে থাক্‌বে? তার বাপ মায়েই বা দিবে কেন এবং সেই বা থাক্‌বে কেন? যদি প্রথমে স্বীকার করে, তবু শেষে চলে গেলে তুমি রাখ্‌তে পার্‌বে না। যদি বল আটক করে রাখ্‌ব; তাতে কি জামাই তোমার কন্যার বাধ্য হবে? তাহবে না, কন্যারও কোন সুখ হবে না। সেই জন্য বলি সুপাত্র দেখে কন্যা দান কর বরং কিছু জমিদারী জাগীর দাও। কন্যা মহাসুখে থাক্‌বে; নিজে দত্তক পুত্র রাখ, রাজত্ব তাকে দেও, পূর্ব্বপুরুষের নাম থাক্‌বে। কন্যাকে রাজত্ব দিলে তো তোমার পূর্ব্বপুরুষের নাম থাক্‌বে না।"

উপেন্দ্র কহিলেন, "শাস্ত্রে পুত্রিকা পুত্র রাখা বিধান আছে। ঔরস পুত্র অগ্রগণ্য। একবারে নিঃসম্পর্কীয় পরের ছেলে রাখা অপেক্ষা নিজ কন্যাকে পুত্রিকা রূপে রাখিয়া তৎপুত্রকে পৌত্ররূপে রাখিলে যে সর্ব্বথা ভাল হয় ইহা শাস্ত্র ও যুক্তি দ্বারা প্রামাণ্য। সুতরাং আমি তদ্রূপেই বংশরক্ষা কর্‌তে চাই। তাতে দোষ কি?"

উপেন্দ্রের দেওয়ান বাগছি সাহেব তাঁহার মতের পোষকতা করিলেন। এখানে বলা আবশ্যক যে ৬০, ৭০ বৎসর পূর্ব্বে সম্ভ্রান্ত হিন্দুদিগের "বাবু" উপাধি প্রচলিত ছিল না। হিন্দুজমিদার ও উচ্চ রাজকর্ম্মচারী যাঁহারা রাজা, মহারাজা উপাধির যোগ্য ছিলেন না, তাঁহাদিগকে সম্ভ্রমার্থ 'সাহেব' বলা যাইত। সাহেব শব্দ অতি উচ্চ সম্ভ্রমার্থক ছিল। সম্রাট ভিন্ন সমস্ত উচ্চ সম্ভ্রান্তদিগের নামেই সাহেব উপাধি যোগ হইত।

হিন্দুর মধ্যে কায়স্থ অপেক্ষা নিম্নতর জাতীয় লোক যত কেন সঙ্গতিপন্ন হউক, তাহাদিগকে সাহেব বলার রীতি ছিল না। কিন্তু কোচবেহারের রাজকুমারদিগকে সাহেব বলা যাইত এবং এখন পর্য্যন্ত বলা হয়। আবার যাজন ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ যাবনিক সাহেব উপাধি পছন্দ করিতেন না, সেই জন্য তাঁহাদিগকে সাহেব বলা হইত না। তাঁহাদিগকে ঠাকুর বলাই রীতি ছিল। সমস্ত ব্রাহ্মণকেই ঠাকুর বলা যাইত, কিন্তু রাজা মহারাজা নবাব, শুবেদার, উজির প্রভৃতি বৈষয়িক অত্যুচ্চ পদবীর ব্রাহ্মণেরা "ঠাকুর" উপাধি পছন্দ করিতেন না, তজ্জন্য তাঁহাদিগকে ঠাকুর বলা হইত

না। "মহাশয়" উপাধিও প্রচলিত ছিল, তাহাও "বাবু" উপাধির প্রতিশব্দ নহে। ইহা ভিন্ন পূর্ব্বে বাঙ্গালা দেশে "জী" উপাধিও প্রচলিত ছিল। এখন বাঙ্গালার এই জী উপাধি প্রায় অপ্রচলিত। উত্তর পশ্চিমে ও দক্ষিণাত্যে এখনও জী উপাধি খুব প্রচলিত। কিন্তু তাহাও বাবু উপাধির ঠিক সমান নহে। সংক্ষেপতঃ বাবু শব্দের ঠিক সমান কোন উপাধি পূর্ব্বে ছিল না। দেওয়ানজীর পোষকতায় বাচস্পতি ঠাকুর ক্রুদ্ধ হইয়া ঘোরতর আপত্তি করিলেন। ক্রমে উভয়ের মধ্যে গালাগালি হইতে মারামারির উপক্রম হইল, বৃদ্ধ গোপাল দৌড়িয়া মধ্যস্থলে দাঁড়াইলেন। উপেন্দ্র, মহেশ্বর ও মুকুটমণি ধরিয়া উভয়কে কতক শান্ত করিলেন। বাচস্পতি ঠাকুরকে স্নান আহ্নিকের জন্য অনুরোধ করিয়া স্থানান্তরিত করা হইল। পুনরায় পরামর্শ চলিতে লাগিল। গোপাল এখন বৃদ্ধ। কাজ কর্ম্ম চালাইতে অক্ষম হেতু চাকরী ত্যাগ করিয়াছিলেন। হিন্দু মুসলমান রাজারা পেন্‌শন দিবেন না কিন্তু তাঁহাদের চাকরী মৌরসী ছিল। কোন কর্ম্মচারী অতি বৃদ্ধ বা লোকান্তর হইলে তাহার দায়াদগণ সেই কর্ম্ম পাইত অথবা তাহার যোগ্যতানুসারে কিছু ছোট বা বড় কর্ম্ম পাইত। সুতরাং পেনশন অপেক্ষাও বেশী উপকার হইত। গোপাল বার্দ্ধক্য হেতু কর্ম্মত্যাগ করিবার সময়েই নিজ পুত্র গোকুলকে নিজের কর্ম্মে সনন্দ লইয়া দিয়াছিলেন। গোপাল এখন চাকরী না করিলেও মধ্যে মধ্যে রাজবাড়ীতে আসিতেন। গোপাল উপেন্দ্রের পুরুষানুক্রমিক ভৃত্য, তাঁহার সর্ব্বাবস্থার সঙ্গী এবং অতিমাত্র বিশ্বাসপাত্র ছিলেন। উপেন্দ্র গোপালের সহ পরামর্শ না করিয়া কোনও গুরুতর কার্য্য করিতেন না। গোপাল বাচস্পতি মহাশয়ের ও দেওয়ানজীর বিবাদের মর্ম্ম শুনিয়া কহিলেন, "আমার বিবেচনায় বাচস্পতি ঠাকুরের কথাই বিশুদ্ধ। ঘর-জামাই রাখিতে হইলে ভাল পাত্র পাওয়া যাইবে না। আর কন্যাকে রাজত্ব দিলে একটাকিয়া রাজবংশ নাম লোপ হইবে। পুত্রিকা পুত্র কলিকালে অসিদ্ধ। এই সকল আলোচনা করিয়া আমার বোধ হয় যে কন্যাকে কিছু জমিদারী জাগীর দিয়া ভাল পাত্রে বিবাহ দেন। আর কিছু দিন দেখিয়া, যদি পুত্র না হয় তবে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। কন্যা সত্ত্বে দত্তক লওয়া চিরকাল প্রচলিত প্রথা। আমার বিবেচনায় সেই প্রথা অনুসরণ করাই ঠিক।"

উপেন্দ্র সকলের মতামত শুনিয়া রাজা মহেশ্বর রায়কে তাঁহার মত জিজ্ঞাসা করিলেন। মহেশ্বর কিঞ্চিৎ গম্ভীর ভাবে কহিলেন, "যখন ভাল পাত্র ঘরজামাই পাওয়া যায় না তখন সুপাত্র দেখিয়া কন্যার বিবাহ দেও। কন্যা ও জামাতাকে ভরণপোষণ যোগ্য কিছু জমিদারী দেও। তাহা হইলে সর্ব্ব বিষয়ে ভাল পাত্র মিলিবে। তাহার পর জামাতাকে নিজ বাড়ীতে আনিয়া রাজকার্য্য শিক্ষা দেও, ক্রমে ক্রমে কাজের ভার দেও। ইহাতে ঘর-জামাই নাম না করিয়াও জামাই ঘরে রাখিতে পারিবে, আর তাহার চরিত্র এবং যোগ্যতা বোঝা হইবে। তার পর যদি তোমার পুত্র না হয় তবে বিবেচনাপূর্ব্বক কন্যা ও জামাতাকে রাজত্ব দিও অথবা দত্তক রাখিও। এখন দত্তক রাখা ও উচিত নয়। কন্যাকে রাজত্ব দেওয়াও উচিত নয়। কেন না এখনও তোমার পুত্র হওয়া অসম্ভব নহে। আর ঘর-জামাই রাখাতো গাধা পোষা কাজ; আমার মতে নিতান্তই অকর্ত্তব্য।"

রাজা মহেশ্বর চতুরতার সহিত নিজ মত এমন ভাবে প্রকাশ করিলেন যে তাহাতে কাহারই মত খণ্ডন করা হইল না। সুতরাং সকলেই তাঁহার মতে সম্মত হইল। সেই ভাবে শীঘ্র কার্য্য ধার্য্য করিতে সর্ব্ববাদী সম্মতরূপে স্থিরীকৃত হইল।

পুরোহিত আসিয়া উক্ত মতের পোষকতা করিলেন এবং তাঁহার কথায় উপেন্দ্র সম্মতি দিলেন। সুতরাং দেওয়ানজী আর কোন আপত্তি করিতে সাহস করিলেন না। পরদিন পাত্র দেখিতে যাত্রা করা স্থির হইল।

রাণী সৌদামিনী ঘরজামাই রাখাই স্থির সংকল্প করিয়াছিলেন। দেওয়ানজী রাণীর মাসতুতো ভগিনীপতি; তিনি রাণীর মতের পোষকতা করিতেন। খাঁ সাহেবের ইচ্ছাও তাঁহাদের মতানুযায়ী ছিল। সুতরাং তিনি পাত্র দেখিতে যাওয়া অর্থে ঘর-জামাই আনাই স্থির করিয়াছিলেন। যখন দেওয়ানজীর নিকট শুনিলেন যে ঘটক ও পুরোহিতের কথায় তাঁহার স্বামী ও ভ্রাতা সে মত পরিবর্ত্তন করিয়া কুলীন জামাই দেখিতে যাইতেছেন, তখন তিনি নিতান্ত ব্যগ্র ভাবে আপত্তি উত্থাপন করিয়া স্বামীর ও ভ্রাতার মত পরিবর্ত্তন করিতে চেষ্টিতা হইলেন। দেওয়ানজী তাঁহাকে প্রচুর উৎসাহ দিলেন। মহেন্দ্রের জীবিতা পত্নী রাণী পবিত্রা ও অন্যান্য স্ত্রীজনেরা রাণীর পক্ষ সমর্থন করিতে

কোমর বাঁধিলেন। ফলতঃ যেমন অভিজ্ঞ সেনানীরা এক যুদ্ধে পরাজিত হইয়া অমনি অন্যযুদ্ধের আয়োজন করে, দেওয়ানজীও তদ্রূপ বাহির দরবারে পরাস্ত হইয়া ভিতর দরবারে পুনর্যুদ্ধের প্রবলতর আয়োজন করিলেন।

সময়ের পরিবর্ত্তনে বাহির বাড়ীর অবস্থা যেমন পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল, বাড়ীর মধ্যের অবস্থা সেরূপ পরিবর্ত্তিত হয় নাই। উপেন্দ্রের বৈঠকখানা মোগলের দরবারের সদৃশ। উপেন্দ্রের উপাধি খাঁ। উপেন্দ্রের দরবারী পোষাক মোগলের তুল্য। তিনি যে ব্রাহ্মণ, তা চিনে উঠা ভার। কিন্তু উপেন্দ্রের বাড়ীর মধ্যের ভাব সম্পূর্ণ বিভিন্ন; প্রাচীন আর্য্য ব্যবহার বাড়ীর মধ্যে প্রায় অক্ষুণ্ণ আছে। উপেন্দ্রের খাঁ উপাধি হইয়াছে কিন্তু তাঁহার পত্নীর উপাধি খাতুন বা খানন হয় নাই, তাঁহার উপাধি "রাণী"। রাণীর পোষাক ধনবতী ব্রাহ্মণীর ন্যায়, মোগলানীর কোন সাজ তাঁহার নাই। বাড়ীর মধ্যে সমস্ত সাজ, সমস্ত কাজ ধনবান ব্রাহ্মণের বাড়ীর মত। অধিক কি বাড়ীর মধ্যে সে উপেন্দ্রও আর মোগল নহেন। উপেন্দ্র পূজা আহ্নিক সমাপন করিয়া আহার করিতে গেলেন। তাঁহার পরিধান গরদের ধুতী, উত্তরীয় গরদের নামাবলী, ললাটে চন্দনের ফোঁটা, কেশ শিখায় আবদ্ধ রক্তজবার ফুল। সবল উজ্জ্বল গৌরবর্ণ শরীর দেখিলে তেজস্পুঞ্জ মহর্ষি বলিয়া বোধ হয়। বাড়ীর মধ্যে তাঁহার উপাধি ও রাজা মহারাজ, খা সাহেব নহে। অবস্থা দৃষ্টে বোধ হয় যেন সনাতন ধর্ম্ম যবন ভয়ে অন্তঃপুরে লুক্কায়িত আছেন।

উপেন্দ্র গরদের ধুতী নামাবলী ছাড়িয়া সুতী কাপড় পরিলেন; গামছা স্কন্ধে ফেলিয়া আহার করিতে বসিলেন। তখন পাচকের হাতে খাওয়া ব্রাহ্মণের পক্ষে অতীব নিন্দনীয় ছিল। ব্রাহ্মণ রাজা মহারাজ হইলেও তাঁহার পত্নী, ভ্রাতৃবধূ, পুত্রবধূ, কন্যা, ভগিনী প্রভৃতিরাই তাঁহার জন্য পাক করিত এবং সমস্ত ব্রাহ্মণবর্গের জন্য পাক করিত এবং পরিবেশন করিত। দাস দাসীরাও ঠাকুর ঠাকুরাণীদের প্রসাদ পাইত। অন্যান্য চাকর ও উপরি লোক বেশী হইলে তাহারা সিধা পাইত, পৃথক পাক করিয়া খাইত। কখনও বা তাহাদের জন্য বাহির বাড়ীতে পাচকেরা পাক করিত। অপরিচিত বা ভিন্ন শ্রেণীর ব্রাহ্মণ অতিথি থাকিলে তাঁহার সমুচিত অভ্যর্থনার পর জিজ্ঞাসা হইত "দেবতার আহ্নিকের ও সেবার কি বিধান?" যিনি শিব পূজা কি বিষ্ণু পূজা করিবেন

তিনি তাহা প্রকাশ করিলে অমনি মণ্ডপঘরে তাঁহার পূজার আয়োজন হইত। যিনি পূজা করেন না এমন ব্রাহ্মণ খুব কম ছিল। তাদৃশী ব্রাহ্মণেরা সংক্ষেপে বলিতেন "জলে জলে"। আর আহার সম্বন্ধে যাঁহারা গৃহীর ঘরে খাইতে ইচ্ছুক তাঁহারা বলিতেন "মা লক্ষীরা যা দেন"। অমনি তাঁহাদের আহারের জন্য বাড়ীর মধ্যে খবর দেওয়া হইত। যাঁহারা ঘরে খাইবেন না তাঁহারা সংক্ষেপে বলিতেন "স্বপাক"। তাঁহাদের খাওয়ার এবং পাকের জন্য বাহির বাড়ীতে আয়োজন করিয়া দেওয়া হইত। বাড়ীর মধ্যে পাচকের সঞ্চার ছিল না। ভিতরে হউক বাহিরে হউক ব্রাহ্মণেরা কদাচ পাচকের হাতে খাইতেন না। গরীব বড় মানুষ সকল ঘরেই মেয়েরা যত্নপূর্ব্বক পাক করিতে শিখিত। ভাল পাক করা তখন সকল স্ত্রীলোকেরই গৌরবের কথা ছিল। বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের জন্য পাক করা, পূজার আয়োজন করা তখনকার ঠাকুরাণীরা বড়ই সৌভাগ্যের কথা মনে করিতেন। এখনকার বড় মানুষের বিলাতী ধরণের বৌ ঝি যেমন পাককরা অপমান বোধ করিয়া কার্পেটের জুতা বুনান সম্মান বোধ করে তখন তাহা ছিল না। তখন "জুতাওয়ালী" অপেক্ষা "অন্নপূর্ণা" উপাধির গৌরব ছিল।

উপেন্দ্র আহারে বসিলেন। রাণী সৌদামিনী স্বয়ং স্বামীর পরিবেশন করিতে লাগিলেন। অনতিদূরে একখানা পিড়ীর উপর মহেন্দ্রের বিধবাপত্নী রাণী পবিত্রা দেবী বসিয়া উপেন্দ্রের আহারের তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন। অন্তঃপুরিকাদের পক্ষে সাংসারিক কথাবার্ত্তার এই একটি প্রধান সময়। রাণী পবিত্রা সেই সুযোগে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ছোট্ ঠাকুর! সর্ব্বার নাকি ঘর-জামাই রাখ্‌বে না?" উপেন্দ্র, "আজ্ঞা না।" "কেন?" "ভাল পাত্র ঘর-জামাই পাওয়া যায় না, যার কুল আছে কি গুণ আছে বারেন্দ্র বামুনের সে ছেলে ঘর-জামাই থাক্‌বে না। আমার যে সর্ব্বা তার কি গাধা পাত্র শোভা পায়? রাজা মহেশ্বরের মত নাই, মুকুটমণি মহাশয়ের মত নাই, গোপালদার মত নাই আর বুড়ো বাচস্পতি ঠাকুর তো ঘর-জামাইর কথা শুনেই রাগে গালাগালি দিতে আরম্ভ করেন। আমি ভেবে চিন্তে ও সংকল্প ছেড়ে দামনাশের সান্যালদের মধ্যে কার্য্য করবো স্থির করেছি। দামনাশের কেশব সান্যালের ভ্রাতুষ্পুত্র নৃসিংহের সহিত সর্ব্বার বিবাহ দিব। ঘটক মুকুটমণি তাঁহাদের বেশ জানেন।"

পবিত্রা কহিলেন, "জ্ঞাতি কুটুম্বে তো তাই চায়। দামনাশের সান্যাল কুলপতির সন্তান এমন কুলীন তো আর নাই। কাজেই পরে বল্‌বে এই ঘরেই কার্য্যকরা উচিত। কিন্তু আমরা তা কেমন করে পারি। কুলীন পাত্র পাঁচটা বিয়ে করবে এক জনের বশ হয়ে অন্যকে দেখতে পারবে না। তখন কি হবে? তুমি যেমন এক বিয়ে করেই তুষ্ট থাক্‌লে আর বিয়ে কল্লে না, অন্য কুলীনের ঘরে তো আর তেমন নাই। নেহাৎ দুইটি বিয়ে না করে আমি এমন কুলীন কখন দেখিও নাই শুনিও নাই। বিশেষ কুলপতির বংশে তা হ'তেই পারে না। যত কুলীনের মেয়ের পাত্র যোগানই তাদের কাজ। তাদের এক একজন চারটি পাঁচটি কুলীনের মেয়ে বিয়ে করে। ইহা তাদের ইচ্ছায় অনিচ্ছায় কর্‌তেই হয়। কোন কুলীন এসে ধর্‌লে তার মেয়ে বাধ্য হয়েই বিয়ে করতে হয় নৈলে কুলপতির সে মানই থাকে না। যে কুলীনের পুত্র আছে, সেই কুলরক্ষার জন্য কি কুল মান বৃদ্ধির জন্য কুলপতি বংশে মেয়ে দেয়। তোমার এক কন্যা বই অন্য সন্তান নাই, কুলের বাছাবাছিতে কোন প্রয়োজন নাই। তুমি কেন অত বড় কুলীনের ঘরে যাবে? নিতান্ত ছোট ঘরে কার্য্য করতে আমার মত নাই। ভাল শ্রোত্রিয় কি কাপ কিম্বা ছোট কুলীনের মধ্যে দেখ্‌তে শুন্‌তে ভাল পাত্র দেখে বিয়ে দেও। সে পাত্র যদি ঘর জামাই না হয় তবু তাকে কিছু টাকা কড়ি দিয়ে বাধ্য রাখা যাবে।"

উপেন্দ্র। আপনি যা এখন বল্লেন তা আগেও বলেছেন, আপনার ছোট জায়ও অনেক বলেছে। অন্য অনেক লোকেও বলেছে এবং আমি নিজেও অনেক চিন্তা করেছি। আমরা মহাত্মা উদয়নাচার্য্যের বংশধর নিরাধিন পঠীর প্রধান কুলীন। কুলপতির বংশের মান আর আমাদের মান প্রায় তুল্য। আমার কন্যা যদি কোন ছোট ঘরে বিয়ে দেই আমার জ্ঞাতি কুটুম্বগণ হয়তো আমার কন্যার হাতে খাবে না। তখন আমাদের মনে কত কষ্ট হবে আর কন্যার মনে আরো বেশী কষ্ট হবে। আমার কন্যার পক্ষে কুলপতির সন্তান বই অন্য পাত্র কোন মতেই শোভা পায় না। যারা সুপাত্র তারা চিরকালই বহু বিবাহ করে তারপরেও কত উপপত্নী রাখে। সুতরাং সতীন থাকে সেও ভাল তবু সৎ বংশে সুপুরুষের হাতেই মেয়ে দেওয়া ভাল। অনেকেই বল্‌ছেন আমার এখনও পুত্র হওয়ার কাল যায় নাই। এখন কুল

ডুবায়ে পরে যদি পুত্র হয় তখন কত অপদস্থ হ'তে হবে। আর এক কথা বলি, শাহজাহান বাদশাহকে কয়েদ করে, ভাই ভাতিজাকে নষ্ট ক'রে এখন ঔরংজেব বাদশাহ হয়েছে। আমি দারা শেকোর পক্ষীয় লোক তা সে খুব জানে। আমার ধন প্রাণ রক্ষা হওয়া কঠিন। এ সময় কুল ডুবালে ভাল হবে না।"

রাণী পবিত্রা উপেন্দ্রকে অত্যন্ত অভিমানী ও উগ্রস্বভাব জানিতেন সুতরাং তাঁহার সুদীর্ঘ বক্তৃতায় প্রতিবাদ করিতে সাহস করিলেন না। তৎকালে কুলাভিমান সকলেরই খুব বেশী ছিল কুল ভাঙ্গিতে রাণীদেরও তত বেশী ইচ্ছা হইল না। সুতরাং রাণী পবিত্রা বলিলেন, "আমরা কুল ভঙ্গ করতে বলি না কেবল চাই যে আমাদের সর্ব্বা কষ্ট না পায়। তাই দেখে তোমার যেথানে ভাল হয় সেই খানে বিয়ে দাও। সে যেন দুঃখ না পায়।"

উপেন্দ্র তাঁহার কথায় অতিমাত্র তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "আপনি মাতৃতুল্য আপনার আজ্ঞা আমার শিরোধার্য্য। সর্ব্বা যাতে সর্ব্ব সুখে থাকে আমি সাধ্যমত তাই চেষ্টা করবো। তার পর কন্যার অদৃষ্ট আর ঈশ্বরের ইচ্ছা।"

পঞ্চদশ অধ্যায়।

উপেন্দ্রের কন্যা সর্ব্বমঙ্গলার বিবাহ।—নৃসিংহের রাজকার্য্য শিক্ষা।—নৃসিংহের দ্বিতীয় বিবাহ।

শ্রাবণ মাস বর্ষাকাল। আবার রাজশাহী অঞ্চল অতি নিম্নভূমি, সমস্ত দেশ জল প্লাবিত। নৌকাই যাতায়াতের এক মাত্র যান। প্রত্যেক গ্রামে প্রত্যেক বাড়ীতেই নৌকায় যাওয়া যায়। অন্যান্য যান অপেক্ষা নৌকায় যাতায়াতে সুখও বেশী। বিশেষতঃ বর্ষাকালে দক্ষিণ ও পূর্ব্ব মুখে জলের স্রোত থাকে। সে দিকে বিনা পরিশ্রমে যাওয়া যায়। আবার উত্তর পশ্চিম মুখে বাতাসের স্রোত। পাল উড়াইয়া বিনা কষ্টে সে দিকে যাওয়া যায়। অন্যান্য দেশে বর্ষাকালে গমনাগমনের পক্ষে অসুবিধা হয়, পক্ষান্তরে রাজশাহী অঞ্চলে বর্ষাকালই ভ্রমণের উৎকৃষ্টতম সময়। আবার এই সময়ে এ অঞ্চল সর্ব্বাপেক্ষা স্বাস্থ্যকর ছিল। অন্যান্য দেশে বৃষ্টির জল খাল বিল ডোবায় বদ্ধ হয় তাহার মধ্যে লতা পাতা পচিয়া বায়ু দূষিত হয় এই জন্যই অন্যান্য স্থানে বর্ষাকাল অস্বাস্থ্যকর। কিন্তু রাজশাহী অঞ্চলে সমস্ত দেশ জলে ডুবিয়া যাইত; গ্রামের উপর দিয়া, কখন বা বাড়ীর উপর দিয়া স্রোত চলিত। অন্যান্য ঋতুতে সঞ্চিত ময়লা সমুদয় সহ বর্ষাকালের ময়লা ধৌত হইয়া যাইত কোন দুর্গন্ধ থাকিতে পারিত না। সেই জন্য এই অঞ্চল বর্ষাকালে সর্ব্বাপেক্ষা স্বাস্থ্যকর। একটু সঙ্গতিপন্ন লোকমাত্রেরই নিজের নৌকা আছে। ভাড়াটিয়া নৌকাও যথেষ্ট পাওয়া যায়। উপেন্দ্র জলপথে দামনাশ যাইবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। দেশ জলে আচ্ছন্ন, আবার জল ধান্যে আচ্ছন্ন। বরেন্দ্রের ধান্যের বড়ই চমৎকার গুণ। জল যতই বাড়ে ধান্যবৃক্ষগুলিও তেমনি বাড়িতে থাকে। জলে ধান তলায় না বরং যতই বর্ষা বেশী হয় ততই ধান্য জন্মে। যতদূর

দৃষ্টি চলে ততদূর কেবল ধান্যক্ষেত্র শ্যামল বর্ণে শোভমান। উপেন্দ্র পুরোহিতাদি সঙ্গে লইয়া দামনাশে চলিলেন। তৃতীয় দিবস অপরাহ্ণে দামনাশের ঘাটে তাঁহাদের নৌকা লাগিল।

মুকুটমণির পরিচিত স্থান। তিনি আগে চলিলেন অন্য সকলে তাঁহার প্রদর্শিত পথে পশ্চাতে চলিল। উপেন্দ্র কেশব সান্যালের বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। মিথিলার পণ্ডিতজীর বাড়ীর কথা তাঁহার মনে পড়িল। উপেন্দ্র দেখিলেন মৈথিল পণ্ডিত অপেক্ষা বাঙ্গালী পণ্ডিতের বাড়ী অধিক শান্তিপ্রদ। প্রাচীন মুনি ঋষিদের রীতি চরিত্র বাঙ্গালী পণ্ডিতে যতদূর লক্ষ্য হয় অন্য কুত্রাপি ততদূর হয় না। কেশব সান্যাল একজন প্রধান পণ্ডিত, তাঁহার উপাধি শিরোমণি। বাড়ীতে চতুষ্পাঠী আছে, অনেকগুলি ছাত্রকে নিজব্যয়ে পালন করেন এবং শিক্ষা দেন। মৈথিল পণ্ডিতেরা "গুরু শুশ্রূষয়া বিদ্যাঃ" এই শ্লোক ধরিয়া ছাত্রদের দ্বারা ভৃত্যের কর্ম্ম করাইয়া থাকেন। বাঙ্গালী পণ্ডিতদের সে ব্যবহার নাই। অধ্যাপকের নিজ সন্তানেরা যেরূপ কাজ করে ছাত্রেরাও কেবল সময়ে সময়ে তদ্রূপ কার্য্য করিয়া অধ্যাপকের সাহায্য করে, তদ্‌ভিন্ন ভৃত্যবৎ কোন কাজ ছাত্রদের করিতে হয় না। সান্যালজীর বাড়ীতে পাকা দালান কোঠা নাই। খড়ের চাল মাটীর দেউল অনেকগুলি ঘর আছে। তাহাতে তিনটী প্রকোষ্ঠ, এক অঙ্গন হইতে অন্য অঙ্গনে যাইতে মধ্যে পরছত্র। কোন কোন ঘরের মাটির দেউলেই চুণাকাম করা আছে। কোন কোন ঘরে খড়ের চালের নীচে মাটীর ছাত দেওয়া আছে।

বিবাহের কথাবার্ত্তা উপস্থিত করা ঘটকদের একচাটিয়া ছিল। মুকুটমণি দালালের মত কেশব সান্যালের কাণে কাণে কয়েকটি কথা বলিলেন আবার আসিয়া উপেন্দ্র ও বাচস্পতি ঠাকুর এবং বাগছি মহাশয়ের নিকট নানা কথা বলিলেন। পাত্রপক্ষ কন্যাপক্ষ পরস্পরকে জানিতেন সুতরাং ঘটকালীর বড় আড়ম্বর করিতে হইল না। কুলপতির বংশীয়েরা বিশেষ অর্থলোভী ছিলেন না পক্ষান্তরে উপেন্দ্র বৈভবশালী রাজা, তাঁহার একমাত্র কন্যার বিবাহে বেশী ব্যয় করিতে কোন আপত্তি ছিল না। সুতরাং বিবাহের আদান প্রদানের কথা গুলিও এক কথাতেই শেষ হইল। মুকুটমণি যাহা বলিলেন উভয় পক্ষই তাহাতে সম্মত হইলেন।

সোণার বেনে, শুঁড়ীদিগের রীত্যানুসারে দক্ষিণ বাঙ্গালার এখন যেমন বিবাহের চুক্তি মধ্যে যৌতুক অলঙ্কার ও নগদ টাকা বা কোনরূপ সম্পত্তি দিবার চুক্তি হয়, বরেন্দ্র ভূমিতে সেরূপ চুক্তি অতি অল্প দিন যাবৎ আরম্ভ হইয়াছে। পূর্ব্বে ব্রাহ্মণের মধ্যে তাদৃশ ব্যবহার কোথাও ছিল না। কেবল পণ, ভোজন এবং বারবর্দারী এই তিনটি পাত্রপক্ষীয়েরা পাইতেন। পণ কুলমর্য্যাদা বিবেচনা করিয়া কুলজ্ঞেরা নির্দ্দিষ্ট করিতেন। তাহাতে উভয় পক্ষের কোন আপত্তি করিবার যো ছিল না। কন্যাকর্ত্তা অবস্থানুসারে কখন কখন পাত্রপক্ষের নিকট পণের কিয়দংশ মাফ লইতেন। সম্বন্ধপত্রে কিন্তু ঘটকের নির্দ্দিষ্ট পণই লিখিত হইত। বারবর্দারী বিবাহ উপলক্ষে পাত্রপক্ষের যাতায়াতের ব্যয়। উভয় পক্ষের বাড়ীর ব্যবধান এক যোজনের অধিক না হইলে কোন বারবর্দারী দিতে হইত না। অধিক দূর হইলে ব্যবধান এবং উভয় পক্ষের অবস্থা বিবেচনা করিয়া বারবর্দারী উভয় পক্ষ এবং পার্শ্ববর্ত্তী সম্ভ্রান্ত অভিজ্ঞ লোকেরা বিতর্ক করিয়া মীমাংসা করিতেন। ভোজনের টাকা সম্বন্ধের সময় মীমাংসা হইত না। বিবাহের পর দিন যখন বরযাত্রীগণকে ভোজনের জন্য কন্যাকর্ত্তা নিমন্ত্রণ করিতেন তখন ভোজনের টাকার তর্ক উপস্থিত হইত। বরযাত্রী মধ্যে যে সকল লোক কন্যাকর্ত্তা অপেক্ষা কুলমর্য্যাদায় বড় তাঁহারা কন্যাকর্ত্তার গৃহে ভোজন করার জন্য যে টাকা পাইতেন তাহাই ভোজনমর্য্যাদা বা ভোজনের টাকা। এই টাকার মীমাংসায় মহা তর্ক বিতর্ক, রাগারাগি মারামারি পর্য্যন্ত হইত। কখন কখন প্রস্তুত অন্ন নষ্ট হইত, ভোজনের টাকার মীমাংসা না হওয়ায় ভোজন হইত না। তৎকালে পাত্রপণ বা বিলাতী ধরণের ডাউরী (dowry) প্রচলিত ছিল না। যৌতুক ও অলঙ্কার কন্যাকর্ত্তা যাহা খুসি তাহাই দিতেন তদ্বিষয়ে কোন চুক্তি হইত না।

মুকুটমণি ১০১৲ টাকা পণ স্থির করিলেন। কেশব বারবর্দারী ২৫০৲ টাকা চাহিলেন। উপেন্দ্র হাস্যমুখে ২৫০০৲ আড়াই হাজার টাকা দিতে চাহিলেন, সুতরাং তর্ক কিছুই হইল না। তখন বাচস্পতি ঠাকুর পাত্র আনিতে বলিলেন। পাত্র সুসজ্জিত করিয়া আনা হইল।

সুসজ্জিত শব্দের বর্ত্তমান অর্থ ও তৎকালীন অর্থ খুব বিভিন্ন। মুসলমান বাদশাহী আমলেও দরবারী পোষাক ছিল। জমিদার এবং সরকারী কার্য্য-

কায়কেয়া দরবারে যাইতে জামা জোব্‌বা ইজার চাপকান পাগড়ী ব্যবহার করিতেন। কিন্তু অন্য সময়ে সূচীকা যুক্ত বস্ত্র বা আলখাল্লা ব্যবহার করিতেন না। সুতরাং নৃসিংহ নিজ অবস্থানুযায়ী তৎকাল প্রচলিত পোষাকে সজ্জিত হইয়া ভাবী শ্বশুরের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার বয়স সতর বৎসর, দাড়ী গোঁপের রেখাও উঠে নাই। শরীর সবল ও ঈষৎ স্থূলকায় কিন্তু একটু লম্বা ছন্দ জন্য স্থূল বোধ হয় না। মাথায় শিখা, চুলে কোন প্রকার সিঁতি নাই। বর্ণ একটু ফর্সা, ফিট গৌরবর্ণ নহে, সমস্ত শরীর নির্দ্দোষ সুগঠিত। বস্ত্রের মধ্যে লাল চেলীর ধুতী চাদর। কাণে সোণার কুণ্ডল, গলায় সোণায় গাঁথা রুদ্রাক্ষ মালা। দক্ষিণ হস্তে সোণার ইষ্টকবচ ও রূপার বলয় ও সোণার অঙ্গুরী। বাম হস্তে সোণার তাগা ও রূপার বলয়। কোমরে রূপার বিছা, পায়ে রূপার খাড়ুয়া ও শিশু কাঠের খড়ম। কপালে চুয়া ও চন্দনের ফোঁটা। ইহাই তৎকালীন মধ্যবিত্ত ব্রাহ্মণের বর-বেশ বা উত্তম পোষাক ছিল।

নৃসিংহ সভা প্রবেশ করিয়া খুড়াকে এবং অন্যান্য উপস্থিত গুরুজনকে প্রণাম করিলেন। খুড়ার উপদেশ মত বাচস্পতি ঠাকুরকে এবং মুকুটমণি ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া "ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ" বলিয়া সমস্ত ব্রাহ্মণবর্গকে নমস্কার করিয়া বিনীত ভাবে খুড়ার সম্মুখে বসিলেন। উপেন্দ্র, মহেশ্বর, বাচস্পতি, গোপীনাথ বাগছি এবং লালা গোপাল বরের আপাদমস্তক পুঙ্খানু-পুঙ্খরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। পাত্র দেখিয়া সকলেই সন্তুষ্ট। পাত্রের বিদ্যা বুদ্ধি পরীক্ষা জন্য উপেন্দ্র নিজেই প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। পরে রাজা মহেশ্বর রায়, রামধন বাচস্পতি, গোপীনাথ বাগছিও নানারূপ প্রশ্ন করিলেন। নৃসিংহ তাহাতে যে উত্তর দিলেন তাহাতে সকলেই তুষ্ট হইলেন। পাত্রী সম্বন্ধে ঘটকের ও বাচস্পতি ঠাকুরের কথায় কেশবের কোন আপত্তি রহিল না। তিনি বিবাহ দিতে সম্মত হইলেন।

ধনবল জনবল উভয় থাকিলে কোন দ্রব্যেরই অভাব হয় না। সন্দেশ বাতাসা মৎস্য দধি ঘৃত পান বাদ্য দুষ্প্রাপ্য জিনিস নয় সুতরাং কিছুই অভাব হইল না, পরদিনেই কার্য্য ধার্য্য ও সম্বন্ধপত্র হইল। খাঁ সাহেব বিদায় হইয়া সদলে বাড়ী চলিলেন। একটাকিয়া রাজার কন্যা কুলপতির সন্তানে বিবাহ

হইবে তাহাতে মন্দ বলিতে কিছুই নাই সুতরাং কেহই কোন দোষ ধরিতে পারিল না। সকলেই ভাল বলিয়া প্রশংসা করিতে লাগিল। দেওয়ানজীর পূর্ব্বে অমত ছিল কিন্তু পাত্র দেখিয়া তিনিও প্রশংসা করিলেন। তাঁহার ও অন্যান্য সকলের মুখে প্রশংসা শুনিয়া রাণী পবিত্রা, রাণী সৌদামিনী এবং অপর অন্তঃপুরিকাগণও তুষ্ট হইলেন। কিন্তু সর্ব্বমঙ্গলার যে সতিনীর গঞ্জনা হইবে রাণীদের মনে সে আশঙ্কা বরং আরো বৃদ্ধি হইল।

বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের পত্র হইলেই একরূপ বিবাহ হয়। তাহার পর একটা শুভদিন দেখিয়া রীতিমত বিবাহ হইয়া থাকে। উপেন্দ্র বাড়ী আসিয়া কন্যার বিবাহের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। শুভ দিনে বিবাহের লগ্নপত্র হইল। উক্ত দিনে বিবাহ মহা ধূমধামে সম্পন্ন হইল। উভয় পক্ষ কুলমর্য্যাদায় সর্ব্ব প্রধান সে জন্য ভোজনে বিশেষ কোন গোলযোগ হইল না। খাঁ সাহেব মুক্ত হস্তে প্রচুর দান খয়রাত করিলেন। সর্ব্বমঙ্গলা স্বামীর বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন।

এখানে আসিয়া সর্ব্বমঙ্গলা "কন্যা" এবং "বৌ" এই দুই অবস্থার ভিন্নতা অনুভব করিলেন। তখন বৌদের অনেক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইত। কিন্তু প্রথম বিবাহের যাত্রায় সে যন্ত্রণা আরম্ভ হইত না। সর্ব্বমঙ্গলা এপর্য্যন্ত পৈতৃক রাজপুরী ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী দুই চারিটী বাড়ী ব্যতীত কিছুই দেখেন নাই। নৌকায় উঠিয়া সাতগড়া হইতে দামনাশ পর্য্যন্ত যাইতে পথে নূতন নূতন স্থান দেখিলেন। স্বামীর আলয়ে গিয়া পাকা অট্টালিকাদি না দেখায় তাঁহার মনে কোন কষ্ট বোধ হইল না। বালিকা নূতন নূতন বস্তু দেখিয়া এবং নূতন অবস্থা অনুভব করিয়া কৌতূহল তৃপ্তি হেতু সন্তোষ বোধ করিতে লাগিলেন। সর্ব্বমঙ্গলার বিবাহ হওয়া অবধি মাথায় ঘোম্‌টা দেওয়া আরম্ভ হইল। এখন অপেক্ষা তখনকার ঘোম্‌টা অনেক লম্বা ছিল। স্বাধীন ভাবে যাতায়াত একবারে বন্ধ হইল। দুই চারি জন বালক বালিকা ও দাসী ভিন্ন অন্যের সহ কথা বলা বন্ধ হইল। ইশারা করিয়া অধিকাংশ মনের ভাব ব্যক্ত করিতে হইল। তিনি নূতন বৌ তাতে বড় মানুষের মেয়ে আর রামেশ্বরের একমাত্র পুত্রের পত্নী সুতরাং তাঁহার শ্বাশুড়ী তাহাকে প্রচুর আদর করিলেন। পাকস্পর্শ, দ্বিরাগমন এবং অষ্টমঙ্গল হইয়া গেল। সর্ব্বমঙ্গলা পুনরায় পিত্রালয় গেলেন। খাঁ সাহেবের বিশেষ অনুরোধে নৃসিংহও সেই যাত্রায় শ্বশুরালয়ে গেলেন।

নৃসিংহ শ্বশুরালয়ে আসিলে খাঁ সাহেব তাঁহাকে নিজ জমিদারীর ভবিষ্যৎ শাসক এবং উত্তরাধিকারী করিতে মনস্থ করিলেন। তাঁহাকে পারসী পড়াইবার জন্য বিজ্ঞ মুন্সী রাখিয়া দিলেন এবং জমিদারী কাজ কর্ম্ম কিছু কিছু করিয়া নিজেই শিক্ষা দিতে লাগিলেন। নৃসিংহ পারসী পড়িতে আপত্তি করিলেন। কিন্তু শ্বশুরের অনুরোধে শেষে স্বীকার করিলেন। তিনি অতিশয় বুদ্ধিমান ছিলেন এক্ষণে খুব মনোযোগ পূর্ব্বক পারসী পড়িতে লাগিলেন। তখন পারসী রাজভাষা ছিল। বাঙ্গালা ভাষার প্রায় তৃতীয়াংশ পারসী মিশ্রিত ছিল। ফলতঃ তখন পারসী বিদেশী ভাষা বলিয়া গণ্য ছিল না। নৃসিংহ তিন বৎসর পাঠ করিয়া মোটামুটী বিজ্ঞতা লাভ করিলেন।

নৃসিংহ মাতার একমাত্র সন্তান সুতরাং দুই তিনমাস মধ্যেই এক একবার মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন। কিন্তু সর্ব্বমঙ্গলা এই তিন বৎসর মধ্যে কেবল তিনবার স্বামীর বাড়ীতে গিয়াছিলেন। আধুনিক চাকুরিয়াদের মত তিনি কেবল দুর্গোৎসব উপলক্ষে দামনাশে যাইতেন এবং একমাস দেড়মাস পরেই পিত্রালয়ে আনীতা হইতেন। পিত্রালয়ে তাঁহার কোন কাজ করিতে হইত না। যাহা ইচ্ছা পূর্ব্বক করিতেন ভাল না করিলেও কেহ কিছু বলিত না। শ্বশুর বাড়ী যাইবার কালেও তাঁহার সঙ্গে পিত্রালয় হইতে দাস দাসী যাইত। কিন্তু ব্রাহ্মণের বাড়ীতে দাস দাসী থাকিলেও অনেক কাজ নিজে করিতে হইত। সেই সকল কাজ শাশুড়ীর সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বমঙ্গলার করিতে হইত।

সর্ব্বমঙ্গলার বিবাহের অনেক পূর্ব্বেই তাঁহার শ্বশুরের অভাব হইয়াছিল। তাঁহার খুড়শ্বশুর কেশব সান্যাল সংসারের কর্ত্তা ছিলেন। এখন যেমন কর্ত্তার পত্নীই সংসারে কর্ত্রী হন তখন তাহা ছিল না। সর্ব্বমঙ্গলার শাশুড়ী সংসারের বড় বৌ ছিলেন, সেই জন্য তিনিই কর্ত্রী ছিলেন। কেশবের তিন পত্নী নির্ব্বিবাদে বড় দেবরের অধীনে থাকিতেন। শ্যামা নামে নৃসিংহের এক বিমাতা ছিলেন, কিন্তু তিনি বিধবা হওয়া অবধি প্রায়ই পিত্রালয়ে থাকিতেন। কেবল দুর্গোৎসবের সময় "ঘরের বৌ পরের বাড়ী থাক্‌তে নাই" বলিয়া তিনিও দুর্গোৎসবের সময় দামনাশে আসিতেন। সুতরাং সর্ব্বমঙ্গলার সহিত তাঁহার

সেই সময়ে দেখা শুনা হইত। কেশব সে কালের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। ঈশ্বর চিন্তা ও শাস্ত্র চিন্তা করিয়াই সময় কাটাইতেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা বৈষয়িক উন্নতির জন্য চেষ্টা বা চিন্তা করা নীচ কর্ম্ম বোধ করিতেন সুতরাং তাঁহাদের বিষয় বুদ্ধি প্রায় ছিল না। যে অসাধারণ বুদ্ধি প্রভাবে মহাত্মা পণ্ডিতগণ সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্রাদির গতি নিরূপণ করিতেন, ন্যায় দর্শনাদি শাস্ত্র প্রণয়ন করিতেন সে বুদ্ধি তুচ্ছ বিষয়ে ধাবিত হইত না। কাজেই ক্ষুদ্র সাংসারিক বিষয়ে অতি সামান্য লোকেরা বিজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে সহজে ঠকাইতে পারিত। কেশব সাংসারিক আয় ব্যয় কিছুই দেখিতেন না। যেখানে যে কিছু টাকা কড়ী পাইতেন অমনি আনিয়া বড় বৌ ঠাকুরাণীর হাতে দিতেন, তিনি যাহা করিতেন তাহাই হইত। কেশব কখন তাহার কোন নিকাশ লইতেন না। সুতরাং কেশব কেবল বাহিরে কর্ত্তা ছিলেন প্রকৃত কর্ত্তৃত্ব নৃসিংহের মাতা ইন্দিরার হাতেই ছিল। ইন্দিরা গৃহিণীর কাজ বেশ বুঝিতেন। সমস্ত লোকের সহিত সদ্ব্যবহার করিতেন। নিজে সকল কাজ দেখিতেন। সমস্ত দ্রব্য ঠিকানা মত রাখিতেন। যখন যে দ্রব্য আবশ্যক হইত অমনি তাহা ভাণ্ডার ঘর হইতে বাহির করিয়া দিতেন এবং কাজটী শেষ হইলেই অমনি সে দ্রব্য সেই ঠিকানায় তুলিয়া রাখিতেন। লেখা পড়া জানিতেন না বটে কিন্তু মেধা বেশ ছিল, আবশ্যকীয় সমস্ত কথাই মনে স্মরণ করিয়া রাখিতেন। যাহারা লেখা পড়া জানে তাহারা প্রয়োজনীয় কথা লিখিয়া রাখে সুতরাং স্মরণ করিয়া রাখা আবশ্যক বোধ করে না। তাহাদের সে সকল কথা মনেও থাকে না। লেখা পড়া না জানিলে কাজের কথা সকলি স্মরণ রাখিতে হয়। সেই চেষ্টা হেতু তাহাদের অনেক বেশী কথা মনে থাকে। কি আয় হইল কি ব্যয় হইল, কি করা হইয়াছে আর কি করিতে হইবে, কোন কোন দ্রব্য কোথায় আছে, কে কি দিল কি দিবে কি পাবে সকলই তাঁহার মনে করিয়া রাখিতে হইত। কোন কোন বিষয়ে স্মরণ সাহায্যের জন্য রশিতে গিরা দিয়া, দেওয়ালে আঁক দিয়া বা সিন্দূরের ফোঁটা দিয়া রাখিতেন। গুরুতর বিষয়ে টোলের ছাত্রদের দিয়া লেখাইতেন। এক্ষণে বিদুষী পুত্রবধু পাইয়া ইন্দিরার কতক সাহায্য হইল। সর্ব্বমঙ্গলা নিকটে থাকিলে ইন্দিরার যাহা লেখাইবার আবশ্যক হইত তাহাকে দিয়াই লেখাইতেন।

সর্ব্বমঙ্গলার দ্বারা তাহার শ্বাশুড়ীর যে সাহায্য হইল নৃসিংহের দ্বারা তাঁহার শ্বশুরের তদপেক্ষাও অধিক সাহায্য হইতে লাগিল। উপেন্দ্র জামাতাকে নিজ কার্য্য শিক্ষা দিতেন এবং ক্রমেই অধিকতর কার্য্যভার তাঁহার উপর অর্পণ করিতে লাগিলেন। নৃসিংহ নবোৎসাহে সেই সকল কার্য্য সুসম্পন্ন করিতেন দেখিয়া খাঁ সাহেব পরম সন্তোষ লাভ করিলেন। রাণীদের ইচ্ছা যে আর দত্তক না রাখা হয়। উপেন্দ্রের নিজেরও তাহা অভিপ্রায় ছিল। তাহা কর্ম্মচারীগণ, প্রজা, ভৃত্য প্রায় সকলেরই সেই ইচ্ছা। ফলতঃ গোপাল এবং বাচস্পতি ঠাকুর ভিন্ন সকলেরই অভিষ্ট হইল যে নৃসিংহ ও সর্ব্বমঙ্গলা ভাদুড়ীচক্রের ভাবী উত্তরাধিকারী হন।

গৌড় বাদশাহের বংশের লোপ হইয়া ভিন্ন বংশীয়েরা একটাকিয়া রাজা হয় ইহা বাচস্পতি ঠাকুরের নিতান্ত অমত। তিনি নৃসিংহকে ও সর্ব্বমঙ্গলাকে আন্তরিক ভাল বাসিতেন তাহাদের শুভানুধ্যায়ীও ছিলেন। কিন্তু পণ্ডিতজীর দৃঢ়বিশ্বাস যে কন্যা পর, পরের ঘর করিবে, ধনবান পিতা কন্যাকে টাকাকড়ি দিবে, কিছু জাগীর ব্রহ্মত্র দিবে, অলঙ্কার দিবে, আপদে বিপদে সাহায্য করিবে এই মাত্র। বংশের নাম লোপ করিয়া কন্যাকে রাজত্ব দেওয়া তাঁহার বিবেচনায় ঘোর অপরাধ। সেই জন্য তিনি উপেন্দ্রকে সর্ব্বদা দত্তক গ্রহণ করিতে বলিতেন এবং তদ্বিরুদ্ধ কথা শুনিলেই ক্রুদ্ধ হইতেন। গোপালের মনেও তদ্রূপ ভাব কতক ছিল, তদ্ভিন্ন তাহার আরো কারণ ছিল; গোপালের পুত্র গোকুল পেশকার ছিলেন। দেওয়ান গোপীনাথ বাগছি এক্ষণে বৃদ্ধ এবং কাজে একরূপ অক্ষম হইয়া পড়িয়াছিলেন। বাগছি সাহেব নামে দেওয়ান থাকিলেও খাঁ সাহেব গোকুলকে অতিশয় ভাল বাসিতেন এবং বিশ্বাস করিতেন। তাঁহার প্রাধান্য বাগছি সাহেবের সহ্য হইত না। নৃসিংহ দেওয়ানজীর পক্ষ ছিলেন। গোপাল ও গোকুল অনুমান করিতেন যে সর্ব্বমঙ্গলা উত্তরাধিকারিণী হইলে প্রকৃতপক্ষে নৃসিংহই রাজা হইবেন তখন গোকুলের প্রাধান্য দূরে থাকুক চাকরী থাকাই কঠিন হইবে। পক্ষান্তরে খাঁ সাহেব দত্তক রাখিলে গোকুলের কর্ত্তৃত্ব বৃদ্ধি হইবারই অধিক সম্ভাবনা ছিল। তাই গোকুল ও গোপাল বাচস্পতি ঠাকুরের পোষকতা করিতেন। নৃসিংহের মাতাকে খাঁ সাহেব নিজ বাড়িতে আনিতে অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হন নাই।

কোন কোন ব্যাপার বিধান উপলক্ষে ইন্দিরাকে খাঁ সাহেব কয়েকবার নিজালয়ে আনাইয়াছিলেন কিন্তু তিনি কোন অনুরোধে বা কোন লোভেই সাতগড়ায় দীর্ঘকাল থাকেন নাই। নৃসিংহ মধ্যে মধ্যে বাড়ীতে গিয়া মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। উপেন্দ্র অধিকাংশ কার্য্যভার জামাতাকে দিয়া নিজে সন্ধ্যা পূজা উপাসনাতেই প্রচুর সময় কাটাইতেন। সেই জন্য নৃসিংহ বাড়ীতে গিয়া অধিক দিন থাকিতে পারিতেন না। বিশেষতঃ রাজভোগ সেবনে নৃসিংহের আমীরী মেজাজ হইয়া উঠিয়াছিল। মুনি ঋষির আশ্রমের ন্যায় পৈতৃক বাটীর শান্তিসুখ তাঁহার তত ভাল লাগিত না। আবার নবযুবতী সর্ব্বমঙ্গলার সহ তাঁহার গাঢ় প্রণয় হইয়াছিল। দুর্গোৎসবের সময় ভিন্ন অন্য সময়ে সর্ব্বমঙ্গলা স্বামীর সঙ্গে আসিতেন না। নৃসিংহ দীর্ঘ বিচ্ছেদ সহিতে পারিতেন না। এই সকল কারণে নৃসিংহ দীর্ঘকাল নিজ বাড়ীতে থাকিতে পারিতেন না। তিনি শ্বশুরের সমস্ত সম্পত্তির কর্ত্তা হইয়াছিলেন। উপেন্দ্র কখন তাঁহার কোন কার্য্যের কি কোন ব্যয়ের নিকাশ লইতেন না। নৃসিংহ ইচ্ছা করিলে নিজ বাড়ীতে যথেষ্ট টাকা দিতে পারিতেন কিন্তু তিনি কখন নিজে কিছুই বাড়ীতে দিতেন না। উপেন্দ্র তাহা বিলক্ষণ জানিতেন। উপেন্দ্র জামাতাকেই সর্ব্বস্ব দিতে মনস্থ করিয়াছিলেন বলিয়া জামাতার নিজস্ব বৃদ্ধির বিশেষ সাহায্য করেন নাই। কেবল কন্যা স্বামীগৃহে গিয়া কাঁচা ঘরে না থাকে এই জন্য জামাতার বাড়ীতে একটি পাকা দালান এবং এক পাকা ইন্দারা দিয়াছিলেন মাত্র। জামাতার নিজবাড়ীতে সম্পত্তি বৃদ্ধি হয় ইহা উপেন্দ্রের অভিপ্রায় ছিল না। বিবাহের পর ক্রমে পাঁচ বৎসর অতীত হইল। শ্বশুর জামাতার মধ্যে পিতা পুত্রবৎ ভাব অক্ষুন্ন থাকিল। খাঁ সাহেব মনে করিলেন দত্তক রাখিবেন না অথচ তৎসম্বন্ধে কোন কথা স্পষ্ট বলিবেন না। তাঁহার অভাবে শাস্ত্রমতেই কন্যা উত্তরাধিকারিণী হইবে। কোন তর্ক বিতর্ক, বিবাদ মীমাংসা কিছুই আবশ্যক হইবে না। তিনি স্পষ্ট কিছু না বলিলেও রাণীরা তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়াছিলেন। পরন্তু গোপাল এবং গোকুল তাঁহার উদ্দেশ্য বুঝিয়া তাহা বিফল করিতে উপায় চিন্তা করিতে ছিলেন। গোকুলের কর্ত্তৃত্ব বাগছি সাহেবের সহ্য হইত না, তাঁহাদের বিবাদ উপস্থিত হইলে নৃসিংহ বাগছি সাহেবের পক্ষ হইতেন এবং গোকুলের চেষ্টা বিফল করিতেন। বৃদ্ধ দেওয়ান তজ্জন্য

তাঁহার একান্ত হিতার্থী হইলেন। পক্ষান্তরে গোকুল বুঝিলেন সান্যালের নিকট তাহার কোন কর্ত্তৃত্ব খাটিবে না। এজন্য গোপাল ও গোকুল তাঁহাকে দূরীকৃত করিতে চেষ্টিত হইলেন।

বৃদ্ধ গোপাল অতিশয় প্রভুভক্ত ছিলেন। সর্ব্বমঙ্গলার কোন গুরুতর অনিষ্ট করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি ছিল না। কিন্তু নৃসিংহের হাতে রাজপদ না পড়ে ইহা তাঁহার একান্ত ইচ্ছা। দুই দিক রক্ষার জন্য তিনি বিবিধ প্রকার চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন যে নৃসিংহের আর দুই একটি বিবাহ হইলে খাঁ সাহেব তাঁহার প্রতি নারাজ হইবেন তখন বাচস্পতি ঠাকুরের সঙ্গে একযোগে পরামর্শ দিয়া খাঁ সাহেবের দত্তক রাখাইবেন। ইহাতে কোন পাপও হইবে না অথচ তাঁহার মৎলব সিদ্ধ হইবে। এই কর্ম্ম করিতে দুই একজন ঘটকের সাহায্য আবশ্যক। গোকুল এত চিন্তা করিয়া কোন সদুপায় ঠিক করিতে পারেন নাই। এখন পিতার নিকট তাঁহার উদ্ভাবিত মত শুনিয়া অমনি তাহাই কর্ত্তব্য স্থির করিলেন। মাঝগ্রামের কুলজ্ঞদিগের দ্বারা কোন চক্রান্ত করিলেই অমনি তাহা মুকুটমণি ঠাকুরের কর্ণগোচর হইয়া সমস্ত চেষ্টা পণ্ড হইবে, গোপাল ও গোকুল তাহা বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন। এজন্য তাঁহারা মাঝগ্রামের কুলজ্ঞদিগের অজ্ঞাতসারে শ্যামনগরের ঘটকদের দ্বারা কার্য্য উদ্ধারে মনন করিলেন। গোকুল অর্থদ্বারা তাহাদিগকে বশীভূত করিয়া নৃসিংহের আর দুই একটি বিবাহ দিতে তাহাদিগকে নিযুক্ত করিলেন। ঘটকেরা এই টাকা উপরি প্রাপ্তি মনে করিলেন। কেন না রূপবান, গুণবান, সঙ্গতিপন্ন, নবযুবক কুলপতির সন্তানের পক্ষে বহুবিবাহ না হওয়াই আশ্চর্য্য, হওয়া কিছু মাত্র আশ্চর্য্য নহে। ঘটকেরা নগদ ছয় শত টাকা পাইলেন এবং কার্য্য সাধন করিতে পারিলে তাহার চতুর্গুণ পাইবার আশা পাইয়া হৃষ্ট চিত্তে গোকুলের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য বাহির হইলেন। ঘটকেরা নানা তর্ক বিতর্কের পর খাজুরিয়ার নরোত্তম লাহিড়ীর কন্যার সহিত নৃসিংহের বিবাহ যোটনা স্থির করিলেন। নরোত্তম অতি ধর্ম্মশীল, দরিদ্র কুলীন। তাঁহার কন্যাটি পরম সুন্দরী, বয়স তের বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছে। নরোত্তম কন্যার বিবাহ জন্য অতিমাত্র চিন্তিত ছিলেন। এমন সময়ে কুলজ্ঞত্রয় তাঁহার বাড়ীতে অনাহুত উপস্থিত হইলেন।

বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের কুলজ্ঞেরা সকলেই কুলীন ছিলেন এক্ষণে কতক কতক ভঙ্গ হইয়াছেন। যাঁহারা কুলীন আছেন তাঁহারা সকল সমাজেই মান্য গণ্য। যে সকল ঘটক কাপ হইয়াছেন তাঁহারা কেবল কাপ ও শ্রোত্রিয় সমাজের কুলজ্ঞ পদস্থ, কুলীন সমাজে তাঁহাদের আদর নাই। এখানে কৌলীন্য প্রথার ফলাফল সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। বল্লাল সেন যখন কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণদিগকে বাসস্থানানুসারে দুই ভাগ করেন তখন এক শত ঘর বারেন্দ্র এবং ছাপ্পান্ন ঘর রাঢ়ী ছিল। আর সাত শত ঘর আদিম বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ ছিল। এখন সেই বাঙ্গালী ব্রাহ্মণেরা বৈদিক শ্রেণী নামে খ্যাত। গৌরাঙ্গ প্রভুর সময় হইতেই তাঁহাদের "বৈদিক শ্রেণী" নাম হইয়াছে। তৎপূর্ব্বে তাঁহাদিগকে সপ্তশতী বা বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ বলিত এবং তাঁহাদের সম্মান অনেক কম ছিল। যাহা হউক গত সাত শত বৎসর মধ্যে এই তিন শ্রেণীর সংখ্যার আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হইয়াছে। সেই সাত শত ঘর বৈদিকের সন্তান এখন দুই হাজারের অধিক নহে। আর একশত ঘর বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের সন্তান এখন তের হাজর ঘর। পক্ষান্তরে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা কম ছিল এখন তাঁহাদের সংখ্যাই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। সেই ছাপান্ন ঘরের সন্তান এখন চৌরাশী হাজার। বারেন্দ্র কুলজ্ঞেরা বলেন যে সপ্তশতী ব্রাহ্মণদের অধিকাংশ রাঢ়ীয় শ্রোত্রিয় দলে মিশিয়া গিয়াছে। সেই জন্য বৈদিকের সংখ্যা এত কম এবং রাঢ়ীর সংখ্যা এত বেশী হইয়াছে। ইহার প্রমাণার্থে তাঁহারা যে কয়েকটি কারণ নির্দ্দেশ করেন তাহা নিতান্ত অসঙ্গত নহে। বারেন্দ্র শ্রেণীতে আট ঘর কুলীন এবং নিরানব্বই ঘর শ্রোত্রিয় ছিল। শ্রোত্রিয়দের কন্যার কতকাংশ কুলীনে বিবাহ দিত বলিয়া অনেক শ্রোত্রিয়ের বিবাহ হইত না। এই হেতু শ্রোত্রিয় বংশ প্রচুর পরিমাণে লুপ্ত হইয়াছে। সাবর্ণি গোত্রীয় কেহ কুলীন হয় নাই এই জন্য বারেন্দ্র শ্রেণীতে সাবর্ণি গোত্র লুপ্ত প্রায়। ভারদ্বাজ গোত্রীয় ভাদড়গাঁই কেবল অল্প দিন কুলীন ছিল, সেই জন্য ভারদ্বাজ গোত্রীয়ের সংখ্যাও অতি অল্প। বাৎস্য গোত্র, কাশ্যপ গোত্র এবং শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ব্রাহ্মণই বারেন্দ্র শ্রেণীর প্রায় সমুদায়। আবার দেখা যায় যে বারেন্দ্র শ্রেণীতে এখন যে এক আনা পরিমাণ কুলীন আছে এবং নয় আনা পরিমাণ কাপ আছে তাহারা সকলেই সেই সাত ঘর কুলীনের সন্তান। আর যে ছয় আনা পরিমাণ

শ্রোত্রিয় আছে তন্মধ্যেও চারি আনা পরিমাণ কুলীন সন্তান। অবশিষ্ট দুই আনা মাত্র মূল বিরানব্বই ঘর শ্রোত্রিয়ের বংশ জাত।

রাঢ়ী কুলীন ভঙ্গ হইয়া শ্রোত্রিয় হয় না। যদি রাঢ়ী শ্রোত্রিয় মধ্যে বৈদিক শ্রেণী মিলিত না হইত তবে রাঢ়ীয় শ্রোত্রিয়ের সংখ্যা আরো কম হইত। কিন্তু কার্য্যতঃ দেখা যায় যে রাঢ়ী শ্রোত্রিয়ের সংখ্যা এখনও কুলীন ও বংশজ অপেক্ষা বেশী। সুতরাং রাঢ়ী শ্রোত্রিয় দলে যে বৈদিকগণ মিশিয়া তাহার সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছে তাহা সঙ্গত বলিয়া অনুমান করা যায়।

ঘটকেরা স্নান পূজা আহার সমাপন করিয়া আসিলেন, নরোত্তম লাহিড়ী আপনা হইতেই তাঁহাদের নিকট নিজ দৈন্য দশা এবং কন্যাদায়ের কথা উত্থাপন করিলেন। সুতরাং তাঁহারা মৎলব সিদ্ধির সহজেই সুযোগ পাইলেন, বিশেষ ভণিতা করিতে হইল না। তাঁহারা নৃসিংহের সহিত তাঁহার কন্যার বিবাহের প্রস্তাব করিলেন।

নরোত্তম ঘটকদের কথা শুনিয়া কিঞ্চিৎ বিষন্নভাবে কহিলেন, "নৃসিংহের বিমাতা আমায় জ্যেষ্ঠতাত ভগ্নী সুতরাং কার্য্য সঙ্গত কি না সন্দেহ। তাহার পর নৃসিংহ খাঁ সাহেবের কন্যা বিবাহ করিয়াছে, সে পাত্রে অন্যে কার্য্য করিতে সাহসী হয় না। কেশব সান্যালও ভয় পায়, খাঁ সাহেব রাজা, আমি প্রজা, আমি তাঁহার আশ্রিত প্রতিপালিত। তিনি আমাকে বড় ভালও বাসেন। আমি যদি তাঁহার এক মাত্র কন্যার সতীন যোগাইতে যাই তবে তিনি অত্যন্ত কুপিত হইবেন। আমারও কষ্ট হইবে আর আমার কন্যারও ততোধিক কষ্ট হইবে। অন্য পাত্র আপনাদের সন্ধানে আছে কি না?"

ঘটকেরা কহিলেন, "খাঁ সাহেব রাজা, কিন্তু রাজত্ব দিতে স্বীকার করিয়াও তাঁহার কন্যার জন্য ঘর-জামাই কোন কুলীনের ছেলে পাইলেন না। তাঁহার জামাই যদি অন্য অনেক বিবাহ করে তাহা নিবারণ করা তাঁহার অসাধ্য। তবে লাহিড়ী মহাশয়! আপনি কি দিয়া জামাই কিনিয়া রাখিবেন যে, সে আর বিবাহ করিবে না। আপনি নিরাধিন পঠীর কুলীন অথচ দরিদ্র। আপনি চারি বিবাহের পাত্রে কন্যা দিতে পারিলে আপনকার সৌভাগ্য। নৃসিংহের মত পাত্র পাওয়া আপনকার অসাধ্য। আমরা তিন জনে যদি সাহায্য করি, চেষ্টা করি, তবে এই কার্য্য বহু কষ্টে ঘটাইতে পারি। কিন্তু ইহাতে আপনার আপত্তি কি?"

তৎকালে ঘটকদের বড় আধিপত্য ছিল। ঘটকগণকে নারাজ করিলে কন্যায় বিবাহ দেওয়া এবং কুল রক্ষা করা অসম্ভব হইত। নরোত্তম ঘটকদিগকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া অতি মাত্র ভীত হইয়া হাত যোড় করিয়া কহিলেন, "আপনারা রাগ করিবেন না— আপনারা যে পাত্রের কথা বল্লেন সে নৃসিংহ আমার একরকম ভাগিনা আমি জানি যে সে পাত্র অতি উত্তম কিন্তু আমি খাঁ সাহেবের ভয়ে ভীত। খাঁ সাহেব রাগ করিলে আমারও বিপদ আমার কন্যারও বিপদ।"

নরোত্তম হাত যোড় করিয়া কান্দিলেন। ঘটকদের কৃত্রিম রাগ শান্তি হইল। তাঁহারা কহিলেন, "কোন ভয় নাই। আপনি আপনার কন্যা ও ভগিনীকে লইয়া আমাদের সঙ্গে দামনাশে চলুন। আমরা সকল ভয় মিটাইয়া সুব্যবস্থা করিয়া দিব।" নরোত্তম সম্মত হইয়া শুভদিন স্থির করিয়া স্বয়ং নৌকা ঠিক করিলেন। একার্য্য যে খুব ভাল তাহা তাঁহার পত্নী এবং আত্মীয়গণ সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিলেন। কিন্তু খাঁ সাহেবের ভয় সকলেরই মনে নানারূপ বিভীষিকা উপস্থিত করিতে লাগিল।

গোকুলের লোক সর্ব্বদা ঘটকদের সঙ্গে থাকিত এবং সমস্ত সংবাদ যোগাইত। নৃসিংহ যখন বাড়ীতে ছিলেন অথচ সর্ব্বমঙ্গলা যখন পিত্রালয়ে ছিলেন সেই সময়ে ঘটকেরা দামনাশে কেশবের আলয়ে উপস্থিত হইলেন। তাহার পর নরোত্তমও তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত ভগিনীকে লইয়া কেশব সান্যালের বাড়ীতে উঠিলেন। যে যখন কর্ত্তা থাকে যত পরিবারের বাড়ী সেই কর্ত্তার বাড়ী বলিয়াই খ্যাত হয়। কিন্তু বাস্তবিক ঐ বাড়ী শ্যামার স্বামীর বাড়ী, সুতরাং তাঁহার নিজ বাড়ী। তিনি নৃসিংহের বিমাতা। শ্যামার নিজের সন্তান না থাকায় তিনি নৃসিংহকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন। তিনি আসিয়াই ঘরের গিন্নি হইয়া বসিলেন। নরোত্তম দামনাশে কন্যার সম্বন্ধ করিতে আসিয়াছেন এই মাত্র প্রকাশ করিলেন। কিন্তু নৃসিংহ যে তাঁহাদের লক্ষ্য তাহা প্রথমে প্রকাশ করিলেন না। দুই চারি দিন দামনাশের সান্যালদের মধ্যে অন্য পাত্রও দেখা হইল। কিন্তু কোনটিই ঠিক হইল না।

অবশেষে নরোত্তম এবং কুলজ্ঞেরা কেশব সান্যালকে অনুরোধ করিলেন যে নৃসিংহের সহিত লক্ষ্মীর বিবাহ দেন। শ্যামাসুন্দরীও কেশবকে এবং নৃসিংহের

মাতাকে অনুরোধ করিলেন। কেশব অনেক ইতস্ততঃ করিয়া পরে স্বীকার করিলেন। তাড়াতাড়ি বিবাহ হইয়া গেল। নৃসিংহের নিজের কোন মতামত প্রকাশের সুবিধা ছিল না। কিন্তু তিনি যে নিতান্ত অনিচ্ছুক ছিলেন না অথচ নিতান্ত উৎসুকও ছিলেন না তাঁহার কার্য্যে সকলে তাহা বুঝিতে পারিলেন। গোকুল কৌশলক্রমে অন্য লোকদ্বারা বিবাহের পরদিন খাঁ সাহেবকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইলেন কিন্তু নিজে যেন কিছুই জানেন না এইরূপ ভাবে থাকিয়া গোপনে বিবাদ ঘটাইতে লাগিলেন। উপেন্দ্র ক্রুদ্ধ ভাবে পত্র সহ বৈবাহিকের নিকট দূত পাঠাইলেন। গোকুলের বাধ্য লোক দূত হইল। সে পত্রের মর্ম্মাপেক্ষা মৌখিক বেশী করিয়া উপেন্দ্রের বিরাগ প্রকাশ করিল। কেশবও ক্রুদ্ধ ভাবেই উত্তর দিলেন। দূত ফিরিয়া আসিয়া কেশবের পত্র দিয়া বিবাহের সমস্ত বাহ্য ঘটনা এবং পত্র দৃষ্টে সান্যাল পরিবারের ক্রুদ্ধ ভাব অনেক বর্দ্ধিত করিয়া উপেন্দ্রকে জানাইল। গুপ্ত চক্রান্ত কিছুই প্রকাশ হইল না। কেশব ভ্রাতৃপুত্রকে আর সাতগড়ায় যাইতে দিলেন না। উপেন্দ্রও কন্যাকে দামনাশে পাঠাইলেন না। ক্রমে চারি বৎসর অতীত হইল উপেন্দ্র জামাতাকে আনিতে চেষ্টা করিলেন না। কেশবও বধূকে লইয়া যাইতে কোন উপায় বা ইচ্ছা করিলেন না। গোকুল কৌশলে উভয়ের মধ্যে অকুশল বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। রাজার কার্য্যে তিনি সর্ব্বেসর্ব্বা হইলেন। বৃদ্ধ দেওয়ান বাগছি সাহেবের কেবল দেওয়ান উপাধি এবং বেতন মাত্র বহাল থাকিল।

ষোড়শ অধ্যায়।

নৃসিংহের তাহিরপুরে কার্য্যগ্রহণ।—সর্ব্বমঙ্গলার স্বামী সম্মিলন চেষ্টা।

কেশব ভ্রাতৃপুত্রকে সাংসারিক আয় ব্যয়ের তত্ত্বাবধারণে এবং নিজ ছাত্রদের অধ্যাপনার সাহায্য করিতে নিযুক্ত করিলেন। তাঁহাকে নানাবিধ সংস্কৃত গ্রন্থাদিও পড়াইতে লাগিলেন। তাঁহার ইচ্ছা যে ভ্রাতৃপুত্রকে নিজের মত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত করেন। কিন্তু নৃসিংহের সে অভিপ্রায় ছিল না। নৃসিংহ পাঁচ বৎসর রাজপুত্রের ন্যায় থাকিয়া বিলাসী এবং প্রভুত্ব প্রিয় হইয়াছিলেন। তিনি পিতৃব্যের আজ্ঞামত সমস্ত কাজ নিরাপত্তিতে করিতেছিলেন বটে কিন্তু মনে মনে তাহা ভাল লাগিত না। যাহা হউক তিনি পৈতৃক সম্পত্তির অনেক উন্নতি করিয়াছিলেন। কেশব অধ্যাপনায় এবং ঈশ্বর চিন্তাতেই কাল কাটাইতেন। বৈষয়িক চিন্তা তাঁহার মনে প্রায় উদিত হইত না। নৃসিংহ জমিজমার সুবন্দোবস্ত করিয়া সম্পত্তির আয় বৃদ্ধি করিলেন এবং ব্যয় সংক্ষেপ করিতে লাগিলেন। বড় মানুষের বাড়ী কোন ব্যাপার বিধান উপস্থিত হইলেই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের নিমন্ত্রণ হইত। বিশেষতঃ কেশব সান্যাল, পরম কুলীন পরম পণ্ডিত এবং পরম ধার্ম্মিক ছিলেন সুতরাং তাঁহার নিমন্ত্রণ অধিক হইত। কেশবের সঙ্গে সঙ্গে নৃসিংহও পণ্ডিতী নিমন্ত্রণ পাইতে লাগিলেন। একবার তাহিরপুরের রাজবাটীতে তাঁহাদের নিমন্ত্রণ হইল। রাজা রূপনারায়ণের সহিত নৃসিংহের আলাপ পরিচয় হইল। রাজার সদর নায়েবী কাজ খালি ছিল তিনি নৃসিংহকে তাহাই দিবার অভিপ্রায় করিলেন। নৃসিংহ স্বীকার করিলেন। কেশব অনেক ইতস্ততঃ করিয়া শেষে সম্মতি দিলেন। নৃসিংহ কর্ম্মোপলক্ষে সেখানে থাকিলেন, কেশব বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন।

এ সংবাদ অল্পকাল মধ্যেই সাতগড়ায় প্রচার হইল। খাঁ সাহেব অপমান বোধ করিয়া ক্ষুব্ধ হইলেন। গোকুল সন্তুষ্ট হইলেন। গোকুল মনে করিলেন সান্যাল তাঁহার উপর কর্ত্তৃত্ব করিত। এখন অপেক্ষাকৃত ছোট রাজার সরকারে

ছোট বেতনে চাকরী স্বীকার করিয়াছে। এখন তাঁহার সঙ্গে দেখা হইলে আর সে উচ্চ মেজাজে কথা বলিতে সাহসী হইবে না। মনুষ্যের বুদ্ধি চালনা করিলে সকলি করা যায়। এই সকল মনে মনে আলোচনা করিয়া গোকুল সন্তুষ্ট হইলেন একটু গর্ব্বিতও হইলেন। গোপাল কিছুদিন পূর্ব্বেই লীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন। বৃদ্ধ দেওয়ান বাগছি সাহেব এবং রাণীরা এই সংবাদে অতিমাত্র দুঃখিত হইয়া রোদন করিলেন।

সর্ব্বমঙ্গলা জানিলেন স্বামী এখন তাহিরপুরে রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন। তৎকালে পরিবার সঙ্গে করিয়া কর্ম্মস্থানে থাকার রীতি ছিল না। পীড়া কিম্বা অন্য কোন গুরুতর কারণ ব্যতীত কেহ বাড়ী হইতে পরিবার অন্যত্র লইয়া যাইত না। সুতরাং সর্ব্বমঙ্গলা ইহাও বুঝিয়াছিলেন যে স্বামী এখন একাকী আছেন। নিজ বাড়ীতে স্বামী যেমন পিতৃব্যের অধীন এখানে অবশ্যই তদপেক্ষা স্বাধীন ভাবে আছেন। স্বামী তাঁহার প্রতি কখন বিরূপ ছিলেন না। তিনিও বিরূপ হওয়ার যোগ্য কোন কাজ কখন করেন নাই। রূপে, গুণে, কুলে, শীলে তাঁহাকে তুচ্ছ করিবারও কোন কারণ ছিল না। স্বামী আর এক বিবাহ করিয়াছেন কিন্তু তাহা তিনি নিজে উদ্যোগী হইয়া করেন নাই, খুড়ার হুকুমে করিয়াছেন। কুলীনের ঘরে তাহা হইয়াই থাকে। সকল দিকে সুখ হয় না। নদীর একপারে চড়া পড়ে আর এক পার ভাঙ্গে। একদিকে সুখ বেশী হইতেই অন্য দিকে দুঃখ হয়। তাঁহার স্বামী রূপে ভাল, গুণে ভাল, একটু সঙ্গতিও আছে আবার কুলেত তুলনাই নাই। যখন এত দিকে সুখ আছে তখন সতীন হইল বলিয়া দুঃখ তাঁহাকে লইতেই হবে। কিন্তু এক্ষণে বাপের বাড়ী থাকা অপেক্ষা স্বামীর নিকট যাওয়াই তাঁহার অধিকতর সঙ্গত বোধ হইল। তিনি স্বামী সন্নিধানে যাইতে মনস্থ করিলেন।

সংকল্প স্থির হইলে সর্ব্বমঙ্গলা স্বামীর নিকট যাওয়ার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। নানা উপায় চিন্তা করিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। কুল-বালা, কুলবধূর পক্ষে সাত নদী সতর গ্রাম পার হইয়া আঠার ক্রোশ দূরে গুপ্তভাবে তাহিরপুর যাওয়া সহজ কথা নয়। অনেক চিন্তা করিয়া বুঝিলেন অন্যের সাহায্য ব্যতীত ইহা তাঁহার অসাধ্য। একজন মেয়ে লোক সঙ্গী ও সহায় করা আবশ্যক। টাকা দিলেই সহায় সঙ্গী যুটিতে পারে। টাকা তাঁহার হাতে

যথেষ্ট আছে তদ্‌ভিন্ন সোণা রূপা, মণি মুক্তার অলঙ্কার আছে। সঙ্গী মিলিবে কিন্তু বিশ্বাসী হইবে কিনা সেই ভয়। পাতানী নামে এক গোয়ালিনী খাঁ সাহেবের বাড়ীতে দুধ দিত। তাহার সহ সর্ব্বমঙ্গলার খুব আলাপ ছিল। সর্ব্বমঙ্গলার বয়স বাইশ বৎসর পাতানীর বয়স চল্লিশের উপর। মঙ্গলা তাহাকে পাতানী দিদি বলিতেন; সর্ব্বমঙ্গলা ব্রাহ্মণ কন্যা জন্য পাতানীও তাঁহাকে ঠাকরুণদিদি বলিত। সেই ডাক সম্পর্কে পাতানী নৃসিংহের শালী। নৃসিংহ সাতগড়ায় থাকা কালে পাতানীর সঙ্গে হাসি তামাসা চলিত। সান্যাল তাহাকে তাহার পুত্রের নাম ধরিয়া "হরার মা" বলিতেন। অন্য লোকেও "হরার মা" বলিত। সর্ব্বমঙ্গলা তাহাকেই নিজের সঙ্গিনী করিতে মনস্থ করিলেন। মঙ্গলা কখন আধ ক্রোশও পদব্রজে যান নাই। এখন আঠার ক্রোশ জমি কোন্ বেশে কি উপায়ে যাইবেন তাহাই চিন্তা করিতে করিতে সে দিবস অতীত হইল। তাঁহার নিজ সেবার্থ দুই জন দাসী ছিল তাহাদের নিকট মনের অভিলাষ কিছুই প্রকাশ করিলেন না। কিন্তু তাঁহার কপটতা অভ্যাস ছিল না, মনের ভাব গোপন করিবার ক্ষমতা ছিল না। সুতরাং তাঁহার মনে যে গুরুতর চিন্তা প্রবাহিত হইতেছে তাহা তাঁহার দাসীরা এবং অন্তঃপুরিকা-গণ সকলেই টের পাইল। আর সেই চিন্তা যে তাঁহার পতিচিন্তা তাহাও সকলেই অনুমান করিতে পারিল।

পরদিন হরার মা দুধ দিতে আসিলে, সর্ব্বমঙ্গলা তাহাকে ডাকিয়া হাত ধরিয়া এদিক ওদিক ঘুরাইয়া নিভৃতে লইয়া গেলেন। নিভৃতে গিয়া সর্ব্বমঙ্গলা কহিলেন, "পাতানী দিদি, আমার খুড়শ্বশুর কর্ত্তা, তিনি অনুরোধে পড়ে বিয়ে কর্‌তে বলেছেন সে তাই করেছে 'আমার উপর যে বিরূপ হয়ে আর এক বিয়ে করেছে তা আমার মনে লয় না। সেই বিয়ে করাতে বাবার সঙ্গে খুড়শ্বশুরের ঝগড়া হয়েছে, সেই জন্যই আমার ইচ্ছা করে আমি নিজে গিয়ে কেঁদে তার পায়ের উপর পড়ি, মনের কথা খুলে বলি, দেখি কি বলে। তা এখন তুমি যদি আমাকে সেইখানে তাঁহার নিকট লইয়া যাও।" পাতানী শুনিয়া অতিশয় ভীতা হইল ও লইয়া যাইতে অস্বীকৃতা হইল। পরে কহিল, "বরং এক কাজ কর, তুমি আমাকে একখানি চিঠি দেও আমি বৈরাগীণী সেজে ভাই নিয়ে তাহিরপুর গিয়ে সান্যাল সাহেবকে চিঠি দেবো এবং যাতে

পারি তাঁকে বশ কর্‌বো, তিনি নিজে এসে নিয়ে যাবেন কি নেবার অন্য উপায় কর্‌বেন, তা হলে সব দিকেই ভাল হবে।”

সর্ব্বমঙ্গলা ক্ষণকাল স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিয়া বুঝিলেন হরার মার কথা ঠিক। তখন একখানি চিঠি লিখিয়া বন্দ করিয়া তাহার হাতে দিলেন। পাতানীও রাণী পবিত্রার মনোভাব বুঝিবার জন্য পত্রখানি গোপনে রাখিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেল।

পাতানী রাণী পবিত্রার মহলে গিয়া দেখিল রাণী সৌদামিনীও সেইখানে আছেন। পাতানী শুষ্কমুখে প্রণাম করিল। কহিল, “আজ রাজকুমারীর কাছে গিয়েছিলাম, দেখ্‌লাম সে চেহারাই নাই, সোণার বরণ কালি হয়ে গিয়েছে, গায় একখানি অলঙ্কার নাই, আমি অনেক কথা জিজ্ঞাসা কল্লাম লজ্জায় কিছু বল্লে না, তবু আমি মনের কথা বুঝ্‌লাম, তোমরা জামাইকে আনো না কেন?”

পবিত্রা বলিলেন, “জামাই আর এক বিয়ে করেছে তাইতে ছোট্ ঠাকুরের সঙ্গে জামাইয়ের ও বিহাইর বিবাদ হয়েছে। সেই জন্য জামাই এখানে আসে না, মেয়েও নেয় না; সর্ব্বার যে দুঃখ তা আমরা দেখি বুঝি কিছুই কর্‌তে পারি না।

পাতানী। মেয়ে পাঠায়ে দেন না কেন?

পবিত্রা। আমি ছোট্‌ঠাকুরকে সে কথা বলেছিলাম, তিনি বল্লেন, পাঠায়ে দিলে যদি তারা না রাখে কি যন্ত্রণা দেয় তবে কষ্ট আরো বেশী হবে, সোহাগের মেয়ে সহ্য কর্‌তে না পেরে আত্মহত্যা কর্‌বে।

পাতানী কহিল, “আর এক কাজ করা যায়, আমি একবার গিয়ে বরং তোমার জামায়ের ভাবগতিক বুঝে আসি।”

রাণী সৌদামিনী পাতানীর কথায় সায় দিলেন। রাণী পবিত্রা বলিলেন, “আগ পাছ না বুঝে কাজ করা ভাল নয়, বুড়ো দেওয়ানজীকে না জিজ্ঞাসা করে আমি এ কথায় সায় দিতে পারি না। তুই একটু থাক্ আমি বাগছি সাহেবকে ডাকি।”

রাণীরা দাসীদ্বারা ডাকাইবা মাত্র বৃদ্ধ দেওয়ান উপস্থিত হইলেন। রাণী পবিত্রা সর্ব্বমঙ্গলার অবস্থা জ্ঞাপন করিয়া কোন লোকদ্বারা জামাতার ভাব

গতিক জানার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন এবং ইহাও বলিলেন যে জামাতা সম্মত হইলে যে কোনরূপে হউক কন্যা তাহার নিকট পাঠাইবেন। বাগছি সাহেব কিছুকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, "আমি আগেই বলেছিলাম ভ্রাতৃহীনা কন্যা, তার বিয়ে কুলীনে দিয়ে কাজ নাই। খাঁ সাহেব তা শুনলেন না পরে যখন নৃসিংহের দ্বিতীয় বিবাহের সংবাদ পেয়ে রাগারাগি কর্‌তে উপক্রম করিলেন তখনও আমি নিষেধ করিলাম, অনেক বুঝালাম তা না শুনে বিবাদ করে সরলা বালিকার মাথায় দুঃখের বোঝা দিলেন। আমি এখন নামে দেওয়ান কিন্তু কার্য্যতঃ আমার কোন কর্ত্তৃত্ব নাই। গোকুল খাঁ সাহেবের একান্ত প্রিয়পাত্র এবং সর্ব্ব বিষয়ের কর্ত্তা। সে জান্‌তো যে সর্ব্বমঙ্গলা রাজত্ব পেলেই কার্য্যতঃ নৃসিংহ রাজা হবে। নৃসিংহ বিদ্বান, বুদ্ধিমান এবং অতিমাত্র তেজীয়ান লোক, তার কাছে গোকুলের কোন কর্ত্তৃত্ব থাকবে না। সেই জন্য সে চক্রান্ত করে নৃসিংহকে স্থানান্তর ও চিত্তান্তর করাইয়াছে। এখনও সর্ব্বা এখানে থাকায় আমাদের আশা আছে। সর্ব্বা স্বামীর বাড়ী গেলেই বোধ হয় দত্তক রাখা হবে। তা হলেই গোকুলের উদ্দেশ্য সফল। জামাই সর্ব্বার উপর বোধ হয় বেশ রাজি আছে, না থাকলেও রাজি করাতে পারি। কিন্তু জামাই আর এখানে থাক্‌বে না। সর্ব্বার যেমন রূপ গুণ তাতে সে স্বামীর বাড়ী গেলে আবার আদরিণী হবে, কিন্তু রাজত্ব পাবে না। সেই জন্য আমি সর্ব্বাকে পাঠাইতে অভিপ্রায় দেই না।"

পবিত্রা। পুরুষে যেমন রাজত্ব প্রভুত্ব জন্য পাগল হয়, মেয়েরা তেমন হয় না। যদি ভাত কাপড়ে দুঃখ না হয়, জ্বালা যন্ত্রণা না থাকে, তবে স্বামী পুত্র নিয়ে সংসার করাই মেয়ে লোকের পরম সুখ। ছোট্‌ ঠাকুরের বয়স কিছু বড় বেশী হয় নাই। তিনি আরো পঞ্চাশ বৎসর বাঁচিতে পারেন। মেয়ে যে বাপের মরণ প্রতীক্ষা করে স্বামী ছেড়ে বসে থাক্‌বে তা কখন হবে না।

দেওয়ানজী। তাহা হইলে তাহারই কাছে আগে লোক পাঠানই ভাল কিন্তু আগে লোক ঠিকানা করা চাই। নৃসিংহ এখন দামনাশে নাই। তাহিরপুরে রাজার চাকরী কচ্ছে। কখন তাহিরপুরে থাকে, কখন মফস্বলে থাকে, কখন বাড়ী যায়। তার কাছে কিম্বা কেশব সান্যালের কাছে লোক পাঠাতে হ'লে, বিদ্বান, বুদ্ধিমান, বিশ্বাসী, শান্ত, কার্য্যক্ষম, কষ্টসহ লোক ঠিকানা করে

গোপনে পাঠাতে হবে। গোকুল যেন জান্‌তে না পারে।

অনেক পরামর্শের পরে স্থির হইল পাতানী একজন পুরুষের সঙ্গে যাইয়া কার্য্যোদ্ধার করিবে।

সেকালে জমিদারের কার্য্যকারকদের বেতন অতি অল্প ছিল কিন্তু তাহারা প্রজার নিকট অনেক টাকা পাইত। ইহার নাম উপরি-প্রাপ্তি। উপরি-প্রাপ্তিই তাহাদের প্রধান সম্বল ছিল। জমিদারের এক পরগণার নায়েবের মাসিক বেতন ৫৲ পাঁচ টাকা। সেই কর্ম্ম পাওয়ার জন্য প্রার্থী যে নজর দিত এবং দেওয়ান প্রভৃতি প্রধান কর্ম্মচারীগণকে উৎকোচ দিত তাহার পরিমাণ দুই তিন শত টাকা। জমিদার কিম্বা দেওয়ানের ঘরে সন্তান হইলে কিম্বা বিবাহ, অন্নপ্রাশন, শ্রাদ্ধ হইলে নায়েবগণ নজর দিতেন। ফলতঃ নায়েব যে বেতন পাইতেন তাহা প্রায় নজর দিতেই যাইত। কেবল উপরি-প্রাপ্তি দ্বারাই নায়েবগণের সর্ব্ব প্রকার ব্যয় বাহুল্য সংকুলন হইত এবং ঘরে প্রচুর তহবিল থাকিত। যেমন নায়েবের উপরি-প্রাপ্তি ছিল তেমনি সকল কর্ম্মচারীরই উপরি-প্রাপ্তি ছিল। সেই উপরি-প্রাপ্তি জমিদারের অজ্ঞাত ছিল না। জমিদারের নিজেরও উপরি-প্রাপ্তি ছিল তাহার নাম বাজে জমা। কেবল বেতনের উপর নির্ভর করিয়া চাকরী করা এবং কেবল খাজনা লইয়া জমিদারী করা ইংরেজ রাজত্বে অল্প দিন হইল প্রচলিত হইতেছে। এখনও উপরি-প্রাপ্তি এবং বাজে জমা সম্পূর্ণ তিরোহিত হয় নাই। অনভিজ্ঞ লোকে বিবেচনা করিতে পারে যে ইংরেজাধিকারের পূর্ব্বে বড় অত্যাচার ছিল। কিন্তু সেটি বড় ভুল। তখন খাজনার হার বড় কম ছিল। ইন্‌কম টেক্‌স ছিল না। বাজে জমা, মামুলি পার্ব্বনী প্রভৃতি দিয়া তৎকালে যে খাজনা দিতে হইত এখন তাহার অপেক্ষা অনেক বেশী দিতে হয়। আধুনিক জমিদার মধ্যে এখনও যাঁহারা কম খাজনা সহ বাজে জমা প্রভৃতি আদায় করেন তাঁহারা অত্যাচারী বলিয়া প্রসিদ্ধ কিন্তু যাঁহারা উক্ত জমার চতুর্গুণ জমা খাজনা ভুক্ত করিয়া লইয়াছেন তাঁহারা ভাল মানুষ। ফল কথা উপেন্দ্রের রাজ্যে কোন অত্যাচার ছিল না। তাঁহার আমলারা দস্তুর মত যাহা পাইত তাহাতে তাহাদের সাংসারিক আবশ্যকীয় ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়া উদ্বৃত্ত হইত অথচ প্রজার কোন কষ্ট হইত না। গোকুল মামুলি ও পার্ব্বনী

যাহা পাইত তাহা দ্বারা তাহার সংসার নির্ব্বাহ হইবার প্রচুর সংস্থা হইয়াছিল। গোকুলের সমস্ত বাড়ী পাকা দালান কোঠাঘর। বাড়ীর মধ্য পাকা প্রাচীরে ঘেরা। বাড়ী প্রবেশের সড়কের দুই পাশে দুইটি পুষ্করিণী। তাহার পার্শ্বে বাগান ও শিব মন্দির। কায়েতেরা যেমন উপার্জ্জন করিত তেমনি ব্যয় করিত। গোকুলের দাস দাসী অনেক ছিল। তাহার অন্নে প্রতিপালিত আত্মীয় কুটুম্ব অনেকে তাহার বাড়ীতেই বাস করিত। পূজা ব্রত দান খয়রাত বিবাহ অন্নপ্রাশন এবং শ্রাদ্ধাদিতেও প্রচুর ব্যয় ছিল। তৎকালে সঙ্গতিপন্ন সকল লোকেই উপপত্নী রাখিত। তাহাতে কোন নিন্দা বা লজ্জার কারণ হইত না। উপপত্নী মধ্যে মুসলমানী, মালিনী ও গোয়ালীনী তৎকালে সমধিক রসিকা বলিয়া বিশেষ আদৃতা ছিল। চৈতন্য প্রভুর উপদেশ মত উপপত্নীদিগকে "হরিনাম" কাণে দিয়া তুলসী মালা গলায় দিয়া বৈষ্ণবী করা হইত। মুসলমানীরা ঐরূপে বৈষ্ণবী হইলে তাহাদের সঙ্গে বসিয়া পান খাওয়া জল ভরা হুকায় তামাক খাওয়া দুষ্য গণ্য হইত না। গোকুলেরও দুইটি মুসলমানী বৈষ্ণবী ছিল। তাহারা গোকুলের বাড়ীরই এক পার্শ্বে থাকিত। কিন্তু তাহাদের বাপ ভাই মুসলমান বলিয়া গণ্য ছিল। গোকুল তাহাদিগকে প্রচুর অর্থ দ্বারা সাহায্য করিত বটে কিন্তু তাহারা তফাতে মুসলমান পাড়ায় বাস করিত। তৎকালে উপপত্নীদিগকে "জলপাত্র" বলিত। গোকুলের জলপাত্রদ্বয়ের নাম রমজানী ও গোলাপ ছিল। গোকুল তাহাদিগকে বৈষ্ণবী করিয়া "সোণা" ও "রূপা" নাম রাখিয়াছিল। গোকুল তৎকালীন রীতি মত মধ্যাহ্নের আহারের পর সোণা ও রূপাকে লইয়া বিহার করিত। রাত্রিতে নিজ পত্নীর নিকট থাকিত। জলপাত্র থাকা হেতু পতি পত্নীতে কোন বিবাদ হইত না। বিশেষতঃ গোকুলের স্ত্রী দক্ষিণা বড় সাধ্বী ছিল। স্বামীকে কদাচ কোন বিষয়ে মনঃকষ্ট দিত না। সোণা ও রূপা তাহাকে ঠাকুরাণী দিদি বলিয়া প্রণাম করিত। দক্ষিণা তাহাদিগকে নিজ ভগিনীর মত ব্যবহার করিত এবং সময় সময় উপকার করিত পরিবারস্থ অন্যান্য লোক দাস দাসী ও আশ্রিত লোকের প্রতিও দক্ষিণার খুব সদ্ব্যবহার ছিল। গোকুলও নিজ পত্নীকে প্রাণ তুল্য ভাল বাসিত এক দিন বৈকালে গোকুল সোণা রূপার মন্দির হইতে বাড়ী আসিতে ছিলেন

সদর দরজায় পাতানীর সহ সাক্ষাৎ হইল। পাতানী মধ্যে মধ্যে গোকুলকে উপপত্নীর জন্য রমণী আনিয়া দিত। এক্ষণে তাহার সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে গোকুল নূতন রমণীর জন্য প্রার্থনা করিল। পাতানীও সুবিধা বুঝিয়া পাছে তাহার গ্রামত্যাগের কারণ প্রকাশ হইয়া পড়ে, এই বিবেচনায় নানা কথায় গোকুলকে ভুলাইয়া তাহার উপপত্নী সন্ধানে শীঘ্রই অন্য গ্রামে যাইবে বলিয়া প্রতিশ্রুত হইল এবং দুই দিবস পরেই পুত্রসহ গ্রামের বাহির হইল।

পাতানী পুঁঠিয়া পর্য্যন্ত গিয়া কুটুম্ব বাড়ীতে উঠিল। সাতগড়া হইতে যে নৌকায় আসিয়া ছিল সে নৌকা বিদায় দিল। তথা হইতে অন্য নৌকা করিয়া পুত্রসহ তাহিরপুরে উপস্থিত হইল। আষাঢ় মাস মধ্যাহ্ন সময় অতি উগ্র রৌদ্র। সেই সময়ে হরা নৌকা হইতে নামিয়া নৃসিংহের বাসা বাড়ী ঠিকানা করিয়া আসিল। পাতানী নৌকা হইতে নামিল। হরা আগে চলিল পাতানী তাহার পাছে চলিল। নৌকার মাল্লা তলপী লইয়া তাহাদের পাছে পাছে নৃসিংহের বাসা অভিমুখে চলিল। বাসার নিকট পথেই নৃসিংহের সহিত সাক্ষাৎ হইল। নৃসিংহের এখন আমলা বেশ। মাথায় সাদা পাগড়ী, কাণে কলম, চাপকান গায়, ধুতী পরা, পায়ে নাগরা জুতা। রাজবাড়ী হইতে কাচারী করিয়া বাসায় যাইতে ছিলেন। পাতানী ও হরা গলবস্ত্র হইয়া প্রণাম করিল। সান্যাল হরাকে একবার মাত্র দেখিয়া ছিলেন, তাহাকে এখন চিনিতে পারিলেন না। পাতানীকে দেখিবামাত্র চিনিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এখানে কোথায় থাক ? ভাল আছ ? ছেলে পুলে ভাল তো ?" পাতানী বলিল, "আপনার আশীর্ব্বাদে প্রাণ গতিক মঙ্গল। বাসায় চলুন সেখানে সকল কথা হবে।" নৃসিংহ তাহাদিগকে লইয়া বাসায় গেলেন। চাকর তামাক দিল। সান্যাল হুকা হাতে করিয়াই পাতানীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হরার মা ! এখন বল দেখি এখানে এসেছিস কেন ।" পাতানী উত্তর করিল, "স্নান আহার করুন তার পর অবসর মত বলিব।" সান্যাল পাতানীর কথা অন্য ভাবে বুঝিলেন। তিনি অনুমান করিলেন সর্ব্বমঙ্গলার মৃত্যু হইয়াছে ; শ্রাদ্ধাধিকারী, সেই জন্য তাঁহাকে সংবাদ দিতে আসিয়াছে। পাতানী সর্ব্বদা হাস্য মুখ এবং অত্যন্ত বাচাল। তাহার আজ গাম্ভীর্য্য দেখিয়া স্পষ্ট বোধ হয় কুসংবাদ দিবে। সংবাদ আগে দিলে অশৌচ হইবে, তাঁহার আহার

হইবে না, এই জন্য স্নান আহারের পরে সংবাদ প্রকাশ করিতে চাহে। গত পাঁচ বৎসর তিনি সর্ব্বমঙ্গলার সম্বন্ধে তত চিন্তা করেন নাই। এখন তাঁহার মৃত্যু অনুমান করিয়া ধর্ম্মপত্নীর সেই সুন্দর প্রেমময়ী মূর্ত্তি হৃদয়ে প্রদীপ্ত অগ্নি-শিখার ন্যায় আবির্ভূত হইল। তাঁহার চক্ষে জল আসিল, তিনি একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, "সংবাদ আর বলিতে হইবে না, তোমাদের চেহারাতেই জানিলাম সোণার প্রতিমা বিসর্জ্জন হইয়াছে, এখন শ্রাদ্ধ করিতে বলিতে আসিয়াছ; আমার দ্বারা তো ইহকালে কোন উপকার হইল না, পরকালের যে টুকু হয় তাহা অবশ্য কর্ত্তব্য।" আর তামাক খাওয়া হইল না, হুকাটী রাখিয়া পুনরায় দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া দণ্ডায়মান হইলেন। পাতানী বুঝিল সর্ব্বমঙ্গলা যাহা বলিয়াছিলেন তাহা ঠিক। সান্যাল যে আর এক বিবাহ করিয়াছেন সে কেবল কুলীনের দস্তুর মত কাজ। তাহাতে পূর্ব্ব পত্নীর প্রতি কোন বিরাগ হয় নাই। পাতানী অশ্রুপাত করিতে করিতে বলিল, "সে সোণার প্রতিমার কথা কি আপনার মনে আছে, কুলীনের বিয়ে টাকা পাওয়ার জন্য, শ্বশুরে টাকা দেওয়া বন্দ কর্‌লেই মেয়ের সহিত সম্পর্ক নাই, যদি স্ত্রীর সহিত সম্পর্ক থাকৃতো তবে কি শ্বশুরের উপর রাগ করে পাঁচ বৎসর তার কোন খবর না করে থাকৃতে পারতেন? খাঁ সাহেব সর্ব্বস্ব তোমাকে দিতে মনস্থ করেছিলেন তাই তোমার আবার বিবাহ শুনে একটু রাগারাগি করেছেন। তা সে রাগারাগি তোমার কাকার প্রতি, তোমার প্রতি নয়; দুই বিহায়ে রাগারাগি হ'লো তাতে তোমার কি? খুড়া মামা আর শ্বশুর তিনই সমান গুরুজন, তিনের সহিত সমান সম্পর্ক। তবে শ্বশুরের সঙ্গে তোমার বিবাদ কি? তার পর শ্বশুরের সঙ্গে বিবাদ হলেই বা আপনার স্ত্রী পুত্র দোষী কিসে? শ্বশুরে যে দিন কন্যা দান করেছে সেই দিনই তার দায় ফুরায়েছে। তোমার স্ত্রী তুমি রাখ্‌বে তুমি খেতে পর্‌তে দিবে। তোমার ভাল মন্দ তার, তার ভাল মন্দ তোমার। ঠাকৃরুণ দিদি তো কোন দোষ করে নাই, আর সে দোষ কর্‌বার মেয়েও না, দেখতে যেমন সোণার প্রতিমা, গুণে তার চেয়ে শত গুণে বেশী। যে অবধি তুমি সাতগড়া ছাড়্‌লে সেই অবধি ঠাকৃরুণ দিদি সর্ব্বস্ব ত্যাগী যোগিনী, সে হাসি নাই খুসি নাই, গায় একখানি অলঙ্কার নাই। যদি তুমি কুলীন না হ'তে, মন পাষাণ না হ'তো, তবে তার মনের কথা তুমি বুঝ্‌তে পার্‌তে।"

নৃসিংহ। অনেক কুলীনের বিয়ে ব্যবসায় বটে কিন্তু আমাদের গোষ্ঠীর সে রীতি নাই। তবে যে পাঁচ বৎসর খবর কর্‌লাম না সেটী দেশাচার দোষে। প্রাচীন সুনীতি এখন নাই। এখন দশজন লোকের সাক্ষাতে স্ত্রীর সহিত কথা বার্ত্তা বলা বড় লজ্জার বিষয়, ঘোর অপকর্ম্ম, চুরি ডাকাতি চেয়েও বেশী দূষ্য। স্ত্রীর ব্যারাম, স্বামী তার কাছে গিয়া দেখ্‌লে নিন্দা হয়, স্বামী মরণাপন্ন কাতর, অন্যে শুশ্রূষা কর্‌ছে কিন্তু স্ত্রী তার কাছে গেলে নির্লজ্জা বলে নিন্দিতা হয়। সেই জন্যই আমি তাকে আন্‌তে পারিলাম না, সেও আস্‌তে পারে নাই। আমি তার মন জানিতাম সেও আমার মন জান্‌তো। আমি যে আর এক বিবাহ করেছি সেটি গুরুজনের অনুরোধে, আর কুলীন ও কুলজ্ঞদের অনুরোধে এবং কুলপতির বংশের কর্ত্তব্য কর্ম্ম জ্ঞানে। শ্বশুরের সম্পত্তিতে লোভ আমাদের পূর্ব্বেও ছিল না এখনও নাই। সে লোভ থাকলে আর দ্বিতীয় বিবাহ কর্‌বো কেন? আমি তাকে মনে ভাল বাস্‌তাম কিনা, আর কেনই বা পাঁচ বৎসর তাকে ছেড়ে আছি, তা এখন বেশী বলে তো কোন ফল নাই।

পা। রাজকুমারী এখনও আছেন কিন্তু মরার মত হয়ে আছেন, সে রূপ নাই সে হাসি নাই, সে চেহারাও নাই; আপনি দেখ্‌লে বোধ হয় চিন্‌তে পারবেন না।

সা। তবে যে তুই বল্‌লি যে সে মরেছে!

পা। কৈ আমি তো তা বলি নাই! আপনি নিজেই ঐরূপ অনুমান কর্‌ছিলেন; প্রকৃত অবস্থাও প্রায় তাই, কেবল আমার ফিরে যাওয়ার অপেক্ষায় প্রাণ আছে।

সা। তোকে পাঠায়েছে কে?

পা। রাজকুমারী পাঠায়েছেন কিম্বা তাঁর অবস্থা দেখে আমি নিজে এসেছি।

সা। কোন চিঠি পত্র আছে?

পাতানি সর্ব্বমঙ্গলার চিঠি দিল। লেখা দেখিয়াই সান্যাল তাঁহার পত্নীর হস্তাক্ষর চিনিলেন, মনস্থির হইল। পত্রখানির আদ্যোপান্ত পড়িয়া সমস্ত মর্ম্ম অবগত হইলেন।

সর্ব্বমঙ্গলা পরমসুন্দরী সুশীলা এবং সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ হইবে নৃসিংহ উত্তমরূপেই জানিতেন। আন্তরিক ভালও বাসিতেন কিন্তু যে প্রেমে লোক গলে যায় সে প্রেম হয় নাই। সে প্রেম তৎকালে এদেশে প্রচলিত ছিল কি না তাহাও

বলা যায় না। আজ কাল কাব্য নাটকাদিতে যেরূপ প্রেমের ঢলাঢলি বর্ণিত হয় তাদৃশ উন্মত্ত প্রেম তখন কাপুরুষের লক্ষণ বলিয়া গণ্য ছিল। দীর্ঘকাল বিচ্ছেদে শিথিলতা প্রাপ্ত প্রেমভাব নৃসিংহের মনে উত্তেজিত হইল। তিনি পত্নীকে নিজের নিকট আনিতে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইলেন। তিনি পাতানীকে বলিলেন,"হরার মা! আমি শ্বশুর বাড়ী যাব না। কিন্তু তোমার ঠাকরাণী দিদিকে অবশ্যই আন্‌তে হবে। কিন্তু কাকার কাছে কি মার কাছে কিছু বলা হবে না। যদি তাঁদের কাছে বলি আর তাঁরা নিষেধ করেন, আমি সে কথা না মেনে রাজকুমারীকে নিয়ে এলে অনেক আপদ অনেক নিন্দা হবে কিন্তু যদি আমি না জানায়ে আপনার স্ত্রী আপনি নিয়ে আসি তাতে বিশেষ কোন দোষ নাই। গুরুজনের বিনা সম্মতিতে কাজ করা আর স্পষ্ট অসম্মতিতে কাজ করায় অনেক তফাৎ। যে কাজ আমি নিশ্চয়ই কর্‌বো অথচ তাতে গুরুজনের সম্মতি হবে কিনা তাহার নিশ্চয় নাই সে কাজ না জানায়ে করাই কর্ত্তব্য। সেই জন্য মাকে কাকাকে কিছু জানাবো না। ওদিকে খাঁ সাহেবকেও কিছু জানাব না। খাঁ সাহেব জান্‌লেই গোকুলও জান্‌বে। সে সেই সুযোগে বিবাদ ও গোলযোগ বৃদ্ধি করতে চেষ্টা কর্‌বে। এই জন্য খাঁ সাহেবকেও জানান হবে না। পরে জান্‌লে কোন দোষ নাই। জামাই নিজে এসে মেয়ে নিয়েছে, মেয়ে স্বেচ্ছাক্রমে স্বামীর সঙ্গে গেছে তাতে সন্তোষ ভিন্ন অসন্তোষের কথা নাই। যদি গোকুলের কুপরামর্শে তিনি তাতে নারাজ হন তবু কোন ক্ষতি নাই। আমি অর্থলোভী নই। শ্বশুরের সম্পত্তির জন্যও লালায়িত নহি। এত দিন কিছু বৃত্তান্ত না জানায় কিছু করিতে পারি নাই। এখন জানিলাম রাজকুমারী আমার কাছে আসিতে ব্যগ্র, রাণীমাদের ইচ্ছা তাহার অনুকূল, তার পর বাগছি সাহেব ও তুমি সাহায্য কর্‌বে, এত সহায় হ'লে কাজ অবশ্যই হবে। আমি গুপ্তভাবে নৌকায় সাতগড়া যাব। প্রাচীরের পূর্ব্বদিকে বাহির হ'তে মই ফেলে কাঁঠাল গাছে উঠে আবার সেই মই প্রাচীরের ভিতরে ফেল্‌বো, ভিতরে নেমে রাজকুমারীর ঘরে যাব। তাকে সঙ্গে নিয়ে ঐ উপায়ে বাহির হয়ে নৌকায় আস্‌ব, এখানে এসে চিঠিদ্বারা জানাব যে 'সর্ব্বমঙ্গলা কুলটা হয় নাই, অন্যের সঙ্গে যায় নাই আমার স্ত্রী আমি এনেছি।' আমি তো এই উপায় স্থির করেছি।"

পাতানী ইহাতে অসম্মত হইল, সে কহিল, "আপনি চৈত্র মাসের যোগে গঙ্গা-স্নান কর্‌তে বালুচর বরনগর যাবেন। আমি, বুড়ো দেওয়ানজী, ঠাকরুণদিদি ও রাণী মাদের নিয়ে সেখানে যাব সেই খানে হাতে হাতে লক্ষ্মীনারায়ণ মিল করে দিব। টাকা কড়ী জিনিস পত্রও দিব। দাস দাসী লোকলস্কর সঙ্গে দিব কোন আপদ বিপদ কিছু হবে না। খাঁ সাহেব শুন্‌বেন জামাই নিজে এসে মেয়ে নিয়ে গেছে, মেয়েও রাজি খুসী হয়ে স্বামীর সঙ্গে গেছে। তাতে তিনিও খুসী হবেন।"

পাতানীর পরামর্শই স্থির হইল। নৃসিংহ সর্ব্বমঙ্গলার নামে এবং বাগছি সাহেবের নামে দুই চিঠি দিলেন। পাতানীকে ও হরাকে পুরস্কার দিতে চাহিলেন, তাহারা অন্য পুরস্কার কিছুই না লইয়া কেবল ধুতী ও কিছু দ্রব্য লইয়া প্রণাম করিয়া বিদায় হইয়া গঙ্গাস্নানে বরনগর বালুচর চলিল।

সপ্তদশ অধ্যায়।

সর্ব্বমঙ্গলার স্বামীসহ মিলন।

তখন গঙ্গার দক্ষিণ পাঁরে বৈষ্ণব মতের বড় বাড়াবাড়ি ছিল। আধুনিক ব্রাহ্ম ধর্ম্মের ন্যায় বৈষ্ণব ধর্ম্মেও প্রায় জাতিভেদ ছিল না। ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব হইলেও ব্রাহ্মণ থাকিত। তদ্‌ভিন্ন অপর সকল শ্রেণীর হিন্দুই বৈষ্ণব হইলে সমান হইত। বৈষ্ণবেরা অসতী রমণীদিগকে বড় ঘৃণা করিত না। নষ্টা দুষ্টা স্ত্রীলোকে পালে পালে বৈষ্ণবী হইত। সেই ব্যবহার এত বেশী হইয়াছিল যে হিন্দু বেশ্যা সমস্তই 'বৈষ্ণবী' নামে অভিহিত হইত। পাতানী গঙ্গাস্নান করিয়া আপনার পচ্ছন্দ মত একটি বৈষ্ণবী খুজিয়া লইল। তাহাকে পাতানী গোকুলের উপপত্নী হইবার প্রস্তাব করিল। গোকুল একটাকিয়া রাজার প্রধান অমাত্য, জাতীতে কায়স্থ, সুন্দর যুবা পুরুষ, সুতরাং সে প্রস্তাব বৈষ্ণবী শ্লাঘ্য জ্ঞান করিল। পাতানী তাহার পালিকা মাতাকে পঞ্চাশটি টাকা দিয়া সম্মত করিয়া একবারে তাহাকে সঙ্গে করিয়া নৌকা পথে সাতগড়া চলিল। গঙ্গা মৃত্তিকা, গঙ্গাজল বালুচরে শাড়ী এবং অন্যান্য গঙ্গাতীরের জিনিস সঙ্গে লইল। তাহাকে নিজ ভগিনীর সমস্ত পরিচয় শিক্ষা দিয়া, পাতানী সাতগড়ায় পৌছিল। বাগছি সাহেব, রাজকুমারী ও রাণীরা দেখিলেন পাতানী তাঁহাদের কার্য্যোদ্ধার করিয়া আসিয়াছে। গোকুল দেখিলেন পাতানী তাঁহার মনোমত উপপত্নী যোটাইয়াছে। অন্য লোক দেখিল পাতানী গঙ্গাস্নান করিয়া নিজ ভগিনীকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিয়াছে। বিভিন্ন উদ্দেশ্যে সকলেই পাতানীর প্রশংসা করিল।

পরদিন বৈকালে পাতানী সেই কৃত্রিম প্যারীকে লইয়া গোকুলের প্রমোদ কাননে উপস্থিত হইল। শিক্ষিতা প্যারী প্রথমে অত্যন্ত লজ্জা প্রকাশ করিল, কৃত্রিম পলায়নের চেষ্টা করিল, অনেক আপত্তি করিল, রাগ করিল, ধর্ম্মের দোহাই দিল, সে যেন লজ্জাশীলা কুলবধূ ইহা গোকুলের হৃদয়ঙ্গম করিয়া আপনার মূল্য বৃদ্ধি করিল। পাতানী ও গোকুল অনেক সাধ্য সাধনা করিলেন, গোকুল তাহার

সর্ব্বাঙ্গে স্বর্ণরৌপ্যের অলঙ্কার দিতে, শরীর ওজনে টাকা দিতে স্বীকার করিয়া পায়ে ধরিলেন, পাতানীও অনেক বুঝাইল অনেক অনুরোধ করিল, তখন যেন নিতান্ত দায়ে পড়িয়া প্যারী গোকুলের বাসনা পূরণ করিতে অস্পষ্ট স্বীকার করিল। সে সম্মত হইবা মাত্র, পাতানী নিষ্ক্রান্ত হইয়া রাজবাড়ী গেল।

পাতানী রাণীদের সহ সাক্ষাৎ করিল। বৃদ্ধ দেওয়ানজীকে ডাকা হইল। তাঁহার নামীয় চিঠি তিনি পড়িলেন। সর্ব্বমঙ্গলার প্রতি যে নৃসিংহের প্রগাঢ় অনুরাগ আছে পাতানী তাহার বর্ণনা করিল। নৃসিংহ যে উপায়ে সর্ব্বমঙ্গলাকে লইয়া যাইতে উৎসুক হইয়াছিলেন আর সে যে উপায়ে মিলন করিবে প্রতিশ্রুত হইয়া আসিয়াছে তাহাও বলিল। গোকুলকে যে উপায়ে বশীভূত করিয়া তাহারই খরচে তাহার অজ্ঞাতে সকল কার্য্য করিয়া আসিল তাহাও বলিল। রাণী সৌদামিনী পাতানীকে বক্‌সিস দিতে চাহিলেন, পাতানী হাসিয়া বলিল, "এখন কিছুই লইব না। যদি লক্ষী নারায়ণ মিলন করিতে পারি তখন যে যা তুষ্ট হবে দিবেন তাহা কম হইলে চেয়ে লইব। আমি সান্ন্যাল সাহেবকেও তাই বলিয়াছি আপনাদের কাছেও তাই বলি।" সকলেই এক বাক্যে পাতানীর বুদ্ধি, কার্য্যদক্ষতা, নির্লোভিতার প্রশংসা করিলেন। পাতানী তাঁহাদিগকে প্রণাম করিয়া রাজকুমারীর নিকট চলিল। বাগছি সাহেব বলিলেন, "তবে গঙ্গাস্নানে যাওয়ার একটা দিন স্থির করি।" রাণী পবিত্রা বলিলেন, "আমি মনে করিয়াছিলাম জামাই বিরূপ হইয়াছে, তাই কি করি স্থির করিতে পারি নাই। যদি জামাই রাজি থাকে তবে আর ভাবনা কি? গঙ্গাস্নানেও যেতে হবে না কোন কল কৌশলও করিতে হইবে না, আমি ছোট্ ঠাকুরকে বলে কয়ে সম্মত করে জামাইয়ের কাছে মেয়ে পাঠাইব। তিনি না যান আপনি গিয়া রাখিয়া আসিবেন। জামাই রাজি আছে শুনে ছোট্ ঠাকুর কোন আপত্তি করিবে না।"

দেওয়ানজী বলিলেন, "খাঁ সাহেব কিন্তু গোকুলের প্রবঞ্চনায় আপত্তি করিতে পারেন। যদি তিনি আপত্তি না করেন তবু গোকুল বিপত্তি উপস্থিত করিবে। সে জানে যে নৃসিংহের কাছে তার কোন কর্তৃত্ব খাটিবে না। সেই জন্য সর্ব্বমঙ্গলা কোন মতে রাজ্য না পায় তাই তার প্রতিজ্ঞা। শ্বশুর জামাইয়ে সদ্ভাব হইতে দিবে না। নৃসিংহ গেছে, সর্ব্বা এখান হইতে যায়

ইহা গোকুলের প্রার্থনীয়। যদি গঙ্গাতীরে আমরা জামাইয়ের হাতে মেয়ে দিয়ে আসি তাহাতে গোকুল খাঁ সাহেবকে বলিবে, কন্যা ও জামাতা তোমার অবাধ্য, তাহাদের উত্তরাধিকারী করা অনুচিত। কিন্তু যদি আমরা খাঁ সাহেবকে রাজি করে জামাইয়ের কাছে মেয়ে পাঠাই তবে গোকুলের ভয় হয়ে সে নৃসিংহ ও তার মা খুড়ার কাছে লোক পাঠায়ে জানাইবে মঙ্গলার চরিত্র মন্দ হইয়াছে, সেই জন্য এতদিন পর খাঁ সাহেব মেয়ে পাঠাইয়াছেন। তখন বিষম বিপদ হইবে। যখন রাজ্যলোভ ত্যাগ করে সর্ব্বমঙ্গলা স্বামীর কাছে যেতে উৎসুক আমারও তাই স্বীকার। তখন আর গোল বাধায়ে কাজ কি? গোকুলের স্বার্থের কোন বিঘ্ন না হইলে সে সর্ব্বার কোন অনিষ্ট করিবে না। তাই আমি বিবেচনা করি যে এখন কোন গোল করে কাজ নাই, সর্ব্বা স্বামীর সঙ্গে যাউক, তথায় দুই বৎসর থেকে সকলের প্রিয় হউক, তার পর আমরা চেষ্টা করে খাঁ সাহেবকে যতদূর পারি রাজি করিব। একবারে সকল মিটাইতে চাহিলে কিছুই হইবে না বরং বিবাদ বেশী হইবে।"

সর্ব্বমঙ্গলা পাতানীর সঙ্গে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন, সমুদায় শুনিলেন, তিনি লজ্জা ত্যাগ করিয়া পাতানীর দ্বারা বলিলেন, "আমি রাজ্য ধন কিছুই চাই না, বাবা দত্তক রাখেন বা সমস্ত রাজ্য গোকুল পাউক তাহাতে আমি ক্ষতি বোধ করি না, আমি স্বামীর ঘরে যাব, তিনি যেরূপ ভাত কাপড় দিবেন তাই আমার ভাল। তাহাতে কোন বাধা না হইলেই আমি সুখী হইব। বাবার সঙ্গে আমার শ্বশুর শ্বাশুড়ীর বিবাদ জন্য পাঁচ বৎসর তাঁহারা আমার কোন খবর করেন নাই। পাতানী দিদি গিয়া আমার একটা পথ করে আসিয়াছে। এখন যদি কেহ আমার একটু কলঙ্ক করে তবেই আর তাঁরা আমাকে লইবেন না। আমি সে কথা শুনিলেই আত্মহত্যা করিব, তখন কার রাজ্য কার ধন।"

তাঁহার কথায় সকল তর্ক শেষ হইল। দেওয়ানজী পঞ্জিকা দেখিয়া গঙ্গা স্নানের দিন স্থির করিলেন। বৃদ্ধ দেওয়ানজী উপেন্দ্রের নিকট প্রস্তাব করিলেন যে, "রাণীরা গঙ্গাস্নানে যেতে চান, আমাকে এবং পুরোহিত ঠাকুরকে সঙ্গে যাইতে বলেন, আপনকার হুকুম হলে দিনস্থির করা যায়।" খাঁ সাহেব নিজে তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু তাহা দেওয়ানজীর

অভিপ্রায় জন্য তিনি নানারূপ আপত্তি উপস্থিত করিলেন। উপেন্দ্র গোকুলের সহিত পরামর্শ না করিয়া কোনই গুরুতর কার্য্য করিতেন না। তিনি গোকুলকে ডাকিয়া তাঁহার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। বাগছি সাহেব যতই অনুপস্থিত থাকেন ততই গোকুলের সুবিধা হয়। কিন্তু খাঁ সাহেব যদি নিজেই তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া যান, তবে বাগছি সাহেব ও রাণীরা গোকুলের অসাক্ষাতে তাঁহার অনিষ্টকর অনেক কথা বলিতে সুবিধা পাইবেন। এজন্য গোকুল খাঁ সাহেবকে সাতগড়ায় রাখিয়া বাগছি সাহেব ও রাণীগণকে স্থানান্তর করিতে মনে করিলেন। দেওয়ানজীর এবং গোকুলের মতের ঐক্য হইল। লালা সাহেব বলিলেন, "এখন ঔরংজীব বাদশাহ হইয়াছেন। আপনি যে শাহজাদা দারার প্রিয়পাত্র ছিলেন তাহা বোধ হয় ঔরংজীব জানেন। একটু গোলযোগ কিম্বা ত্রুটি হইলে অনেক বিপদ হইতে পারে। এ সময় রাজকার্য্য ছাড়িয়া এক মুহূর্ত্তের জন্যও আপনার স্থানান্তর যাওয়া অনুচিত। ঘরে বসিয়া ঈশ্বরের নাম করিলেই সকল তীর্থের ফল হয়। বিষয়ী লোকের যেমন ধর্ম্ম দেখিতে হয় তেমনি কর্ম্মও দেখিতে হয়। রাণী মা যে বাগছি সাহেব ও বাচস্পতি ঠাকুরকে লইয়া গঙ্গাস্নানে যাইতে চাহিয়াছেন আমি বিবেচনা করি তাহাই উত্তম।" বাগছি সাহেবের ও লালা সাহেবের মত এক হওয়ায় আর কোন আপত্তি হইল না। উপেন্দ্র যাত্রার দিন স্থির করিয়া আবশ্যক সামগ্রী সংগ্রহের আদেশ দিলেন। সর্ব্বমঙ্গলা মাতার সঙ্গে যাইতে অনুমতি প্রার্থনা করায় উপেন্দ্র তাহাও অনুমোদন করিলেন। সমস্ত আয়োজন হইতে লাগিল। বাগছি সাহেব গোপনে চিঠি লিখিয়া নৃসিংহকে যথা সময়ে বালুচরে উপস্থিত হইতে অনুরোধ করিলেন।

পূর্ব্বে আমাদের দেশের নদ নদীগুলি প্রবাহিত ছিল। ভূমি উর্ব্বরা ছিল, লোক সরল সবল সুষ্টুকায় এবং দীর্ঘজীবী ছিল। লোকের আকৃতি অনেক বড় ছিল এবং আহার প্রচুর বেশী ছিল। লোকে অতি অল্পমাত্র জিনিষ প্রয়োজনীয় বোধ করিত, সেই সকল জিনিষও সস্তা ছিল; অল্প টাকায় সংসার চলিত। লোকের মুখ প্রফুল্ল এবং চিত্ত সন্তুষ্ট ছিল। তখন রঙ্গপুর দিনাজপুর প্রভৃতি উত্তর বাঙ্গালার অবস্থা অতিশয় হীন ছিল। কলিকাতা ও তাহার দক্ষিণবর্ত্তী স্থান নরককুণ্ড নামে খ্যাত ছিল।

ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব্বপারস্থ স্থানগুলিও তদ্রূপ অপকৃষ্ট ছিল। ঐ সকল স্থান তৎকালে বাঙ্গালা দেশ বলিয়াই গণ্য ছিল না। পক্ষান্তরে ভাগীরথীর ও ইচ্ছামতীর তীরবর্ত্তী স্থান সমূহ স্বর্গতুল্য ছিল। দুগ্ধের ন্যায় শুভ্র সুমিষ্ট স্বাস্থ্যকর জলরাশি এই সকল নদীতে বারমাস প্রবল বেগে প্রবাহিত হইত। ওলাউঠা ম্যালেরিয়া ইনফ্লুএঞ্জা প্রভৃতি রোগের নামও ছিল না। নদ নদীর উভয় তীরে বহুসংখ্যক সমৃদ্ধ গ্রাম নগর হাট বাজার ছিল। প্রতি গ্রামের সম্মুখে নদীর ধারে নানাবিধ দেবালয় ছিল। অল্প জমিতে কৃষি কার্য্য হইত তাহাতেই প্রচুর শস্য হইত। বিদেশে রপ্তানি প্রায় ছিল না, সুতরাং বেশী জমি কর্ষণ আবশ্যক হইত না। পশুচারণের জন্য বড় বড় মাঠ ছিল। তদ্ভিন্ন বিস্তীর্ণ জঙ্গল ছিল। জ্বালানি কাঠ প্রায় কেহ মূল্য দিয়া কিনিত না। হস্তী, গণ্ডার, বন্য মহিষ, বন্য শূকর, বন্য গরু, হরিণ প্রভৃতি জন্তু সেই সকল জঙ্গলে বাস করিত। সেই সকল জঙ্গলে নানা প্রকার ব্যাঘ্র এবং বিষাক্ত সর্পও ছিল। জল জঙ্গল বেশী থাকায় দেশের শীত বেশী ছিল। লোকেরা সাহসী ও বলবান ছিল, রাজশাসন কম ছিল। অনতিদূরেই জঙ্গলে গোপনে থাকিবার সুবিধা ছিল, সেই জন্য দস্যু তস্কর অনেক বেশী ছিল। বিদ্যা ও শিল্পকার্য্যের চর্চ্চা অনেক কম ছিল কিন্তু যাহা ছিল তাহা সমস্তই স্বদেশীয়। এক্ষণে যেমন বিদেশীয় বিদ্যা মুখস্থ করিয়া তাহাই উদ্গীরণকারী বিদ্বান নামে খ্যাত হয় এবং বিদেশীয় শিল্পের অনুকরণকারী আপনাকে বিশ্বকর্ম্মা জ্ঞান করে, তখন তাহা ছিল না। তখন যে যাহা করিত তাহা তাহার নিজ বুদ্ধি পরিচালন দ্বারাই হইত। ফলতঃ একাল হইতে সে কালে কোন কোন বিষয়ে ভাল আবার কোন কোন বিষয়ে মন্দ ছিল। এখন কাশীধামে যেমন বহুসংখ্যক বাঙ্গালীর বসতি হইয়াছে তখন তাহা ছিল না। কদাচিৎ কেহ তত দূরে তীর্থ করিতে যাইত। ভাগীরথীর ধারেই নানা স্থানের লোক গিয়া গঙ্গাবাস করিত। তন্মধ্যে রাজসাহী, পাবনা, বগুড়া, ময়মনসিংহ এবং ঢাকার উত্তর ভাগের লোকেরা সচরাচর বালুচর বরনগরেই গঙ্গাস্নানে বা গঙ্গাবাসে যাইত। বরনগরে মস্তরাম বাবাজীর আখড়া অতি প্রসিদ্ধ পবিত্র আশ্রম। এখানে হিন্দুস্থানী সন্ন্যাসীদিগের একটি দেবালয় আছে। আশ্রমের নিকট দুইটি বড় বড়

বেগুণের গাছ আছে। অনেকেই দেবালয় দর্শন করিতে গিয়া ঐ বেগুণের গাছ দুইটি না দেখিয়া কৌতুহল নিবৃত্তি করিতে পারিত না। বাগছি সাহেব রাণীদিগকে মস্তরাম বাবাজীর আখড়া দেখাইতে যাইতে ছিলেন। তীর্থস্থানে বিশেষ আড়ম্বর ছিল না। সকলের আগে দুইজন পাণ্ডা, তার পশ্চাতে দুইজন সিপাহী, তার পর বাগছি সাহেব ও পুরোহিত ঠাকুর, তৎপশ্চাতে রাণী পবিত্রা, সর্ব্বমঙ্গলা ও রাণী সৌদামিনী ও পাতানী, তৎপশ্চাতে কয়েকজন পূজারী ব্রাহ্মণ, তার পরে কয়েকজন দাস দাসী, সর্ব্ব পশ্চাতে আর দুই জন সিপাহী। রাণীরা ও রাজকুমারী আখড়ার বাহিরে ডুলী রাখিয়া পদব্রজেই যাইতে ছিলেন। হঠাৎ পাতানী সর্ব্বমঙ্গলার প্রতি ইঙ্গিত করিল। মঙ্গলা চকিত হইয়া পাতানীর অঙ্গুলি নির্দ্দেশ মত দক্ষিণ দিকে চাহিলেন। বৃহৎ বার্ত্তাকুতরু তলে তাঁহার হৃদয়ের একমাত্র চিন্তার বিষয়ীভূত নৃসিংহকে দেখিতে পাইলেন। দৃষ্টিমাত্র মনে অদ্ভুত প্রেম ভাবের উদয় হইল। তাঁহার গতি রোধ হইল। গুরুজন নিকটে থাকায় তিনি একবার মাত্র স্বামীর দিকে দৃষ্টি করিয়াই মস্তক অবনত করিলেন। মনের ইচ্ছা সত্ত্বেও লজ্জায় আর মাথা তুলিতে পারিলেন না।

সর্ব্বমঙ্গলাকে নিস্পন্দ দেখিয়া রাণী সৌদামিনী তাঁহাকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। মঙ্গলা বাহ্যজ্ঞানশূন্য, কোন উত্তর দিলেন না। পাতানী আবার অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া নৃসিংহকে দেখাইলেন। বাগছি সাহেব জানিলেন নৃসিংহ তাঁহারই পত্র অনুসারে তথায় আসিয়াছেন অতএব তাঁহাকে ডাকিয়া আনা তাঁহারই কর্ত্তব্য কর্ম্ম। তৎক্ষণাৎ তিনি ও বাচস্পতি ঠাকুর নৃসিংহের নিকট উপস্থিত হইলেন। নৃসিংহ উভয়কে প্রণাম করিলেন। উভয়েই আশীর্ব্বাদ করিলেন। পরস্পর মঙ্গল জিজ্ঞাসার পর বাচস্পতি ঠাকুর নৃসিংহকে ধর্ম্মপত্নীর প্রতি অবহেলা এবং চাকুরী ব্যবসায় অবলম্বন হেতু কিছু মিষ্ট তিরস্কার করিলেন। নৃসিংহ বিনীত ভাবে বলিলেন, "আমি কর্ত্তা নহি, নিজ ইচ্ছামত কিছুই করিতে পারি না। আপনারা যদি খুড়া মহাশয়ের নিকট কোনরূপ অনুরোধ করিতেন বোধ হয় তিনিও তাহা লঙ্ঘন করিতেন না। যাহা হউক, আমি চাকরী উপলক্ষে স্থানান্তরে থাকি বলিয়া কতক স্বাধীন আছি; আমার হাতে টাকা আছে সেই জন্য আমি

দেওয়ানজীর আজ্ঞামত এখানে আসিতে পারিয়াছি নতুবা ছোট কর্ত্তার অনুমতি ব্যতীত কিছুই করিতে পারিতাম না। অথচ আধুনিক দেশাচার বিরুদ্ধে আমি তাঁহার নিকট এবিষয়ে অনুমতি লইতে পারিতাম না। এখন যেমন আজ্ঞা করিবেন আমি সাধ্যমত তাহাই পালন করিব।” দেওয়ানজী এবং পণ্ডিতজী উভয়েই তাঁহার বিনীত উত্তরে সন্তুষ্ট হইলেন, তাঁহারা নৃসিংহকে সঙ্গে লইয়া রাণীদের নিকট উপস্থিত করিলেন। নৃসিংহ তাঁহাদিগকে প্রণাম করিলেন। রাণীরা বিস্তর রোদন ও অনুযোগ করিলেন।

পথের মধ্যে অধিক কথা হইল না। মস্তরাম বাবাজীর আখড়া দেখা হইল। সান্যাল, বাচস্পতি ও দেওয়ানজীর মধ্যে থাকিলেন। কার্য্যদর্শী বাচস্পতি দেবমন্দিরে নৃসিংহকে প্রতিজ্ঞা করাইলেন যে, “তিনি সর্ব্বমঙ্গলার প্রতি পূর্ব্ববৎ প্রীতি রাখিবেন এবং তাঁহার মঙ্গল চেষ্টা করিবেন।” পরে সকলে বাসায় প্রত্যাগমন করিলেন। বহু দিবস পরে স্বামী সহ সর্ব্বমঙ্গলার মিলন হইল, কিন্তু দেশাচার জন্য এ পর্য্যন্ত তাঁহাদের উভয়ের কোন কথোপকথন হইল না, নীরবে অবগুণ্ঠন মধ্যে সর্ব্বমঙ্গলা আনন্দাশ্রুপাত করিলেন।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

সর্ব্বমঙ্গলার স্বামীগৃহে গমন।—উপেন্দ্রের দত্তক গ্রহণ।

বাসায় উপস্থিত হইলে দেওয়ানজী বলিলেন, "বাপুহে! 'স্ত্রী দিয়া শ্বশুরের সহিত সম্পর্ক, শ্বশুর দিয়া স্ত্রীর সহিত সম্পর্ক নয়। শ্বশুরের উপর রাগ হয় আপনার স্ত্রী আর ছেড়ে দিও না তাতে পত্নীর প্রতি বিরাগ কর্‌তে নাই। তুমি বিদ্বান বুদ্ধিমান তোমাকে অধিক বলা অনাবশ্যক। তার হিতাহিত পাপ পুণ্যের ভাগী তুমি। তার বাপের কোন দায় দাবী নাই। ও মেয়ে এখন তোমারি এই বুঝে তোমার যা কর্ত্তব্য তাই করবে।" রাণীরাও কান্দাকাটি করিয়া বলিলেন, "সর্ব্বা তোমার জন্য সর্ব্বত্যাগী, সে তোমার, তুমি তাকে দেখো, তুমি না দেখ্‌লে আর জগতে তাকে কে দেখ্‌বে?"

নৃসিংহ বলিলেন, "আমি প্রথমেই পাতানীর কাছে আমার সমস্ত কথা বলেছি। আমি কাহারও উপর রাগ করি নাই, বিরাগও করি নাই, বিবাদও করি নাই। খাঁ সাহেব রাগ করেছেন জেনে মা খুড়া খুড়ী আমাকে সাতগড়ায় যাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন সেই জন্য আমি যাই নাই। আমি ইচ্ছামত নিয়ে যাইতে পারি নাই। আপনারা যদি তাকে পাঠাতেন কি নিয়ে যেতে বল্‌তেন ছোট কর্ত্তাও তা অস্বীকার কর্‌তেন না। পাছে অপমান হয় এই ভয়েই বোধ হয় কাকা তাকে নিতে চেষ্টা করেন নাই। আমি যা করেছি তা সমস্তই বাধ্য হয়ে করেছি। আমার অনুরাগ বা মমতা তাতে কিছু মাত্র কম হয় নাই। আমি এবার নিয়ে যাচ্ছি, আমি তাকে কি ভাবে রাখি কেমন দেখি তা জানতে পার্‌বেন।"

রাণী পবিত্রা বলিলেন, "আমাদের আশা ছিল যে এ কুটুম্ব বিবাদ অল্প দিনে মিটিবে। আবার তোমাকে সাতগড়ায় নিয়ে যাব ক্রমে তোমাকে ভাদুড়ীচক্রের রাজা কর্‌বো। সর্ব্বা সাতগড়া ছাড়িলেই দত্তক রাখা হবে তখন আর তোমাদের রাজপদের আশা নাই। আমাদের সে আশা আর হ'লো না, তোমরা

অভিমান করে থাকলে ছোট ঠাকুরও অভিমান করে থাক্‌লো, মেয়ে এদিকে প্রতিজ্ঞা করে বসেছে যে সতীনের দাসী হবে তোমার কাছে থাক্‌বে তবু বাপের বাড়ী থাক্‌বে না, সে রাজ্য ধন কিছু চায় না কেবল তোমাকে চায়। তোমার কাছে না থাক্‌তে পার্‌লে সে আত্মঘাতী হবে, কাজেই আমরা সকল আশা ছেড়ে তাকে তোমার হাতে এনে দিলাম। সর্ব্বা আমাদের বড় আদরের মেয়ে এখন তুমি যদি আদরে রাখ তবেই তার সুখ নতুবা সকল আদরই মিথ্যা।" এই বলিয়া পবিত্রা সর্ব্বমঙ্গলার হাত ধরিয়া নৃসিংহের হাতে দিয়া কান্দিতে লাগিলেন। রাণী সৌদামিনী কান্দিলেন। বাচস্পতি ঠাকুর অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "বাপুহে, কলিকাল যুগধর্ম্ম দেখে আমার কিছু বল্‌তে হচ্ছে নতুবা তোমার ধর্ম্মপত্নী তাকে তুমি ভাল বাসবে এ কথা বলা আবশ্যক কি? তুমি কুলপতির সন্তান, সকল ব্রাহ্মণের শিরোমণি, নিজে বিদ্বান বুদ্ধিমান জ্ঞানবান ধার্ম্মিক, আর এই সর্ব্বমঙ্গলা অতি সতী সাধ্বী সুশীলা সর্ব্বগুণান্বিতা। তুমি অন্য কানপত্নীর বশ হয়ে কদাচ ইহাকে অবহেলা করো না। নিজ ধর্ম্ম রাখ, কুলের গৌরব ঠিক রাখ ঈশ্বরকে সর্ব্বদা সম্মুখে দেখে চল। আমার কথা এই যে যখন দুই বিবাহ করেছ আর বিবাহ করো না, উভয় পত্নীর প্রতি সমদৃষ্টি রেখো আর স্ববৃত্তি যে আরম্ভ করেছ ও চাকরীটি ছেড়ে দিও।" তাহার পর বাগছি সাহেব এবং পাতানীও যথাসাধ্য সর্ব্বমঙ্গলার সচ্চরিত্র ব্যাখ্যা করিয়া তাঁহার প্রতি সদ্ব্যবহারে অনুরোধ করিলেন।

নৃসিংহ অবনত শিরে বলিলেন, "আমি যে তাহাকে বরাবর ভাল বাসি এবং বরাবর ভাল বাসিব তাহাতে অন্যের অনুরোধ বা প্রলোভনের কোন প্রয়োজন নাই। তবে আপনারা গুরুজন উপযুক্ত সময়ে যাহা বলিলেন তাহা আমার শিরোধার্য্য। আমি কিম্বা আমাদের গোষ্ঠী অর্থলোভী নয়। লোভী হইয়া কদাচ কুলমর্য্যাদা অব্যাহত রাখিতে পারিতেন না। শ্বশুরের সম্পত্তিতে আমার কোন লোভ কখন ছিল না সুতরাং তিনি দত্তক রাখিলে আমি কোন ক্ষতি বোধ করি না। বরং শ্বশুরের কুল বজায় থাকে সেই ভাল। আমার অনুরোধ যে আপনারা তাহাতে কিছু মাত্র দুঃখিত হইবেন না কিম্বা প্রতিবন্ধকতা করিবেন না, আমার পৈতৃক যাহা কিছু আছে, তার পর যাহা বৃদ্ধি করা হইয়াছে তাহাতে বার্ষিক হাজার টাকা আয় হয়। গরীব ব্রাহ্মণের পক্ষে ইহাই আবশ্যকের অতিরিক্ত। তার পর

খুড়া মহাশয় উপার্জ্জনশীল আমিও উপার্জ্জনশীল। সকলেই রাজা হয় না আর রাজা হইলেই যে খুব সুখ হয় তাহা নহে। আমি দোল দুর্গোৎসব, দীপান্বিতা, শ্রাদ্ধ, শান্তি ব্রত নির্ব্বাহ করিয়া, কাকার টোলের ছাত্রদিগকে এবং নিজ পরিবার-বর্গকে ভরণপোষণ করিতে পারি ইহাই যথেষ্ট। রাজকুমারী যে রাজ্য ধন ত্যাগ করিয়া আমার সঙ্গে কুটীরে থাকিতে ইচ্ছুক ইহাতে আমি পরম পরিতোষ লাভ করিলাম। আমি আর কিছুই চাহি না। আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন যেন আমরা শান্তি সুখে কাল কাটাইতে পারি।" এই বলিয়া শ্বাশুড়ীদ্বয়কে, দেওয়ানজীকে এবং বাচস্পতি ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন।

রাণীরা নৃসিংহকে বাসাবাড়ীতে লইয়া যাইতে চাহিলেন। নৃসিংহ অস্বীকার করিয়া বলিলেন, "আমি ছোট কর্ত্তার এবং মায়ের অনুমতি লইয়া আসি নাই। আমি আপনাদের বাসায় গেলে যদি তাঁহারা কিছু বলেন সেটা ভাল হবে না। আমার স্ত্রী আমি নিয়ে যাব তাতে তাঁরা বোধ হয় কিছু বল্‌বেন না, যদি বলেন তবু আমি ধর্ম্মতঃ নিজ কর্ত্তব্য কার্য্য করে কিছু মাত্র দুঃখিত হব না। ইহাতে আপনারা দুঃখিত বা অসন্তুষ্ট হবেন না। আমাদের গোষ্ঠীতে কেহ বাপ খুড়ার অবাধ্য হয় নাই আমিও হইতে ইচ্ছা করি না। আপনারা আমাকে সন্তান জানিয়া আশীর্ব্বাদ করুন।"

রাণীরা কিছু অর্থ দিতে চাহিলেন, নৃসিংহ তাহাও স্বীকার করিলেন না। অবশেষে রাণীরা অনেক অনুরোধ করিয়া সর্ব্বমঙ্গলাকে নগদ ও জিনিষে প্রায় পাঁচ হাজার টাকার দ্রব্যাদি দিলেন। তিনখানা পালকী করিয়া সর্ব্বমঙ্গলা সহ রাণীরা নৃসিংহের নৌকার নিকট গেলেন। আর সকলেই পদব্রজে গেল। সর্ব্বমঙ্গলা মা ও জেঠীমাকে, দেওয়ান ও পুরোহিতকে প্রণাম করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে নৌকায় উঠিলেন। নৃসিংহও বিদায় লইয়া নৌকায় উঠিলেন।

মাল্লারা কালী কালী বলিয়া পাল উঠাইয়া নৌকা ছাড়িল। সর্ব্বমঙ্গলা নৌকার জানালা দিয়া মাতৃগণকে দেখিতে লাগিলেন তাঁহারাও তাঁহার দিকে অনিমিষ দৃষ্টিতে থাকিলেন। পালের জোরে নৌকা দূরবর্ত্তী হইল। দেওয়ানজী রাণীদিগকে লইয়া বাসায় প্রত্যাগমন করিলেন।

পাল ভরে নৌকা বেগে উত্তর মুখে চলিল। স্নান, পূজা, সন্ধ্যা, পাক, আহার নৌকাতেই হইল। নৃসিংহ একবারে দামনাশ যাইতে সাহস করিলেন

না। পদ্মা পার হইয়া পূর্ব্বমুখে নৌকা চালাইয়া লোচনগড়ে তাঁহার এক বিধবা মাসী কমলমণির বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। তথায় দাসী দ্বারা মাসীর নিকট সবিস্তার বিবরণ জানাইলেন এবং মাসীকে তাঁহাদের সহিত দামনাশে যাইতে অনুরোধ করিলেন। কমলমণিও তাহাতে সম্মত হইলেন। মাসীর অনুরোধে দুই তিন দিন লোচনগড়ে থাকিয়া মাসীকে সঙ্গে লইয়া দামনাশে উপস্থিত হইলেন। পথিমধ্যে সর্ব্বমঙ্গলা কমলমণির নানাপ্রকার শুশ্রূষা করিয়া তাঁহাকে তুষ্ট করিলেন। নৃসিংহ যে মা খুড়ার অনুমতি ব্যতীত সর্ব্বমঙ্গলাকে লইয়া আসিয়াছেন তাহাতে তাঁহারা কি মনে করিবেন কি বলিবেন এই চিন্তায় নৃসিংহের মনে নানাবিধ ভাবের উদয় হইতে লাগিল। অবশেষে তিনি স্থির করিলেন, 'আমি কোন অন্যায় কাজ করি নাই, যদি মা কাকা ইহাতে রাগ করেন তবে তাহিরপুরেই বাড়ী করিব। কাহার অসন্তোষ নিবারণে কি সন্তোষ সাধনে আমি সর্ব্বমঙ্গলাকে পরিত্যাগ করিব না। দ্বিতীয় পত্নী আছে আবশ্যক হইলে তাহাকেও তাহিরপুরের বাড়ীতে লইয়া আসিব। যদি সে না আসে তবে তাহার দোষ।' নৌকা দামনাশে উপস্থিত হইলে কমলমণি একবারে সর্ব্বমঙ্গলাকে সঙ্গে লইয়া বাড়ীতে উঠিতে চাহিলেন কিন্তু নৃসিংহ বা সর্ব্বমঙ্গলা তাহাতে সাহসী হইলেন না। সর্ব্বমঙ্গলা নৌকাতেই থাকিলেন নৃসিংহ মাসীর সহিত বাড়ীতে গেলেন। এখন অপেক্ষা তখন লোকের আত্মীয় কুটুম্বের উপর মায়া অনেক বেশী ছিল। ইন্দিরা বহুকালের পর ভগিনীকে পাইয়া অতিমাত্র আহ্লাদিতা হইলেন। কেশবের পত্নীরাও তাঁহাকে নিজ ভগিনীর ন্যায় সমাদর করিলেন। কমলমণির অভ্যর্থনার জন্য কেশবও বাড়ীর মধ্যে আসিলেন। পরস্পর সাংসারিক অবস্থা এবং শারীরিক মঙ্গল সমাচার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

কমলমণি জিজ্ঞাসা করিলেন, "সান্যাল মহাশয় নরসিংহের বড় বৌ কোথায়?"

কেশব কহিলেন, "নরসিংহের আর এক বিবাহ হওয়াতে খাঁ সাহেবের সঙ্গে মনান্তর হইয়াছে, তিনি কন্যা এখানে পাঠান না।"

কমল। তিনি না পাঠালে আপনি নিয়ে আসেন না কেন?

কেশব। বোধ হয় ছেড়ে দিবেন না বরং যে আন্‌তে যাবে তাকে অপমান করবেন।

কমল। যখন কন্যা বিয়ে দিয়েছেন তখন স্বামীর কাছে আস্‌তে দিবেন

না, একি হতে পারে? তোমার আনা উচিত ছিল। আপন মনে বিভীষিকা দেখে ঘরের বৌ পাঁচ ছ' বছর না আনা ভাল কথা নয়। যদি একটা ভাল মন্দ হয় তবে তোমার উচু মাথা হেট হবে। তুমি এত বড় পণ্ডিত এই সোজা কথাটা মনে কর না!

কেশব। মনে ভেবে কি করি। সমান অবস্থার লোক হয় তার সঙ্গে ঝগড়া করা যায়। আমরা গরীব ব্রাহ্মণ সে রাজাধিরাজ, তার সঙ্গে বিবাদ করা কি আমার সাধ্য। আর খাঁ সাহেবের কন্যার চরিত্র ভাল। সে বাড়ীতে কোন পুরুষ অন্দরে যেতে পারে না, সেখানে কোন চরিত্র দোষ হবে না।

কমল। যদি কন্যার চরিত্র ভাল তবে তাকে না আনা কেন? আমি ছেলের মতও জানি রাণীদের মতও জানি, কেবল দুপক্ষের কর্ত্তাদেরই মেজাজ জানি না। আমি কিন্তু বৌমাকে আনিয়াছি, তাহাতে কেহ কোনও ওজর করেন নাই বরং আহ্লাদই প্রকাশ কল্লেন। এখন যদি তোমরা বল, তবে বৌ ঘরে নিয়ে আসি, তাহাকে নৌকায় রেখে এসেছি।

কমলার কথা শুনিয়া সকলে আনন্দিত হইয়া সর্ব্বমঙ্গলাকে সমাদর পূর্ব্বক গৃহে আনয়ন করিল। সর্ব্বমঙ্গলাও আহ্লাদিত চিত্তে শ্বশুরগৃহে প্রবেশ করিলেন। সমস্ত ভাবনা দূর হইল।

সর্ব্বমঙ্গলা যে সকল ভয় করিয়াছিলেন কার্য্যতঃ তাহা কিছুই দেখিলেন না। তাঁহার পূর্ব্বে যেমন সমাদর ছিল এখনও তাহাই থাকিল। খাঁ সাহেব কন্যা ও জামাতার জন্য যে দালান প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন তাহার যে কুঠুরীতে সর্ব্বমঙ্গলা পূর্ব্বে থাকিতেন এখনও সেই স্থানেই তাঁহার শয়ন কুঠুরী হইল। সর্ব্বমঙ্গলা সঙ্গে যে সমস্ত টাকা কাপড় গহণা প্রভৃতি আনিয়াছিলেন তাহা তিনি শাশুড়ীর নিকট দিলেন। সুবুদ্ধি ইন্দিরা তাহা দেবরকে ডাকিয়া দেখাইলেন। তাঁহারা উভয়ে পরামর্শ করিয়া সে সমস্ত সর্ব্বমঙ্গলার হাতেই রাখিলেন।

সর্ব্বমঙ্গলা পূর্ব্বে যখন আসিতেন তখন সঙ্গে দাস দাসী আসিত। কোন কাজ নিজে করা আবশ্যক না হইলেও মঙ্গলা কখন আলস্য করিতেন না। উপস্থিত মত সকল কাজই করিতেন। এবার কোন দাস দাসী সঙ্গে নাই। স্বামী গৃহে কেবল এক জন আচরণীয় চাকর ও একজন দাসী ছিল আর

একটি চাঁড়াল চাকর ছিল। কাজ অনেক তাহা প্রায় সমস্তই বৌ ঝির করিতে হইত। সর্ব্বমঙ্গলা অতি প্রত্যুষে উঠিয়া সকলের আগে সাংসারিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন। কোনরূপ অহঙ্কার হিংসা দ্বেষ করিতেন না। সুতরাং সকলেরই প্রিয় হইবেন।

সর্ব্বমঙ্গলা পাঁচ বৎসর পিত্রালয়ে থাকা কালে তাঁহার সপত্নী লক্ষ্মীর একটি পুত্র হইয়াছিল। সপত্নীর আগমনে লক্ষ্মীর মনে বিদ্বেষ হইল। তিনি শ্বাশুড়ীর কঠিন শাসনে প্রকাশ্যে ঝগড়া বিবাদ করিতে পারিতেন না কিন্তু গুপ্ত ভাবে সর্ব্বমঙ্গলার অনিষ্ট চেষ্টা করিতেন। ইন্দিরা সুযোগ্য গৃহিনী ছিলেন। লেখা পড়া জানিতেন না কিন্তু সংসার কিরূপে চালাইতে হয় তাহা খুব ভাল বুঝিতেন। তিনি কুলীন কন্যা, কুলীন পত্নী, পিত্রালয়ে শ্বশুরালয়ে আজন্ম সতীন দেখিয়াছেন। সতীনে সতীনে যাহাতে বিবাদ না হয় তাহার সদুপায় তাঁহার জানা ছিল। তিনি প্রতি রাত্রে এক বৌ নিজের কাছে রাখিতেন অন্য বৌ পুত্রের নিকট পাঠাইতেন। পরিবারভুক্ত ব্যক্তিগণ মধ্যে বিশেষ মেয়ে মেয়েতে কি মেয়ে পুরুষে কোন বিবাদের কারণ হইলে গিন্নির নিকট নালিশ হইত; তিনি বৃত্তান্ত শুনিয়া বিচার মীমাংসা ও প্রয়োজনীয় দণ্ড করিতেন। পরস্পর ঝগড়া বিবাদ করিতে কাহারও ক্ষমতা ছিল না। তথন গুরুজনের মান্য বেশী ছিল। কর্ত্তা বা গিন্নি অসন্তুষ্ট হইবেন বলিয়া সকলে ভয় করিত। সেই জন্যই তাঁহাদের শাসন তথন কার্য্যকারী হইত।

লক্ষ্মী নৃসিংহের নিকট সর্ব্বমঙ্গলার নানারূপ নিন্দা করিতেন এবং নিজের ও নিজ পুত্রের প্রতি সর্ব্বমঙ্গলার বিদ্বেষ আছে বলিয়া প্রকাশ করিতেন। নৃসিংহ সেই কথার সত্যতা পরীক্ষার জন্য সর্ব্বমঙ্গলার মন বুঝিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার সহিত নানারূপ কপট আলাপ করিতেন। তিনি লক্ষ্মীর নিন্দা ও তৎপ্রতি কৃত্রিম অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিতেন। কিন্তু সর্ব্বমঙ্গলা তাহাতে সায় না দিয়া বরং প্রতিবাদ করিতেন এবং সমদৃষ্টি করিতেই অনুরোধ করিতেন। সর্ব্বমঙ্গলা নিজ ব্যয়ে সপত্নী পুত্রের অলঙ্কার প্রস্তুত করাইয়া দিলেন, নিজের শাড়ী ও অলঙ্কার কতক সপত্নীকে দিলেন। তাঁহার সদ্ব্যবহারে লক্ষ্মীর বিদ্বেষ ভাব দূর হইল। নৃসিংহও লক্ষ্মীকে বুঝাইলেন, "তুমিই মঙ্গলার সপত্নী, সে আগে একা আমার ছিল তুমিই পরে তাহার ঘরে ভাগ বসাইয়াছ তবু সে তোমার কোন

অনিষ্ট চেষ্টা করে না। তার মন্দ করিলে তোমার মহাপাপ হইবে। সে এক মহারাজার কন্যা, সে চেষ্টা করিলে তোমার অনেক অনিষ্ট করিতে পারে কিন্তু তাহার চরিত্র অতি পবিত্র দেব তুল্য। আমি যদি তাহার মন বুঝিবার জন্য তোমার প্রতি বিরাগ দেখাই তাহাতে সে তুষ্ট না হইয়া বরং তোমার স্বপক্ষতা করে। সে বলে, 'সতীন না হয় ইহা সকল স্ত্রীলোকেই ইচ্ছা করে, কিন্তু যখন হয়েছে, তুমি ধর্ম্ম সাক্ষী করে তাকেও বিবাহ করেছ তখন দুই জনের প্রতি সমান দৃষ্টি থাকাই উচিত। কিন্তু আর সতীন বাড়াইও না। যে সপত্নী ও তাহার সন্তানদিগকে হিংসা করে সে একরূপ স্বামীকেই হিংসা করে।' আমি কুলপতির সন্তান আমাদের গোষ্ঠীতে কেহ স্ত্রৈণ কাপুরুষ নাই। তুমি যদি সর্ব্বমঙ্গলার অনিষ্ট চেষ্টা কর তাহাতে তাহার প্রতি আমার বিরাগ হইবে না বরং তোমার প্রতি বিরাগ হইবে।" স্বামীর শাসন ও সর্ব্বমঙ্গলার চরিত্র গুণে লক্ষ্মীরও চরিত্র শোধিত হইল। অতঃপর লক্ষ্মী আর কখনও সর্ব্বমঙ্গলার কোন অনিষ্ট চেষ্টা করিতেন না। হিংসাই হিংস্রকের কষ্টের কারণ। লক্ষ্মী যখন হিংসা ত্যাগ করিলেন তখন তিনি দেখিলেন সপত্নী তাঁহার কোনই কষ্ট বা অনিষ্টের কারণ নহে বরং সমস্ত সাংসারিক কার্য্যের সহায় এবং আমোদ প্রমোদের সঙ্গী। তৎকালে স্বার্থপরতা দূষিত বিলাতী প্রেম এদেশে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। ভাগ্যবান হিন্দু মুসলমান সকলেই বহু বিবাহ করিত। তাহার পরও অনেকের উপপত্নী থাকিত। স্বামী আর এক বিবাহ করিবে শুনিলেই অমনি আত্মহত্যা করা আবশ্যক বলিয়া কেবল রমণীর মনে ধারণা হইত না। বিশেষতঃ লক্ষ্মী কুলীনের কন্যা, কুলীন পত্নী। তাঁহার সপত্নী বিদ্বেষ তত বেশীও ছিল না। সুতরাং তিনি সহজেই হিংসা ত্যাগ করিতে পারিলেন। তাহাতে তাঁহার মন উন্নত ও প্রফুল্ল হইল। তিনি সর্ব্বমঙ্গলাকে জ্যেষ্ঠা ভগিনী জ্ঞানে মান্য করিয়া চলিতে লাগিলেন, তাহাতে উভয়েরই সুখ হইল এবং তাঁহাদের স্বামীও সুখী হইলেন।

নৃসিংহ তাহিরপুর যাইতে উদ্যোগ করিলেন কিন্তু সর্ব্বমঙ্গলা তাঁহাকে চাকরী ত্যাগ করিতে অনুরোধ করিলেন। নৃসিংহের তখন বাচস্পতি ঠাকুরের কথা স্মরণ হইল। তিনি বুঝিলেন চাকরী ব্যবসায় তাঁহার সম্মানের হানি জনক। বাচস্পতি ঠাকুর স্পষ্ট নিষেধ করিয়াছেন, পত্নীও চাকরী ত্যাগ অনুরোধ করেন। খুড়া চাকরী করা ভাল বোধ করেন না। তবে আর চাকরী

করা হইবে না। তিনি তাহিরপুর গিয়া কর্ম্মে এস্তাফা করিলেন এবং নিকাশী কাগজাদি দিয়া রাজার নিকট বিদায় হইয়া আসিলেন।

এদিকে বাগছি সাহেব ও রাণীরা সাতগড়ায় ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহারা যে জামাতাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছিলেন তাহা না বলিয়া খাঁ সাহেবের নিকট প্রকাশ করিলেন যে জামাতা জিদ করিয়া সর্ব্বমঙ্গলাকে লইয়া গিয়াছে এবং সর্ব্বমঙ্গলাও উৎসুক ভাবে তাহার সঙ্গে গিয়াছে। উপেন্দ্র হাস্য করিয়া বলিলেন, "তার গঙ্গাতীরে গিয়া জিদ করার তো কোন আবশ্যক ছিল না। তার স্ত্রী সে লইবে তাতে কারো কোন অরুচিও নাই আপত্তিও নাই। বরং সে পাছে না লয় এই ভয়ে আমি পাঠাই নাই। যদি নিতে ইচ্ছা ছিল তা আমাকে জানালে আমিই পাঠাইতাম। যাহা হউক জামাই যে নিজে এসে নিয়েছে আর মেয়েও যে রাজী খুসিতে তার সঙ্গে গিয়াছে সেটা বেশ হয়েছে।" বাচস্পতি ঠাকুর বলিলেন, "মঙ্গলার যাওয়া কালে রাণী মা'রা সঙ্গে টাকা কড়ি দিয়ে দিয়েছিল। আপনিও আর কিছু সাহায্য করুন মঙ্গলার কোন কষ্ট হবে না। স্বামী সহবাসে পরম সুখে থাকবে। যদি অন্ন বস্ত্রের কষ্ট না থাকে, স্বামী গুণবান হয় এবং ভালবাসে, যদি যথা সময়ে সন্তানাদি হয় এবং শারীরিক ভাল থাকে তবেই রমণীর জীবন সার্থক। তাহার সৌভাগ্যের পরাকাষ্ঠা। বাপের বাড়ীতে ঘরজামাইর পত্নী হয়ে থাকা এবং নির্ব্বংশ পিতার উত্তরাধিকারিণী হওয়া সৌভাগ্যবতীর লক্ষণ নহে। তোমার কন্যা ধন্যা, সে যে তোমার গৃহ ত্যাগ করে স্বামীর বাড়ী গিয়াছে সেটা তুমি শ্লাঘ্য জ্ঞান কর। মঙ্গলার সুখে ভরণ-পোষণের উপায় করে দেও। তার পর নিজ বংশরক্ষার উপায় কর।"

গোকুল সুযোগ পাইয়া বাচস্পতি ঠাকুরের সমর্থন করিল। কিন্তু কন্যা ও জামাতার কোন সাহায্য করিতে না দিয়া বরং তাহাদের প্রতি বিরূপ করিতেই অস্পষ্ট ভাবে চেষ্টা করিল। দেওয়ানজী পূর্ব্ববৎ প্রতিবাদ করিলেন কিন্তু এবার স্রোত ফিরাইতে পারিলেন না। দত্তক রাখাই ধার্য্য হইল। ভাওলীর ভাদুড়ী বংশীয় আড়াই বৎসর বয়স্ক একটি শিশু জ্ঞাতি পুত্রকে দত্তক গ্রহণ করিয়া রূপেন্দ্র নারায়ণ খাঁ নামকরণ করা হইল। গোকুলের মনস্কামনা এত দিনে সিদ্ধ হইল। বাগছি সাহেব অতিমাত্র মনঃক্ষোভে নানাবিধ চক্রান্ত করিতে লাগিলেন কিন্তু গোকুলের কৌশলে সকলই বিফল হইয়া গেল।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

গোকুলের কর্ম্মচ্যুতি।—জামাতার সহ উপেন্দ্রের সদ্ভাব।—রামদয়ালের কর্ম্মপ্রাপ্তি।—গোকুলের সাঁতোড় গমন।

পাতানী বালুচর হইতে প্যারীকে লইয়া ফিরিয়া আসিলে গোকুল খুব সন্তুষ্ট হইলেন। সর্ব্বমঙ্গলা স্বামীর সহ দামনাশে গিয়াছে ইহাও সে গোকুলের নিকট প্রকাশ করিল। গোকুল কহিলেন, "আমি সব জানি। আমার অজ্ঞাতে কিছুই হইতে পারে না। বুড়ো দেওয়ান যে নৃসিংহকে চিঠি পাঠাইয়াছিল এই দেখ তাহার নকল আমার কাছে আছে। বাগছি সাহেব যখন যা করে আমি তাহা সমস্তই খবর রাখি। রাজকুমারী এখানে থাকিলে খাঁ সাহেব দত্তক রাখিতে পারিবেন না, এজন্য আমারও ইচ্ছা ছিল যে তিনি স্বামীর বাড়ী যান। সেই জন্য আমি বাধা দিলাম না। আর আমি ভয় করিতাম যে মঙ্গলা এখানে এ ভাবে থাকিলে হয় তো আত্মহত্যা করিবে নতুবা নষ্টা দুষ্টা হইবে। ব্রাহ্মণ মনিব, তাহাতে চিরকালের প্রতিপালক; তাঁহার গুরুতর অনিষ্ট হইলে আমারও পাপ হইবে। এইজন্য বাগছি সাহেবের এ ইচ্ছা সফল হইতে দিলাম, নহিলে সাধ্য কি যে আমার অনভিমতে কেহ কোন কাজ করে।"

পাতানী বুঝিল গোকুলকে ফাঁকি দেওয়া সহজ নহে। সে কহিল, "লালা সাহেব! বাগছি সাহেব বোধ হয় একাজ একা করতে পারে নাই, আরো অনেক সঙ্গী থাকা সম্ভব।"

গোকুল। রাণীদের সঙ্গে তার সাজস আছে। অপর সামান্য লোকের সম্বন্ধে কোন অনুসন্ধান রাখিনা। যে আমার অনিষ্ট করতে পারে আমি কেবল তাহার বিষয়েই সতর্ক থাকি। যাহাদের চেষ্টায় আমার কোন রূপে অনিষ্ট হবে না তাহাদের প্রতি আমি তত দৃষ্টি রাখি না।

পাতানী জানিল লালা সাহেব তাহাকে তুচ্ছ বিবেচনা করেন। তজ্জন্য তিনি তাহার কোন কাজ টের পান নাই। পাতানী মনে মনে বলিল, 'আমিই তোমাকে খর্ব্ব করিব।'

পাতানী গোপনে দেওয়ানজীর সহিত সাক্ষাৎ করিল এবং গোকুল যে তাঁহার সমস্ত কার্য্য ভাব গতিক পর্য্যবেক্ষণ করে তাহা তাঁহাকে জানাইল। বাগছি সাহেব বলিলেন, "আমি তা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, গোকুল বড় ধূর্ত্ত তার কাছে গোপন করিয়া কোন কাজ করা অসাধ্য। আমি আর সাক্ষী-গোপাল হয়ে থাকৃতে ইচ্ছা করি না, আমি শীঘ্রই কার্য্য ত্যাগ করবো।" পাতানী বলিল, "আপনি আর কিছু দিন থাকুন, আমি গোকুলকে খর্ব্ব করে দিচ্ছি। আপনি যখন যে কাজ করেন গোকুল অমনি তার অনুসন্ধান লয়। কিন্তু সে আমাকে তুচ্ছ করে, আমার কোন বিষয়ে খবর করে না। দেখুন আমি তাকে জব্দ করৃছি।" পাতানীর কার্য্য দৃষ্টে পূর্ব্বেই বাগছি সাহেবের বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে পাতানী কাজের লোক বটে। সুতরাং পাতানীর কথায় উপহাস না করিয়া সে কি উপায়ে কি করিবে তাহার তদন্ত করিলেন। পাতানী বলিল, "আমি একটা বেশ্যাকে আমার ভগিনী পরিচয় দিয়া গোকুলের উপপত্নী করে দিয়েছি, এখন তার স্বামী যোটাইয়া আন্‌বো, তাহাদ্বারা গোকুলের নামে নালিশ করিব। আপনি সময় মত কয়েকজন সাক্ষী যোটাইয়া দিবেন। কিন্তু আপনি প্রমাণাবধি নিজে কোন কথা বল্‌বেন না কিংবা কোন কাজে যাবেন না। আপনার প্রত্যেক কাজের অনুসন্ধান গোকুল রাখে। আমাকে অত্যন্ত তুচ্ছ জ্ঞান করে বলিয়া আমার কোন কাজের অনুসন্ধান লয় না। আমার ভগিনী তার উপপত্নী এই বিশ্বাসে বরং আমাকে বিশ্বাস করে। কতক গুপ্ত খবরও বলে। আপনি গুপ্তভাবে সহায়তা কর্‌বেন। আমি গোকুলকে দমন করে দিব।" দেওয়ানজী অতিমাত্র আপ্যায়িত হইয়া পাতানীকে ধন্যবাদ দিলেন এবং খরচের জন্য এক শত টাকা দিলেন।

গোপাল সুখের ঘরে জন্মিয়াছিলেন। যদিও বাল্যকালে তাঁহার পিতা উপেন্দ্রের দলভুক্ত হইয়া বিদ্রোহী হওয়ায় কিছু দিন কষ্টে পড়িয়াছিলেন কিন্তু সে কষ্ট বড় বেশী হয় নাই বেশী দিনও থাকে নাই। তাহার উপর বিধাতার অসাধারণ অনুগ্রহ। গোকুল যে কাজে প্রবৃত্ত হন তাহাতেই কৃতকার্য্য হইতে লাগিলেন। পদ মর্য্যাদা, বিদ্যা বুদ্ধি, ধন জন সকল বিষয়েই গৌরবলাভ করিলেন। গোকুলের পত্নী সাধ্বী ও সুন্দরী। তাঁহার তিন পুত্র দুই কন্যা সকলেই প্রশংসনীয়। একাদিক্রমে ত্রিশ বৎসর কাল এমন সর্ব্ব বিষয়ে সুখ সৌভাগ্য

একটাকিয়া রাজা কিম্বা কোন নবাব বাদশাহেরও ভাগ্যে ঘটে নাই। কিন্তু কাহারও চিরদিন সমান যায় না। গোকুল অনেক প্রাজ্ঞ মন্ত্রীকে বুদ্ধি কৌশলে পরাজয় করিয়া অবশেষে এক সামান্য গোপরমণীর নিকট পরাস্ত ও অপদস্থ হইলেন।

খাঁ সাহেব একদিন ঠাকুর বাড়ী হইতে নিজ প্রাসাদে ফিরিয়া আসিতে-ছিলেন, পথিমধ্যে দুই ব্যক্তি আসিয়া তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিল। উপেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কে? বৃত্তান্ত কি?" তাহারা উত্তরে বলিল, "হুজুর মহারাজ ধর্ম্মাবতার, গরীবের বিচার করুন।" অনেক গৌরচন্দ্রিকার পর উহারা নিভৃতে আপনাদের প্রার্থিত বিষয় জানাইতে চাহিল। খাঁ সাহেব ভৃত্যদিগকে কিঞ্চিৎ সরিয়া যাইতে আদেশ করিলেন। ভৃত্যগণ সরিয়া গেলে তাহাদের একজন কহিল, "পাতানীর ভগিনী প্যারী, এই নিধিরাম তাহার স্বামী। আপনার নায়েব দেওয়ান লালাসাহেব তাহাকে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া আনিয়া তাঁর বাগান বাড়ীতে রেখেছেন। প্রকাশ্যে নালিশ করিলে তিনি প্যারীকে স্থানান্তর করিবেন তখন ঘটনা প্রমাণ করিতে আমাদের সাধ্য হইবে না। লালাসাহেব প্রত্যহ মধ্যাহ্নে আহারের পর বাগান বাড়ীতে যান সেই সময়ে হঠাৎ তথায় গেলে লালাসাহেব ও প্যারী একত্রে ধরা পড়িবে এবং সমুদায় কথা একবারে প্রমাণ হইবে। আপনি রাজা, ব্রাহ্মণ নারায়ণ, আপনি দয়া করিয়া সুবিচার না করিলে আমরা আপনার সম্মুখেই আত্মঘাতী হইব।"

উপেন্দ্রের দয়া হইল, সন্দেহও হইল। তিনি স্থির করিলেন ঘটনা সত্য হইলে গোকুলকে দণ্ড করিতে হইবে। কিন্তু দেওয়ানজী অনেকবার বলেন গোকুলের দৌরাত্ম্যে প্রজাগণের সুন্দরী ঝি বৌর সতীত্ব রক্ষা করা কঠিন। কিন্তু আমি তদন্ত করিয়া তাহা মিথ্যা জানিয়াছি। গোকুল অতিশয় চতুর, সম্ভবতঃ তাহার কৌশলেই সমস্ত প্রকৃত ঘটনা অপ্রমাণ হয় অথবা দেওয়ানজীর সহ তাহার মনোবাদ থাকায় অপবাদই মিথ্যা। এরূপ স্থলে সত্য অবধারণ করা বড় কঠিন। এ নালিশের তদন্ত আমি স্বয়ং সঙ্গোপনে করিব। লোক দুই-টিকে আশ্বাস দিয়া নালিশের বৃত্তান্ত গোপন রাখিতে বলিলেন। এবং তাহা-দিগকে কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে থাকিতে উপদেশ করিয়া গোপনে বলিয়া দিলেন, কল্য অপরাহ্নে তোমাদিগকে ডাকাইয়া তোমাদের নালিশের তদন্ত করা যাইবে।

গোকুল সংবাদ পাইলেন খাঁ সাহেবের নিকট দুইজন লোক কোন গুপ্ত নালিশ করিয়াছে, অমনি রহস্য ভেদের চেষ্টা করিলেন। লোক দুইটি অনেক ইতস্ততঃ করিয়া ভয়ে ভয়ে বলিল, "বাগছি সাহেব তাহাদিগকে একটি জলকরে পত্তন করিবার আশা দিয়া একশত টাকা লইয়াছেন কিন্তু এখন জলকরেও পত্তন করেন না টাকাও ফেরত দেন না।" নালিশ দেওয়ানজীর বিরুদ্ধে জানিয়া গোকুল আশ্বস্ত হইলেন এবং তাহাদের সাহায্য করিতে মনস্থ করিলেন, কিন্তু প্রকাশ্যে সে কথা না বলিয়া বলিলেন, "বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বড়লোক তাঁহার সহিত বিবাদ করা ভাল নয়।" লোক দুইটি বলিল, "আমাদের আবার বিবাদ কি? আমরা দুঃখী লোক, জলকর কি টাকা একটা পেলেই হয়।" গোকুল প্রকাশ্যে দেওয়ানজীর সহিত কোন বিবাদ করিতেন না অন্যের দ্বারা তাঁহার চেষ্টা বিফল করিতেন ও তাঁহাকে অপ্রস্তুত করিতেন। এই উপলক্ষে দেওয়ানজীর প্রতি রাজার ও সর্ব্ব সাধারণ লোকের অবিশ্বাস জন্মাইতে মনে মনে নানারূপ সংকল্প করিতে লাগিলেন।

পর দিন বেলা তৃতীয় প্রহরের সময় খাঁ সাহেব সেই দুই জন লোককে ডাকাইয়া আনিলেন এবং আট জন অশ্বারোহী সহ বেড়াইতে বাহির হইলেন। তিনি কি উদ্দেশ্যে কোথায় যাইতেছেন, কেহ জানিতে পারিল না। তিনি হঠাৎ গিয়া গোকুলের বাগান বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। গোকুল প্যারীকে বক্ষে লইয়া নিদ্রা যাইতে ছিলেন। খাঁ সাহেবের হঠাৎ আগমন শুনিয়া শয্যা হইতে উঠিলেন কিন্তু প্যারীকে স্থানান্তর করিতে অবসর পাইলেন না। রাজা যে প্যারীকে ধরিতে আসিয়াছেন ইহা তাঁহার মনেও উদয় হইল না। রাজা তাঁহাকে উপপত্নী সহকারে দেখিলে লজ্জার বিষয় হইবে কেবল এই জন্যই তিনি প্যারীকে স্থানান্তর করিতে চেষ্টিত হইয়াছিলেন, তাঁহার চেষ্টা সফল হইল না। উপেন্দ্র গৃহে প্রবেশ মাত্র গোকুল গলবস্ত্র দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। প্যারী ঘোমটা দিয়া পালঙ্কের আড়ালে দাঁড়াইল। ফরিয়াদীদ্বয় অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, "মহারাজ! ধর্ম্মাবতার! এই সেই প্যারী।" তখন গোকুল বুঝিলেন আগন্তুক লোকদিগের অভিযোগ তাঁহারই বিরুদ্ধে। তাহারা প্যারীর স্বামীকুলের লোক। তাহারা বাগছি সাহেবের যোগে আসিয়াছে। নতুবা তাঁহার নিকট উদ্দেশ্য গোপন করিয়া বাগছি সাহেবের নামে নালিশ করার কথা

বলিত না। এবার বিপদ শক্ত। গোকুল চতুর কিন্তু সাহসী ছিলেন না। কখনও বিপদে পড়েন নাই সুতরাং বিপদ সম্বরণ করা অভ্যাস ছিল না। গোকুলের মুখ শুখাইল শরীর কাঁপিতে লাগিল। উপেন্দ্র নিজে গোকুলের হাত ধরিয়া বাহিরে লইয়া গেলেন।

উপেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্যারী কে? তাহাকে তুমি কোথায় পেলে?"

গোকুল। (নতশিরে) সে এখানে বেশ্যাগিরি কর্‌তে এসেছিল, আমি চাকরের কাছে খবর পেয়ে নিয়ে এসেছি।

উপেন্দ্র। সে কোন জাত? কোথায় বাড়ী? পরিচয় জান কি না?

গোকুল। আমি তাহারই কাছে শুনিয়াছি সে গোয়ালার মেয়ে, স্বামীর অত্যাচারে বেশ্যা হয়েছে। বাড়ী পদ্মার ওপার। আর কোন পরিচয় জানিনা।

উপেন্দ্র। তোমার কোন্ চাকর তোমাকে প্যারীর খবর দিয়াছিল?

গোকু। তনু কৈবর্ত্ত।

উপেন্দ্র তৎক্ষণাৎ তনু কৈবর্ত্তকে তথায় আনাইয়া তাহাকে কহিলেন, "আমি ব্রাহ্মণ, আমাকে ছুঁয়ে বল্ দেখি, তুই প্যারীর কোন সংবাদ লালা সাহেবকে দিয়াছিলি কি না?"

তনু। না, আমি লালা সাহেবকে প্যারীর সম্বন্ধে কিছুই বলি নাই।

উপেন্দ্র প্যারীকে ডাকাইয়া বলিলেন, "তুই কে? কেমন করিয়া লালা সাহেবের নিকট এসেছিলি?"

প্যারী। আমি তাঁতীর মেয়ে, শৈশব কালে আমার পিতার মৃত্যু হয় আমার মা আমাকে প্রতিপালন করিতে না পারিয়া বালুচরের এক বৈষ্ণবীর নিকট দেয়। সেখান হইতে লালা সাহেব আমাকে আনাইয়াছেন।

উপেন্দ্র। তোকে আন্‌তে গিয়েছিল কে?

প্যারী। চিনি না।

উপেন্দ্র। তুই পাতানীর ভগিনী কি না?

প্যারী। না।

উপেন্দ্র। তুই পাতানীর বাড়ীতে কখনও ছিলি কি না? এবং তার সঙ্গে রাজবাড়ী গিয়াছিলি কি না?

প্যারী কোন উত্তর দিতে না পারিয়া মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল।

উপেন্দ্র তখন পাতানীকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্যারী কে? কাহার স্ত্রী? লালা সাহেব ইহাকে কোথায় পেলেন?"

পাতানী। প্যারী আমার ভগিনী। নিধিরাম গোপের স্ত্রী। আমি ইহাকে নিজ বাড়ীতে আনিয়াছিলাম। সে আমার সঙ্গে রাজবাড়ীতে ও লালা সাহেবের বাড়ীতে গিয়াছিল। লালা সাহেব তাহাকে দেখিয়া তাহার পরিচয় লইয়াছিলেন। এবং তাহার স্বামীর নাম ও বাড়ীর ঠিকানা আমার নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। প্যারী আমার বাড়ী হইতে শ্বশুর বাড়ী যাওয়ার দুই মাস পরে শুনিলাম যে প্যারী সন্ধ্যার পর জল আনিতে নদীর ঘাটে গিয়াছিল আর ফিরে আসে নাই। কেহ বলে প্যারীকে কুমীরে খাইয়াছে, কেহ বলে বাঘে মারিয়াছে, আবার কেহ বলে প্যারী কুলটা হয়ে বেরিয়ে গেছে। কিন্তু ঠিক করিয়া কেহই কিছু বলিতে পারে না। আজ ১৪। ১৫ দিন হলো আমার বেটা হরা এক দিন বলিল প্যারী মাসীর মত একটি মেয়ে লালা সাহেবের বাগান বাড়ীতে দেখিলাম। আমি ধমক দিয়ে বলিলাম না বুঝে সুজে হঠাৎ কোন কথা বলিস্ না। তার পর আর কিছুই জানি না।

হরা, নিধি গোপ ও তাহার সঙ্গীর এজাহার লইয়া খাঁ সাহেব বুঝিলেন এই প্যারী প্রকৃতই এই নিধি গোপের পত্নী। গোকুল পাতানীর সঙ্গে তাহাকে দেখিয়া তাহাকে হরণ করিবার জন্য তাহার সমস্ত ঠিকানা লইয়াছিল। পরে তাহাই করিয়াছে। তখন উপেন্দ্র গোকুল ও প্যারীকে বন্দী করিয়া কাচারীতে লইয়া যাইতে আদেশ করিলেন। গোকুলকে সকলেই ভয় ও সম্মান করিত কিন্তু রাজাজ্ঞা বলবত্তরা জন্য অনুচরেরা গোকুল ও প্যারীকে বন্দী করিয়া কাচারীতে লইয়া আসিল।

সকলেই ভাগ্যের সেবক, নিজের লোক কেহই নাই। গোকুল এখন তাহা প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলেন। এত দিন যাহারা গোকুলের আজ্ঞাকারী ছিল এখন তাহারাই গোকুলের প্রতি নানারূপ দোষারোপ করিতে লাগিল। দেওয়ানজী মনের সন্তোষ গোপন করিয়া কৃত্রিম সদয় ভাব প্রকাশ পূর্ব্বক বলিলেন, "মহারাজ, আপনকার কৌশলে গোকুল এবার ধরা পড়িয়াছে। এরূপ অপরাধ গোকুলের আরও অনেক আছে, কিন্তু গোকুল ক্ষমার যোগ্য।

গোকুল এবং তাহার পিতা পিতামহ চিরকাল আপনার বিশ্বাসী ভৃত্য ও সর্ব্বাবস্থায় সঙ্গী ছিল।" বাচস্পতি ঠাকুর কহিলেন, "গোকুলের অপরাধ নিশ্চিত হইয়াছে কিন্তু আজকাল ধনবান্ লোকের এ অপরাধ সচরাচর সকলেরই হয়। আমার বিবেচনায় গোকুল নিধিরামকে প্রচুর অর্থ দিয়া হাত যোড় করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করুক। তার পত্নী যদি সে নিয়ে যেতে চায় তবে প্যারীকেও ফেরত দিউক। নিধিরাম খাঁ সাহেবের প্রজা নয় তার স্ত্রী হরণ জন্য এতদপেক্ষা গুরুতর দণ্ড অনাবশ্যক।" দেওয়ানজী বলিলেন, "আপনি যাহা বলেন সেটি বড় পক্ষপাতের কথা, আপনার পত্নীকে কেহ হরণ করিয়া কিছু টাকা দিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলে আপনি সন্তুষ্ট হন কি না?"

উপেন্দ্র গোকুলকে অনেক ভৎর্সনা করিলেন। গোকুল তাঁহার পায়ে পড়িল। নিধিরামও পায়ে পড়িল। উপেন্দ্র নিধিরামকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি প্যারীকে নিয়ে যেতে চাও কি না?" প্যারী বলিয়া উঠিল, "ও কে? আমি ওর কাছে যাব না।" নিধিরামও বিবেচনা করিল প্যারীকে লইলে গুপ্ত কথা ব্যক্ত হইবে সুতরাং কপটে কহিল, "আর উহাকে নিয়ে কি হবে? যে নষ্টা জাতের বাহির হইয়াছে তাহাকে ঘরে নিয়ে একঘরিয়া হইতে হইবে। আর তাকে হাতে পাইলে মনের রাগে খুন করেও ফেলিতে পারি তাতে প্রাণের দায়ে ঠেক্‌তে হবে। আমি তাহাকে চাই না। মহারাজ ধর্ম্মাবতার, ঐ নষ্টা মাগীর নাক কাণ কেটে দিন। আর দুষ্ট লালাকে এমত দণ্ড দিন যেন আর কখনও এমন কাজ না করে। আমি টাকা নিয়ে কি করিব, আমি টাকা চাই না। আপনি যেমন সুবিচার করে কসুর আসকারা করিলেন তেমনই উচিত দণ্ড করুন।"

খাঁ সাহেব অনেক চিন্তা করিলেন। গোকুল অতিশয় প্রিয়পাত্র অথচ বিচার কার্য্যে কাহারও কোন খাতির করা সংগত বোধ করিলেন না। তিনি গোকুলকে কর্ম্ম হইতে বরখাস্ত করিলেন এবং তাহার তিন হাজার টাকা জরিমানা করিয়া তাহা সমস্তই নিধিরামকে দিলেন, প্যারীর মাথা মুড়াইয়া তাহাকে রাজবাড়ীতে দাসী করিলেন। গোকুল জানিতেন তিনি প্রকৃত দোষী। সুতরাং এই দণ্ড রাজানুগ্রহ জনিত লঘু মনে করিলেন। ফরিয়াদীরা জানিত সকলই মিথ্যা সুতরাং যাহা হইল সেই ভাল। গোকুলকে বরখাস্ত

করানই দেওয়ানজীর মনস্কামনা ছিল তাহা সিদ্ধ হওয়াতে তিনি তুষ্ট হইলেন। পুরোহিত ঠাকুরও গোকুলের এই সামান্য দণ্ড উচিত বোধ করিলেন। সুতরাং এ বিষয়ে সকলেই তুষ্ট হইল। কেবল পাতানী ও প্যারী কাঁদিয়া দিগ্দেশ পূর্ণ করিল। প্যারী কাঁদিল প্রকৃত মনের দুঃখে, পাতানী কাঁদিল মনের আনন্দে। আপন কৃতিত্ব জন্য পাতানীর মন আনন্দে উদ্বেলিত। সে মনে করিল জগতে আমিই অদ্বিতীয় কৃতী। যে গোকুল অসাধারণ চতুর ও কার্য্যদক্ষ, রাজার একান্ত প্রিয়পাত্র, স্বয়ং রাণীরা এবং অতি অভিজ্ঞ রাজমন্ত্রীগণ চেষ্টা করিয়াও যে গোকুলের কিছুমাত্র ব্যাঘাত করিতে পারেন নাই, আমি পাতানী সেই গোকুলকে জব্দ করিলাম, এবং আমার ষড়যন্ত্রও কিছু মাত্র প্রকাশ হয় নাই। এখনও আমি গোকুলের প্রিয় ও বিশ্বাসী আছি। দেওয়ান ঠাকুরতো এখন আমাকে সাত জন্মের মা বলিয়া স্বীকার করিবেন। গোকুলের সঙ্গেও খাতিরটা রাখিতে হইবে। রাণী, রাজকুমারী ও সান্যালজীর নিকটও বাহাদুরী লইতে হইবে। এখন ভয়, পাছে বা এই প্যারী আমার ষড়যন্ত্র প্রকাশ করে। এই ভাবিয়া পাতানী কাঁদিতে কাঁদিতে গিয়া প্যারীর গলা ধরিল এবং চুপে চুপে বলিল, "তোমায় ভয় নাই। আমি তোমাকে উদ্ধার করিব।"

বাগছি সাহেবের প্রাধান্য আবার বাড়িল। সর্ব্বমঙ্গলার সন্তান সম্ভাবনা হইল। বাগছি সাহেব সংবাদ পাইয়া খাঁ সাহেবের অনুমতি লইয়া নিজেই দামনাশে গেলেন। কুটুম্ব বিচ্ছেদের যাবতীয় দোষ গোকুলের উপর দিয়া দেওয়ানজী সকল বিবাদ মিটাইলেন। সর্ব্বমঙ্গলা ও নৃসিংহকে সাতগড়ায় লইয়া আসিলেন। রাণীদের আহ্লাদের সীমা থাকিল না। পুনরায় শ্বশুর জামাতায় পূর্ব্ববৎ সদ্ভাব হইল। তখন দত্তক রাখা হইয়াছে। সুতরাং সর্ব্বমঙ্গলার উত্তরাধিকারিণী হইবার সম্ভাবনা ছিল না। তথাপি রাণীরা এবং দেওয়ানজী সর্ব্বমঙ্গলাকে রাজ্যের কতক অংশ দিতে অনুরোধ করিলেন। বাচস্পতি ঠাকুর পুনরায় আপত্তি করিলেন যে শাস্ত্রমতে রাজ্য অবিভাজ্য বিশেষতঃ পৈতৃক স্থাবর সম্পত্তি দান করিতে উপেন্দ্রের অধিকার নাই। উপেন্দ্র নানারূপ ইতস্ততঃ করিয়া অবশেষে স্থির করিলেন যে ভাদুড়ীচক্রই আমার প্রকৃত পৈতৃক রাজত্ব তাহা আমার দত্তকের থাকিবে। আর পরগণা প্রতাপবাজু পৃথক জমিদারী

মাত্র, তাহাই কন্যাকে দান করিব। এ পরগণার বার্ষিক মুনাফা ২০,০০০৲ টাকা মাত্র। পৈত্রিক সম্পত্তির ক্ষুদ্রাংশ দান করা শাস্ত্রমতে দূষ্য নহে। অতএব তাহাই কর্ত্তব্য।

এখন যেমন ইংরেজের অনুকরণে উইল করা প্রচলিত হইতেছে পূর্ব্বে তাহা ছিল না। উইলনামার ঠিক প্রতিশব্দ সংস্কৃত ভাষায় নাই। শাস্ত্রমত যে উত্তরাধিকারী সম্পত্তি সেই পাইত। ভালবাসা মন্দ বাসার সহিত দায়াধিকারের কোন সম্বন্ধ ছিল না। উইলনামা দ্বারা শাস্ত্র লঙ্ঘন করিয়া প্রকৃত দায়াদকে বঞ্চিত করিয়া অন্য ব্যক্তিকে সম্পত্তি বা তাহার কোন অংশ দিলে তাহা নিন্দনীয় পাপকর্ম্ম বলিয়া গণ্য হইত। তজ্জন্য উপেন্দ্র ইচ্ছা সত্বেও ভাদুড়ীচক্রের কোন অংশ কন্যাকে দিতে পারিলেন না। কেবল দানপত্র দ্বারা প্রতাপবাজুর অর্দ্ধাংশ কন্যাকে দিলেন।

এদিকে সর্ব্বমঙ্গলার একটি পুত্রসন্তান হইল। সেই উপলক্ষে রাজবাড়ীতে আনন্দোৎসবের স্রোত বহিল। দান খয়রাতও বিস্তর হইল। পাতানী এই উপলক্ষে সুযোগ বুঝিয়া প্যারীকে উদ্ধার করিতে মনস্থ করিল। সে ঝগছি সাহেবকে বুঝাইল প্যারী রাজবাড়ীতে থাকায় আমার বড় ভয় হয়। সে গুপ্তকথা ব্যক্ত করিলে আমার অনেক বিপদের সম্ভাবনা। আর প্যারী গোকুলের কাছে না থাকিলে আমি তাহার গুপ্ত খবর পাই না এজন্য রাজকুমারীর পুত্র হওয়া উপলক্ষে যদি তাহাকে মুক্ত করিয়া গোকুলের কাছে দিতে পারি তবে সর্ব্বথা মঙ্গল। দেওয়ানজী পাতানীর প্রস্তাবে সম্মত হইয়া সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। পাতানী দেওয়ানজীর আশ্বাস পাইয়া রাণীমাতাদিগের নিকট যাইয়া বলিল, "আমার বোন প্যারী রাজবাড়ীতে দাসী হইয়া আছে। যদি আপনারা তাকে এই আমোদের সময় মুক্তি দেন তবে আমি পরম সুখী হই।" রাণীরাও তাহাকে আশ্বাস দিয়া খাঁ সাহেবের নিকট প্যারীকে মুক্তি দিতে অনুরোধ করিলেন। দেওয়ানজী তাঁহাদের পোষকতা করিলেন। উপেন্দ্র অনুমতি দিলেন। পাতানীও প্যারীকে লইয়া গোকুলের নিকট দিল।

গোকুল কর্ম্মচ্যুত হইয়া কিয়দ্দিবস বিষণ্ণ মনে কাল কাটাইলেন। তাঁহার সুশীলা পত্নী দক্ষিণা তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন, "তোমার প্রতি রাজার প্রচুর অনুগ্রহ ছিল বলিয়া তোমার কোন শারীরিক দণ্ড করেন নাই। কোন

গুরুতর অর্থদণ্ডও করেন। তোমার সোহাগের উপপত্নী রাজবাড়ীতে দাসী হয়েছে তাত ভালই হয়েছে, ভবিষ্যৎ পাপের স্রোত রুদ্ধ হয়েছে। চাকরী গিয়াছে তাতেই বা ক্ষতি কি? ত্রিশ বৎসর চাকরী করিয়া সম্পত্তি প্রতিপত্তি যথেষ্ট হইয়াছে। এখন নিশ্চিন্ত হয়ে ঘরে বসে ধর্ম্মে মন দাও কিম্বা যদি তোমার চাকরী করাই কর্ত্তব্য হয় তবে দিনাজপুরের রাজ সরকারে তোমার মামা প্রধান কার্য্যকারক সেই খানে যাও।"

গোকুল। যদি ব্রাহ্মণের ঘরে চাকরী পাই তবে অন্য জাতির চাকরী কর্‌বো না। আমরা একটাকিয়া রাজার ক্রীতদাসের সন্তান, বল্‌তে গেলে এখনও ক্রীতদাস। কিন্তু তাতে আমার জাত কুল মান কিছুই কম হয় নাই। ব্রাহ্মণের সেবা করা আর শালগ্রামের সেবা করা আমাদের পক্ষে দুই-ই সমান। অন্য জাতির চাকরী করতে গেলে সম্পূর্ণই চাকর হতে হয়। যদি অন্য জাতের চাকরী করি তবে নবাব সরকারেই চাকরী কর্‌বো, নবাবের কোন কর্ম্মচারী হ'তে আমার বিদ্যাবুদ্ধি বড় কম হবে না। গুণ থাক্‌লে সকল স্থানেই আদর হয়। নদে, পুঁঠে, শুশুং, তাহিরপুর, সাঁতোড় সকল রাজঘরেই আমি পরিচিত আছি। এই সকল ব্রাহ্মণ রাজাদের কাছে গেলে আমাকে একটা কাজ অবশ্যই দিবে। তবে কি না ঐ সকল রাজারা সাধারণ জমিদার মাত্র। একটাকিয়া রাজারাই আসল রাজা এবং আমার সাত পুরুষের মনিব। এ ঘর একবারে ছেড়ে যেতে কষ্ট হয়। আমার উপর খাঁ সাহেবের দয়াও আছে। আমার ছেলে পিলের মধ্যে কোন এক জনকে এ ঘরে কোন একটা কাজে বহাল না করে আমার অন্যত্র যাওয়া ভাল হয় না। আমার এখনই রাজার কাছে যেতে লজ্জা হয়। তাই মনে কর্‌ছি কয়েক দিন পরে যাব।

দক্ষিণা। তুমি এখন যেতে না পার আমি যাব। কান্দাকাটি করে ধরে রামদয়ালকে একটা কর্ম্ম নিয়ে দেবো। তার পর তুমি নদের রাজার চাকরী লও। নদে গঙ্গাতীরে মহাপ্রভুর জন্মস্থান। সে খানে তুমি চাকরী পেলে আমিও সেখানে গিয়ে থাক্‌বো।

গোকুল। নদের রাজার চাকরী করা আমারও ইচ্ছা। এখন তুমি যদি রাজবাড়ী যেতে চাও তবে যাও দেখ কি হয়। আর রাণী পবিত্রাকে হাত করিতে চেষ্টা করিও। খাঁ সাহেবের দয়া আছে, তার পর রাণী তোমার

সাপক্ষতা করিলে উদ্দেশ্য সফল হবে।

পরামর্শমত কার্য্য হইল। শুভদিনে দক্ষিণা রামদয়ালকে লইয়া পালকী-যোগে রাজ অন্তঃপুরে উপস্থিত হইলেন। রাণী পবিত্রা ও রাণী সৌদামিনীকে যথারীতি প্রণামী দিয়া প্রণত ভাবে তাঁহাদের অনুগ্রহ প্রার্থনা করিলেন। সন্ধ্যার পর উপেন্দ্র সন্ধ্যা-বন্দনা ও ঠাকুর আরতি করিয়া জল খাইবার জন্য অন্তঃপুরে আসিলেন। দক্ষিণার আগমন সংবাদ পাইয়া দেওয়ানজী প্রতিবাদ করিবার জন্য খাঁ সাহেবের নিকট উপস্থিত থাকিলেন। রাণী পবিত্রা দক্ষিণাকে সঙ্গে করিয়া উপেন্দ্রের নিকট গিয়া বলিলেন, "ছোট ঠাকুর! গোকুলের বৌ তোমাকে প্রণাম করিতে আসিয়াছে।" উপেন্দ্র কহিলেন, "আচ্ছা, তাকে আসতে বলুন।" দক্ষিণা লম্বা ঘোম্‌টা দিয়া গিয়া আগে দেওয়ানজীকে প্রণাম করিলেন, তারপর উপেন্দ্রের পা ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

উপেন্দ্র কহিলেন, "গোকুলকে আমি সন্তানের মত দেখ্‌তাম কিন্তু তার অপরাধের দণ্ড না কল্লে ধর্ম্ম থাকে না। তবু আমি তার কোন কঠিন দণ্ড করি নাই। তার পর আর কি কর্‌তে বল।"

দক্ষিণা উত্তর করিলেন, "উচিত দণ্ড পরমেশ্বর করেন রাজাও করেন, তা না করাই দোষ। তবে কি না এক জনের দোষে সকলের দণ্ড হ'তে পারে না। যে দোষ করেছে তার দণ্ড হয়েছে। এখন আমাদের প্রতিপালনের একটা উপায় করে দিন। আমরা দাস দাসী। পুরুষানুক্রমে এই চরণ সেবা করে গুজরাণ কর্‌ছি। এখন আমরা বঞ্চিত হ'লে যাব কোথা? তাই আমার রামদয়ালকে নিয়ে এসেছি। তাকে কোন একটা কর্ম্ম দিয়ে আমাদের অন্ন বস্ত্রের সংস্থান করে দিন।"

উপেন্দ্র কহিলেন, "রামদয়াল বালক, সে তাহার বাপ পিতামহের চাকরী কর্‌তে পার্‌বে না। অথচ তাকে কোন ছোট কর্ম্মও দেওয়া যায় না। সে আমার নিজ সেরেস্তায় ১৫৲ টাকা বেতনে তাইজনবিশী করুক। কাজকর্ম্ম শিখ্‌লে কোন ভাল কাজ দেওয়া যাবে।"

দেওয়ানজী মনে করিয়াছিলেন দক্ষিণা গোকুলের পুনরায় চাকরী পাওয়ার প্রার্থনা করিতে আসিয়াছে। তজ্জন্যই তিনি প্রতিবাদ করিতে প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছিলেন। কিন্তু এখন তিনি দেখিলেন দক্ষিণার সে প্রার্থনা নয়।

কেবল রামদয়ালের জন্য কোন কর্ম্ম চায়। রামদয়াল বালক নিরপরাধ, সে কোন কর্ম্ম পাইলে তাহাতে তাঁহার কোন ক্ষতি নাই। তাহার বিপক্ষতা করিলে সকলেই নিন্দা করিবে। আর তিনি মিথ্যা চক্রান্ত করিয়া গোকুলকে দণ্ডিত করিয়াছেন, রামদয়ালের আনুকুল্য করিলে সে পাপ খণ্ডন হইবে। সুতরাং তিনি চতুরতা পূর্ব্বক কোন বাধা না দিয়া বরং তাহার সাপক্ষতা করিয়া বলিলেন, "রামদয়াল নাবালক হইলেও বেশ বুদ্ধিমান, ভাল ছেলে, অল্প দিনেই কাজ কর্ম্ম শিখ্‌তে পার্‌বে। আর এখন এই রামদয়ালের রোজগারই যখন তাদের একমাত্র জীবন উপায় তখন তার বেতন কিছু বেশী দেওয়াই উচিত। তাইজনবিশীতে বেশী কোন উপরি-প্রাপ্তি নাই। টাকা পাঁচেক উপরি পাবে আর পঁচিশ টাকা বেতন হ'লে ত্রিশ টাকায় এক রকম চলে যাবে।"

দক্ষিণা এবং অপর সকলেই মনে করিয়াছিলেন বাগজি সাহেব বিপক্ষতা করিবেন; এক্ষণে তাঁহার অনুকুল কথা শুনিয়া সকলেই বিস্মিত হইলেন। খাঁ সাহেব সম্মতি দিলেন। দেওয়ানজী অমনি সনন্দ লিখিলেন। উপেন্দ্রও সহাস্য বদনে সনন্দখানি দক্ষিণার হস্তে দিলেন।

দক্ষিণা ও রামদয়াল যথারীতি প্রণাম করিয়া বিদায় চাহিলেন। রাণী পবিত্রা বলিলেন, "এদের খেলাৎ?" উপেন্দ্র বলিলেন, "বৌকে একখানা বালুচরে শাড়ী আর রামদয়ালকে গরদেয় এক ধুতি চাদর দিন।" দক্ষিণা খেলাত ও সনন্দ লইয়া পালকীতে উঠিলেন। খাঁ সাহেব যে দয়া করিবেন গোকুল পূর্ব্বেই তাহা অনুমান করিয়াছিলেন কিন্তু দেওয়ানজীর সদয় ব্যবহার তিনি আশা করেন নাই। এখন স্ত্রী পুত্রের মুখে তাঁহার ব্যবহার শুনিয়া গোকুল কুণ্ঠিত হইলেন।

গোকুল প্যারীকে পুনরায় পাইলেন, পুত্র রামদয়ালকেও রাজ সরকারের কর্ম্মে ভর্ত্তি করিলেন সুতরাং এখন আর সাতগড়ায় থাকা আবশ্যক বোধ করিলেন না। শুভদিন দেখিয়া তিনি সাঁতোড়ের রাণী সর্ব্বানীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। গোকুল সাতগড়ায় চাকলে ভাদুড়িয়ার প্রধান কার্য্য-কারক ছিলেন বলিয়া তৎকালীয় বাঙ্গালার সকল জমিদারের ঘরেই তিনি সুপরিচিত ছিলেন। তিনি কর্ম্ম প্রার্থনা করিলে রাণী সর্ব্বানী তাঁহাকে বিনা জামিনে ৫০৲ টাকা বেতনে পদ্মার দক্ষিণ পারে আলমপুর পরগণার নায়েবী

দিলেন। গোকুল ক্রমাগত একাদশ বৎসর সেই পরগণার নায়েবী কর্ম্ম করিয়া প্রচুর প্রশংসা লাভ করিলেন। যদিও তৎকালে কর্ম্মস্থলে বিদেশে পরিবার লইয়া যাওয়ার রীতি ছিল না তথাপি দক্ষিণা মধ্যে মধ্যে আলমপুর যাইয়া তথা হইতে নবদ্বীপ যাইতেন। তাহাতে তাঁহার স্বামী সহ সাক্ষাৎও হইত এবং গঙ্গাস্নান ও চৈতন্য মহাপ্রভুর জন্মস্থান দর্শন করাও হইত।

বিংশ অধ্যায়।

উপেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যু।—গোকুলের প্রত্যাবর্ত্তন।—রূপেন্দ্রনারায়ণের রাজ্য প্রাপ্তি।—রাণী সৌদামিনীর কাশী নির্ব্বাসন।—নৃসিংহের সহ বিবাদ।—রূপেন্দ্রের বিবাহ।—গোপীনাথের মৃত্যু।—রূপেন্দ্রের ব্যয়বাহুল্য।

গোকুলের এই একাদশ বর্ষ অনুপস্থিতি কাল মধ্যে রামদয়াল ক্রমে জমানবিশী কর্ম্ম পাইল। বৃদ্ধ রাজা উপেন্দ্র নারায়ণ খাঁ এবং রাণী পবিত্রার গঙ্গা প্রাপ্তি হইল। কাজেই নাবালক রূপেন্দ্রনারায়ণ সম্পূর্ণ নিঃসহায় হইলেন। রাণী সৌদামিনী দত্তককে কণ্টক জ্ঞান করিতে লাগিলেন। বাগছি সাহেব রাণীর মতাবলম্বী। রূপেন্দ্র কেবল নাম মাত্র রাজা কার্য্যতঃ কিন্তু কিছুই নহে। যদি খাজাঞ্চি গৌরচন্দ্র খাঁ, নাবালক রাজার সহায় না হইতেন তাহা হইলে রূপেন্দ্রকে নির্ব্বাসিত হইতে হইত। রামদয়াল রাজ-সংসারের এই সকল অবস্থা গোকুলকে জানাইলেন। গোকুল অমনি তাঁহার হৃতপদ পুনরুদ্ধারের এই প্রশস্ত সুযোগ বুঝিয়া কর্ম্ম হইতে বিদায় লইয়া সাতগড়ায় আসিলেন।

গোকুলের দ্বিতীয় পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে গোকুল রূপেন্দ্রকে নিজ বাড়ীতে আনিলেন। রাণী সৌদামিনী এবং বাগছি সাহেবকেও নিমন্ত্রণ করিয়া আনা হইল। এদিকে গুপ্ত ষড়যন্ত্রের সাধন জন্য তিন শত সিপাহী গোপনে আনাইয়া বিবাহের আনুযাত্রিকরূপে রাখা হইয়াছিল। রামদয়ালের সংগৃহীত

দুই শত সিপাহী আসিয়া তাহাদের সহিত মিলিত হইল। অতি সমারোহ ব্যাপার জন্য কেহ তাদৃশ সম্মিলিত সেনা দেখিয়া কোন সন্দেহ করিল না। গোকুল বিনীত ভাবে দেওয়ানজীকে বলিলেন, "আপনি বাড়ীর মধ্যে গিয়া নবদম্পতিকে আশীর্ব্বাদ করিয়া আসুন।" দেওয়ানজী গোকুলের চক্রান্ত বুঝিতে না পারিয়া একজন মাত্র লোক সহ বাড়ীর ভিতরে গেলেন। গোকুল একটি গৃহে তাঁহাকে বসিতে দিয়া তামাক দেওয়াইলেন। এবং পুত্র ও পুত্রবধূকে আনাইবার উপলক্ষে গৃহের বাহির হইয়া অমনি সেই প্রকোষ্ঠের কপাট বন্ধ করিলেন। রাণী সৌদামিনীকেও ঐরূপে অন্য প্রকোষ্ঠে আটক করা হইল। তখন গোকুল রূপেন্দ্রকে লইয়া লোক লস্কর সহ রাজবাড়ীতে উপস্থিত হইলেন।

রূপেন্দ্রকে বেদখল করিয়া সর্ব্বমঙ্গলাকে রাজত্ব দিতে রাণী ও দেওয়ানজীর ইচ্ছা ছিল কিন্তু সর্ব্বমঙ্গলা তাহাতে সম্মত ছিলেন না। তাঁহার স্বামীরও তাহাতে বিশেষ ইচ্ছা ছিল না। সুতরাং দেওয়ানজী এপর্য্যন্ত স্পষ্টতঃ তদ্বিষয়ে কোন প্রকার চক্রান্ত করেন নাই। রূপেন্দ্রই শাস্ত্রমত উত্তরাধিকারী সুতরাং রূপেন্দ্রের কার্য্যতঃ কোন ক্ষমতা না থাকিলেও প্রকাশ্য নামতঃ তিনিই রাজা ছিলেন। রূপেন্দ্র লোক লস্কর লইয়া রাজ বাড়ীতে উপস্থিত হইলে কেহই তাঁহাকে কোন বাধা দিল না। সেনাপতি কামতার খাঁকে ও খাজাঞ্চি গৌরচন্দ্র খাঁকে গোকুল পূর্ব্বেই হস্তগত করিয়াছিলেন। সুতরাং বাধা দিবার কোন লোকও ছিল না। রাজকোষ তাঁহার হস্তগত হইল, সৈন্য সামন্তেরা বশ্যতা স্বীকার করিল। গোকুল দেওয়ান ও সর্ব্বেসর্ব্বা হইলেন। বাগছি সাহেবের অনুগত কর্ম্মচারীরা পদচ্যুত হইল এবং গোকুলের পক্ষের লোকেরা সেই সকল কার্য্যে বহাল হইল। এতদ্দ্বারা গোকুল যে কেবল তাঁহার পূর্ব্বপদ প্রাপ্ত হইলেন তাহা নহে পূর্ব্বাপেক্ষা প্রচুর প্রতিপত্তি লাভ করিলেন। রাণী সৌদামিনী ও বাগছি সাহেবকে তদবস্থায় সাতগড়ায় রাখায় অনেক ভাবী বিপদের আশঙ্কা ছিল এজন্য তাঁহাদিগকে সসম্মানে নির্ব্বাসন করা ধার্য্য হইল। রাণী সৌদামিনীকে বার্ষিক ৬০০০৲ টাকা ও বাগছি সাহেবকে বার্ষিক ১২০০৲ টাকা তন্‌খা নির্দ্দিষ্ট করিয়া তাঁহাদিগকে কাশীধামে পাঠান হইল।

নাবালক রাজার শিক্ষার জন্য গোকুল শিক্ষক নিযুক্ত করিলেন। অস্ত্র ও ব্যায়াম শিক্ষা দিবার ভার কামতার খাঁর উপর অর্পিত হইল। রূপেন্দ্রের আহারীয় প্রস্তুতের জন্য পাঁচ জন সুদক্ষ পাচক নিযুক্ত হইল। পাক গোকুলের বাড়ীতেই হইত। খাদ্যে কোন বিষাক্ত পদার্থ আছে কি না পরীক্ষার জন্য ঐ সকল খাদ্যের কতকাংশ অগ্রে পাচককে এবং আরও দুই চারিজন লোককে খাওয়ান হইত পরে উহা শিশু রাজাকে আহারার্থ দেওয়া হইত। পূর্ব্বে অন্য লোক দ্বারা না চাখাইয়া বা উত্তমরূপে পরীক্ষা না করিয়া কোন দ্রব্য খাইতে রূপেন্দ্রকে নিষেধ করিয়া দিলেন। নাবালক রাজার শরীররক্ষার্থে আট জন বিশ্বাসী সিপাহী নিযুক্ত হইল। তাহারা শিশু রাজাকে সর্ব্বদা ঘিরিয়া থাকিত। রাজার শয়ন গৃহও গোকুলের বাড়ীতে নির্দ্দিষ্ট হইল। তাহাতে গোকুলের বাড়ীই প্রকৃত রাজবাড়ী হইল। স্বর্গীয় রাজা পরগণা প্রতাপবাজুর অর্দ্ধাংশ তাঁহার কন্যা সর্ব্বমঙ্গলাকে দিয়াছিলেন গোকুল বল পূর্ব্বক তাহা পুনরায় দখল করিয়া লইলেন। সর্ব্বমঙ্গলা তাহাতেও বিবাদ করিতে ইচ্ছা করিলেন না, কিন্তু নৃসিংহ রাজা মহেশ্বর রায়ের প্রবর্ত্তনায় নবাবের দরবারে নালিস করিলেন। এই মোকদ্দমার বিচার জন্য নবাব চারি জন কাজী ও এক জন পণ্ডিতের উপর ভার দিলেন। তাঁহাদের তলব মত গোকুল গিয়া জানাইলেন যে রাজ্য অবিভাজ্য হেতু স্বর্গীয় রাজার দত্তক থাকিতে কন্যা কিছুই পাইতে পারে না। আর পরগণা প্রতাপবাজু স্বর্গীয় মহারাজার স্বোপার্জ্জিতও নহে। পৈতৃক স্থাবর সম্পত্তি দান করিতে তাঁহার কোন অধিকার ছিল না সুতরাং দান অসিদ্ধ।

এই মোকদ্দমার বাদী বিবাদী উভয়েই হিন্দু, কিন্তু একটাকিয়া রাজারা মুসলমান বাদসাহের প্রদত্ত জাগীর ও জমিদারী ভোগকারী প্রজা। তাঁহাদের উত্তরাধিকারে হিন্দু শাস্ত্র কি মহম্মদীয় মত প্রযোজ্য ইহা লইয়া কাজীদের মধ্যে মহা চিন্তা উপস্থিত হইল। চারি দিন তর্ক ও বিবাদের পর স্থির হইল যে দিল্লী হইতে এ বিষয়ে বাদসাহী ফতোয়া অনাইয়া এ তর্ক মীমাংসা করা উচিত। তদনুসারে উপস্থিত প্রশ্ন ও তৎ সম্বন্ধে পঞ্চ বিচারকের স্বতন্ত্র রায় লিখিয়া ফতোয়া পাইবার জন্য দিল্লীতে পাঠান হইল। উত্তর সাপেক্ষে উভয় পক্ষ তৎকালীন রাজধানী ঢাকায় থাকিলেন।

দিল্লী হইতে কাতোয়া আসিতে বহু বিলম্ব হইবে জানিয়া রাজা মহেশ্বর ও নৃসিংহ বাড়ী আসিলেন। তাঁহাদের পক্ষে তদ্বিরাদির জন্য এক জন মাত্র কারপরদাজ ঢাকায় থাকিল। গোকুল অমনি সুযোগ বুঝিয়া কাজীদের সঙ্গে ঘুষ বন্দোবস্ত করিলেন। তখন আর দিল্লী হইতে কাতোয়া আসার আবশ্যক হইল না। কাজীরা নিষ্পত্তি করিলেন যখন উভয় পক্ষই হিন্দু তখন হিন্দু শাস্ত্র মতেই দায়ভাগ হইবে। হিন্দু শাস্ত্র মতে দত্তক পুত্র থাকিতে কন্যা কিছুই পাইতে পারে না এবং পৈতৃক স্থাবর সম্পত্তির দান অসিদ্ধ। সুতরাং বাদীনীর দাবী অগ্রাহ্য। গোকুল জয়ী হইয়া ধুমধামে ফিরিয়া আসিলেন কিন্তু সর্ব্বমঙ্গলার নিকট খরচা আদায়ের কোন চেষ্টা করিলেন না।

রূপেন্দ্রনারায়ণ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেন। নানা স্থান হইতে তাঁহার বিবাহের প্রস্তাব আসিতে লাগিল। গোকুল ও গৌরচন্দ্র পরামর্শ করিলেন যে রূপেন্দ্রের এরূপ পাত্রী দেখিয়া বিবাহ দেওয়া আবশ্যক যে তদ্দ্বারা রাজার নানাপ্রকার উপকার হয়। সেই উদ্দেশ্যে নানারূপ চেষ্টা করিয়া তাঁহারা কেশব সান্যালের কণিষ্ঠা কন্যা জগদম্বার সহিত রূপেন্দ্রের প্রথম বিবাহ দিলেন। সেই বিবাহের সঙ্গে সঙ্গেই রূপেন্দ্রের রাজ্যাভিষেক মহা ধুমধামে হইল। জগদম্বার পাটরাণী হওয়ায় সান্যালদিগের বৈরভাব তিরোহিত হইল। তাহার পর তাহির-পুরের রাজকুমারী পূর্ণিমার সহিত রূপেন্দ্রের বিবাহ হইল। এই দুই বিবাহ দ্বারা রূপেন্দ্রের রাজপদ দৃঢ়ীভূত হইল। তাঁহার রাজ্য নাশ প্রাণ নাশ জন্য ষড়যন্ত্র হওয়ার যে সকল আশঙ্কা ছিল এই দুই বিবাহে সে ভয় রহিত হইয়া রূপেন্দ্র নির্ভয় ও নিরাপদ হইলেন।

রূপেন্দ্র রাজা হইয়া গোকুল, গৌরচন্দ্র ও কামতার খাঁর প্রচুর সম্মান ও সম্পত্তি বৃদ্ধি করিয়া দিলেন। রাজকার্য্য করিতে তাঁহার অবসরও ছিল না ইচ্ছাও ছিল না। তিনি অতি প্রত্যুষে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য শেষ করিয়াই লস্করে যাইতেন। সেখানে অশ্বচালনা, অস্ত্রচালনা, কুস্তি করিতে করিতেই স্নানের বেলা হইত। কখন বা শিকারে যাইতেন, ফিরিয়া আসিতে অপরাহ্ন হইত। যখন তিনি স্নানের উদ্যোগে বসিয়া কুরসী টানিতেন ভৃত্যেরা গায়ে তৈল মাখাইত, সেই সময়ে তিনি গোকুল ও গৌরচন্দ্রের প্রেরিত কাগজ দস্তখত ও মোহর করিয়া দিতেন। সেই সকল কাগজে কি লেখা আছে তাহা প্রায়ই

পড়িয়া শুনিয়া দেখিতেন না। গৌর, গোকুল ও কামতার খাঁকে তিনি অতিশয় বিশ্বাস ও সম্মান করিতেন। তাঁহাদের সাক্ষাতে তামাক খাইতেন না। গোকুল ও কামতার খাঁকে তিনি দাদা বলিয়া ডাকিতেন। গৌর সম্পর্কে রাজার ভ্রাতৃপুত্র, কিন্তু বয়সে অনেক বড় ছিলেন। রাজা তাঁহাকে গৌর খুড়া বলিয়া ডাকিতেন।

যশোহর অঞ্চলে তারপাশা গ্রাম নিবাসী রামরত্ন মুখোপাধ্যায় নামক একজন রাঢ়ীয় কুলীন ব্রাহ্মণ ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান বাগছি সাহেবের ধর্ম্মপুত্র ছিল। দেওয়ানের অনুরোধে রাজা উপেন্দ্রনারায়ণ তাহাকে মাসিক দুই টাকা বেতনে খাসনবিশী কর্ম্ম দিয়াছিলেন। রতন মুখোপাধ্যায় সাধারণ বাঙ্গালা লেখা পড়া মাত্র জানিত কিন্তু অতিশয় চালাক চতুর ছিল। তাহার আকৃতি সুন্দর ছিল এবং গীত-বাদ্যে ও পাশা-দাবা খেলায় মোটামুটি পটুতা ছিল। সর্ব্বদা রাজার নিকট থাকা খাসনবিশের কাজ। রাজাকে যাহার যে কোন এত্তালা দিবার প্রয়োজন তাহা খাসনবিশের মারফত দিতে হইত। সুতরাং বেতন দুই টাকা হইলেও খাসনবিশের বেশ উপরি-প্রাপ্তি ছিল। তাহার পর রতন রূপেন্দ্রের ইয়ার হইয়া ছিল তজ্জন্য রতনের উপার্জ্জন ও আধিপত্য প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি হয়। খিজমত আলি নামক দিল্লীনিবাসী জনৈক কালোয়াত রূপেন্দ্রকে দুই জন অতি সুন্দরী নৃত্যগীতে সুশিক্ষিতা বাই আনিয়া দিয়াছিল। রাজা মধ্যাহ্নে আহারের পর রঙ্গমহলে উপপত্নীদের নিকট যাইতেন এবং সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সেখানেই থাকিতেন। তাহার পর ঠাকুর বাড়ী যাইয়া বৈকালিক সন্ধ্যা করিতেন, ঠাকুর আরতি দর্শন করিতেন এবং প্রসাদ লইয়া জলযোগ করিতেন। পরে পুনরায় রঙ্গমহলে গিয়া খেলা ও আমোদ প্রমোদ করিতেন। রাত্রিতে আহারীয় প্রস্তুত হইলে নকীব গিয়া এত্তালা দিত তখন রূপ খাঁ অন্দরমহলে যাইতেন। তথায় রাণীরা তাঁহাকে সহসা গৃহে প্রবেশ করিতে দিতেন না। বস্ত্র পরিবর্ত্তন, গঙ্গাজল স্পর্শ ও বিষ্ণু স্মরণ করিয়া পবিত্র হইলে রাণীরা তাঁহাকে গৃহে যাইতে দিতেন। সেই খানে আহার বিহার ও নিদ্রায় রাত্রি অতিবাহিত হইত। সুতরাং রাজকার্য্য করিবার বা দেখিবার জন্য রূপেন্দ্রের অবসর ছিল না।

খিজমত আলি ও রতন মুখোপাধ্যায় রূপেন্দ্রের অতীব প্রিয়পাত্র হইয়াছিল। খিজমত মাসিক ৬০৲ টাকা বেতন পাইত তদ্ভিন্ন প্রচুর পুরস্কার পাইত। তাহার

বার্ষিক আয় দুই হাজার টাকারও অধিক ছিল। রতন আবার তদপেক্ষা অধিকতর প্রিয়পাত্র। খিজমত কেবল মাত্র রঙ্গমহলে রাজার সহচর ছিল। রতন কেবল অন্দর মহলে যাইত না তদ্ভিন্ন সর্ব্বত্রই রাজার সঙ্গে থাকিত। রাজার সঙ্গে সঙ্গে ব্যায়াম করিত, অশ্বচালনা ও অস্ত্রচালনা করিত, শিকারে যাইত, এক সঙ্গে স্নান সন্ধ্যা পূজা এবং মধ্যাহ্নে আহার করিত। রঙ্গমহলে এবং ঠাকুর বাড়ীতেও সে রাজার সঙ্গে থাকিত। কেবল রাত্রিতে রাজা যখন অন্তঃপুরে যাইতেন তখন রতন বিদায় লইয়া বাসায় যাইত। রতনের বেতন মাসিক ২৲ টাকাই ছিল। কোষাধ্যক্ষ গৌরচন্দ্র খাঁ সম্মত না হওয়ায় রাজা রতনের বেতন বৃদ্ধি করিতে পারেন নাই। কিন্তু রাজা তাঁহার খাস খরচ হইতে রতনকে প্রচুর পুরস্কার দিতেন, তাহাতে এবং উপরি-প্রাপ্তিতে রতন বৎসরে ন্যূনাধিক ছয় সহস্র টাকা পাইত। গৌর, গোকুল ও কামতার খাঁ ভিন্ন আর কেহই ভাদুড়ীরাজ্যে রতনের তুল্য পদস্থ থাকিল না। অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে রতনের শারীরিক ও মানসিক উন্নতিও হইল। রতন কৃশ, দুর্ব্বল ও কৃপণ ছিল। এখন প্রত্যহ ব্যায়াম, রাজভোগ আহার এবং প্রচুর অর্থ ও প্রতিপত্তি হওয়ায় রতন বিলক্ষণ হৃষ্টপুষ্ট, বলিষ্ঠ এবং দান বিতরণ পরায়ণ হইল।

রাজা এক দিন রতনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওহে মুখুটি তুমি বিয়ে করেছ কয়টি?" রতন বলিল, "তেরটি।"

রাজা। তুমি এখানে কতক পরিবার আন। তোমার এত স্ত্রী থাকিতে তুমি বেশ্যা সেবা কর, তোমার পত্নীরাও তো কুপথে যেতে পারে?

রতন। বিদেশে পরিবার আনিতে নাই। বিশেষতঃ রাজধানীতে পরিবার আনা আর বাজারে বেশ্যা করে দেওয়া দুই-ই তুল্য। হুজুর কিম্বা হুজুরের জ্ঞাতি কুটুম্ব কি প্রধান অমাত্যগণ আমার ঘরে ঢুকিলে নিবারণ করিবার আমার কি সাধ্য আছে?

রাজা। এখানে যদি তোমাকে বাড়ী করিয়া দেই তবে তো আর এস্থান বিদেশ হইল না সুতরাং বিদেশে পরিবার আনা বলিয়া আপত্তিও হইতে পারিবে না। রাজধানীতে পরিবার আনা দূষ্য, কিন্তু সকল রাজধানীতে নহে। আমরা ছাগ্‌লা* রাজা নহি এবং আমাদের বিচারেও পক্ষপাত নাই। প্যারীকে

*সাঁতোড়, ভাদুড়িয়া ও তাহিরপুরের রাজা, গুদিবাড়ীর রায়, দিনাজপুরের রাজা এবং

হরণ করার অপরাধে গোকুল দাদার কি দশা হয়েছিল তা অবশ্যই শুনেছ। তবে আর এখানে পরিবার আনায় বাধা কি? বরং না আনাই দূষ্য।

রতন। মহারাজ! আমাকে সাতগড়ায় বাড়ী করিয়া দিলেও ইহা আমার স্বদেশ হইতে পারে না। আমি রাঢ়ী ব্রাহ্মণ, নৈকষ্য কুলীন। এই সকল স্থানে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণের বসতি প্রায় নাই। যে দুই চারি ঘর আছে তাহারা নিকৃষ্ট শ্রোত্রিয় কিম্বা বংশজ ব্রাহ্মণ। আমার পুত্র কন্যার বিবাহ দিতে বহুদূরে যাইতে হইবে। হুজুর যদি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে কিছু সম্পত্তি দেন তবে আমি এদেশে বাড়ী করিতে পারি।

রাজা 'তথাস্তু' বলিয়া বানাইখাঁড়া গ্রামে রতনকে চারিখাদা (৬৪ বিঘা) ভূমি ব্রহ্মত্র* দিলেন এবং বাড়ী করিবার জন্য এক হাজার টাকা দিলেন। রতন সাতগড়ায় বাড়ী করিল। তাহার তের পত্নীর মধ্যে চারিটি বয়সে তাহার অপেক্ষা বড় ছিল, তাহারা পিত্রালয়ে থাকিত, সেখানেই থাকিয়া গেল। অবশিষ্ট পত্নীদিগকে ও জননীকে লইয়া রতন সাতগড়ার বাড়ীতে আসিল।

এই সময়ে পদচ্যুত দেওয়ান গোপীনাথ বাগছির কাশীপ্রাপ্তি সংবাদ আসিল। গোপীনাথের পুত্র রামনাথ বাগছি একটাকিয়ার জমিদারী বাজুদ্বয়ের নায়েব ছিলেন। তিনি রাজ সরকারে পিতৃশ্রাদ্ধের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। গোকুল এক শত টাকা মাত্র সাহায্য দেওয়া ধার্য্য করিলেন। তাহাতে রামনাথ ক্রুদ্ধ হইয়া রাজার নিকট অধিবাদ করিতে গেলেন। রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে অগ্রে রতনের নিকট যাইতে হইল। রতনের পিতার নাম গোপীনাথ মুখোপাধ্যায় সেই নামের মিতালি হেতু বাগছি সাহেব রতনের ধর্ম্ম বাপ ছিলেন। রামনাথ ও রামরত্ন এ দুই নামেও কতক ঐক্য ছিল। উভয়ের বয়সও প্রায় সমান। রামনাথ বারেন্দ্র কুলীন, রতন রাঢ়ী কুলীন।

নাটোরের মহারাজা ইঁহারা কখনও ভৃত্য, প্রজাবর্গের স্ত্রী কন্যার প্রতি কুদৃষ্টি করিতেন না। তাঁহাদের অনেকেরই উপপত্নী ছিল বটে কিন্তু তাহা বিদেশ হইতে সংগৃহীত হইত। তজ্জন্য তাঁহাদের লাম্পট্য দূষ্য বা নিন্দনীয় ছিল না। পক্ষান্তরে, অন্যান্য অনেক স্থানের রাজারা প্রজা, ভৃত্য, জ্ঞাতি কুটুম্বদিগের পরিবারবর্গের উপর অত্যাচার করিতেন। তাঁহাদিগের তাদৃশ ছাগবৎ অবিচারিত কামুকতা হেতু লোকে তাঁহাদিগকে ছাগ্‌লা রাজা বলিত।

* সেই ব্রহ্মত্রের কিয়দংশ এখনও তদ্বংশীয়দিগের আছে।

চেহারা বরং রতনেরই অধিক সুন্দর। কিন্তু রামনাথ দেওয়ানের পুত্র এবং সম্পত্তিশালী বড় লোক এবং পারসী ভাষায় বিদ্বান, তজ্জন্য তিনি দরিদ্র ও ক্ষুদ্র চাকুরিয়া রতনকে মিতা বলিতে অপমান বোধ করিতেন। এখন রতন রাজার প্রিয়পাত্র এবং সঙ্গতিপন্ন হওয়ায় রামনাথ প্রথমেই গিয়া রতনকে মিতা বলিয়া সম্বোধন করত তাহার সহিত কোলাকুলি করিলেন। কাজেই এখন দুই জনে খুব মিতালি হইল। এ মিতালি উভয়েরই উপকার জনক। রতনের মাতা ও পত্নীরা রাণীদের নিকট বক্তৃতা করিয়া রামনাথ ও রতনের উন্নতির চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহাতে বাগছি সাহেবের দলবল পুনরায় উজ্জীবিত হইল।

রাজা কুমার গৌরচন্দ্র খাঁকে ডাকিয়া মৃত দেওয়ানের শ্রাদ্ধের সাহায্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। গৌর গোকুলের দলের লোক অথচ তাঁহার সহিত কাহারও বিবাদ বা শত্রুতা ছিল না। তিনি কহিলেন, "স্বর্গীয় দেওয়ানজীর শ্রাদ্ধে কেবল এক শত টাকা মাত্র সাহায্য করা রাজ সরকারের অযোগ্য, কিন্তু মহারাজের অপব্যয় বৃদ্ধি হওয়ায় অন্যান্য ব্যয় সংক্ষেপ করা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। গোকুল কাকা অবিবেচক লোক নন। তবে কিনা রাজ-কোষের অবস্থা দৃষ্টে তিনি হাত ছোট করিয়াছেন। অপব্যয় এইরূপ থাকিলে আপনকার পিতৃশ্রাদ্ধের ব্যয়ও কমাইতে হইবে।" গৌরচন্দ্রের উত্তর শুনিয়া রাজা অনেকক্ষণ লজ্জায় মাথা নামাইয়া থাকিলেন। পরে কহিলেন, "বাবাজী! আমি আর একটা শূন্য বসান কর্ত্তব্য বোধ করি।" গৌরচন্দ্র কহিলেন, "শূন্যই যোগ্য বটে কিন্তু তহবিল শূন্য জন্য কম করুন।" রাজা ইতস্ততঃ করিয়া ৫০০৲ টাকা মঞ্জুর করিলেন।

ইহার অল্পকাল পরেই পেস্কারী কর্ম্ম খালি হইল। রাজা রামনাথকে ঐ কর্ম্ম দিতে চাহিলেন। কিন্তু রামনাথ গোকুলের নিকটস্থ অধীন কর্ম্মচারী হইতে সম্মত হইলেন না। যদিও রাজ্যস্থ সকল কর্ম্মচারীই দেওয়ানের অধীন ছিল তথাপি কামতার খাঁ ও গৌরচন্দ্রের উপর গোকুল কোন প্রকার কর্ত্তৃত্ব প্রকাশ করিতে সাহস করিতেন না। রামনাথ গৌরচন্দ্রের অধীনে স্থানান্তরে কর্ম্ম করিতেন তজ্জন্য তাঁহার উপর গোকুলের বিশেষ কোন প্রকার কর্ত্তৃত্ব ছিল না। সদরের পেস্কারী উচ্চতর কর্ম্ম বটে কিন্তু তাহাতে

গোকুলের সম্মুখে স্পষ্ট অধীনে থাকিতে হয় বলিয়া রামনাথ তাহা স্বীকার করিলেন না। তিনি কুমার সাহেবের অধীনে জমিদারীর নায়েবী করাই শ্রেয়ঃ বোধ করিলেন। রাণী জগদম্বা ও রতনের অনুরোধে তাঁহার বেতন বৃদ্ধি হইল। লালা রামদয়াল পেন্সন হইলেন। জমানবিশী খালি হওয়ায় রতন তাহাই প্রার্থনা করিলেন। রাজা কহিলেন, "কেন, তোমার তো উপার্জ্জন কম হচ্ছেনা অথচ রাজভোগ খাও আর ইয়ার্কি দিয়ে বেড়াও, কোন কষ্ট নাই। জমানবিশী করিতে হাড়ভাঙ্গা মেহনত করিতে হইবে আর আমার সঙ্গে দেখা করিতে অবসরও পাইবে না।" রামনাথ কহিল, "জমানবিশীতে মিতা যা পাবে সেটি হবে তার সদুপার্জ্জন আর এখন এখানে যা পাচ্ছে তা সদুপার্জ্জন নয়। লালা এবং কুমার সাহেব তাহা মহারাজের অপব্যয় বলে জ্ঞান করেন। আর হুজুরের সঙ্গে ইয়ারকি দিয়ে রাজপুত্রের মত থাকা গরীবের পক্ষে ভাল নয়। এই জমানবিশী কর্ম্ম মিতাকে দিন। যদি হুজুরের ইচ্ছা হয় তবে সন্ধ্যাকালে ডেকে নিবেন আর রাত্রিতে আহারের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সে আপনার সঙ্গে সঙ্গে থাকিবে।" রামনাথের চেষ্টায় কুমার গৌরচন্দ্র এবং রাণী জগদম্বাও রতনকে জমানবিশী দিতে অনুরোধ করিলেন। ইচ্ছা না থাকিলেও অনুরোধে বাধ্য হইয়া রাজা রতনকে জমানবিশী কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। রতন জমানবিশী কর্ম্ম পাওয়ায় রাজার একটি মস্ত অপব্যয় কমিল, রতনের সম্ভ্রান্ত পদ হইল এবং রামনাথেরও বল বৃদ্ধি পাইল।

রূপ খাঁ রাজকার্য্য করিতেন না বটে কিন্তু গোকুল অতিমাত্র যোগ্যতা ও পরিশ্রম পূর্ব্বক সমস্ত কাজ চালাইতেন বলিয়া কোন গোলযোগ হইত না। ফলতঃ রূপ খাঁর উপর কেহ অসন্তুষ্ট ছিল না। তিনি উদ্ধত হইলেও অত্যাচারী ছিলেন না। তিনি কামুক ছিলেন কিন্তু লম্পট ছিলেন না। তিনি বিদ্বান বা কার্য্যদক্ষ ছিলেন না বটে কিন্তু প্রজা, ভৃত্য এবং আত্মীয় স্বজনের একান্ত হিতার্থী ছিলেন। তিনি অনেক দরিদ্র প্রজার জীবিকার সদুপায় করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার প্রজা কিম্বা ভৃত্যবর্গ মধ্যে অর্থাভাবে যাহাদের বিবাহ হইত না তিনি নিজ ব্যয়ে তাহাদের বিবাহ দিয়া দিতেন। তিনি অতিশয় দয়ালু ছিলেন। একদিন তিনি শিকার করিতে যাইতেছিলেন, পথের ধারে একটি দরিদ্রা বৃদ্ধাকে রোদন করিতে দেখিয়া তাহার দুঃখের কারণ অনুসন্ধান

করিলেন। প্রতিবাসী লোকের নিকট শুনিলেন যে ঐ বৃদ্ধার একটি মাত্র পুত্র ছিল তাহার মৃত্যু হইয়াছে। বৃদ্ধার প্রতিপালনের আর কোন উপায় নাই। সে শোকে দুঃখে কান্দিতেছে। রাজা হাতী হইতে নামিয়া গিয়া বৃদ্ধার কোলে বসিলেন এবং তাহাকে মা বলিয়া নিজের চাদর দ্বারা তাহার চক্ষের জল মুছিলেন। বৃদ্ধা যখন জানিতে পারিল যে তাহার সেই সান্ত্বনাকারী স্বয়ং মহারাজা রূপেন্দ্রনারায়ণ খাঁ সাহেব, তখন সে কাঁপিতে কাঁপিতে পদতলে পড়িল। রাজা তাহাকে নানারূপ প্রবোধ দিয়া শান্ত করিলেন এবং তাহার মাসিক ৩৲ টাকা বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিয়া দিলেন। এইরূপ তিনি যাহার দুঃখ দেখিতেন তাহারই দুঃখ মোচনের চেষ্টা করিতেন। সৈন্য সামন্তদিগের সহিত তাঁহার বন্ধুবৎ ব্যবহার ছিল এবং যোগ্যতানুসারে তাহারা পুরস্কার পাইত। লোক বশীকরণ শক্তি একটাকিয়া রাজবংশের পুরুষানুক্রমিক। রূপেন্দ্র সে গুণে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন ছিলেন না। তাঁহার সৈন্য, সেনাপতি, অমাত্য, ভৃত্য, প্রজা, কুটুম্ব, পত্নী, উপপত্নী সকলেই তাঁহার অনুগত ও হিতার্থী ছিল। দোষের মধ্যে তাঁহার ব্যয়বাহুল্যে ধনাগার শূন্য হইয়াছিল। তাহাই তাঁহার সর্ব্বনাশের হেতু হইল।

একবিংশ অধ্যায়।

মোগল সম্রাট কর্ত্তৃক রূপেন্দ্রকে মুসলমান করিতে চেষ্টা।—রূপেন্দ্রের মুক্তি ও পুত্রলাভ। —সর্ব্বমঙ্গলার সাতগড়ায় আগমন ও সনন্দ প্রাপ্তি।—নৃসিংহের মৃত্যু ও লক্ষ্মীর সহমরণ।—সর্ব্বমঙ্গলার সতীত্ব রক্ষা।

দিল্লীর মোগল সম্রাটেরা পাঠানদের অপেক্ষা বেশী কুলাভিমানী ছিলেন। তাঁহাদের পুত্রেরাও কোন ছোট লোকের কন্যা বিবাহ করিত না। মোগলেরা সৈয়দ ভক্ত ছিল না এবং কোন দরিদ্র সৈয়দের সহিত কন্যার বিবাহ দিত না। মোগলেরা ভ্রাতৃঘাতক ছিল। যখন যে বাদশাহ হইত অমনি নিজ ভ্রাতাদিগকে সবংশে বিনাশ করিত, তজ্জন্য ভ্রাতৃপুত্র সহ কন্যা বিবাহ দিতে পারিত না। তাহারা কোন ব্রাহ্মণকে মুসলমান করিতে পারিলে বড়ই গৌরব এবং পুণ্যকর্ম্ম জ্ঞান করিত। মোগল সম্রাটগণ কোন রূপবান্ গুণবান্ সঙ্গতিসম্পন্ন ব্রাহ্মণ যুবক দেখিলে কখন কখন তাহাকে প্রলোভনে বা বল পূর্ব্বক মুসলমান করিয়া তাহার সহিত কন্যা বিবাহ দিতেন। তাঁহারা ক্ষত্রিয় রাজাদিগের কন্যা বিবাহ করিতেন বটে কিন্তু ক্ষত্রিয়ের সহিত কন্যা বিবাহ দিতেন না। ভারতবাসী কোন মুসলমানের সহিত কন্যা বিবাহ দেওয়া অপমানজনক বোধ করিতেন। মোগল সম্রাটেরা দীন-দুনিয়ার মালিক অর্থাৎ ধর্ম্ম ও রাজ্য উভয়েরই কর্ত্তা বলিয়া খ্যাত ছিলেন এবং আপনাদিগকে অতীব কুলীন বলিয়া জ্ঞান করিতেন, এজন্য কোন উচ্চ কুলোদ্ভূত ব্রাহ্মণকে মুসলমান করিয়া তৎসহ কন্যা বিবাহ দিতে না পারিলে তাঁহাদিগের কন্যার বিবাহ হইত না। সুতরাং অধিকাংশ কন্যাই যাবজ্জীবন অবিবাহিতা থাকিত। আকবর শাহ একটাকিয়া রাজকুমার চন্দ্রনারায়ণের সহ এক কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন, আর সঙ্গীত শাস্ত্রবিৎ বিখ্যাত কাশ্মীরী পণ্ডিত তানসেনের সহিত আর এক কন্যার বিবাহ হয়। সম্রাট আলমগীর নিজ ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্রদিগকে বিনাশ করিয়াছিলেন কিন্তু তাহাদের কন্যাগণকে নষ্ট করেন নাই। তিনি দেখিলেন বাদশাহী বংশীয়া বহুকন্যা অবিবাহিতা রহিয়াছে। তিনি তাহাদের বিবাহ

দিবার জন্য ইরাণ, তুরাণ এবং আরবের রাজবংশে মুসলমান পাত্র এবং ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ পাত্র সংগ্রহ করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন কিন্তু দুইটির অধিক কন্যা বিবাহ দিতে পারেন নাই। কাশ্মীরী পণ্ডিত কৃষ্ণনারায়ণ তাঁহার প্রথম জামাতা এবং বোখারার মির্জা আস্কর খাঁ তাঁহার দ্বিতীয় জামাতা। আলমগীর তৎকালীন বাঙ্গালার সুবেদার শায়স্তা খাঁকে আদেশ করিয়াছিলেন যে, একটাকিয়া ঠাকুর বংশে সুপাত্র থাকিলে তাহাদিগকে আটক করিয়া মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করণান্তর প্রহরী বেষ্টিতাবস্থায় দিল্লীতে পাঠাইয়া দেন। কিন্তু সেই পাত্র যে পর্য্যন্ত ভক্ত মুসলমান না হয় সে পর্য্যন্ত যেন তাহাকে দিল্লীতে পাঠান না হয়। কেন না তাঁহার কন্যার বর ঘৃণিত কাফের স্বভাবে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হওয়া তিনি ইচ্ছা করিতেন না। নবাব শায়স্তা খাঁ অতিশয় সদাশয় লোক ছিলেন কিন্তু বাদশাহের হুকুম অমান্য করিতে তাঁহার সাধ্য ছিল না। তিনি সম্রাটের আদেশমত বিধর্ম্মীর উপর জিজিয়ার অর্থাৎ মাথাগন্তি শুল্ক আদায়ের হুকুম দিয়াছিলেন বটে কিন্তু কার্য্যতঃ অতি অল্পই আদায় করিতেন। তিনি সম্রাটের সেই আদেশ পত্র তাঁহার প্রধান সচীব খানিব আলীকে দেখাইলেন। সচীব কহিলেন, "একটাকিয়ারা প্রধান কুলীন এবং অতি সম্পত্তিশালী লোক। তাহারা সুন্দরী কন্যা বাছিয়া বিবাহ করে। তাহাদের সন্তান অধিকাংশই সুন্দর হয় এবং সেই সকল সন্তান অতি যত্নে পালিত ও শিক্ষিত হয়। তাহাদের পুরুষেরা প্রায় সকলেই পারসী ভাষা জানে। একটাকিয়া বংশে এত পাত্র জুটিতে পারে যে তাহাতে বাদশাহের সমস্ত কন্যার ও পৌত্রীর বিবাহ হইতে পারে।" নবাব কহিলেন, "আলাউদ্দীন বাদশাহ অতিশয় স্বেচ্ছাচারী ছিলেন। তিনি একদিন একটি কয়েদীকে হত্যা করিয়া তাহার মাংস আহার করিবার অভিপ্রায়ে বাবুর্চিকে (পাচক) সেই মাংস উত্তমরূপে পাক করিতে হুকুম দিলেন। উজির গোপনে বাবুর্চিকে কহিলেন, এই মাংস পাক হইলে আগে আমাকে না জানাইয়া বাদশাহকে দিবে না তদনুসারে বাবুর্চি মাংস পাক করিয়া উজিরকে সংবাদ দিল। উজির সেই মাংসের যৎকিঞ্চিৎ মুখে দিয়া দেখিলেন তিনি যত প্রকার মাংস খাইয়াছেন তদপেক্ষা মনুষ্য মাংস সুখাদ্য। তখন উজির পাচককে কহিলেন, এই মাংস যেরূপ সুখাদ্য যদি বাদশাহ ইহার আস্বাদ পান তবে প্রত্যহ

নরহত্যা করিয়া মাংস খাইবেন। অতএব তুমি এই মাংসে প্রচুর পরিমাণে লবণ ঢালিয়া দিয়া ইহা অখাদ্য বিস্বাদ করিয়া ফেল। বাদশাহ জিজ্ঞাসা করিলে বলিও যে এই মাংসে একেবারেই লবণ দেওয়া হয় নাই। আমি তাঁহাকে বুঝাইয়া দিব যে পশু পক্ষীরা লবণ খায় না তাহাদের মাংস লবণ দিয়া পাক করিতে হয়। মনুষ্যেরা লবণ খায় বলিয়া তাহাদের মাংস স্বভাবতঃ লোণা। তাহা অখাদ্য জন্যই কোন সভ্যজাতি মনুষ্য-মাংস খায় না। উজির এই উপায়ে বাদশাহের তাদৃশ কুপ্রবৃত্তি নিবারণ করিয়াছিলেন। আমাদের তাদৃশ কোন উপায় করিতে হইবে নতুবা এতদ্দ্বারা হিন্দু মুসলমান সকলের অনিষ্ট ঘটিবে। ঔরংজেব এদেশীয় কোন মুসলমানকে কন্যা দিবে না কেবল ব্রাহ্মণের জাতি মারিতে উৎসুক। সৈয়দ হোসেন শাহ যেমন একটাকিয়া বংশে এক অন্ধ ব্যতীত সমস্ত যুবককেই মুসলমান করিয়াছিল ঔরংজেবও সেইরূপ করিতে হুকুম দিবে। তাহাতে হিন্দুদের উপর অনেক অত্যাচার হইবে অথচ মুসলমানেরও বিপদ হইবে। বিদ্যা বুদ্ধিতে মুসলমানেরা কখনও হিন্দুর তুল্য হইতে পারিবে না। যে সকল মুসলমান উচ্চ কর্ম্মচারী আছে তাহারা খারিজ হইবে। আর বাদশাহের নূতন জামাতাগণ এবং তাহাদের আত্মীয়েরা সেই সকল কর্ম্মে নিযুক্ত হইবে। সুতরাং সেই ভবিষ্যৎ আপদ নিবারণ জন্য বাছিয়া বাছিয়া দুই একটি পাত্র বাদশাহের নিকট পাঠাইয়া লিখিবে যে হিন্দুর মধ্যে আর কোন সুপাত্র দেখিতে পাওয়া গেল না। ঔরংজেব বড় সন্ধানী লোক। তাহাকে একবারে ফাঁকি দেওয়া যাইবে না। তুমি একটাকিয়াদের মধ্যে দুই একটি ভাল পাত্র ঠিক কর। আমি তাহাদিগকে তলপ দিয়া এখানে আনিয়া তাহার পর বিবাহে প্রস্তাব করিব। সাবধান যেন কেহ আগে কিছু টের না পায়।" খানিব আলি অনুসন্ধান করিয়া রূপেন্দ্র ও ভাজনীর অমল চাঁদ রায় এই দুইজনকে মনোনীত করিল। নবাব তাঁহাদিগকে ঢাকায় আনিয়া আটক করিলেন। সেই সংবাদ সাতগড়ায় পৌছিলে রাণীরা শোকে দুঃখে নিতান্ত অধীর হইয়া পড়িলেন। সকলেই অত্যন্ত ব্যস্ত হইল। গৌরচন্দ্র রামনাথ বাগছির উপর এবং গোকুল রামদয়ালের উপর নিজ নিজ কার্য্যভার অর্পণ করিয়া রাজার উদ্ধারার্থে ঢাকাভিমুখে যাত্রা করিলেন। রূপেন্দ্র কর্ণে কম শোনেন বলিয়া ভাণ করিতেছিলেন। গৌর ও গোকুল গোপনে থাকিয়া

প্রচুর উৎকোচে বশীভূত নবাবের পারিষদবর্গের দ্বারা রূপ খাঁর ধাতুর পীড়া থাকা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। নবাব হাকিম ও কবিরাজ দ্বারা পরীক্ষা করাইলেন। চিকিৎসকেরাও ঘুষের বশবর্ত্তী হইয়া রূপ খাঁর শরীর পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "রূপ খাঁর ধাতুর পীড়া আছে গরমীর পীড়াও ছিল কিন্তু তাহা এখন বাহিরে আরাম হইলেও রক্ত নির্দ্দোষ হয় নাই।" তখন নবাব রূপ খাঁকে ছাড়িয়া দিলেন। রূপ খাঁ মুক্তি পাইলেন বটে কিন্তু এই মুক্তি লাভ করিতে তাঁহার বহু অর্থ ব্যয় হইল। অমল চাঁদকে মুসলমান করা জন্য অনেক ভয় ও প্রলোভন দেখান হইল কিন্তু তিনি কিছুতেই মুসলমান হইতে স্বীকার করিলেন না তজ্জন্য বাদশাহের হুকুম মতে নবাব তাঁহার প্রাণদণ্ড করিলেন। ইহার পর একটাকিয়া বংশে আর কেহই মুসলমান হয় নাই।

রাণী জগদম্বার সন্তান সম্ভাবনা ছিল। তাঁহার একটি পুত্র হইল। তাহার কিছুকাল পরেই রূপেন্দ্র মুক্তিলাভ করিয়া সাতগড়ায় পৌঁছিলেন। এই উভয় আনন্দে মহা ধূমধামে কালী পূজা ও মহোৎসবের আয়োজন হইল। জগদম্বার বিবাহ অবধি নৃসিংহের সহ উপেন্দ্রের কতক সদ্ভাব হইয়াছিল। এই মহোৎসব উপলক্ষে সমস্ত কুটুম্বদিগের নিমন্ত্রণ হইল। নৃসিংহ আসিলেন না বটে কিন্তু কেশব সর্ব্বমঙ্গলাকে লইয়া সাতগড়ায় আসিলেন। অশৌচের পরেই পূজা ও উৎসব হইল। ব্যাপার সমাধা হইলে কেশব বিদায় প্রার্থনা করিলেন। রূপ খাঁ শ্বশুরকে আরও কিছুদিন রাখিবার জন্য আকিঞ্চন করিলেন। কিন্তু কেশব সম্মত না হওয়ায় রাজা তাঁহাকে যথোচিত লৌকিকতা দিয়া বিদায় দিলেন। কিন্তু সর্ব্বমঙ্গলাকে আর কিছু দিন সাতগড়ায় থাকিতে একান্ত অনুরোধ করিলেন।

সর্ব্বমঙ্গলা কহিলেন, "আমি গৃহে না যাইলে আমাদের সংসার অচল হইবে, অতএব আমাকে যাইতে দাও।" তখন রূপেন্দ্র একজন মুহুরীকে এবং গৌরচন্দ্র ও গোকুলকে ডাকিয়া পাঠাইলেন, তাঁহারা উপস্থিত হইলে রূপেন্দ্র কহিলেন, "আমি দিদিকে একটী তালুক সনদ দিবার ইচ্ছা করি। ডিহি খাজুরিয়া একশত টাকা জমায় দিতে ইচ্ছা করি।" ইহাতে গৌর চন্দ্র কম জমা বলিয়া আপত্তি করিলেন, শেষে অনেক তর্ক বিতর্কের পর জমার টাকা আরও কিছু বাড়াইতে হইবে স্থির হইল। গৌরচন্দ্র মুহুরীকে তিন অঙ্গুলি দেখাইয়া

সঙ্কেত করিলেন। তদনুসারে মুহুরী অমনি তিনশত টাকা জমা ধার্য্যে মকররী মৌরষী তালুকের পাট্টা কবুলিয়ত লিখিয়া ফেলিল। গৌর ও গোকুল পাট্টা কবুলিয়ত পাঠ করিয়া পাট্টা দস্তখত করিলেন। মুহুরী পাট্টা রাজার হাতে এবং কবুলিয়ত সর্ব্বমঙ্গলার হাতে দিল। পাট্টা পড়িয়া রাজা কহিলেন, "জমাটা আর কিছু কম হলে ভাল হয়।" গৌর বলিলেন, "ছোট পিসী তো আমার পর নয় তবে কি না এর চেয়ে জমা আর কমান যায় না বলেই এই জমা ধার্য্য করিলাম।" রাজা কিছু ইতস্ততঃ করিয়া পাট্টা দস্তখত মোহর করিলেন। পরে তালুকের পাট্টাখানি সর্ব্বমঙ্গলার গায়ের উপর রাখিয়া প্রণাম করিলেন। সর্ব্বমঙ্গলা কবুলিয়ত দস্তখত করিয়া ১০৮৲ টাকা নজর সহ রূপ খাঁর হাতে দিলেন। রূপ খাঁ রাজব্যবহারে সেই নজরের টাকা গ্রহণ করিলেন। আবার ভাগিনা ও ভাগিনীর দুধ মিষ্ট খাইবার খরচা বলিয়া সেই টাকা প্রত্যর্পণ করিলেন। গৌর ও গোকুল এক এক মোহর দিয়া মঙ্গলাকে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলেন। রাণীরা প্রত্যেকে পাঁচ মোহর প্রণামী দিয়া বিদায় সূচক রোদন করিলেন। স্ত্রীলোকের চক্ষের জল আজ্ঞাবহ, মনে দুঃখ হউক বা না হউক সর্ব্বমঙ্গলা কাঁদিয়া বিদায় লইলেন।

এই ঘটনার কয়েক মাস পরেই কেশবের মৃত্যু হইল। তাঁহার তিন পত্নী মধ্যে দুই জন তাঁহার সহ চিতারোহণ করিলেন। তাঁহাদিগের শ্রাদ্ধোপলক্ষে রূপেন্দ্র নিজেই জগদম্বাকে সঙ্গে লইয়া দাদনাশে গেলেন। তাঁহার সাহায্যে বহু ব্যয় বিধানে শ্রাদ্ধ নির্ব্বাহ হইল। এই সময়ে রাণী সৌদামিনীর কাশী-প্রাপ্তির সংবাদ আসিল। নৃসিংহ ও সর্ব্বমঙ্গলা সেই শ্রাদ্ধোপলক্ষে সাতগড়ায় গেলেন। বহুদিবস পরে নৃসিংহ পুনরায় সাতগড়ায় আসিলেন। সাতগড়ার পরিবর্ত্তিত নূতন অবস্থা নৃসিংহের মনে পূর্ব্বস্মৃতি জাগরিত করিয়া দিল। তিনি এক হাজার টাকা শ্রাদ্ধের সাহায্য করিলেন এবং সকলের সহিত সদ্ব্যবহার করিলেন। গোকুল এবার নৃসিংহকে খুব ভক্তি করিলেন। গোকুল আড়ম্বরে জল খাওয়ার আয়োজন করিলেন। নৃসিংহ, সর্ব্বমঙ্গলা, রাজা, রাণী সকলেই গোকুলের বাড়ী গিয়া জলযোগ করিয়া আসিলেন। নগরবাসী সম্ভ্রান্ত লোক প্রায় সকলেই নৃসিংহকে ভোজন, ফলাহার বা জলযোগের নিমন্ত্রণ করিতে লাগিল। নৃসিংহ কাহারও নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করিলেন না। সপ্তদশ দিবস

এইরূপ নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া সর্ব্বমঙ্গলা সহ নৃসিংহ দামনাশে ফিরিয়া আসিলেন। ইহাই তাঁহাদের শেষযাত্রা সাতগড়া দর্শন।

ইহার পর নৃসিংহ দুই বৎসর জীবিত ছিলেন। সেই দুই বৎসর মঙ্গলার সর্ব্বসুখময়। স্বামীর মৃত্যু হইলে লক্ষ্মী সর্ব্বমঙ্গলার উপর তাঁহার সন্তান-পালনের ভার অর্পণ করিয়া পতির সহমৃতা হইলেন। সর্ব্বমঙ্গলারও তদ্রূপ অভিপ্রায় ছিল কিন্তু নানা কারণে ইচ্ছা সত্বেও তিনি পতি সহ চিতারোহণ করিতে পারেন নাই। নৃসিংহ মৃত্যু-শয্যায় তাঁহার তাদৃশ অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া তাঁহাকে নিষেধ করিয়া বলিয়াছিলেন, "বিধবার পক্ষে ব্রহ্মচর্য্যই সর্ব্বোত্তম, সহমরণ মধ্যম এবং পত্যন্তর গ্রহণ অধম পথ। ব্রহ্মচারিণী পত্নী ধর্ম্মসাধন দ্বারা নিজের ও পরলোক গত স্বামীর উপকার করিতে পারে এজন্য শাস্ত্রকারেরা তাহাই শ্রেষ্ঠতম পথ বলিয়া নির্ব্বাচন করিয়াছেন। সহমরণ কেবল পাপ হইতে পলায়ন মাত্র। যে নারীর ইন্দ্রিয় প্রবল থাকে অথবা জীবিকানির্ব্বাহের সদুপায় থাকে না, সহমরণ কেবল তাদৃশ রমণীর জন্যই প্রশস্ত। তোমার যৌবনান্ত হইয়াছে, জীবিকানির্ব্বাহের সংগতিও প্রচুর আছে এ অবস্থায় সহমরণ তোমার আত্মহত্যার পাপ হইবে। অধিকন্তু আমার কতকগুলি শিশু সন্তান আছে, স্বর্গীয় কাকা মহাশয়েরও কতকগুলি বালক বালিকা আছে। তাহাদেরও লালন পালনের ভার তোমার উপর দিয়া খুড়ীমারা কাকা মহাশয়ের সহমৃতা হইয়াছেন। সংসারে পুরুষ অভি-ভাবক কেহই থাকিল না। তাহাদের পিতা মাতা উভয়ের কাজই তোমাকেই করিতে হইবে। তুমি না থাকিলে তাহারা মারা যাইবে। তাহাতেও তোমার গুরুতর পাপ হইবে। তৃতীয়তঃ পুরুষানুক্রমিক আমাদের যে সকল নিত্য নৈমিত্তিক সৎকার্য্য আছে তোমার অভাবে তাহা চলিবে না। তাহাতে তোমার আমার উভয়েরই মহাপাপ হইবে। এবং তাহাতে কুলের অখ্যাতি হইবে। অতএব তুমি সহগমন ইচ্ছা পরিত্যাগ করিয়া আমার প্রতিভূরূপে সংসার চালাও এবং তদ্দ্বারা পুণ্য ও প্রতিষ্ঠা লাভ কর।" প্রজা, ভৃত্য, আত্মীয়, গুরু, পুরোহিত সকলের অনুরোধ এবং অসহায় বালক বালিকাদিগের রক্ষার উপায় না থাকায় সর্ব্বমঙ্গলা অগত্যা পতির সহমরণাভি-প্রায় পরিত্যাগ করিলেন।

শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন স্ত্রীলোক কখনই স্বাতন্ত্র অবলম্বন করিবেন না। পিতার অধীনে বাল্যে, যৌবনে স্বামীর অধীনে এবং বার্দ্ধক্যে পুত্র পৌত্রাদির অধীনে থাকিবে। রমণী স্বাধীনাবস্থায় থাকিলে ভ্রষ্টা হয় অথবা বহু কষ্টে পতিত হয়। এই জন্য স্ত্রী জাতি কোন অবস্থায়ই স্বাধীন হইবার যোগ্য নহে। সর্ব্বমঙ্গলা এখন শাস্ত্রের সেই উপদেশের সারবত্তা অনুভব করিতে লাগিলেন। কর্ত্তৃত্ব ও প্রাধান্য সুখকর বলিয়া বোধ হয় বটে কিন্তু সকল সময় সকল অবস্থায় নহে। কিঞ্চিৎ পরিমাণে কর্ত্তৃত্ব ও প্রাধান্য সকলের পক্ষেই সুখপ্রদ হইলেও কেবল মাত্র মিষ্ট যেমন কাহারও খাইতে ভাল লাগে না বরং মিষ্টতার পরিমাণ বেশী হইলে তাহা খাওয়া কষ্টকর বা অসাধ্য হইয়া উঠে, সেইরূপ নিরবচ্ছিন্ন সর্ব্ব বিষয়ে কর্ত্তৃত্ব সুখকর না হইয়া কষ্টকর এমন কি অনেক সময়ে অসহনীয় হয়। যে লেখা পড়া জানে সে একটু স্বাধীনতা প্রিয় এবং প্রাধান্য লিপ্সু হয়। সর্ব্বমঙ্গলা রাজার কন্যা লেখা পড়ায় সুশিক্ষিতা জন্য কর্ত্তৃত্ব করিবার লালসা তাঁহার খুব প্রবল ছিল। শাশুড়ী বর্ত্তমানে যখন তিনি প্রপন্ন ও প্রধান ছিলেন না ততদিন তিনি কর্ত্তৃত্ব বড়ই সুখকর বলিয়া বিশ্বাস করিতেন এবং তজ্জন্য তাহা লাভের জন্য লালায়িতা ছিলেন। পরে যখন গৃহিণী হইয়া তিনি প্রথমে অন্তঃপুরের কর্ত্তৃত্ব পাইলেন তখন ভাণ্ডার ঘর তাঁহার নিজ জিম্মায় ছিল, তজ্জন্য তাঁহাকে বহু পরিশ্রম করিতে হইত তথাপি তাহাতে তাঁহার সুখ বোধ হইত। তাহার পর যখন তালুক পাইলেন, মুহুরী, ভাণ্ডারী চাকর রাখিলেন, তখন তাঁহার পরিশ্রম কমিল প্রাধান্য বেশী হইল। সুতরাং এই সময়ই তাঁহার জীবন সর্ব্বাপেক্ষা সুখময় ছিল। এখন বিধবা হওয়ার পর তিনি সর্ব্ব বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনা। ষোল আনা কর্ত্তৃত্বই তাঁহার নিজের হাতে। কিন্তু সে স্বাধীনতা সে কর্ত্তৃত্ব সর্ব্বমঙ্গলার নিকট আর সুখকর বলিয়া বোধ হইল না। ঘরে সধবা স্ত্রীলোক কেহই নাই। এক খুড়শাশুড়ী ও নিজে, সমস্ত বালক বালিকা প্রতিপালন করিতে হয়। চাকর চাকরাণী দ্বারা ব্রাহ্মণের বিধবার বিশেষ কোন সাহায্য হয় না। পাকের ঘরে শূদ্রের জল অব্যবহার্য্য, পূজার ঘরেও তাই। সুতরাং বালক বালিকা ও চাকরদের জন্য পাক করিয়া তাহাদিগকে খাওয়াইয়া পুনরায় স্নান করিতে হয়। তাহার পর শিবপূজা, ইষ্টমন্ত্র জপ সমাপনান্তে হবিষ্য ঘরে পাক

করিয়া শালগ্রাম ঠাকুরের ভোগ হইলে বেলা তৃতীয় প্রহরে সর্ব্বমঙ্গলার আহার হয়। আহারান্তেও এক মুহূর্ত্ত বিশ্রাম করিবার যো নাই। সাংসারিক আয় ব্যয় দেখিতে হয়, টাকার শুধ আসল আদায়ের চেষ্টা করিতে হয়, রাইয়তের নিকট খাজানা আদায় ও তাহার সরঞ্জাম খরচা দেখিতে হয়, খামার জমিতে বর্গাদার পত্তন করিয়া বিছল দিতে হয়, বর্গাদারী শস্যের ভাগ বুঝিয়া লইতে হয়, বাড়ী ঘর মেরামত, দোল দুর্গোৎসব, দীপান্বিতা, শ্রাদ্ধ, শান্তি, ব্রত, নিয়ম, অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, প্রভৃতি ব্যাপারের আয়োজন হইতে শেষ পর্য্যন্ত সকলই নিজেরই দেখিতে হয়; অতীথি অভ্যাগত কুলজ্ঞদিগের যথোচিত অভ্যর্থনা নিজে না করিলে চলে না। নিজের সন্তান, সপত্নীর সন্তান, দেবর ও ননদী মোট তেরটি বালক বালিকা তাঁহার প্রতিপাল্য। তাহাদের মধ্যে কেহ কাতর হইলে কবিরাজ ডাকাইতে, ঔষধ খাওয়াইতে, অনুপান, পথ্য যোটাইতে হয়। গুরুতর পরিশ্রমে ও চিন্তায় সর্ব্বমঙ্গলার শরীর দিন দিন শুষ্ক ও ক্ষীণ হইতে আরম্ভ হইল। তিনি স্বাধীন কর্ত্রী হওয়া অপেক্ষা পরাধীন নববধূর অবস্থা শত গুণে সুখকর বলিয়া বিবেচনা করিতে লাগিলেন। তথাপি তাঁহার সহায় সম্পদ ছিল। তিনি একটাকিয়ার ভগিনী জন্য তাঁহার কোন অনিষ্ট করিতে কাহারও সাহস হইত না। তাঁহার হাতে প্রচুর টাকা ছিল, আর্থিক কোন অনাটন ছিল না। এই দুই কারণে তিনি একবারে অবসন্ন হইয়া পড়েন নাই। নতুবা তাঁহার যে কত দুরবস্থা হইত তাহা অনুধাবন করা কঠিন। সর্ব্বমঙ্গলা দেখিলেন কর্ত্তা ও গৃহিণী উভয়ের কার্য্য একাকী করা তাঁহার অসাধ্য। এজন্য তিনি একজন সুযোগ্য কর্ম্মচারী রাখা মনস্থ করিলেন। তিনি সোণা-পাতিল নিবাসী দুর্গানাথ শর্ম্ম্য চৌধুরীকে মাসিক ১৫৲ টাকা বেতনে ও খোরাকী স্বীকারে মুচ্ছদ্দি নিযুক্ত করিলেন। দুর্গানাথ অতি সুশৃঙ্খলা পূর্ব্বক সমস্ত কার্য্য চালাইতে লাগিলেন। কিন্তু অল্প দিন মাত্র কাজ করার পরই সর্ব্বমঙ্গলার প্রতি কুদৃষ্টি পড়িল। তিনি সর্ব্বমঙ্গলাকে নিজের উপপত্নী করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

এক দিন সন্ধ্যার পর ঠাকুর আরতি করিয়া দুর্গানাথ জল খাইতে বসিলেন। সর্ব্বমঙ্গলা তাঁহাকে পরিবেশন করিতে লাগিলেন। তখন ঘরে আর অন্য লোক ছিল না। সুযোগ বুঝিয়া দুর্গানাথ হঠাৎ সর্ব্বমঙ্গলার হাত

ধরিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "ওঁ স্বস্তি।" মঙ্গলা বলপূর্ব্বক হাত ছাড়াইয়া লইলেন। লোককে কটু কথা বলা তাঁহার একবারেই অভ্যাস ছিল না তথাপি কিঞ্চিৎ উগ্রভাবে বলিলেন, "নিমকহারাম! তোমার কি প্রাণের ভয় নাই? তুমি জান আমি কে?" দুর্গানাথ ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে হাত যোড় করিয়া কহিল, "মা! আমাকে রক্ষা কর।"

মঙ্গলা। তোমার এ দুর্ব্বুদ্ধি কে দিল?

দুর্গানাথ। বিধাতার ইচ্ছা। তিনি ভিন্ন আর কে দিবে। সুন্দরী দেখিলেই পুরুষের কাম ভাব হয়। কামান্ধ লোকের ন্যায় অন্যায় জ্ঞান থাকে না। প্রাণের ভয়ও থাকে না।

মঙ্গলা। তোমাকে আর আমি বিশ্বাস করিতে পারি না।

দুর্গানাথ। আমিও তাহা চাই না। যদিও বিপদে পড়ে আমি তোমাকে মা বল্লাম বটে কিন্তু মুখে মা বল্লেই মন শুদ্ধ হয় না। তোমার অপেক্ষা আমার বয়স কিছু বেশী হইলেও তোমার আমার যৌবন সম্পূর্ণ যায় নাই। এক স্থানে থাকিলে আবার মন খারাপ হ'তে পারে। সেই জন্য আমিও আর এখানে থাক্‌বো না। যখন কয়েক দিন তোমার চাকরী কল্লাম, তখন তোমাকে একটি সদুপদেশ দিয়ে যাই যাতে তোমার উপকার হবে।

মঙ্গলা। কি উপদেশ?

দুর্গানাগ। যেখানে মেয়ে লোক কর্ত্তা অন্য অভিভাবক নাই সেখানে যে প্রধান কার্য্যকারক থাকে সে কর্ত্রীর পুত্র, স্বামী বা পিতৃবৎ থাকিয়া কার্য্যনির্ব্বাহ করিতে বাধ্য হয় নতুবা ভালরূপে কার্য্য চলে না। মনিবের পুত্র তুল্য থাকিয়া কাজ করাই প্রশংসনীয়। তাহাতে চাকর মনিব উভয়েরই ভাল। কিন্তু তোমার যে বয়স তাহাতে সন্তানের মত হইতে হইলে বয়স কম হওয়া আবশ্যক তাদৃশ অপরিপক্ক বয়স্ক লোকদ্বারা মুচ্ছদ্দির কাজ চলিবে না। যদি যুবা পুরুষ চাকর রাখ তবে হয়তো সে তোমার সতীত্বনাশের চেষ্টা করিবে অথবা তোমার ক্ষতি করিয়া স্বার্থ সাধনের চেষ্টা করিবে কিম্বা উভয় চেষ্টাও করিতে পারে। যদি তুমি সম্পত্তি ও ধর্ম্ম উভয়ই রক্ষা করিতে চাও তবে এখন একজন সুযোগ্য বৃদ্ধ লোক চাকর রাখ যে তোমার বাপের মত থাকিয়া সমস্ত কার্য্য সুচারুরূপে চালাইতে পারিবে।

সর্ব্বমঙ্গলা। এমন প্রাজ্ঞ লোক কোথায় পাব ?

দুর্গানাথ। আমার জ্ঞাতি জেঠা রাধামোহন চৌধুরী, বয়স আশী বৎসরের উপর, তিনি পারসী জানেন না বটে কিন্তু তোমার চাকরীতে পারসীর আবশ্যকও নাই। তাঁহাকে নিযুক্ত কর তাঁহাদ্বারা তোমার কাজ বেশ চলিবে। তিনি রোগা মানুষ সকাল সকাল আহার করেন বলিয়া ঠাকুর সেবা ঠাকুর ভোগ করিতে পারিবেন না। সে কাজের জন্য পূজারী রাখিও।

মঙ্গলা। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণেরা কোন ছোট কাজ করেন না, এ বারেন্দ্র দেশে পাচক পূজারী মিল্‌বে না।

দুর্গানাথ। তোমার ভাইএর বাড়ীতে যে সকল পাচক পূজারি আছে তাদের বল্লে তারাই তোমাকে পাচক পূজারী ব্রাহ্মণ এনে দিবে।

সেই রাত্রিতেই দুর্গানাথ প্রস্থান করিলেন। মূল ঘটনা সর্ব্বমঙ্গলা ব্যক্ত না করায় দুর্গানাথের তাদৃশ অকস্মাৎ প্রস্থানের কারণ কেহই জানিতে পারিল না। দুর্গানাথের সেই দুশ্চেষ্টা সর্ব্বমঙ্গলা কখনও প্রকাশ করেন নাই। ঘটনার বহুদিন পর ভাদুড়ী রাজ্য ধ্বংশ হইলে সর্ব্বমঙ্গলার বিশুদ্ধ চরিত্রের প্রশংসা প্রসঙ্গে দুর্গানাথ নিজেই এক সময়ে তাদৃশ দুশ্চেষ্টার কথা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

দুর্গানাথের উপদেশ বাক্য সারবান বিবেচিত হওয়ায় সর্ব্বমঙ্গলা উক্ত রাধামোহন চৌধুরীকেই মুচ্ছদ্দি রাখিলেন। এবং জটাধর নামীয় একজন অল্প বয়স্ক রাঢ়ী ব্রাহ্মণকে পূজারি রাখিলেন। জটাধর তাঁহার সন্তানের ন্যায় এবং রাধামোহন তাঁহার পিতার ন্যায় থাকিয়া কার্য্য করিতে থাকিলেন। এই কর্ম্মে নিযুক্ত হইবার পর রাধামোহন এগার বৎসর জীবিত ছিলেন, মঙ্গলা তাঁহাকে পিতৃবৎ সুশ্রূষা করিতেন এবং রাধামোহনও বিশ্বস্ত ভাবে যথাসাধ্য যত্ন সহকারে নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করিতেন।

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

রূপেন্দ্রের অপব্যয় সংশোধন চেষ্টা।—খিজমতের হত্যা।

নৃসিংহ সান্যাল ও রাণী সৌদামিনীর মৃত্যু হওয়ায় রূপেন্দ্রের শত্রু মধ্যে আর কেহ অবশিষ্ট থাকিল না কিন্তু গোকুলের শত্রু শেষ হইল না। রামনাথ বাগছি ও রামরতন মুখোপাধ্যায় সর্ব্বদাই গোকুলের একাধিপত্য বিনাশে সচেষ্ট ছিলেন। যদিও গোকুলের বুদ্ধি কৌশলে তাঁহারা গোকুলের কোন অনিষ্ট করিয়া উঠিতে পারেন নাই তথাপি তাঁহাদের ভয়ে গোকুলকে সর্ব্বদা সশঙ্কিত থাকিতে হইত। রাজার অপব্যয় নিবারণার্থ গৌর ও গোকুল নানা প্রকার উপায় করিতে লাগিলেন। রাজা যাহাকে যত টাকা দিবার হুকুম দেন গৌর তাহাকে তাহা সম্পূর্ণ দেন না। গোকুলের সহিত পরামর্শ করিয়া যথাসম্ভব কম করেন। নিতান্ত অপব্যয় বলিয়া বোধ হইলে কোন কোন স্থলে তহবিলে টাকা নাই বলিয়া কাহাকে বা কিছুই না দিয়া হাঁকাইয়া দেন। এই সকল কাজ গোকুলের পরামর্শমতে হইলেও গোকুল প্রকাশ্যে কোনরূপ রাজাজ্ঞা লঙ্ঘনের মধ্যে যাইতেন না। রূপেন্দ্র তাঁহার উপপত্নী-বর্গের আত্মীয়গণকে যত টাকা দিবার আদেশ করিতেন, গৌরচন্দ্র কখনও তাহাদিগকে সম্পূর্ণ টাকা দিতেন না, কখন বা একেবারেই শূন্যহস্তে বিদায় করিতেন। ইহাতে খাঁ সাহেব মনে মনে রুষ্ট হইলেও গৌরকে সম্মুখে কিছুই বলিতেন না। তিনি গোকুলকে একদিন বলিলেন, "দেখ, গোকুল দা, গৌর খুড়া সর্ব্বদাই আমার হুকুম অমান্য করে। একি তার উচিত? আমি অনেক সহ্য করি বটে কিন্তু মানুষের সহিষ্ণুতা কত দিন থাকে।" গোকুল গম্ভীর ভাবে উত্তর করিলেন, "কুমার সাহেব বয়সে বড় হইলেও সম্পর্কে হুজুরের ভ্রাতৃপুত্র, তিনি ঘরের ছেলে হলেও মহারাজের চাকর। তিনি যদি রাজাজ্ঞা লঙ্ঘন করেন তবে তাঁর গুরুতর অপরাধ। কিন্তু আমি যতদূর জানি তিনি তেমন

অবাধ্য লোক নন। তিনি সাধ্য পক্ষে হুজুরের হুকুম অমান্য করবেন এমন আমার বোধ হয় না। তবে কিনা রাজকোষের অনাটনে তিনি অনেক হুকুম পালন করে উঠ্‌তে পারেন না। রাণী ত্রি[illegible]ার আমল হ'তে এ সংসারে কখনও অর্থের অনাটন ছিল না। তাহার পর স্বর্গীয় মহারাজ উপেন্দ্রনারায়ণ মালবের নবাবী করে প্রচুর রোকড় বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। হুজুরের ব্যয় বাহুল্যে সমস্ত সঞ্চিত ধন রাশি নিঃশেষ হইয়াছে। এখন রাজ্যের আয় তিন লক্ষ টাকা। তাহার মধ্যে ষাট হাজার টাকা মালগুজারী ও নর্মা দিতে হয়। রাজ সরকারের বন্দেজী ব্যয় দুই লক্ষ ষোল হাজার। সুতরাং দান খয়রাত ও নৈমিত্তিক ব্যয়ের জন্য কেবল চব্বিশ হাজার টাকা মাত্র থাকে। তাহাতে না কুলাইলে কুমার বাবাজী নাচার হয়ে হুজুরের হুকুমানুযায়ী কাজ করিতে পারেন না। ইহাতে তাঁহার দোষ কি দিব। তিনি বীর, ধীর, অতি সদাশয় এবং মহারাজের একান্ত হিতৈষী। তাঁহার প্রতি যাহারা দোষারোপ করে তাহারা সৎলোক নহে।"

রূপেন্দ্র। আমার আবশ্যকীয় ব্যয় অবশ্যই চালাইতে হইবে। বহুদিন যাবৎ প্রজার জমা বৃদ্ধি করা হয় নাই। এখন তাহা কতক বাড়াইয়া এবং বন্দেজী খরচা কতক কমাইয়া খয়রাতী তহবিলে নব্বই হাজার টাকা করিতে হইবে। আমি ব্যয় কম করিলেও নিতান্ত পক্ষে মাসিক সাড়ে সাত হাজার টাকা আমার খাস খরচ হইবে। ইহার কমে আমি কোন মতেই চালাইতে পারিব না।

গোকুল। শস্যের মূল্য বৃদ্ধি না হইলে জমা বৃদ্ধি করিয়া কোন ফল নাই। জমা বৃদ্ধি করিলেই হয় না তাহা আদায়ের উপায় কি? স্বর্গীয় মহারাজ মহেন্দ্র নারায়ণের সময় হইতে এ পর্য্যন্ত শস্যের মূল্য বৃদ্ধি হয় নাই কাজেই জমা বৃদ্ধি হয় নাই। মৎস্যের মূল্য কিছু কিছু বৃদ্ধি হওয়ায় জলকর কিছু বৃদ্ধি হইয়াছে। আর পতিত জমি আবাদ হওয়ায় রাজস্ব কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পাইয়াছে। বনকর ফলকর কিছু কম হইয়াছে। জমা বৃদ্ধি করিলে প্রজাগণ সেই বর্দ্ধিত জমা দিতে পারিবে না। বন্দেজী খরচাও কম করা কঠিন। যাহার লাভের হানি হইবে সেই হুজুরের নিকট নালিশ করিবে। হুজুরের যেরূপ চক্ষুলজ্জা তাহাতে আপনিও তাহার নালিশ অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন না। আপনি নিজ ব্যয়

কম করুন। সকল লোকের প্রার্থনা পূরণ করা স্বয়ং পরমেশ্বরেরও অসাধ্য। এই জন্যই রাজা, বড় মানুষেরা সকলের সহিত সাক্ষাৎ করেন না। আপনি সাধারণের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন না, যাহার যে কিছু প্রার্থনা হয় আমাদের নিকট দরখাস্ত দিবে। আমরা তাহা পেশের উপযুক্ত বোধ করিলে মন্তব্য সহ পেশ করিব। হুজুর অবস্থানুসারে ন্যায় অন্যায় বিবেচনা করিয়া প্রার্থীর অসাক্ষাতে হুকুম দিবেন। তাহাতে চক্ষুলজ্জায় ঠেকিয়া অনর্থক ব্যয় বাহুল্য নিবারিত হইবে।

খিজমত সেই স্থানে উপস্থিত ছিল। সে দেখিল রাজা গোকুলের কথা মতে চলিলে তাহার লাভের পথ বন্ধ হয়। এজন্য সে গোকুলের কথায় ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল, "আপনারা সমস্ত রাজ্য লুটে খাচ্ছেন তাতে দোষ নাই, গরীব লোক মহারাজের কাছে যে দুই চারি টাকা পায় তাতেই আপনকার মনে বড় কষ্ট হয়। আপনি একাকী যা পান তা দিয়ে এক হাজার গরীব প্রতিপালিত হইতে পারে।"

গোকুল। (হাসিতে হাসিতে) তুমি উজির হইলে বোধ হয় খুব অল্প টাকায় বেশ কাজ চালাতে পার?

বক্তিয়ার খাঁ কামতার খাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র। এই সময়ে সে তথায় উপস্থিত ছিল। সে কহিল, "লালা সাহেবের উপর সমস্ত রাজ্যের ভার। তিনি রাজ-কার্য্য সম্বন্ধে যা জানেন তুমি সে কথার কি জান? কি বোঝ? তোমার সে কথায় সওয়াল জবাব কেন?"

রাজার আদরে খিজমতের ঔদ্ধত্য বাড়িয়া গিয়াছিল; সে অমনি বলিল, "আমি মহারাজের কাছে যা খুষি তাই বলি তাতে তোমার কি—তুমি কে?"

পাঠান সেই কথা শুনিবামাত্র চোক মুখ রক্তবর্ণ করিয়া লম্ফ দিয়া উঠিল এবং কোমরবন্ধে লম্বমান তরবারি খুলিল। রাজা বেগতিক দেখিয়া অতি ত্রস্ত-ভাবে বক্তিয়ারের কোমর ধরিয়া কহিলেন, "বাবাজী একি?" আবার খিজমতের দিকে মুখ ফিরাইয়া পলাইতে ইঙ্গিত করিলেন।

বক্তিয়ার সক্রোধে বলিল, "মহারাজের অনুচিত আদরে ঐ হারাম-জাদার বড়ই আস্পর্দ্ধা হইয়াছে। হুজুর, কোমর ছাড়ুন, আমি ওকে পরিচয় দেই যে আমি কে?" খিজমত পলাইতে চেষ্টা করিল কিন্তু পারিল না। খিজমত ভয়ে অজ্ঞান হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেল। রাজ ভৃত্যেরা তাহাকে ধরাধরি

করিয়া কক্ষান্তরে লইয়া গিয়া কপাট বন্ধ করিল। রাজা ও সভাসদগণ নানা প্রকার মিষ্ট বাক্যে বক্তিয়ারকে শান্ত করিয়া বিদায় করিলেন।

খিজমত সে যাত্রায় রক্ষা পাইল বটে কিন্তু ঐ দিন হইতেই তাহার সৌভাগ্য-নাশের সূত্রপাত হইল। গোকুল অনেক দিন হইতেই খিজমত ও রতনকে দূরীভূত করিতে ইচ্ছুক ছিলেন কিন্তু রামনাথ বাগছি ও রাণী জগদম্বা রতনের সহায় থাকায় তাহাকে দূর করা সহজ ছিল না। আবার রতনও প্রথমাবস্থায় রাজার উপপত্নী যোটাইয়া নিজের উন্নতি করিয়াছিল বটে কিন্তু জমানবিশী কর্ম্ম ও নিষ্কর সম্পত্তি পাওয়া অবধি সে পূর্ব্বভাব ত্যাগ করিয়াছিল। রতন লেখাপড়া কম জানিলেও অতিশয় চতুর ছিল। সে রাজার উপপত্নীদিগের সহিত সদ্ভাব রাখিত বটে কিন্তু তাহাদের দলে মিশিত না। রতন অসদুপার্জ্জন ত্যাগ করা অবধি রাজাকে সুবুদ্ধি ভিন্ন কখনও কুবুদ্ধি দিত না। কাজ কর্ম্মও অতি যত্নসহকারে করিত। তজ্জন্য রতন কুমার গৌরচন্দ্রেরও প্রিয়পাত্র হইয়াছিল। উপরি উক্ত কারণে রতনকে উৎখাত করা বড় সহজ ছিল না এবং বিশেষ আবশ্যকও ছিল না। খিজমতের দলকে দূরীভূত করা গৌর ও গোকুল উভয়েরই ইচ্ছা, রাণীদেরও সেই অভিপ্রায় ছিল; এখন সেনাপতি কামতার খাঁ সেই ইচ্ছায় যোগদান করিলেন। সুতরাং "দশের চক্রে ভগবান ভূতের" উপক্রম হইল। রাজার বিশেষ অনুগ্রহ সত্ত্বেও খিজমত আত্মরক্ষা করিতে পারিল না।

সেই দিন সন্ধ্যার সময় রূপেন্দ্র ঠাকুরবাড়ী হইতে অশ্বারোহণে খিজমতের বাসার দিকে যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে সহসা কামতার খাঁ আসিয়া তাঁহার ঘোড়ার লাগাম ধরিলেন। রাজা ব্যস্তভাবে কহিলেন, "ওস্তাদজী, সেলাম।" কামতার খাঁ কহিলেন, "সেলাম, রাজা সাহেব! সেলাম। আপনি যাচ্ছেন কোথা?"

রাজা ইতস্ততঃ দৃষ্টি করিয়া দেখিলেন অদূরে গৌর, গোকুল, বক্তিয়ার খাঁ, রামনাথ বাগছি এবং রাণী পূর্ণিমার দাসী দাঁড়াইয়া আছে। তখন তাঁহাদের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া মৃদুভাবে কামতার খাঁকে কহিলেন, "আমি হাওয়া খেতে যাচ্ছি।"

কামতার। চলনবিলের উপর দিয়া তোমার ইমারতের ছাদের উপর অতি ঠাণ্ডা পরিষ্কৃত হাওয়া আসছে, তা ফেলে সহরের ময়লা হাওয়া খাও কেন?

রাজা। সন্ধ্যার পর বেড়াইয়া হাওয়া খাওয়া আমার অভ্যাস।

কামতার। তোমার অভ্যাস আমি জানি। কিন্তু তুমি যখন বাহিরে হাওয়া খাও তখন যদি কেহ তোমার ঘরে হাওয়া খায়, তবে একটাকিয়ার এত বড় ইজ্জত কোথায় থাকবে?

রূপ খাঁ অপ্রতিভ হইয়া কোন উত্তর দিলেন না, লজ্জায় মাথা হেট করিয়া থাকিলেন। পাঠান তাঁহাকে ধরিয়া ঘোড়া হইতে নামাইল এবং আপনি কোলে করিয়া রাজবাড়ীর পথে লইয়া চলিল। তদ্দর্শনে দর্শকবৃন্দ মুখ ফিরাইয়া হাসিতে লাগিল। খিজমত রাজার সঙ্গে ছিল কিন্তু পাঠানের উগ্র স্বভাবের পরিচয় সে পাইয়াছিল, সেজন্য কিছুই বলিতে সাহস করিল না। কামতার খাঁ রাজাকে অন্তঃপুরে পাঠাইয়া নিজে দ্বারদেশে এক চৌকীতে বসিয়া কুরসী টানিতে লাগিল। অন্তঃপুরের সেই এক মাত্র দ্বার ভিন্ন অন্য দ্বার ছিল না। সুতরাং রূপেন্দ্র আর বাহির হইতে না পারিয়া ধীরে ধীরে রাণীদের মন্দিরে চলিলেন। তিনি রাণী জগদম্বার মন্দিরে গিয়া জামা জোড়া ত্যাগ করিলেন। পা ধুইয়া খড়ম পায়ে দিয়া গঙ্গাজল স্পর্শ করতঃ খাটের উপর গিয়া বসিলেন। দাসীরা ব্যস্ত হইয়া কেহ তামাক দিল, কেহ বাতাস দিল, কেহ তাঁহার আহারের ঠাঁই করিল। বড় রাণী নিজে রাজার আহারের আয়োজন করিতে লাগিলেন। এদিকে রাণী পূর্ণিমা দাসীর নিকট সংবাদ পাইয়া বড় রাণীর ঘরে উপস্থিত হইলেন এবং ব্যঙ্গ ভাবে রাজাকে কহিলেন, "আজ যে মহারাজের বড়ই অনুগ্রহ দেখছি।" রূপ খাঁ কখন রাণীদিগকে কটু কথা বলিতেন না কিন্তু সে দিন ছোট রাণীর উপহাস তাঁহার সহ্য হইল না। তিনি ক্রুদ্ধভাবে কহিলেন, "আমি তোমাদের অভিপ্রায় সব বুঝেছি—তোমাদের ষড়যন্ত্রে আমার এই অপমান হ'লো তা বুঝতে পেরেছি। কিন্তু এটা কি তোমাদের উচিত হ'লো? তোমরা আমার অধীন, আমি তোমাদের অধীনে নয়। আমি ইচ্ছা কল্লে এর প্রতিফল দিতে পারি।"

পূর্ণিমা কহিলেন, "দেখ, তোমার অপব্যয়ে ভাতুড়ী রাজ্য আজ ছারখার হচ্ছে। রাজভাণ্ডার অর্থশূন্য। দুই পরগণার জমিদারী নিলাম হয়েছে। এখনও যদি তোমার চৈতন্য হয় মঙ্গল, নতুবা সর্ব্বস্বান্ত হতে হবে। এখনও যাঁহারা তোমার প্রকৃত হিতার্থী তাঁহাদের কথা শোনা উচিত।"

রাজা। (সক্রোধে) আমার সম্পত্তি, আমি যা ইচ্ছা তাই করবো। আমার বস্তু আমি নষ্ট করি তাতে অন্যের কি? না খেয়ে না প'রে টাকা মজুদ করা আমার সাধ্য নাই। যদি পেট ভরে ভাত খেতে লক্ষ্মী ছেড়ে যায় তবে ছাড়ুক।

পূর্ণিমা। ঈশ্বর না করুন, যদি তোমার লক্ষ্মী ছাড়ে তবে তোমার রাঁড় ভাঁড় প্রভৃতি অলক্ষ্মীর দল কি তোমার সঙ্গে থাকবে? যদি তাদের ছাড়তে হয় তবে আগেই ছাড়। সম্পত্তি নাশ করে কাজ কি?

রাজা। আমি মরলে তো সম্পত্তি সঙ্গে যাবে না। তবে যত দিন সম্পত্তি আছে ততদিন স্বেচ্ছামত সুখে ভোগ করি, তার পর যা হয় হবে।

পূর্ণিমা। এ সম্পত্তি তো তুমি নিজে উপার্জ্জন কর নাই। ইহা তোমার নিজেরও নয়। বহুকালের পৈতৃক সম্পত্তি। তাতে তুমি নামে মাত্র রাজা, শরীক অনেক। রাজ্যের আমদানী হ'তে আগে নবাবের মালগুজারী, নর্ম্মা, সেলামী দিতেই হবে। তার পর যে সকল নিত্য নৈমিত্তিক দেবকর্ম্ম, ধর্ম্মকর্ম্ম পুরুষানুক্রমে হয়ে আসছে তা তোমার করতেই হবে। তোমার যে সকল জ্ঞাতি আয়মা বা তনখা পাচ্ছে তাদের তা দিতেই হবে। রাজার এক ছেলেমাত্র রাজা হয় অন্য সকলে জাগীর, আয়মা বা তনখা পায়। তারা প্রকৃত পক্ষে তোমার শরীক। তার পর দিদি এক শরীক, আমি এক শরীক, ছেলে পিলেরাও শরীক। যে সকল মৌরসী চাকর আছে পুরুষানুক্রমে এই রাজ্য বৃদ্ধি করেছে, রক্ষা করেছে, এই রাজ্যের আয় হ'তে তাদের প্রতিপালন করতেই হবে। ফল কথা পৈতৃক সম্পত্তির তুমি একাকী মালিক নও, কর্ত্তা মাত্র। সকল শরীকের হিস্যা বজায় রেখে তোমার নিজ হিস্যা যা থাকে তা তুমি যা খুষি তাই কর। তুমি নির্ব্বোধ নও, একবার স্থিরচিত্তে বুঝে দেখ, যাদের তুমি শত্রু জ্ঞান করছ তাহারা তোমার ভাল বই মন্দ চেষ্টা করে না।

রূপেন্দ্র মুখ ভার করিয়া থাকিলেন, কোন উত্তর প্রত্যুত্তর করিলেন না। ইতিমধ্যে রাণী জগদম্বা পরিবেশন করিয়া রাজাকে আহার করিতে বলিলেন। রূপেন্দ্রের আর সে হাস্য মুখ নাই। মৌতাতের সময় নেশা না যুটিলে নেশাখোর যেমন ছট্‌ফট্‌ করে রূপ খাঁর মনও তেমনই উদ্যমভঙ্গ হেতু ছট্‌ফট্‌ করিতেছিল। ছোট রাণীর কর্কশ কথায় তাঁহার রাগ হইয়াছিল অথচ তাঁহার

সকল কথাই যে ঠিক তাহাও তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন। দাহ্য বস্তুর অভাবে অগ্নি যেমন আপনি নির্ব্বাণ হয় কেহ প্রতিবাদ না করিলে ক্রোধীর ক্রোধও তেমনি আপনা হইতেই নিস্তেজ হইয়া উপশমিত হয়। কেহ কোন উত্তর না করায় রূপ খাঁর ক্রোধ নিস্তেজ হইল। তিনি উঠিয়া আহার করিতে বসিলেন। অন্যান্য দিন অপেক্ষা আহার কম হইল। আচমন করিয়া পান তামাক সেবনান্তে শয়ন করিলেন। কোন আমোদ প্রমোদ করিলেন না, কাহাকেও কিছু বলিলেন না। অন্য কেহও তাঁহাকে কোন কথা বলিতে সাহস করিল না। রাত্রে নিদ্রা হইল না, শয্যায় ছট্‌ফট্‌ করিয়া রাত্রি অতিবাহিত করিলেন।

এদিকে সেই রাত্রে গোকুলের বাগান-বাড়ীতে একটি ক্ষুদ্র সভা হইল। বাচস্পতি ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র হরি সিদ্ধান্ত এখন রাজপুরোহিত এবং বরিয়া পাকুড়িয়া নিবাসী কাশীনাথ ঠাকুর রাজগুরু হইয়াছিলেন। তাঁহারা রাণী জগদম্বার প্রার্থনা মতে রাজার মতি গতি ফিরাইবার জন্য ঐ সভায় আহুত হইয়াছিলেন। রাণী পুর্ণিমার প্রার্থনা মতে তাহেরপুরের রাজার দেওয়ান রামানন্দ মৈত্রও সেই সভায় উপস্থিত হন। গৌর, গোকুল, কামতার খাঁ রাজ্যের মঙ্গলার্থে সভাসীন হইলেন। লালা রামদয়াল তদ্বিবকারক স্বরূপ থাকিলেন। অন্য কেহই নিকট থাকিতে পারিল না। মন্ত্রণা আরম্ভ হইল।

রামানন্দ কহিলেন, "আমাদের রাজকুমারী বড়ই মনঃক্ষুণ্ণা হয়ে পিতার নিকট লিখিয়াছেন—'আপনি আসিয়া সদুপায় না করিলে রাজত্ব থাকে না।' মহারাজ স্বয়ং আসতে না পেরে আমাকে পাঠায়েছেন। ভাদুড়ীর ঘর বাদশাহী ঘর, এতে সুযোগ্য লোকের অভাব নাই। এই যে গুরুদেব, পুরোহিত ঠাকুর, কুমার সাহেব, লালা সাহেব, সর্দ্দার সাহেব আছেন ইঁহাদের এক এক জনের তুলনায় আমি অতি ক্ষুদ্র কীট। আপনাদিগকে পরামর্শ দেই এমন সাধ্য আমার কিছুই নাই। আপনারা বিদ্যমানে যদি ভাদুড়ী রাজ্য নষ্ট হয় তবে বড়ই কলঙ্কের কথা।"

কাশীনাথ। যদি কেহ নিজের অনিষ্ট নিজে করে অন্যের চেষ্টায় তাহা নিবারণ অসম্ভব। রাজ পারিষদগণের মধ্যে যেমন অযোগ্য লোক কেহই

নাই তেমনি কাহার কোন দোষও নাই। বড় রাণী জগদম্বা অতিশয় সাধ্বী ও সুশীলা। আপনাদের রাজকুমারী পূর্ণিমা দেবী যেমন রূপে পূর্ণিমার চাঁদ তেমনি অসাধারণ বুদ্ধিমতী। কুমার গৌরচন্দ্র যেমন বীর তেমনি ধার্ম্মিক এবং রাজা প্রজা উভয়েরই হিতার্থী। লালা গোকুল যেমন বিদ্যা বুদ্ধিতে বৃহস্পতি তেমনি সদাশয়। রূপেন্দ্রের নাবালকী আমলে এই গোকুল সাহেবের এক কলমে সমস্ত রাজত্ব চলেছে কেহ কোন বিষয়ে একটিও ত্রুটি ধরিতে পারে নাই। ফৌজদার কামতার খাঁ সাহেব যেমন বীরশ্রেষ্ঠ তেমনি সদাশয়। পুরোহিত সিদ্ধান্ত মহাশয় যেমন পণ্ডিত ও ধার্ম্মিক তেমনি নিঃস্বার্থ রাজহিতৈষী। রাজার ও রাজ্যের হিত চেষ্টায় কাহারও ত্রুটি নাই কিন্তু চেষ্টা করিয়া কি করিবেন, রাজা নিজের অনিষ্ট নিজে করিতেছেন, সে অপব্যয়ের বাধা দেওয়া অন্যের অসাধ্য, কাজেই অনুপায় হয়েছে।

গৌরচন্দ্র। এখন কিছু সদুপায় হয়েছে। খিজমত গোকুল কাকা ও বক্তিয়ার খাঁকে অপমান করায় সকলেই তাহার উপর খড়্গহস্ত। পূর্ব্বে রাম-নাথ বাগছি ও রতনের সঙ্গে তার খুব সদ্ভাব ছিল এখন তাহারাও বিরূপ হয়েছে। এখন তাহার সাপক্ষ আর কেহই নাই। আমাদের ফৌজদার চাচা মহারাজের সঙ্গে খিজমতের সাক্ষাৎ হওয়া বন্ধ করেছেন। তার আর মঙ্গল নাই। রতন মুখুয্যে ঠিক সে ভাবের লোক নয়। সে প্রথমে রাজার উপপত্নী যোটায়ে প্রিয় হয়েছিল বটে কিন্তু আপনার কাজ গোছায়ে নিয়ে সে এখন ভাল মানুষ হয়েছে। মুসলমান উপপত্নীদের আত্মীয় স্বজন যেমন তাদের উপপতির কাছে সম্পর্ক প্রকাশ করিয়া পুরস্কার চায় হিন্দুরা তা পারে না। হিন্দু উপপত্নীদের আত্মীয়গণ তাদের সহ সম্পর্ক থাকা প্রকাশ করিতে লজ্জা ও ঘৃণা বোধ করে সুতরাং তাদের উপপতির নিকট সহসা কোন উপকার প্রার্থী হয় না। রতন মহারাজের জন্য যে সকল জলপাত্র যোটাইয়াছিল তাহারা সকলেই হিন্দু। তাহাদের আত্মীয় কুটুম্ব রাজার কাছে অধিক আসে না সুতরাং রতনের দল দ্বারা তত বেশী অনিষ্ট হবে না। এ জন্য আমার বিশ্বাস রাণী মাতারা যে ভয় পাচ্ছেন অল্প কাল মধ্যেই সে ভয় দূর হবে। অতি শীঘ্রই খিজমতের দল তাড়িত হবে; তা দেখে রতনের দলও সাবধান হবে। আমাদের মহারাজা মোটের উপর মন্দ লোক নন। তিনি সকলের সঙ্গেই

সদ্ভাব করেন, সকলেরই দুঃখ দূর করিতে চান। চক্ষুলজ্জায় নিজ ব্যয়ের দিকে দৃষ্টি করিতে পারেন না। ইহাই তাঁহার দোষ। তিনি দুষ্ট লোককে প্রশ্রয় দেন না, সৎ লোকের বশীভূতও হন না। তিনি ভাল লোক মন্দ লোক চেনেন এবং লোকের উদ্দেশ্যও বুঝিতে পারেন। আপনারা যত দূর আশঙ্কা করিয়াছেন প্রকৃত পক্ষে তা কিছুই নয়, তবে কিনা খিজমতকে দূর করা আবশ্যক বটে।

কামতার খাঁ। দূর করা কেমন? খিজমত ও রতনকে দুনিয়া হইতে দূর করা চাই।

কামতারের যে কথা সেই কাজ। এজন্য রতনের সম্বন্ধে নানা প্রকার তর্ক উপস্থিত হইল। হিন্দু রাজ্যে ব্রহ্মহত্যা, গো-হত্যা হইলে মহাপাপ হয় বলিয়া অবশেষে রতনকে হত্যা না করিয়া দূরীভূত করাই স্থির হইল। এবং তৎসঙ্গে ইহাও ধার্য্য হইল যে খিজমত ও তাহার দলকে কেবল নির্ব্বাসিত করিবার চেষ্টা করা হইবে। যদি সহজে তাহাদিগকে নির্ব্বাসিত করিতে পারা না যায় তবে আবশ্যক হইলে হত্যাকাণ্ডও করিতে হইবে।

গোকুল সমস্তই শুনিলেন কিন্তু নিজের মতামত কিছুই প্রকাশ করিলেন না। গুরুঠাকুর ও কামতার খাঁ তাহা লক্ষ্য করিলেন না কিন্তু আর সকলেই বুঝিলেন লালা সাহেব তাঁহাদের মতে সম্পূর্ণ সম্মত নহেন। তিনি অবশ্যই কোনরূপ পরিবর্ত্তন করিবেন; কিন্তু কি পরিবর্ত্তন করিবেন তাহা কেহই অনুমান করিয়া উঠিতে পারিলেন না।

রূপেন্দ্রের নৈশ-বিহার বন্ধ হইল। তিনি কৌলিক নিয়মানুসারে সন্ধ্যাকালে ঠাকুর-বাড়ীতে হাত মুখ ধুইয়া সন্ধ্যা-বন্দনাদি করিতেন। আরতির পর ঠাকুর-বাড়ীতে জলযোগ করিয়া প্রকোষ্ঠের দ্বারে আসিলে তথায় গুরু, পুরোহিত, মন্ত্রীবর্গ ও কামতার খাঁ সহ তাঁহার সাক্ষাৎ হইত। তাঁহারা রাজাকে সসম্মানে আটক করিতেন এবং নানারূপ সদালাপে ব্যাপৃত রাখিয়া তাঁহাকে স্থানান্তরে যাইতে দিতেন না। পাক প্রস্তুত হইলে রূপ খাঁ অন্তঃপুরে যাইতেন, কখন কখন গৌরচন্দ্রও তাঁহার সঙ্গে যাইতেন। আহারান্তে গৌরচন্দ্র সদর দরজার সম্মুখে বসিয়া পান তামাক খাইতেন। কামতার খাঁও সেই স্থানে জলপানি ও পান তামাক খাইতেন। তাহার পর ফটক বন্ধ করিয়া বাসায় যাইতেন। রূপেন্দ্র

তাঁহাদের অভিপ্রায় জানিতেন কিন্তু কোনরূপ প্রতিবাদ করিতে সাহস পাইতেন না।

মধ্যাহ্নের আহারের পর রূপ খাঁ একবার উপপত্নীগণ সহ আমোদ প্রমোদ জন্য বাহির হইতেন এবং সন্ধ্যার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সেই আমোদেই থাকিতেন। রাণীরা কি মন্ত্রীগণ তাঁহাকে সে সময়ে প্রতিবন্ধকতা করা সঙ্গত বোধ করেন নাই। পূর্ব্বে রাজা এই সময় কেবল হিন্দু উপপত্নীদের মহলেই অতিবাহিত করিতেন। এখন রাত্রি বিহার বন্ধ হওয়ায় তিনি এক দিন প্রমোদোদ্যানে হিন্দু উপপত্নীদিগের নিকট, অন্য দিন বাজারে খিজমতের আড্ডায় বাইজীদের নিকট যাইতেন। উভয় শ্রেণীর উপপত্নী একত্র করিবার সুবিধা ছিল না। একত্র করিলেই তাহাদের মধ্যে পরস্পর ঝগড়া বেশী হইবে বুঝিয়া রূপ খাঁ তাহাদিগকে একত্র করা সঙ্গত বোধ করেন নাই। বহু চেষ্টায় রাণী ও মন্ত্রীগণ রাজার রাত্রি বিহার বন্দ করিলেন বটে কিন্তু যে উদ্দেশ্যে তাঁহারা এত কষ্ট স্বীকার করিলেন তাহা কিছুই সফল হইল না। রাজার অপব্যয় পূর্ব্বে যেরূপ ছিল এখনও তাহাই থাকিয়া গেল। অধিকন্তু রূপ খাঁ তদবধি কোপন স্বভাব হইয়া উঠিলেন। পূর্ব্বে তিনি কাহাকেও সহসা কোন কটু কথা বলিতেন না কিন্তু এখন অতি সহজেই ক্রুদ্ধ হন। বেশী কথা শুনিলেই বিরক্তি প্রকাশ করেন।

গোকুল চিন্তা করিলেন যে, 'রাজা মূর্খ হইলেও একটাকিয়ার বংশধর। রাজগুণ তাহাতে ষোল আনাই আছে। কেবল খিজমত ও রতনই রাজার সর্ব্বনাশের মূল। ইহাদের দূর করিতে সকলেই ইচ্ছুক; কিন্তু কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছে না। কেবল নানা জনে নানা উপায় কল্পনা করিয়াছে মাত্র। সে যা হউক আমি এমনই উপায় কর্‌বো যা'তে এক গুলিতে তিন বাঘ মরে অথচ এ চক্রান্তের ভিতর যে আমি আছি তাহা কেহই বুঝিতে না পারে। খিজমত পাঠান সর্দ্দারদের অবিশ্বাসী প্রমাণ কর্‌তে চায়, সেই পরীক্ষাতেই তার দফা শেষ কর্‌বো। সেই সঙ্গে রতনকেও নিরস্ত কর্‌বো।'

গোকুলের চর গুপ্তভাবে খিজমতকে উৎসাহ দিয়া তাহা দ্বারা কামতার খাঁর নামে এই মর্ম্মে চিঠি লেখাইল যে,—"রাজা রূপনারায়ণ খাঁ কাণ্ডজ্ঞান শূন্য অযোগ্য লোক। তাঁহার রাজত্ব থাকিবেক না। তাঁহাকে সৎপথে

আনিবার চেষ্টা বৃথা। আপনি যে তাঁহার অপব্যয় বন্ধ করিতে চেষ্টা করিতেছেন তাহাতে তিনি ভয় প্রযুক্ত আপনাকে প্রকাশ্যরূপে কিছু বলেন নাই বটে কিন্তু গুপ্তভাবে আপনাকে হত্যা করিবার চেষ্টা করিতেছেন। আপনাকে আহারের নিমন্ত্রণ করিয়া বিষ প্রয়োগে নষ্ট করিবার জন্য রাজা আমাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন কিন্তু আপনিও মুসলমান আমিও মুসলমান, আমাদ্বারা আপনার তাদৃশ কোন অনিষ্ট কদাচ হইবে না। বরং আমরা উভয়ে ঐক্য ভাবে পরস্পরের হিত চেষ্টা করিলেই উভয়ের মঙ্গল। রাজার যেরূপ ইচ্ছা তাহাতে আপনার বিপদ অতি নিকট। আপনি সাবধান হউন। এই সময়ে তাঁহার যে কিছু ধনসম্পত্তি হাত করিতে পারেন তাহা লইয়া স্থানান্তর যাওয়াই যুক্তি সিদ্ধ। আমি আপনার অনুগত। আপনি আমাকে যে হুকুম করিবেন আমি যথাসাধ্য তাহা পালন করিতে চেষ্টা করিব।"

এই সময়ে একদিন গোকুল অতিশয় ধুমধামে শ্মশান-কালীর পূজা আয়োজন করিলেন। খিজমত এবং তাহার দলস্থ প্রধান আটজন লোক গান, বাদ্য ও আহারের জন্য নিমন্ত্রিত হইল। মুসলমানেরা দেবতার প্রসাদ খায় না বলিয়া খিজমতের দলের জন্য তফাতে স্বতন্ত্র গৃহ নির্দ্দিষ্ট হইল এবং তথায় মুসলমান-দিগের আহারের জন্য কয়েকটা ছাগ ও মেষ জবাই করা হইল। খিজমত যথা সময়ে বাইজীদের আত্মীয়গণ সহ সেই স্থানে উপস্থিত হইলে পূর্ব্ব নিয়োজিত ঘাতকগণ তাহাদিগকে হত্যা করিয়া তাহাদের মৃতদেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া কয়েকটা মাটির হাঁড়িতে ভরিল, এবং সেই সকল হাঁড়ির উপর আম্রপল্লব, ফুল, বেলের পাতা প্রভৃতি আনিয়া দিয়া তাহা পূজার ঘটরূপে স্থাপন করিল। তাহাদের রক্ত নিহত পশু-রক্ত সহ মিশিয়া গেল। কেহ কিছুই টের পাইল না। খুব বাদ্যভাণ্ড করিয়া ধুমধামে কালী পূজা হইতেছিল এমন সময়ে গোকুলের এক গুপ্তচর দ্রুত গিয়া কুমার গৌরচন্দ্রকে সংবাদ দিল যে খিজমত আলি ইর্শানী খাজনা লুট করিয়া সদলে নৌকাপথে পলাইতেছে। গৌরচন্দ্র অতিশয় ব্যস্ত হইয়া তাহাদিগকে ধরিবার চেষ্টা করিলেন। সিপাহীগণ অস্ত্রে শস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া নৌকারোহণে চারিদিকে ছুটিল। রাজবাড়ীতে ও গোকুলের নিকট সংবাদ দিবার জন্য দ্রুতগামী অশ্বারোহী প্রেরিত হইল। ফৌজদার কামতার খাঁর নিকটও সমাচার পাঠান হইল। এদিকে খিজমতের

লিখিত চিঠি পাইয়া কামতার খাঁ খিজমতকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য সিপাহী সর্দ্দার পাঠাইয়া স্বয়ং গৌরচন্দ্রের বাসায় যাইতেছিলেন, পথিমধ্যে কুমার সাহেবের দূত সহ তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। সহরে মহা হুলুস্থূল পড়িয়া গেল। সংবাদ পাইয়া রূপেন্দ্রও সেই আড়াই প্রহর রাত্রির সময় অন্দর হইতে বাহির হইয়া দর্বারে বসিলেন। গৌর, কামতার ও অপরাপর প্রধান অপ্রধান লোকেরা দৌড়িয়া দর্বারে আসিলেন। গৌরের প্রেরিত দূত মুখে সংবাদ পাইয়া গোকুল যেন কিছুই জানেন না এই ভাবে বিস্ময় প্রকাশ করিলেন। পূজা নির্ব্বাহের ভার অন্যের উপর ন্যস্ত করিয়া গোকুল দ্রুতপদে রাজ দর্বারে চলিলেন এবং পথে তাঁহার জন্য হাতী পাল্কী প্রস্তুত দেখিয়া পাল্কীযোগে সেই তৃতীয় প্রহর রাত্রে দর্বারে উপস্থিত হইলেন।

গোকুল যেরূপে খিজমতকে বিনাশ করিয়াছেন তাহা রাজা, গৌর, কামতার খাঁ, গুরু, পুরোহিত কেহই জানিতেন না। তাঁহাদের সকলেরই বিশ্বাস ঈর্শানী খাজানা লুট করিয়া খিজমত পলাইয়াছে। কামতার খাঁ খিজমতের চিঠি বাহির করিয়া দিলেন। তাহা দেখিয়া সকলেই খিজমতের নানা প্রকার নিন্দা করিতে লাগিলেন। গোকুল যেন দর্বারে আসিয়াই এই বৃত্তান্ত প্রথম জানিলেন সেই ভাবে রতনের উপর ঠেস দিয়া কথা বার্ত্তা কহিলেন।

পর দিন সকালে কালী প্রতিমা সহ ঘটাদি বিসর্জ্জন করা হইল। খিজমত ও তৎসঙ্গীগণের মৃতদেহপূর্ণ কলসীগুলি এইরূপে বিসর্জ্জিত হওয়ায় এই হত্যা-কাণ্ডের বিষয় কেহই জানিতে পারিল না। কোথাও খিজমতের অনুসন্ধান না পাইয়া অনুসন্ধানকারী সিপাহীগণ ক্রমে সকলেই নিষ্ফল প্রযত্ন হইয়া ফিরিয়া আসিল। খিজমতের সম্পর্কীয় সমস্ত লোক রাজাজ্ঞায় ভাদুড়ীরাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত হইল। তৎসঙ্গে রতনের উপরও রাজার অবিশ্বাস জন্মিল। ভাদুড়ী-রাজ্যে গোকুলের একাধিপত্য পুনরায় সংস্থাপিত হইল। রাজনীতিজ্ঞদিগের ধর্ম্মজ্ঞান স্বার্থপরতার অধীন। গোকুল কৃতকার্য্য হইয়া পরমানন্দ লাভ করিলেন। তিনি যে বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্বক নিমন্ত্রিত খিজমতকে বিনাশ করিলেন সে পাপ হেতু তাহার মনে কিছুমাত্র অনুতাপ হইল না।

দে... নিজ কৈফিয়তে জানাইলেন যে—"নবাব নাজিমের বাদশাহী হাত। তাঁহার ব্যয় বাহুল্যে রাজস্ব সমস্তই ব্যয় হয়। আমি অধীন চাকর। শাহজাদার ব্যয় কম করা আমার সাধ্য নয়। সুতরাং অতি অল্পাংশ মাল-গুজারী হুজুরে প্রেরিত হয়।"

* আজিম ওশ্মান এত আমোদ প্রমোদ লিপ্ত হইয়া অপব্যয় করিতেন যে তাহা সংবাদ-পত্রে পাঠ করিয়া ঔরংজীব বিশেষ বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে পত্র লেখেন,—

"চিরা এ জাফরাণি বারসর ও হোল্লা এ এর
গাওয়ানি দারবর সেল্লে সরিফ চেহেল ও শাস
আফরিঁ রেস ও ফস।"

অর্থাৎ, পীত ও গোলাপী পরিচ্ছদ ছ-চল্লিশ বৎসরের শ্মশ্রুর সহিত শোভা পায় না।

আজিম ওশ্মানের সওদা খাস ও সওদা আম নামক ক্রয় বিক্রয় প্রথা প্রবর্তন অর্থাৎ, বিদেশীয় বাণিজ্যদ্রব্য বঙ্গদেশে আনীত হইলে তিনি সে সমুদয়ের একমাত্র সওদাগর হওয়াতেই তিনি ঔরংজীবের বিশেষ বিরাগভাজন হইয়াছিলেন।

লেন।

মোগল রাজত্বকালে সুরাট ভারতবাসীর একটি প্রধান বন্দর ছিল। ভারতবাসী মুসলমানেরা হজ্ অর্থাৎ মক্কা মদিনা তীর্থ দর্শন জন্য এই বন্দরে আসিয়া জাহাজে উঠিত। এই স্থানে বাদশাহী রণতরীর আড্ডা ছিল। দিল্লী, আগ্রা ও গোলকুণ্ডা ভিন্ন সুরাটের তুল্য সমৃদ্ধ নগর ভারতবর্ষে আর ছিল না। মুর্শিদকুলী সুরাটের কাজীর অনুগ্রহে বাদশাহী রণতরীসমূহের জমানবিশী কর্ম্ম পাইলেন। তিন বৎসর কাল সুচারুরূপে ও স্বল্পব্যয়ে সেই কার্য্য নির্ব্বাহ করায় তাঁহার প্রতি সম্রাটের প্রচুর অনুগ্রহ হইল।

ঔরংজীব সম্রাট শাহজাহানের তৃতীয় পুত্র ছিলেন। সরলভাবে চলিলে তিনি সম্রাট হইতে পারিতেন না। শাহজাহান ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র দারা শেকো মুসলমান ধর্ম্ম মানিতেন না, এবং মুসলমানদিগকে বিশ্বাসও করিতেন না। তাঁহাদিগের অধিকাংশ পত্নীই হিন্দু রাজকুমারী ছিল। কর্ম্মচারীগণেরও অধিকাংশ হিন্দু ছিল। হিন্দু বেগমদিগের নামে বাদশাহী ব্যয়ে হিন্দু পূজা পর্ব্বাদি চলিতে ছিল। শাহজাহানের দ্বিতীয় পুত্র সুজা মুসলমান ধর্ম্ম মানিতেন

বটে কিন্তু মুসলমান ধর্ম্ম বিরুদ্ধ সুরাপান করিতেন। ধর্ম্মে তাঁহার গোঁড়ামী ছিল না, এবং হিন্দু মুসলমান উভয় জাতীয় কর্ম্মচারীদিগকেই সমান জ্ঞান করিতেন। সম্রাটের চতুর্থ কুমার মোরাদ সর্ব্বাপেক্ষা বলবান, সাহসী, অহঙ্কারী এবং নির্ব্বোধ ছিলেন। মোরাদের কোন ধর্ম্মে আন্তরিক বিশ্বাস ছিল না, তিনি প্রায় নাস্তিক ছিলেন, কোন ধর্ম্মই মানিতেন না। ঈশ্বর ও পরকালের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন না। হিন্দু মুসলমান উভয়ের প্রতি তাঁহার সমদৃষ্টি ছিল। সম্রাটের তৃতীয় পুত্র ঔরংজীব সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান ও দুর্ব্বল ছিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে তিনি মুসলমান ধর্ম্মে একান্ত ভক্তি দেখাইয়া মুসলমানদিগকে স্বপক্ষ করিবেন এবং তাহাদের সাহায্যে সম্রাট হইবেন। তদ্ভিন্ন সাম্রাজ্যলাভের আর অন্য কোন উপায় নাই। মুসলমান ধর্ম্মে তাঁহার আন্তরিক ভক্তি বিশ্বাসও ছিল কিন্তু স্বার্থলাভ উদ্দেশ্যে তদপেক্ষা সমধিক গোঁড়ামী দেখাইতেন এবং নিজ পিতা ও ভ্রাতাদিগকে কাফের অর্থাৎ বিধর্ম্মী বলিয়া প্রকাশ করিতেন। তাঁহার সাম্রাজ্যলাভ কালে এই উপায় প্রচুর উপকারী হইয়াছিল। কিন্তু অবশেষে সেই উপায়ই মোগল সাম্রাজ্য ধ্বংশের হেতু হইল। পাঠান ও ভারত-বর্ষীয় মুসলমানেরা প্রায় সমস্তই মোগলদিগের বিপক্ষ ছিল। তুরাণী মুসলমান-দিগের মধ্যেও উজ্‌বক ও সেলজাক জাতি মোগল বিদ্বেষী ছিল। মোগলেরাও পরস্পর বিদ্বেষী এবং বিলাসী হইয়াছিল। মোগল সাম্রাজ্য প্রধানতঃ রাজপুত ক্ষত্রিয়দিগের বুদ্ধি বিক্রমেই উন্নত ও বর্দ্ধিত হয়। ঔরংজীব বহু চেষ্টা করিয়াও সমস্ত মুসলমানদিগকে স্বপক্ষ করিতে পারেন নাই অথচ তাঁহার অনুচিত গোঁড়ামী দৃষ্টে রাজপুত, মহারাষ্ট্র, শিখ, জাঠ প্রভৃতি নানা জাতীয় হিন্দুগণ বিদ্রোহী হইয়া উঠিল, তজ্জন্য অল্পকাল মধ্যেই পরাক্রান্ত মোগল সাম্রাজ্য নিষ্প্রভ হইয়া গেল।

ঔরংজীব হিন্দু কর্ম্মচারী ছাড়াইয়া তৎপরিবর্ত্তে মুসলমান নিযুক্ত করিতে সর্ব্বদাই ইচ্ছা করিতেন কিন্তু তিনি জানিতেন যে মুসলমানেরা অতিশয় অপব্যয়ী ও বিলাসী। তাহাদের হাতে টাকা পড়িলে তাহারা অমনি খরচ করিয়া ফেলে, আর আদায় হয় না। এজন্য তিনি দায় ঠেকিয়া অর্থ সম্বন্ধীয় কার্য্যে অধিকাংশ হিন্দু কর্ম্মচারী রাখিতেন। দেওয়ান অর্থাৎ অর্থ-সচীবগণ সমস্তই হিন্দু ছিল। এক্ষণে ঔরংজীব দেখিলেন মুর্শিদকুলী খাঁ গোঁড়া মুসলমান হইয়াছে অথচ

হিন্দুসন্তান জন্য আয় ব্যয় বেশ বোধ আছে। এজন্য সম্রাট মুর্শিদকুলী খাঁকে প্রথমতঃ মালব দেশের দেওয়ানী পদে নিযুক্ত করিলেন। তাহার পর উড়িষ্যায় এবং অবশেষে ১৭০১ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গালায় নবাব দেওয়ান করিয়া পাঠাইলেন।

মুর্শিদকুলী বাঙ্গালার সুবার জমা প্রভৃতি কাগজপত্র পরীক্ষা করিয়া কোনরূপ জরীপ বন্দোবস্ত ব্যতীত জমিদারগণের জমা বৃদ্ধি করিলেন। তাহাতে বাঙ্গালা, বেহার ও উড়িষ্যার মালগুজারী এক কোটী টাকা বৃদ্ধি হইল এবং সেই টাকা আদায় জন্য প্রতি বৎসর সমান চারি কিস্তী ধার্য্য হইল। কিস্তীর শেষ তারিখে কোন জমিদারের মালগুজারী বাকি থাকিলে অমনি তাহার জমিদারী নিলাম করিবার নিয়ম হইল। জমিদারী নিলাম দ্বারা সমস্ত বাকি শেষ না হইলে দণ্ডক দ্বারা জমিদারগণকে গ্রেপ্তার করিয়া বাকি আদায় করা হইত এবং বাকি শোধ না করিতে পারিলে সেই জমিদারকে মলমূত্র পূর্ণ কুণ্ডের মধ্যে কোমর পর্য্যন্ত ডুবাইয়া দাঁড় করিয়া রাখা হইত। নূতন দেওয়ান নিজ কার্য্যদক্ষতা দেখাইবার জন্য এইরূপ কঠোর উপায়ে সেই বর্দ্ধিত মালগুজারী আদায় করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, কায়স্থ এবং মুসলমান ভিন্ন অন্য কোন জাতীয় লোক জমিদার হইতে পারিত না। এক্ষণে নিলামে খরিদ করিয়া যে কোন লোক জমিদার হইতে লাগিল। তাহাতে পুরাতন ভুঁইয়াদিগের মহা কষ্ট ও বিপদ উপস্থিত হইল। অনেকে মান সম্ভ্রম রক্ষার্থে একবারে সর্ব্বস্বান্ত হইল। অনেক জমিদার চুরি ডাকাতি প্রভৃতি অসদুপায় অবলম্বনে অর্থ সংগ্রহ করিয়া মালগুজারী চালাইতে বাধ্য হইলেন। তাহাতে জমিদার শব্দ ঘৃণিত হইয়া উঠিল।

নূতন দেওয়ান যেমন আয় বৃদ্ধি করিলেন ব্যয়ও তেমনি কমাইলেন। তিনি বাঙ্গালা, বেহার, উড়িষ্যার সমস্ত ব্যয় কেবল মাত্র ৪২,০০০০০৲ টাকা বরাদ্দ করিলেন। আর নবাব নাজিমের নিজ ব্যয় জন্য মাসিক কেবল মাত্র ১০,০০০৲ টাকা বরাদ্দ করিয়া শাহজাদা আজিম ওশ্মানকে জানাইলেন। তাহাতে শাহজাদা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন যে, "তোমার মাসিক পাঁচ টাকায় চলে, আমার পাঁচ হাজার টাকার কমে দিন চলে না।" উভয়েই সম্রাটের নিকট নালিশ করিলেন।

সম্রাট নাজিমের প্রত্যহ ১০০০৲ টাকা খরচা বরাদ্দ করিয়া দিলেন। তাহাতেও কিন্তু তাঁহার ব্যয় পোষাইত না। তজ্জন্য তিনি নানারূপ মিথ্যা খরচ লিখিয়া নিজের আয় বৃদ্ধির চেষ্টা করিতেন। কিন্তু দেওয়ান তাহা মঞ্জুর করিতেন না। সেই হেতু নাজিম ও দেওয়ানের মধ্যে সদ্ভাব ছিল না। রাজা দর্পনারায়ণ উভয়েরই সহিত সদ্ভাব রাখিতেন এবং উভয়ের বিবাদ মিটাইতে চেষ্টা করিতেন।

চতুর্ব্বিংশতি অধ্যায়।

রামজীবন ও রঘুনন্দন।—কাননগু দর্পনারায়ণ।

যে দেশে জাতিভেদ নাই তথায় যাহার ধন বেশী তাহারই মান বেশী। হিন্দু সমাজে কেবল ধন বেশী হইলেই মান-মর্য্যাদা বেশী হয় না বটে কিন্তু ধনের ক্ষমতা হিন্দু সমাজেও নিতান্ত কম নহে। ধন দ্বারা নানা প্রকার সৎকার্য্য করিয়া হিন্দু সমাজেও সম্মান বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। আবার ধনাভাবে হিন্দু সমাজেও মর্য্যাদা রক্ষা করা যায় না। ভাগ্য পরিবর্ত্তনে ব্রাহ্মণেরও যে সম্মানের কতদূর হ্রাস বৃদ্ধি হইতে পারে মহারাজ রামজীবনের বংশাবলী তাহার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। রামজীবন মৈত্রগাঁই প্রসিদ্ধ কুলীনের বংশধর। কিন্তু লক্ষ্মীর অকৃপায় তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষগণ নিজ কৌলীন্য মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারেন নাই। তাঁহারা ক্রমে কষ্ট শ্রোত্রিয় হইয়াছিলেন। এই গোষ্ঠীর কেহ কেহ অপকৃষ্ট শূদ্রাদির দান গ্রহণ করিয়া শূদ্র যাজক বর্ণ ব্রাহ্মণ হইয়া গিয়াছে। আবার যখন ভাগ্য পরিবর্ত্তনে তাঁহাদিগের প্রতি লক্ষ্মীর সুদৃষ্টি হইল তখন তাঁহারা শ্রোত্রিয় কুলের শিরোমণি এবং সমাজের নেতা হইলেন। কিন্তু যে কুল মর্য্যাদা হারাইয়াছেন বিপুল ধনশালী হইয়াও সে কুলীনত্ব পুনর্লাভ করিতে পারিলেন না। হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মণ সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ। ধনাভাবে ব্রাহ্মণ অপদস্থ হন বটে কিন্তু তখনও ব্রাহ্মণের জাতিগত

শ্রেষ্ঠতা একবারে বিলুপ্ত হয় না। ব্রাহ্মণ দরিদ্র হইলেও অপর বর্ণের নিকট ব্রাহ্মণ বলিয়া পূজ্য। আবার ধন বৃদ্ধি দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি হইলেও জাতিগত মান-মর্য্যাদা একবারে অতিক্রম করিতে পারা যায় না। এমন কি ব্রাহ্মণের মধ্যেও যে কুল-মর্য্যাদার ইতর বিশেষ আছে ধনাধিক্যে তাহার অন্যথা হইতে পারে না। অর্থাভাবে কুলীন অবনত হইয়া শ্রোত্রিয় বা কাপ হইতে পারেন কিন্তু যে কুল-মর্য্যাদা একবার নষ্ট হইয়াছে বহু অর্থ ব্যয়েও তাহার পুনরুদ্ধার হয় না। ধন বৃদ্ধি হেতু সম্মান বৃদ্ধি হয় বটে কিন্তু তদ্দ্বারা কোন শ্রোত্রিয় পুনরায় কুলীন বা কাপ হইতে পারেন না। ফলতঃ অন্যান্য জাতি অপেক্ষা আর্য্যজাতি মধ্যে ধনের ক্ষমতা কিয়ৎ পরিমাণে কম বটে।

বর্ত্তমান নাটোরের ন্যূনাধিক এক ক্রোশ পূর্ব্ব দিকে আমহাটী গ্রামে কামদেব পাঠক নামে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের বাস ছিল। একটাকিয়ার প্রদত্ত ৮/ বিঘা ব্রহ্মত্র এবং তিন খানি খড়ের ঘর ভিন্ন তাঁহার অন্য কোন সম্পত্তি ছিল না। তিনি যাজনিক ব্যবসায় করিতেন কিন্তু পণ্ডিত ছিলেন না। তিনি ঋণগ্রস্ত ছিলেন কিন্তু ঋণ পরিশোধের তাঁহার কোন উপায় ছিল না। রামজীবন ও রঘুনন্দন সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণের পুত্র। অতি সামান্য কারণে পিতা কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়া অর্থোপার্জ্জন কামনায় রামজীবন ও রঘুনন্দন পুঁঠিয়ায় তাঁহাদের ভগিনীপতি রত্নেশ্বর চক্রবর্ত্তীর নিকট গেলেন। রত্নেশ্বর পুঁঠিয়ার রাজা দর্পনারায়ণের পূজারী ছিলেন। কার্য্যবশতঃ তিনি কয়েক মাসের জন্য ছুটির প্রার্থী হওয়ায় রাজা তাঁহাকে প্রতিনিধি দিলে ছুটি দিতে স্বীকার করিলেন। তজ্জন্য রত্নেশ্বর তাঁহার অনুপস্থিতি সময়ে কার্য্যনির্ব্বাহের প্রতিনিধি যোটাইবার জন্য চেষ্টিত ছিলেন, ঠিক সেই সময়ে রামজীবন ও রঘুনন্দন তাঁহার নিকট উপস্থিত হওয়ায় রত্নেশ্বর অতিশয় আগ্রহ পূর্ব্বক শ্যালকদ্বয়কে সম্বর্দ্ধনা করিলেন এবং তাহাদিগকে প্রতিভূ রাখিয়া নিজ গৃহে গমন করিলেন।

যাহাদিগের উন্নতি বা অবনতি হইবে তাহাদিগের সেই দশা উপস্থিত হইবার পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনাবলীর অধিকাংশ স্থানই যেন অনালোচিত পূর্ব্ব ভাবে আপনাপনি শ্রেণীবদ্ধ সোপানের ন্যায় ঘটিতে থাকিয়া পরবর্ত্তী অবস্থার

অনুকূলতা করিতে থাকে। তাদৃশ সুযোগ ব্যতীত কেবল মাত্র নিজ চেষ্টায় কেহই মহোন্নতি লাভ করিতে পারে না। এই জন্যই লোকে "ভাগ্য বা প্রারব্ধ" স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। রামজীবন ও রঘুনন্দন যা-ই মাত্র পুঁঠিয়া গেলেন অমনি চাকরী পাইলেন তজ্জন্য তাঁহাদের কোন উমেদারী করিতে হইল না। তাঁহারা তিন দিন মাত্র কর্ম্ম করিবার পর তাঁহাদের মস্তকে সর্পছত্র* দেখিয়া রাজা দর্পনারায়ণ জানিতে পারিলেন যে তাঁহারা মহারাজা হইবেন। দর্পনারায়ণ অমনি সেই ভ্রাতৃদ্বয়কে তৎকালীন রাজভাষা পড়াইতে লাগিলেন এবং তাঁহাদিগকে রাজপুত্রের ন্যায় সমাদরে রাখিলেন।

রামজীবন নিজ সাংসারিক দুরবস্থা ও পিতামাতার কষ্ট স্মরণ করিয়া সর্ব্বদা দুশ্চিন্তায় মগ্ন থাকিতেন। তজ্জন্য তিনি বেশী দিন পড়া শুনা করিতে পারিলেন না। রাজা দর্পনারায়ণের নিকট কর্ম্ম প্রার্থী হইলেন। রাজা কহিলেন, "তুমি কিছু দিন কষ্ট স্বীকার করিয়া পড়া শুনা কর তাহাতে তুমি মহারাজা হইতে পারিবে।" রামজীবন কহিলেন, "আমি ততদূর আশা করি না। যদি হুজুরের অনুগ্রহে আমি পিতা মাতার কষ্ট দূর করিতে পারি তাহাই আমার মহারাজা হওয়া অপেক্ষা অধিকতর সুখপ্রদ।" রাজা তাঁহার কথায় তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে নিজ জমিদারী সেরেস্তার জমার মুহুরীগিরি কর্ম্মে মাসিক ৭৲ টাকা বেতনে নিযুক্ত করিলেন।

পুঁঠিয়ার জমিদারী লস্করপুর পরগণার জমি ভাল অথচ তথাকার খাজনার পরিমাণ অতি কম সুতরাং প্রজাগণ সুখী ছিল। এবং তথায় জমিদারের আমলাগণের বেশ উপরি-প্রাপ্তি ছিল। রামজীবন কোনরূপ অসদুপায়ে প্রজাগণের অর্থ-শোষণের চেষ্টা করিতেন না। তথাপি তাঁহার মাসিক প্রায় ত্রিশ টাকা

*কথিত আছে, একদা মধ্যাহ্ন সময়ে রাজা দর্পনারায়ণ ঠাকুর-দর্শনার্থে দেবমন্দিরে যাইয়া দেখিলেন তাঁহার পূজারী রামজীবন ও রঘুনন্দন গভীর নিদ্রায় অভিভূত আছে এবং দুইটি গোক্ষুর সর্প ফণা বিস্তার করিয়া মন্দিরের জানালার ভিতর দিয়া আসিয়া তাহাদিগের কপালে পতিত সূর্য্যরশ্মি ছত্ররূপে নিবারণ করিতেছে। তদ্দর্শনে তিনি বুঝিতে পারিলেন যে কালে এই দুইটি যুবক মহারাজ চক্রবর্ত্তী হইবে। তখন তিনি তাহাদিগকে ডাকাইয়া প্রতিজ্ঞা করাইলেন যে, কালে তাহারা রাজা হইলে পুঁঠিয়ার কোন সম্পত্তি গ্রহণ করিবে না। যুবকদ্বয় সেইরূপ প্রতিজ্ঞা করিলে রাজা তাহাদিগকে তৎকালীন রাজভাষা পারসী শিক্ষা দেওয়াইতে লাগিলেন।

উপরি-প্রাপ্তি হইত। অন্যান্য আমলাদিগের প্রাপ্তি অপেক্ষাকৃত অনেক বেশী হইলেও তাহাদের অনেকেই অতিশয় অপব্যয়ী ও অসদ্ব্যয়ী ছিল। সেই জন্য তাহারা প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়াও ধনবান হইতে পারে নাই। রামজীবনের যেমন কোন অসদুপার্জ্জন ছিল না তেমনি কোন অসদ্ব্যয়ও ছিল না। তিনি দয়ারাম নামক * একটি তিলী বালককে মাসিক ৷৷৹ আনা বেতনে চাকর রাখিয়াছিলেন। তিনি নিজে পাক করিয়া খাইতেন এবং অতি সামান্য ধুতী চাদর ব্যবহার করিতেন। অথচ কৃপণাশয়ও ছিলেন না। তাঁহার বাসায় কোন অতিথি বা ভিক্ষার্থী গেলে তিনি তাহাকে বিমুখ করিতেন না। এই ভাবে দুই বৎসর চাকরী করিয়া তিনি পিতার সমস্ত ঋণ শোধ করিলেন। নিজ বাড়ী ঘর ভাল করিলেন। নিজে বিবাহ করিলেন এবং রঘুনন্দনেরও বিবাহ দিলেন। তাঁহার পিতা মাতার আহ্লাদের সীমা থাকিল না। এদিকে রাজা দর্পনারায়ণও তাঁহার কাজ কর্ম্মে মনোযোগ ও সচ্চরিত্রতা দৃষ্টে অতিশয় তুষ্ট হইলেন।

রামজীবন সাংসারিক দুরবস্থা অপনয়ন করাতে রঘুনন্দনের কোন দুশ্চিন্তা থাকিল না। তিনি বুদ্ধিমান ও মেধাবী ছিলেন। তৎকালে পারসী বিদেশীয় ভাষা বলিয়া গণ্য ছিল না। বাঙ্গালা ভাষার মধ্যে এক চতুর্থাংশ শব্দ পারসী মূলক ছিল। রঘুনন্দন চারি বৎসর কাল দৃঢ় মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিয়া পারসী ভাষায় সম্পূর্ণ ব্যুৎপন্ন হইলেন। তখন রাজা দর্পনারায়ণ সুপারিস করিয়া তাঁহাকে মাসিক ৫০৲ টাকা বেতনে মীর মুনসী পদে নিযুক্ত করিয়া বাঙ্গালার তাৎকালীক রাজধানী ঢাকায় পাঠাইলেন।

রামজীবন ও রঘুনন্দন উভয়েই সুন্দরাকৃতি ছিলেন। রামজীবন দীর্ঘকায়, বলবান ও ধর্ম্মশীল ছিলেন। তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধি কম ছিল। পক্ষান্তরে রঘুনন্দন মধ্যমাকৃতি, বিদ্বান, বুদ্ধিমান এবং সম্পূর্ণ বৈষয়িক লোক ছিলেন। যাহাতে ধন বা প্রতিপত্তি লাভ হয় রঘুনন্দন তাহাই করিতেন; তাহাতে ন্যায় অন্যায়

---

* কথিত আছে, রামজীবন একদা চলনবিলে ভ্রমণ করিতে ছিলেন, এমন সময় সহসা কমল গ্রামের একটী বালকের দিকে তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। বালকটী রূপবান ছিলেন। রামজীবন দুইটি কথায় বুঝিতে পারিলেন, সে যেমন রূপবান, সেইরূপ প্রতিভাশালীও বটে। গুণগ্রাহী রামজীবন যখন জানিতে পারিলেন, বালকটী পিতৃমাতৃহীন, তখন তাঁহাকে নৌকায় তুলিয়া নাটোরের রাজভবনে আনিয়া পুত্রনির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করেন।

কিছুই দেখিতেন না। চরিত্রগত এরূপ বৈষম্য সত্ত্বেও উভয় ভ্রাতার মধ্যে বিলক্ষণ সদ্ভাব ছিল।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে দৈনিক একহাজার টাকায় বাদশাহজাদার ব্যয় কুলাইত না। এজন্য তিনি নানা প্রকার মিথ্যা খরচ লিখিয়া আয় বৃদ্ধির চেষ্টা করিতেন। দেওয়ান মুর্শিদকুলী তাদৃশ ব্যয় মঞ্জুর করিতেন না। তজ্জন্য আজীম ওশ্মান প্রচুর ঋণগ্রস্ত হইয়াছিলেন। রঘুনন্দন মীর মুন্সী হইয়া রায় দর্প-নারায়ণের আদেশ মত বারংবার নাজিমের নিকট যাতায়াত করিতেন। সেই সুযোগে তিনি নাজিমের কতক প্রিয় হইয়াছিলেন। দেওয়ানের মোহর হস্তগত করিতে কাননগু দর্পনারায়ণ * ও রঘুনন্দনের বিলক্ষণ সুযোগ ছিল। রঘুনন্দন নাজিমের অনুরোধে দেওয়ানের ও কাননগুর মোহর চুরি করিয়া নাজিমের জমা খরচে ছাপ দিয়া দিলেন এবং পুনরায় মোহর আনিয়া যথাস্থানে রাখিয়া দিলেন। দেওয়ান এই বিষয় কিছুই জানিতে পারিলেন না। নাজিম সেই সুযোগে সম্রাটের নিকট সাড়ে চৌদ্দ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত খরচ মঞ্জুর করাইয়া লইলেন। তদ্দ্বারা তিনি ঋণদায় হইতে মুক্ত হইয়া রঘুনন্দনকে রায়-রাইয়াঁ পদে নিযুক্ত করিলেন।

সম্রাট ঔরংজেব পৌত্রের জমা খরচ মঞ্জুর করিলেন বটে কিন্তু খরচ বেশী বেশী দেখিয়া সেই সকল স্থান চিহ্নিত করিয়া কৈফিয়ত জন্য দেওয়ানের নিকট সেই জমা খরচ পাঠাইয়া দিলেন। দেওয়ান সেই জমা খরচে নিজ মোহর দৃষ্টে নিজ কর্ম্মচারীগণের প্রতি বিশেষতঃ দর্পনারায়ণের প্রতি সন্দিহান হইলেন। তাঁহার অজ্ঞাতসারে তাঁহার মোহর মিথ্যা হিসাবে ছেপ্ত হইয়াছে, এ কথা প্রকাশ হইলে সম্রাট তাঁহাকে অসাবধান ও অযোগ্য লোক বলিয়া বিবেচনা করিবেন এই ভয়ে মুর্শিদকুলী প্রকৃত ঘটনা প্রকাশ করিলেন না। যশোহর অঞ্চলে ও উড়িষ্যার বিদ্রোহ হেতু খরচ বেশী হইয়াছে প্রকাশ করিয়া দেওয়ান বাদশাহের নিকট কৈফিয়ত দিলেন। কাননগু দর্পনারায়ণ নিজের প্রতি দেওয়ানের অসন্তোষ বুঝিয়া কর্ম্মত্যাগ করিতে চেষ্টা করিলেন কিন্তু

* পুঁঠিয়ার রাজা দর্পনারায়ণ ব্রাহ্মণ আর কাননগু দর্পনারায়ণ কায়স্থ। একই সময়ে এক নামের দুই ব্যক্তিকে একজন বলিয়া ভ্রম হয়। দেওয়ানের অধীন রাজস্ব বিভাগের কর্ম্মচারী-গণ কাননগুনামে পরিচিত ছিলেন। কাননগু শব্দের প্রকৃত অর্থ, নিয়মপদ্ধতির ব্যাখ্যাকারী।

দেওয়ান তাঁহাকে সুকৌশলে অপহত্যা* করিয়া নিজের কুটুম্ব এবং একান্ত নরাধম রেজা খাঁ† নামক এক ব্যক্তিকে নায়েব দেওয়ানরূপে নিযুক্ত করিলেন। এই নায়েব দেওয়ানের মালগুজারী আদায় সম্বন্ধে কঠোরতা ইতিহাসে চির-প্রসিদ্ধ।

এই সময়ে রামজীবন পুঁঠিয়াতে জমানবিসী করিতেছিলেন। একদিন পুঁঠিয়ার দেওয়ান চণ্ডী রায় রামজীবনের হিসাবে একটি ভুল দেখিয়া কহিলেন, "বাপু হে! তোমার মুহুরী দেখ এই একটা ভুল করেছে, এসব তোমার দেখা এবং সারিয়া লওয়া উচিত।" রামজীবন বিনীত ভাবে কহিলেন, "কর্ত্তা! আমার অপরাধ মাফ করিবেন, ঐ ভুলটি মুহুরীর নয়, আমি নিজেই ভুলিয়াছি। ভবিষ্যতে আমি সাবধান হইব।" তাঁহার কথায় দেওয়ানজী হাসিলেন এবং অন্যান্য লোকেরাও হাসিল। একজন আমলা বিদ্রূপ করিয়া কহিল, "ওহে রামজীবন! তোমার মত বেকুফ (নির্ব্বোধ) আমি কোথাও দেখি নাই। লোকে নিজের দোষ অন্যের উপর দিতে চেষ্টা করে আর তুমি এমন নির্ব্বোধ যে আপন হইতে দোষ স্বীকার কর।" রামজীবন কহিলেন, "আমি মিথ্যা প্রতারণা করিয়া নিজের দোষ অন্যের উপর চাপাইতে চাহি না। বিশেষতঃ যাহারা আমার অধীন তাহাদের উপর অযথা দোষ আরোপ করা ধর্ম্ম বিরুদ্ধ।" সেই আমলাটি আবার কহিল, "ওহে রামজীবন, তুমি তো তীর্থ

* গোলাম হোসেন ও ষ্টুয়ার্ট্ সাহেব প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করিয়াছেন যে, এক সময়ে কাননগু দর্পনারায়ণ কাগজে স্বাক্ষর করিতে অস্বীকৃত হওয়ায় মুর্শিদকুলী খাঁ তাঁহার উপর অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন এবং তাহার প্রতিশোধ লইবার জন্য চেষ্টিত ছিলেন। তিনি দর্পনারায়ণকে অধিক কার্য্যভার দিয়া দুর্নামগ্রস্ত করিতে মনন করিলেন, কিন্তু তাহাতে দর্পনারায়ণের কার্য্যতৎপরতা দেখিয়া পরে ক্রমশঃ তাঁহার ক্ষমতা হ্রাস করিয়া রাজস্ব সম্বন্ধীয় হিসাব তলব পূর্ব্বক তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিয়া তদবস্থায় বহু ক্লেশ দিয়া বধ করেন। [১৬৯৭ খৃষ্টাব্দ]

† সৈয়দ রেজা খাঁর সহিত মুর্শিদকুলী খাঁর দোহিত্রীর (উড়িষ্যার নায়েব নাজিম সুজাউদ্দিন মোহাম্মদ খাঁর কন্যা নাফিসার খানম) বিবাহ হয়। ইনি বাঙ্গালার দেওয়ান সৈয়দ ইক্রাম খাঁর মৃত্যুর পর দেওয়ান হন। 'রিয়াজ-উস-সালাতিন' নামক গ্রন্থে ইঁহার নাম সৈয়দ রর্জ্জিউদ্দিন খাঁ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

করিতে পুঁঠে এস নাই, রোজগার করিতে আসিয়াছ। এমন সাধু হইলে রোজগার হয় না।" প্রত্যুত্তরে রামজীবন কহিলেন, "আমি ধর্ম্ম বিক্রয় করিয়া রোজগার করিতে চাই না, আমি গরীব ব্রাহ্মণের ছেলে, ধর্ম্ম ঠিক রাখিয়া যৎকিঞ্চিৎ যাহা উপার্জ্জন হয় তাহাই ভাল।" দেওয়ানজী তাঁহার হৃদয়ের মহত্ত্ব বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, "বাপু হে! আমি রাজার কাছে শুনিয়াছি যে তুমি মহারাজা হইবে। তোমার চরিত্র তদ্রূপই বটে। ঈশ্বর করুন শীঘ্রই তোমার রাজ্যলাভ হউক।" তিনি আর কিছু না বলিয়া নিজেই রামজীবনের ভুল চুক সারিয়া লইলেন। ক্ষুদ্র আমলারা তাঁহার হৃদয়ের উচ্চতা বুঝিতে পারিল না। তাহারা তাঁহাকে "মহারাজা মহারাজা" বলিয়া নানারূপ বিদ্রূপ করিত কিন্তু সেই বিদ্রূপ রামজীবনের দীর্ঘকাল সহ্য করিতে হয় নাই। একমাস মধ্যেই তিনি রঘুনন্দনের চিঠিসহ নবাব নাজিমের প্রদত্ত চাকরীর সনন্দ পাইলেন। তখন নিকাশ দিয়া বিদায় হইয়া রামজীবন পুঁঠিয়া হইতে ঢাকা চলিলেন।

রামজীবন জন্মাবধি দীর্ঘকায়, গৌরবর্ণ এবং সুন্দরাকৃতি ছিলেন। কিন্তু দারিদ্র্য হেতু বাল্যকালে কৃশ ও দুর্ব্বল ছিলেন। পুঁঠিয়ার ফলাহার চির প্রসিদ্ধ। পুঁঠিয়াতে ব্রাহ্মণেরা প্রতিমাসে ৮।১০ দিন মাত্র নিজ গৃহে আহার করে। মাসের অধিকাংশ দিনই রাজবাড়ীর ফলাহারে কাটিয়া যায়। রামজীবন পাঁচ বৎসর কাল পুঁঠিয়ার ফলাহার সেবনে বিলক্ষণ পুষ্ট ও বলিষ্ট হইয়াছিলেন। তৎকালে লাঠী, তলোয়ার, তীর, গুলি চালাইতে প্রায় সকল লোকেই জানিত, রামজীবনও তাহা জানিতেন। পুঁঠিয়াতে চাকরী করা কালে রামজীবন ঘোড়ায় চড়িতে এবং বন্দুক ছুড়িতেও শিখিয়াছিলেন। এদিকে রঘুনন্দন রায়-রাইয়াঁ হইয়াই জ্যেষ্ঠের জন্য নবাব সরকারে একটি উচ্চ কর্ম্মের যোগাড় করিতেছিলেন। কিন্তু নিজের অধীনে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে চাকরী দিতে তাঁহার ইচ্ছা ছিল না। এজন্য সৈনিক বিভাগে একটি হাওয়ালদারী কর্ম্ম রামজীবনকে দিতে রঘুনন্দন শাহজাদার নিকট প্রার্থনা করিলেন। অমনি অনুগ্রহপ্রবণ নবাব সনন্দ দিলেন। রামজীবন বাদশাহজাদার নিকট উপস্থিত হইলে, নবাব তাঁহার চেহারা দেখিয়াই তুষ্ট হইলেন এবং তাঁহার মাসিক ১০১৲ টাকা বেতন ধার্য্য করিলেন।

রামজীবন ও রঘুনন্দন যেমন বাদশাজাদার প্রিয় ছিলেন তেমনি নিজ নিজ কার্য্যেও সুদক্ষ ছিলেন। নবাবের প্রিয়পাত্রগণ নানারূপ অনুচিত উপায়ে প্রচুর অর্থ লাভের চেষ্টা করিত। রামজীবনের সেই দোষ কিছুমাত্র ছিল না। কিন্তু রঘুনন্দনের সেই দোষ অল্প মাত্রায় ছিল। রামজীবন দীর্ঘকায়, বলবান্, সাহসী, সরল এবং আমোদপ্রিয় ছিলেন। তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধি অধিক ছিল না কিন্তু ধর্ম্মজ্ঞান এবং ভক্তি প্রবল ছিল। রঘুনন্দন মধ্যমাকৃতি, দুর্ব্বল, ভীরু, মিষ্টভাষী এবং গম্ভীর প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধি প্রচুর ছিল কিন্তু ধর্ম্মজ্ঞান তত বেশী ছিল না। আকৃতি প্রকৃতির অনেক বিভিন্নতা সত্ত্বেও উভয় ভ্রাতার মধ্যে অতিশয় প্রণয় ছিল এবং পরস্পরের উপর বিশ্বাস সম্পূর্ণ ছিল। তাঁহারা পরস্পরের সাহায্যেই উন্নতি সাধনে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহারা যেমন নবাবের প্রিয় ছিলেন তেমনি দেওয়ানেরও প্রথম প্রথম প্রিয় ছিলেন। তজ্জন্য শাহজাদার অনুগ্রহ ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতেছিল। তাঁহারা যখন রাজা দর্পনারায়ণের নিকট শুনিয়াছিলেন যে তাঁহারা মহারাজা হইবেন তখন তাঁহারা সেই কথা অলীক স্বপ্নবৎ বোধ করিয়াছিলেন। এখন নবাবের অনুগ্রহ দৃষ্টে রাজ্যলাভ অতি নিকটবর্ত্তী বলিয়া বুঝিতে পারিলেন। কেননা আজিম ওশ্মান নিজে বাঙ্গালা, বেহার ও উড়িষ্যার নবাব এবং দিল্লীর সম্রাটের জ্যেষ্ঠ পুত্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র। তাঁহার অনুগ্রহে মহারাজা হওয়া কিছুমাত্র আশ্চর্য্য নহে। তাঁহারা সুযোগ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন এবং স্বল্পকাল মধ্যেই সুযোগও উপস্থিত হইল। রাজসাহী পরগণা লালা উদয়নারায়ণ রায়ের জমিদারী ছিল। মুর্শিদকুলী খাঁ তাঁহাকে বিচ্যুত করিয়া নদীয়ার রাজাকে দিতে ইচ্ছুক ছিলেন কিন্তু নাজিম তাহা রামজীবনকে দিলেন।

যখন যাহার উন্নতি বা অবনতি হইবে তাহার পার্শ্ববর্ত্তী ঘটনাবলী শ্রেণীবদ্ধ সোপানের ন্যায় উপস্থিত হইতে থাকে। যে সুযোগমালায় রামজীবন সমস্ত বাঙ্গালা দেশের তৃতীয়াংশের অধীশ্বর হইয়াছিলেন তাহার বর্ণনা আরম্ভের পূর্ব্বে আর দুইটি বড়লোকের বিবরণ বলা আবশ্যক। ইঁহাদের নাম দয়ারাম রায় ও সীতারাম রায়।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

দয়ারাম রায়।—সীতারাম রায়।

দয়ারাম রায় নরসিংহ নামক এক দরিদ্র তিলীর জ্যেষ্ঠ পুত্র। রামজীবন যখন ৭৲ টাকা বেতনে মুহুরীগিরি কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছিলেন সেই সময়ে তিনি দয়ারামকে মাসিক ॥০ আট আনা বেতনে পরিচারক রাখিয়াছিলেন। তখন দয়ারামের বয়স চতুর্দ্দশ বৎসর মাত্র এবং লেখা পড়া কিছুই জানিত না। রামজীবন হাওয়ালদার হইলে দয়ারাম সাধারণ পরিচারক পদ হইতে উন্নত হইয়া ভাণ্ডারী হইলেন এবং লেখা পড়া শিখিতে আরম্ভ করিলেন। বাঙ্গালাভাষায় জমা খরচ লিখিবার ক্ষমতা হইলে দয়ারাম ভাণ্ডারনবিস এবং বাজার-সরকার হইলেন। তাঁহার মাসিক বেতন তখন ৫৲ টাকা হইল। তাহার পর দয়ারাম পারসী পড়িতে লাগিলেন। ক্রমে রামজীবনের যখন উন্নতি হইতে লাগিল তিনি অমনি দয়ারামকেও উন্নত করিতে লাগিলেন। অবশেষে দয়ারাম ৫০০৲ পাঁচশত টাকা বেতনে নাটোরের মহারাজের দেওয়ান এবং সর্ব্ব বিষয়ের কর্ত্তা হইয়াছিলেন। তাঁহারই বংশধরেরা এখন দিঘাপাতিয়ার রাজা।

দয়ারামের ন্যায় অবিচ্ছিন্ন ভাগ্যবান লোক পৃথিবীর ইতিহাসে আর দেখা যায় না। পৃথিবীতে যত লোক উন্নতিলাভ করিয়াছে সকলেরই সময়ে সময়ে ভাগ্য বিপর্য্যয় হইয়াছে। দয়ারাম অপেক্ষা অপকৃষ্ট অবস্থা হইতে শতগুণ শ্রেষ্ঠতর অবস্থা অনেকে লাভ করিয়াছে বটে কিন্তু কেহই অবিচ্ছিন্ন সৌভাগ্যে জীবন কর্ত্তন করিতে পারে নাই। দয়ারামের সুদীর্ঘ জীবন, পরিবর্ত্তনশীল জগতের একমাত্র বর্জ্জিত উদাহরণ। সুযোগ ও সৌভাগ্য চিরদিন দয়ারামের অনুচর ছিল। দয়ারাম মহারাজা রামজীবনের একান্ত বিশ্বাস পাত্র এবং দক্ষিণহস্ত স্বরূপ ছিলেন। দয়ারাম যখন যে কার্য্যে যাইতেন তাহাতেই কৃতকার্য্য হইতেন। প্রতিদিনই তাঁহার কিছু কিছু উন্নতি লাভ হইয়াছে। তাঁহার কখন কোন বিপদ বা

বিভ্রাট উপস্থিত হয় নাই। অথচ তিনি সেই উন্নতিলাভের জন্য কদাচ কোন গুরুতর পাপ কার্য্যে লিপ্ত হন নাই।

* * *

সীতারাম রায়ের পূর্ব্বপুরুষগণ জেলা মুর্শিদাবাদের গিধ্‌না গ্রামে বাস করিত। তাহারা কি জাতি তাহা ঠিক জানা যায় না। তাহাদের অবস্থা অতি মন্দ ছিল। তাহারা পরিচর্য্যা, মজুরী এবং কৃষিকার্য্য করিয়া কষ্টে জীবিকানির্ব্বাহ করিত। সীতারামের পিতামহ হিমা দাস লেখা পড়া শিখিয়া এক জমিদারের পক্ষে 'খাস-বিশ্বাস' পদে নবাব দর্বারে নিযুক্ত হইয়াছিল। পূর্ব্বে সঙ্গতিপন্ন তালুকদার ও মহাজনেরা আপনাদের বিশ্বাসী কোন ব্যক্তিকে প্রতিনিধিরূপে রাজা জমিদারদিগের দরবারে রাখিত। তাহাকে বিশ্বাস বা মুক্তার বলিত। তেমনি আবার জমিদার ও রাজারা নবাব দর্বারে নিজ নিজ প্রতিনিধি রাখিতেন তাহাদিগকে খাস-বিশ্বাস বা সদর নায়েব বা সদর মুক্তার বলিত। কখন বা একাধিক ব্যক্তির পক্ষে একজন মাত্র বিশ্বাস বা খাস-বিশ্বাস থাকিত। আবার কখন কখন একই ব্যক্তির পক্ষে একাধিক খাস-বিশ্বাস নিযুক্ত হইত। সেই বিশ্বাসেরা নিজ নিযোক্তাদিগের পক্ষে সদরে প্রয়োজনীয় কার্য্য সকল সম্পাদন করিত এবং দরবারের নূতন পরিবর্ত্তনাদি নিযোক্তাদিগকে জানাইত। বিশ্বাসেরা অল্প বেতন পাইত। তদ্ভিন্ন তাহারা যে কাজে যত টাকা খরচ করিত তদপেক্ষা অনেক বেশী খরচ লিখিয়া নিযোক্তাগণের নিকট আদায় করিত। ইহাই তাহাদের উপরি-প্রাপ্তি ছিল। বিশ্বাসগণ সুবিধা পাইলে অন্যান্য চাকরী বা ব্যবসায়ও করিতে পারিত। খাস-বিশ্বাসদিগের পারসী জানা নিতান্ত আবশ্যক ছিল।

পূর্ব্বে যে কোন জাতীয় শূদ্র হউক লেখা পড়া শিখিলেই সে কায়স্থ বলিয়া পরিচিত হইতে চেষ্টা করিত। সে কিছু অর্থব্যয় করিয়া প্রসিদ্ধ কায়স্থ বংশে দুই চারিটি বিবাহ আদান প্রদান করিলেই কায়স্থ বলিয়া গণ্য হইত। এখন যে সকল লোক মৌলিক কায়স্থ বলিয়া পরিচিত তাহাদের অধিকাংশই এইরূপ কৃত্রিম কায়স্থ। অধিকাংশ ধনবান্ ও গুণবান্ শূদ্র কায়স্থ-জাতিতে প্রবিষ্ট হওয়ায় কায়স্থ জাতির ধনবল, জনবল, এবং বিদ্যাবল অন্যান্য শূদ্র অপেক্ষা সমধিক হইয়াছে। হিমা দাস লেখা পড়া শিখিয়া খাস-বিশ্বাস হইয়াছিল। ঐ কর্ম্মে থাকিয়া ধনবান হইলেই সে কায়স্থ হইয়া উঠিল। তখন তাহার নাম "হিমাকর

বিশ্বাস” হইল। ঘটকদিগকে কিছু মোটা হাতে অর্থ দিবামাত্র হিমাকরের পূর্ব্ব পুরুষদিগের নাম এবং সৎকীর্ত্তি সমূহ কল্পিত হইল। * সুতরাং বিদ্যা ও সম্পত্তি লাভ হইবামাত্র হিমা দাস মান্য গণ্য কায়স্থ হইলেন। হিমার পুত্র ভীমা দাসও তদবধি “উদয়রাম বিশ্বাস”† নামে আখ্যাত হইলেন। তাঁহারা হইলেন উত্তর রাঢ়ী কায়স্থ। কোন কৃত্রিম কায়স্থকে কুলীন কায়স্থ হইতে দেখা যায় না।

উদয়রাম দীর্ঘাকৃতি, স্থূলকায় ছিলেন। তাঁহাকে দেখিতে খুব বীর পুরুষ বলিয়া বোধ হইত। কার্য্যতঃ তিনি বীর পুরুষ ছিলেন কি না তাহা কিছুই জানা যায় না। কিন্তু তাঁহার আকৃতি দেখিয়াই লোকে তাঁহাকে “ভীমা দাদা” বলিত। সেই নামই প্রসিদ্ধ ছিল। তাঁহার “উদয়রাম” নাম কেবল লেখা পড়ায় ব্যবহৃত হইত। উদয়রাম এক কুলীন কায়স্থের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। যশোহর অঞ্চলে চাকলা ভূষণার জমীদার নিজ পক্ষে হিমাকরকে খাস-বিশ্বাস নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং হিমাকরের পুত্র উদয়রামকে নিজের দেওয়ান নিযুক্ত করিয়াছিলেন। হিমাকরের অন্যান্য পুত্রেরা পৈত্রিক সম্পত্তি পাইয়া সেখানেই বাস করিত। ভীমা দাস পৈতৃক সম্পত্তির কোন অংশ পান নাই এবং তিনি স্বীয় দেশেও যাইতেন না। প্রথম পত্নীর পীড়া হওয়ায় ভীমা দাদা সুমিত্রা নাম্নী একটি দক্ষিণ রাঢ়ী কুলীন কায়স্থ কন্যা বিবাহ করেন। ভীমা দাদা তাঙ্গে খাঁর দেওয়ানী করিয়া তাঁহার প্রভুর অনুগ্রহে মহম্মদাবাদ, গোপালপুর এবং সূর্য্যকুণ্ডা এই তিন খানি গ্রাম ৩০০৲ টাকা জমায় তালুক বা আয়মা পাইয়াছিলেন। মাতলামি অপরাধে তিনি কর্ম্মচ্যুত হইয়া সূর্য্যকুণ্ডাতে গিয়া বাস করিয়াছিলেন। সেই স্থানে তিনি এক কালীমূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি প্রত্যহ কালী পূজা দিতেন এবং প্রচুর সুরাপান করিতেন। ভীমা দাদা নিজের ন্যায় বলবান, বৃহদাকার লোক ভাল বাসিতেন। তাঁহার দুই পত্নীই দুর্ব্বল, কৃশ এবং খর্ব্বাকৃতি ছিলেন। এজন্য তিনি তাহাদিগকে ভাল বাসিতেন না। লজ্জাশীলা কুলবালারা প্রায়শঃ লম্পট মাতালের প্রেয়সী হইতে পারে না।

* প্রচলিত প্রবাদ—“হাল বয়, তাল খায়, গিধ্‌নায় বাস।
তার বেটা কায়েত হ’লো বিশ্বাস খাস॥”

† কেহ কেহ উদয়রামকে উদয়নারায়ণ বলিত।

সেইজন্য কুলীন কায়স্থের কন্যাদ্বয় সুন্দরী, সুশীল, হইয়াও স্বামীর প্রিয়পাত্রী হইতে পারেন নাই। কালুটী নাম্নী এক চণ্ডালিনী ভীমার পরম বল্লভা ছিল। কালুটীর বর্ণ উজ্জ্বল কাল, আকৃতি সুগঠিত এবং শরীর দীর্ঘ, পুষ্ট ও সবল ছিল। সে উলঙ্গ হইয়া ভীমার হাত ধরিয়া নাচিত এবং একত্র সুরাপান করিত। সেই জন্য সে উপপতির প্রাণ তুল্য ছিল।

তখনকার সমাজের রীতি অনুসারে সকলেরই চলিতে হইত। কেহ কোন-রূপ স্বেচ্ছাচার করিতে পারিত না। ভীমা উপপত্নীর বশীভূত হইলেও তাঁহার নিজ গৃহে তাঁহার পত্নীরাই কর্ত্রী ছিল। তিনি পত্নী বা সুজাত পুত্র-কন্যার প্রতি কোন উৎপীড়ন করেন নাই অথবা পৈত্রিক বা স্বোপার্জ্জিত কোন স্থাবর সম্পত্তিও উপপত্নীকে দেন নাই। তিনি কেবল নগদ টাকা ও অস্থাবর সম্পত্তি প্রচুর পরিমাণে কালুটীকে দিতেন এবং তাহাই মাত্র দিতে পারিতেন। পক্ষান্তরে, তাঁহার পত্নীরাও স্বামীকে অন্যাসক্ত দেখিয়া আত্মহত্যা করে নাই, স্বামী হত্যা বা তাঁহার উপপত্নীও হত্যা করে নাই। আবার উপপত্নীও বৈধপত্নী এবং তৎসন্তানদিগকে স্পষ্ট হিংসা করিতে সাহস করে নাই। ভীমা দাদার প্রথম পত্নীর একমাত্র পুত্রেরই নাম সীতারাম রায়। দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভে এক কন্যা ও লক্ষ্মীনারায়ণ নামক এক পুত্র এবং উপপত্নীর গর্ভে সাত পুত্র ও চারি কন্যা হইয়াছিল। ভীমা তাঁহার এক মাত্র সুজাতা কন্যাকে নিজ পুরোহিত ভৈরব চক্রবর্ত্তীর সেবাদাসী করিয়া দিয়াছিলেন।

এখানে সেবাদাসী শব্দের অর্থ ও তাৎপর্য্য প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। পূর্ব্বে বহুসংখ্যক শূদ্র-কন্যা ব্রাহ্মণের সেবাদাসী হইত। সেবাদাসী হইবার পূর্ব্বে তাহারা ভেক লইয়া বৈষ্ণবী বা বৈরাগিনী হইত। ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে যে কোন জাতীয় যে কোন পদস্থ লোক হউক ব্রাহ্মণের সেবা করিলে কাহার কোন মানহানি বা পাতিত্য হয় না। বহুসংখ্যক ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র রাজগণ দুঃসময়ে ব্রাহ্মণের পরিচর্য্যা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের কিছুমাত্র নিন্দা বা মানহানি হয় নাই। শূদ্র কন্যারা প্রথমে বৈষ্ণবী হইয়া তাহার পর কোন ব্রাহ্মণের উপপত্নী হইত। তাহাদিগকে সেবাদাসী বলিত। ব্রাহ্মণ না যুটিলে বৈষ্ণবীরা অন্য বৈষ্ণবের সহ মালা বদল করিয়া বিবাহিতা হইত। কখন বা সমজাতীয় বা উচ্চতর জাতীয় অন্য পুরুষের

ছিল তাহা জানা যায় না। হরসুন্দর, শ্যামসুন্দরের বুদ্ধি এবং মেনা ধনার বিক্রম দ্বারাই সীতারামের উন্নতি হইয়াছিল।

পূর্ব্বে দস্যু ভয় খুব বেশী ছিল। হুজুরী তালুকদার অর্থাৎ গাঁইয়া ভূঁইয়াগণ তাহাদের মালগুজারী সোজাসুজি নবাব সরকারে পাঠাইলে তাহা পথিমধ্যে প্রায়ই লুঠ হইত। যদি সেই মালগুজারীর রক্ষার্থ প্রচুর সৈন্য পাঠাইত তাহাতে ব্যয় বাহুল্য হইত। এজন্য তাহারা নিজ নিজ মালগুজারী পরগণা-পতি জমিদারকে দিত। জমিদার নিজ মালগুজারী সহ তালুকদার-দের মালগুজারীও ইর্শাল করিতেন। জমিদারেরা ইর্শাল খরচ বলিয়া তালুকদারদের নিকট দশোত্তরা অর্থাৎ শতকরা ১০৲ দশ টাকা হারে লভ্য অর্থাৎ মালীকানা মুনফা পাইতেন। তদ্ভিন্ন জমিদারেরা নানা উপলক্ষ করিয়া তালুকদারদের নিকট আবোয়াব বাজে জমা প্রভৃতি নামে অতিরিক্ত টাকা আদায় করিতেন। ভূষণা পরগণার জমিদার তাজে খাঁর পুত্র তোরাব খাঁর সহ বাজে জমা লইয়া সীতারামের প্রথম বিবাদ উপস্থিত হইল। মেনা ধনা এক দল চণ্ডাল সৈন্য প্রস্তুত করিল। সেই সেনার সাহায্যে সমস্ত ভূষণা চাকলা সীতারামের অধিকৃত হইল। তোরাব খাঁ পলাইয়া ঢাকায় নবাবের নিকট নালিশ করিল। নবাবও সীতারামকে তলব করিলেন। সীতারাম নালিশের জবাব দিতে হরসুন্দরকে পাঠাইলেন।

তখন কোন উকিলের বক্তৃতা হইত না। নবাবী দর্বারের আমলাদিগকে অর্থ দিয়া স্বপক্ষ করা, নিজ সাক্ষীদিগকে শিখান এবং বিপক্ষের সাক্ষীদিগকে বশীভূত করা এবং অতি বিনীত ভাবে সদ্যুক্তিপূর্ণ জবাব দেওয়া তখনকার মোকদ্দমার সার তদ্বির ছিল। হরসুন্দর নবাবকে জানাইলেন যে, "তোরাব অতি অপব্যয়ী, সে সমস্ত প্রজা ও গাঁইয়া ভূঁইয়ার নিকট রাজস্ব আদায় করিয়া ব্যর্থ ব্যয় করিয়াছে। আর অতিরিক্ত আবোয়াব না দিলে সীতারামকে 'গোড়ায় বাঁধিয়া ধান খাওয়াইবে' বলিয়া ভয় দেখাইয়াছে। সীতারাম তত টাকা দিতে অপারগ হওয়ায় তোরাব তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছে, সীতারাম অগত্যা আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ করিয়াছেন। সীতারাম তোরাবকে বেদখল করেন নাই। তোরাব হুজুর সরকারের বকেয়া মাল-গুজারী ফাঁকি দিতে এবং তৎদরুণ অপরাধ সীতারামের উপরে চাপাইতে

মনস্থ করিয়া এই মিথ্যা নালিশ করিয়াছে।” এই কথার প্রমাণার্থ হরসুন্দর তোরাবের এক তাগিদ পরোয়ানা দাখিল করিলেন। ঘুষের বশে আমলাগণ হরসুন্দরের কথাই সমর্থন করিল। নবাব তোরাবকে কহিলেন, “তুমি যদি এক মাস মধ্যে সমস্ত বকেয়া মালগুজারী পরিষ্কার করিয়া দিতে পার, তবে তোমাকে জমিদারীতে দখল দিব নতুবা তোমার কোন কথা শুনিব না।” তোরাব বকেয়া মালগুজারী দিতে পারিলেন না।* ভূষণা পরগণা প্রকৃত পক্ষে সীতারামের দখলে ছিল। শ্যামসুন্দর সমস্ত পরগণার খাজানা আদায় করিয়া মজুদ রাখিয়াছিলেন। হরসুন্দর সেই টাকা আনাইয়া সমস্ত বকেয়া রাজস্ব শোধ করিলেন এবং এক হাজার টাকা নজর দিলেন। নবাব অমনি সীতারামকে ভূষণা পরগণার জমিদার স্বীকার করিয়া সনদ দিলেন।

ভূষণা পরগণার পার্শ্বে ডুমরাই ও নখিলা পরগণায় কুতুব খাঁ পাঠানের জমিদারী ছিল। তিনি বার ভূঁইয়ার মধ্যে এক ভূঁইয়া এবং পুরাতন খিলজী বংশ সম্ভূত সম্ভ্রান্ত সর্দার। তাঁহার জমিদারীমধ্যে মৃত্যুঞ্জয় মৈত্র নামে এক কুলীন ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি কয়ড়া নিবাসী মথুরানাথ চৌধুরীর পরম সুন্দরী কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। মৈত্রপত্নীর সৌন্দর্য্যের প্রশংসা শুনিয়া কুতব তাঁহাকে হরণ করিতে একশত সৈন্য পাঠাইলেন। মৃত্যুঞ্জয় তাহার সন্ধান পাইয়া সীতারামের এলাকায় পলায়ন করিলেন। কুতুবের সেনাগণ ভূষণায় প্রবেশ করিয়া মৈত্রপত্নীকে হরণ করিল। মৈত্র গিয়া সীতারামের নিকট ধন্না দিলেন। সীতারাম আহার করিতে যাইতেছিলেন, তিনি অমনি প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, মৈত্রপত্নী উদ্ধার না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি অন্নজল গ্রহণ করিবেন না। তাঁহার আহার না হওয়ায় তাঁহার বাড়ীর সকলেই অনাহারে থাকিল। মেনা ধনা অতি ত্রস্ত সৈন্য লইয়া গিয়া পথিমধ্যেই অপহারকগণকে বিনাশ করিল। নিহত পামরদিগের মুণ্ড দ্বারা মুণ্ডমালা গাঁথিয়া মেনারাম ও ধনারাম গলায় পরিল। রাত্রি তৃতীয় প্রহরের সময় মৈত্রপত্নীকে লইয়া মেনা ধনা মহম্মদাবাদে প্রত্যাগমন করিল। সীতারাম ভূষণা পরগণার জমিদারী

---

* ষ্টুয়ার্ট প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণ বলেন যে, নবাব কর্ত্তৃক কোন সাহায্য না পাইয়া তোরাব (আবুতোরাব) সীতারামকে গোপনে আক্রমণ করিতে চেষ্টা করিয়া সীতারামের অনুচরগণ কর্ত্তৃক নিহত হন।

পাইয়া সূর্য্যকুণ্ডা হইতে মহম্মদাবাদে বাড়ী করিয়াছিলেন। মেনা ধনা মুণ্ডমালা পরিয়া সসৈন্যে "জয় সীতারাম" বলিয়া নৃত্য করিতে লাগিল। মৃত্যুঞ্জয় জানিলেন যে তাঁহার পত্নীর সতীত্ব নষ্ট হয় নাই, শত্রুগণ নিহত হইয়াছে। তিনি অমনি মেনা ধনার হাত ধরিয়া "জয় সীতারাম" বলিয়া নাচিতে লাগিলেন। সীতারাম এবং দর্শকগণ পুষ্পবৃষ্টি করিলেন। রাত্রি প্রভাত হইল, কাহারও আহার হইল না। পরদিন কালীপূজা অন্তে সকলে ধুমধামে প্রসাদ ভক্ষণ করিল। এই মৃত্যুঞ্জয় মৈত্র হইতেই কুতুবখানি পঠীর কুলীন সৃষ্টি হয়।

এই অবধি কুতুব খাঁর সহ সীতারামের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কুতুব দুই পরগণার জমিদার এবং পাঠান সর্দার। পক্ষান্তরে, সীতারাম বাঙ্গালী কায়েত এবং এক পরগণার নূতন জমিদার। সুতরাং কুতুব অতি সহজে জয় লাভ করিবার আশা করিয়াছিলেন। কিন্তু কার্য্য কালে দেখিলেন যে তাঁহার গর্ব্বী পাঠান যোদ্ধাগণ মেনা ধনার বাহুবলে পদে পদে পরাজিত হইতে লাগিল। দুই বৎসর ঘোর যুদ্ধের পর কুতুব রণশায়ী হইলেন। তাঁহার জমিদারী দুই পরগণা সীতারামের অধীন হইল। কুতুবের ওয়ারিসগণ জানিত যে নবাবের দরবারে ধনীর বিরুদ্ধে নালিশ করিয়া গরীবের কোন সুফল হওয়া অসম্ভব। এজন্য তাহারা কোন নালিশ না করিয়া উড়িষ্যায় প্রস্থান করিল। হরসুন্দর ও শ্যামসুন্দর সহকারে সীতারাম এবার স্বয়ং ঢাকায় গিয়া নবার্জ্জিত দুই পরগণার বাকি মালগুজারী শোধ করিয়া তিন পরগণার জমিদার হইলেন। এইবারে তিনি বহু ব্যয় করিয়া "রাজা" উপাধি লাভ করিলেন। এই অবধি "সীতারাম বিশ্বাস" নামের পরিবর্ত্তে "রাজা সীতারাম রায়" বলিয়া নাম হইল। ইহার পর তের বৎসর কাল শান্তভাবে সীতারাম তিন পরগণার রাজত্ব করিয়াছিলেন।* এই তের বৎসর মধ্যে তিনি অনেকগুলি দস্যু দমন করিয়াছিলেন। তিনি কতকগুলি দস্যুকে নিজ সৈনিক দলে গ্রহণ করিয়াছিলেন; অবশিষ্ট দস্যুদিগকে নষ্ট বা তাড়িত করিয়াছিলেন।

* সীতারামের প্রতিষ্ঠিত দশভুজার মন্দিরের ফলকলিপি পাঠে জানা যায়, উক্ত মন্দির ১৬২১ শক অর্থাৎ ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দে নির্ম্মিত হয়। ১৭১৪ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ অধ্যক্ষ সীতারামের পুত্রকন্যা প্রভৃতিকে হুগলীর ফৌজদারের হস্তে সমর্পণ করেন। সুতরাং সীতারামের প্রভুত্ব অন্ততঃ তের বৎসর কাল অক্ষুণ্ণ ছিল।

নবাব আজিম ওশ্মানের শাসনকালে যখন মুর্শিদকুলী খাঁ দেওয়ান হইয়া বাঙ্গালার নূতন বন্দোবস্ত করিলেন তখন বাঙ্গালাদেশে ঘোর উপপ্লব উপস্থিত হইল। জমিদারদিগের মালগুজারী বৃদ্ধি হইল। আবার সেই মালগুজারী দিবার চারি কিস্তী ধার্য্য হইল। কিস্তীমত টাকা না দিলে জমিদারী তৎক্ষণাৎ নিলাম হইত। তদ্দ্বারা বাকি শোধ না হইলে জমিদারকে ধৃত করিয়া নানারূপ কষ্ট দিয়া বাকি আদায় করা হইত। সৈয়দ রেজা খাঁ নামে একজন মহাপাপী নায়েব দেওয়ান ছিল। সে একটা কুণ্ড তৈয়ারী করিয়া তাহা মল মূত্রাদি ঘৃণিত পদার্থে পরিপূর্ণ করিয়া রাখিত। সেই নরক কুণ্ডকে সে বৈকুণ্ঠ বলিত। সে বাকিদার জমিদারগণকে সেই নরকে কটিদেশ পর্য্যন্ত ডুবাইয়া রাখিত। যাবৎ বাকি আদায় না হইত তাবৎ বাকিদার জমিদারকে সেই অবস্থাতেই থাকিতে হইত। এই নিষ্ঠুর উপায়ে রাজস্ব বৃদ্ধি করিয়া মুর্শিদকুলী বাদশাহের প্রিয়পাত্র হইলেন। এদিকে জমিদার ও প্রজাগণের দুর্দ্দশার পরিসীমা থাকিল না। অনেক জমিদার ডাকাতী করিয়া রাজস্ব সংগ্রহ করিত, প্রজার উপর ঘোর অত্যাচার করিত। কোন জমিদারের রাজস্ব বাকি পড়িলে সে নরকে পতন ভয়ে দেশত্যাগী হইত অথবা আত্মহত্যা করিত। পূর্ব্বে জমিদারেরা করদায়ী রাজার ন্যায় অতি সম্মানিত ছিলেন। এখন জমিদার উপাধি ঘৃণিত হইল। অনেক পুরাতন জমিদারের জমিদারী গেল। মুসলমান জমিদার প্রায় নিঃশেষ হইল। পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, কায়স্থ এবং সম্ভ্রান্ত মুসলমান ভিন্ন কেহ জমিদার হইতে পারিত না। এখন যে কোন ব্যক্তি নিলাম খরিদ করিয়া জমিদার হইতে লাগিল। জমিদারদিগের অত্যাচার ভয়ে ধনীগণ ধন গোপন করিয়া দরিদ্র ভাবে থাকিত। সমস্ত দেশ হাহাকারে পরিপূর্ণ হইল। অনেক কৃষক খাজনা চালাইতে না পারিয়া যোত ত্যাগ করিয়া জঙ্গলে আশ্রয় লইল এবং মৃগয়া ও দস্যুবৃত্তি করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিতে লাগিল।

সীতারামের এক পরগণা বাকি মালগুজারীর জন্য নিলাম হইল। একজন শুঁড়ী তাহা ১।০ পাঁচ সিকা মূল্যে খরিদ করিল। হরসুন্দর বহু চেষ্টা করিয়াও নিলাম রদ করিতে পারিলেন না। শুঁড়ী ক্রীত সম্পত্তি দখল করিতে গেলে মেনা ধনা তাহাকে বিলক্ষণ মারিপিট করিয়া তাড়াইয়া দিল। ক্রেতা নালিশ করিলে,

নবাব দেওয়ান তাহাকে খরিদা জমিতে দখল দিতে এবং সীতারামকে ধরিয়া আনিতে ৬০০ ছয়শত সৈন্য পাঠাইলেন। সীতারাম তাহাদিগকে পরাজয় করিলেন এবং তাহাদের বন্দিগণকে কালীমূর্ত্তির নিকট বলিদান করিলেন। ইহাতে সীতারামের খুব নাম হইল। সম্পত্তি বিচ্যুত জমিদারেরা দলে দলে সীতারামের শরণাগত হইল। সীতারাম তাহাদিগের জমিদারী নিজে দখল করিয়া পূর্ব্ব জমিদারকে সদ্ভাবে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন এবং মাল-গুজারী দেওয়া একবারেই বন্ধ করিলেন। ক্রমে আট জন মুসলমান, পাঁচজন ব্রাহ্মণ এবং চারিজন কায়স্থ জমিদার সীতারামের আশ্রয় লইল। নবাব নাজিম সীতারামকে দমন না করিয়া বরং গোপনে উৎসাহ দিতে লাগিলেন।

এই সময়ে সীতারামের মনে স্বাধীন হইবার ইচ্ছা হইল। দেশ মধ্যে মুসলমানেরা অত্যন্ত প্রবল। আর হিন্দুদিগের ঐক্য নাই। দুই কারণে সীতারাম পূর্ব্বে কখন স্বাধীন হইবার কথা মনেও চিন্তা করেন নাই। যখন তিনি নিলামী জমিদারী ক্রেতাকে দখল দিলেন না এবং নবাব দেওয়ানের প্রেরিত সেনা পরাজয় করিলেন তখন নবাব নাজিম তাঁহাকে উৎসাহ দিয়া-ছিলেন। শুবাদারের সহ দেওয়ানের সদ্ভাব ছিল না। সুতরাং দেওয়ান যাহাতে অপ্রতিভ হন শুবাদার তাহারই চেষ্টা করিতেন। দেওয়ান নাজিমের নিকট সীতারামকে দমনের জন্য সেনা চাহিলেন। নাজিম নানারূপ গোলমাল করিয়া সাহায্য করিলেন না। দেওয়ান নিজে সীতারামকে দমনে সক্ষম হইলেন না। তদ্দর্শনে বহুসংখ্যক উৎপীড়িত হিন্দু মুসলমান জমিদার তাঁহার সহ যোগ দিলেন। এই সুযোগে সীতারাম আঠার পরগণার রাজা হইয়া উঠিলেন। পঁচিশ হাজার হিন্দু সৈন্য এবং আট হাজার মুসলমান সৈন্য সুশিক্ষিত হইল। ইংরেজেরা বিবেচনা করেন যে, নবাবী আমলে এদেশের মুসলমানেরা রাজার জাতি ছিল এবং বিশেষ সম্ভ্রান্ত ও উচ্চপদস্থ ছিল। বাস্তবিক তাহা নহে। বাঙ্গালা দেশের মুসলমান মধ্যে প্রায় সাড়ে পনের আনাই অতি নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু সন্তান। অতি অল্প সংখ্যক সদ্বংশ জাত হিন্দু সন্তান। তাহারা কোন কারণে জাতিভ্রষ্ট হইয়া মুসলমান হইয়াছে। বিদেশ হইতে সমাগত মুসলমান শতকরা একজন হইবে কিনা সন্দেহ। মোগলেরা এদেশের মুসলমানদিগকে স্বজাতি বলিয়া জ্ঞান করিত না। এ দেশীয় মুসলমানদিগকে লোকে "পাতি নেড়ে"

বলিত। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়েরা হাড়ী মুচিদিগকে যেরূপ জ্ঞান করে সৈয়দ ও মোগলেরা পাতি নেড়েদিগকে তদ্রূপ জ্ঞান করিত। মুসলমান রাজপুরুষেরা হিন্দুদিগকে যতদূর সম্ভ্রম করিত পাতি নেড়েদিগকে কদাচ তত সম্ভ্রম করিত না। অথবা তাহাদিগকে কোন উচ্চপদ কখন দিত না। ফলতঃ ইংরেজ রাজত্বে বাঙ্গালী-মুসলমানদিগের মান মর্য্যাদা ও অবস্থা যেরূপ আছে মোগল রাজত্ব কালে তদপেক্ষা সর্ব্বাংশেই অপকৃষ্ট ছিল। যাবতীয় উচ্চপদ সৈয়দ, মোগল এবং উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুরা ভোগ করিত। নেড়ে মুসলমানেরা কখনও আপনাদিগকে হিন্দু-দের তুল্য জ্ঞান করিতে সাহসী হইত না। হিন্দুরা নেড়েদিগকে "নমঃ" অর্থাৎ জাতিভ্রষ্ট বলিত। তাহারাও আপনাদিগকে তদ্রূপ পতিত জাতি বলিয়া জানিত। সীতারাম বিদ্রোহী হইলে পাঠান ও নমঃগণ পালেপালে আসিয়া নিরাপত্তে সীতারামের সহ যোগ দিয়াছিল। সামান্য পদাতিক সামন্তই চণ্ডাল এবং নমঃ ছিল। উচ্চতর কর্ম্মে নানা জাতীয় লোক ছিল। মেনারাম সিংহ, ধনারাম সিংহ এবং তকী খাঁ ও আমিন বেগ তাঁহার প্রধান সেনাপতি ছিল।

মহারাষ্ট্রের শিবজী এবং বাঙ্গালাদেশের সীতারাম রায় প্রায় সমকালীন লোক। প্রত্যেকেই তিন খানি গ্রাম পৈত্রিক সম্পত্তিরূপে প্রাপ্ত হইয়া নিজ চেষ্টায় রাজা হইয়াছিলেন। শিবজীর কতকগুলি মাওলী যোদ্ধা একান্ত সহায় ছিল। সীতারামেরও কতকগুলি চণ্ডাল যোদ্ধা তদ্রূপ অনুগত ছিল। মহারাষ্ট্রদেশে পর্ব্বত ও জঙ্গলে বিদেশী লোকের পক্ষে পথ-ঘাট দুর্গম ছিল। বাঙ্গালা দেশে পর্ব্বত নাই বটে কিন্তু ভয়ানক সর্পব্যাঘ্রসঙ্কুল বাঁশবেতকণ্টকাকীর্ণ দুর্ভেদ্য জঙ্গল, দুষ্পার হ্রদ নদী অনেক ছিল। ফলতঃ বিদেশীয় আস্কন্দীর পক্ষে বাঙ্গালাদেশ মহারাষ্ট্র অপেক্ষা সুগম ছিল না। শিবজী নিজে বীর পুরুষ ছিলেন, সীতারাম নিজে বীর ছিলেন কি না জানা যায় না। কিন্তু শিবজীর সেনাপতিগণ অপেক্ষা সীতারামের সেনানীগণ বীরত্বে শ্রেষ্ঠতর ছিলেন। শিবজীর যেমন রামদাস বাবাজী ও আত্মারাম বাবাজী উপদেশক ছিলেন, সীতারামের রামসুন্দর, শ্যামসুন্দর, হরসুন্দর ও কৃষ্ণসুন্দর তদপেক্ষা সুদক্ষ মন্ত্রী ছিলেন। শিবজী চুরি ডাকাতী বিশ্বাসঘাতকতা প্রভৃতি বহু প্রকার পাপ কার্য্য দ্বারা নিজ অবস্থা উন্নত করিয়াছিলেন। সীতারাম তাদৃশ কোন কুকর্ম্ম করেন নাই বরং অতি ধর্ম্মশীল বলিয়া তাঁহার সর্ব্বত্র সুযশ

ছিল। হিন্দু মুসলমান স্বপক্ষ বিপক্ষ কেহই সীতারামের কোন দুশ্চরিত্র বা পাপ কার্য্য কোথাও উল্লেখ করেন নাই। শিবজী মূর্খ, সীতারাম বিদ্বান্ ছিলেন। তনূপ-শক্তি অর্থাৎ লোক বশীকরণ শক্তি বোধ হয় শিবজী অপেক্ষা সীতারামের বেশী ছিল। কেননা শিবজীর কোন মুসলমান স্বপক্ষ ছিল না। পক্ষান্তরে, সীতারামের বহু সংখ্যক মুসলমান সৈন্য ও সেনাপতি একান্ত বাধ্য ছিল। শিবজীর আর একটি প্রধান সুবিধা ছিল, সীতারামের তাহা ছিল না। শিবজীর সমকালে মহারাষ্ট্রের চতুষ্পার্শ্বে মোগল সাম্রাজ্য, বিজয়পুর রাজ্য, গোলকুণ্ডা রাজ্য, মহীশুর প্রভৃতি হিন্দুরাজ্য এবং গোয়া প্রভৃতি ফিরিঙ্গী রাজ্য ছিল। তিনি একজন কর্ত্তৃক উপদ্রুত হইয়া অপরের আশ্রয় লইতে পারিতেন। সীতারামের চতুর্দ্দিকেই মোগল সাম্রাজ্য ছিল সুতরাং তিনি কাহারও সাহায্য পান নাই। তজ্জন্য সীতারাম শেষে আত্মরক্ষা করিতে পারেন নাই।

এদিকে দেওয়ান মুর্শিদকুলী সম্রাটকে জানাইলেন যে, "পদ্মার দক্ষিণে একটা শয়তান কায়েত বিদ্রোহী হইয়াছে। তাহাকে দমন জন্য আমি পাদশা-জাদা নবাব নাজিমের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করায় তিনি আমার সাহায্য করা দূরে থাকুক বরং আমাকে অপদস্থ করিবার জন্য গোপনে সেই হারামজাদা বিদ্রোহী কাফেরের সাহায্য করিতেছেন। পদ্মার দক্ষিণে দক্ষিণ-বাঙ্গালার মালগুজারী কিছুই আদায় হইতেছে না। এজন্য প্রার্থনা যে হুজুর আলি সদর হইতে খাস দশ হাজার জঙ্গী ফৌজ এ দাসের কার্য্যসাধন জন্য পাঠাইবেন।" সম্রাট ঔরংজীব নিকটবর্ত্তী রাজপুত, জাঠ ও শিখদিগের সহ সমরে এবং মহারাষ্ট্রীয় ও পাঠানদের সহ যুদ্ধে অতিমাত্র ব্যস্ত ছিলেন। তাঁহার নিজ পুত্রেরাও তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিতে ষড়যন্ত্র করিতেছিল। বাদশাহজাদা আকবর স্পষ্টই বিদ্রোহী হইয়াছিলেন। সুতরাং বাঙ্গালা দেশে সেনা পাঠাইতে তাঁহার অবসর ছিল না। তিনি ভৎ‍র্সনা করিয়া পুত্রকে চিঠি লিখিলেন যে, "তোমার দেওয়ানের পত্রে জানা যায় যে সীতারাম কায়েত নামে একটা কাফের বিদ্রোহী হইয়া নিজে মালগুজারী দেয় না এবং অন্যান্য জমিদারগণকেও মালগুজারী দিতে দেয় না। তাহাকে দমন জন্য দেওয়ান প্রার্থনা করায় তুমি তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র তদ্বির না করিয়া বরং হারামজাদা কাফেরকে উৎসাহ

দিতেছ। এই সংবাদ কতদূর সত্য আমি তাহা জানি না। সাম্রাজ্য এখন আমার এবং ভবিষ্যতে তোমার, দেওয়ান কেবল অস্থায়ী চাকর মাত্র। তুমি যে দেওয়ানকে অপ্রস্তুত করিবার জন্য নিজ সম্পত্তি নষ্ট করিতেছ, আমি তাহা বিশ্বাস করি না। যাহা হউক, তোমার শাসনাধীন স্থানে বিদ্রোহী দমন হইতেছে না, ইহা তোমার দোষ। তুমি অবিলম্বে বিদ্রোহ দমন করিয়া বিস্তারিত কৈফিয়ত দিবে। নতুবা তোমার সুবাদারী এবং ভাবী সাম্রাজ্য লাভের আশা একেবারে নিঃশেষ হইবে। আমি আমার সন্তানগণ মধ্যে তোমাকে সর্ব্বাপেক্ষা সুযোগ্য বলিয়া বিশ্বাস করি সেই জন্য অধিক লিখিলাম না। দেখিও যেন তোমার কার্য্য দৃষ্টে আমার সেই বিশ্বাস না টলে।”

আজিম ওশ্মান নিজ পিতামহের উগ্রস্বভাব অবগত ছিলেন। সুতরাং তৎপ্রেরিত পত্র দৃষ্টে অতিমাত্র ভীত হইলেন। তিনি অবিলম্বে বিদ্রোহ দমন জন্য বিশ হাজার সৈন্য পাঠাইলেন এবং সেনাপতিকে বলিয়া দিলেন যে, “তুমি প্রথমে সীতারামকে আপোষে বশীভূত করিতে চেষ্টা করিও এবং তাহাকে জানাইও যে, যদি সে বিনাযুদ্ধে বশ্যতা স্বীকার করে তবে তাহার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করিয়া স্বপদে স্থায়ী রাখিব, নতুবা তাহার কিছুতেই মঙ্গল নাই।”

বাদশাহজাদা বরাবরই দেওয়ানের উপর রুষ্ট ছিলেন এক্ষণে পিতামহের চিঠি দেখিয়া তাঁহার ক্রোধের ইয়ত্তা থাকিল না। তিনি যথাসাধ্য দেওয়ানের উপর দোষারোপ করিয়া কৈফিয়ত পাঠাইলেন যে,—

“মুসলমানেরা হিন্দুদের অপেক্ষা বলবান্, সাহসী, বীর পুরুষ এবং আরো কোন কোন গুণে শ্রেষ্ঠ বটে কিন্তু আয় ব্যয় বিবেচনায় হিন্দু মুসলমান অপেক্ষা সর্ব্বাংশেই সুদক্ষ। এজন্য হুজুরের পূর্ব্ব পুরুষেরা সর্ব্বদাই দেওয়ানী ও অপরাপর অর্থসচীবী কার্য্যে কেবল হিন্দুদিগকেই নিযুক্ত করিতেন। তাহাতে সম্রাটের এবং প্রজা জমিদারগণের সকলেরই সুখ এবং মঙ্গল হইত। হুজুরালি কাফের বিদ্বেষ বশতঃ মুসলমান দেওয়ান নিযুক্ত করিয়াছেন। তজ্জন্যই ঘোরতর প্রজাপীড়ন হইতেছে এবং বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে। সুযোগ্য দেওয়ান সাহেব মালগুজারী আদায় জন্য চারি কিস্তী ধার্য্য করিয়াছেন। সেই কিস্তীর তারিখে সম্পূর্ণ কিস্তীর টাকা এবং নিজের নজর সেলামী আদায় না হইলে তিনি জমিদারদিগের প্রতি অতি নিষ্ঠুর দণ্ড করেন। সুযোগ্য নায়েব দেওয়ান

সম্পূর্ণ ভরা না হওয়ায় হাইদর খাঁ নামক একটি মুসলমান ফৌজদারকে রামজীবনের সাহায্যার্থ পাঠাইলেন। * দয়ারামও এই সঙ্গে চলিলেন। †

রামজীবন বিশ হাজার সৈন্য সহ চন্দনা নদীর উত্তর তীরে ছাউনী করিলেন। সেই স্থানে তিনি কোঁড়কদির ভট্টাচার্য্যদিগের নিকট শুনিলেন মেনা ধনাকে বিনাশ করিতে না পারিলে কোন মতেই তাঁহার জয়ের আশা নাই। তিনি মেনা ধনাকে কৌশলে বিনাশ করিয়া কার্য্যোদ্ধারে উৎসুক হইলেন। দয়ারাম রামজীবনের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ছিল। তাহার সহ পরামর্শ না করিয়া তিনি কোন কার্য্যই করিতেন না। তিনি হাইদরের উপর শিবিরের ভার দিয়া কালী পূজার উপলক্ষে ব্রহ্মচারীবেশে শিবির হইতে বাহির হইয়া মহম্মদপুর চলিলেন। দয়ারাম তাঁহার চেলা সাজিয়া সঙ্গে চলিল। মেনারাম ও ধনারামের কি ব্যসন

* গোলাম হোসেন, ষ্টুয়ার্ট প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণ ও কালীপ্রসন্ন বাবু যাহা লিখিয়াছেন যে মুর্শিদকুলী খাঁ তাঁহার শ্যালীপতি বক্‌স্‌ হাসন, আলী খাঁ দ্বারা সীতারামকে ধৃত করিয়াছিলেন, তাহা ভ্রমপূর্ণ। কেননা রামজীবন সীতারামকে ধরিয়া নাটোরে আনিয়া যে ঘরে রাখিয়াছিলেন তাহা এখনও বিদ্যমান আছে। মুর্শিদকুলী বা তাঁহার অনুচর মধ্যে কেহ রায় ছিল না। তিনি বাঙ্গালা দেশের সর্ব্বনাশ করিয়া বাদশাহকে বেশী টাকা পাঠাইতেন; এই জন্য বাদশাহী দরবারে তাঁহার খুব প্রশংসা ছিল। তাঁহার চাটুকারদের লিখিত কাগজ-পত্রদৃষ্টে ইঁহারা ভ্রান্ত হইয়াছেন। সীতারাম অতি প্রবল ও সৎলোক ছিলেন। পার্শ্ববর্ত্তী জমিদারেরা তাঁহার হিতার্থী ছিল। তাঁহাকে বন্দী করা মুর্শিদকুলীর সাধ্য ছিল না। আরও এক কথা, পাছে সীতারাম পলাইয়া যান এই জন্য মুর্শিদ-কুলী খাঁ চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী জমিদারবর্গের সাহায্য প্রার্থনা করেন। জমিদারেরাও ভয়ে ভয়ে তাঁহার সাহায্যে স্বীকৃত হন। সুতরাং বক্‌স্‌ আলী খাঁ প্রেরিত হইলেও রামজীবনের সাহায্যে সীতারামকে ধৃত করা অসঙ্গত হয় না, বরং তাহাই সম্ভবপর।

† এই অভিযানের ফলে সীতারাম পরাভূত ও বন্দী হইয়া নাটোরে নীত হইয়াছিলেন। সীতারামের রাজধানীর লুণ্ঠিত দ্রব্যজাতের মধ্যে নাটোর-রাজের লভ্যাংশ লইয়া আসিয়া দয়ারাম নাটোরের রাজভবনে পঁহুছিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি একটী জিনিস দেন নাই। যেখানে এখন দীঘাপতিয়ার রাজবাড়ী, সেই খানে জঙ্গলের মধ্যে দয়ারাম একটী জিনিস লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন। একথা যখন নাটোর-রাজের কানে উঠিল, তখন অনুসন্ধানে জানা গেল, দয়ারামের লুকান ধন আর কিছু নহে,—রাজা সীতারামের আরাধ্য দেবতা "কৃষ্ণজী"। মহারাজ রামজীবন দয়ারামের ভক্তির পুরস্কার স্বরূপ কৃষ্ণজীর সেবার জন্য একখানি তালুকের মকররী মৌরসী স্বত্ব প্রদান করেন।

আছে, কি উপায়ে তাহাদিগকে কলে কৌশলে নষ্ট করা যায়, তাঁহারা গুপ্তভাবে সেই উপায় আবিষ্কার করিতে চেষ্টা করিলেন।

রামজীবন সীতারামের রাজ্য মধ্যে সুখ ও সমৃদ্ধি দৃষ্টে চমৎকৃত হইলেন। নবাবের দখলী স্থানের জমিদার তালুকদারগণ দেওয়ানের উৎপীড়নে অস্থির, আবার জমিদারের উৎপীড়নে প্রজাগণ অস্থির—সকলেই বিমর্ষ ও বিষণ্ণ; সুখী লোক প্রায় কেহই নাই। পক্ষান্তরে, বিদ্রোহী সীতারামের প্রজা সকলেই সুখী। হিন্দু মুসলমান সকলেই সীতারামের একান্ত ভক্ত। প্রজাদের পরস্পর বেশ সদ্ভাব। মেনা ধনা নীচ জাতীয় হইলেও তাহাদের আকৃতি প্রকৃতি ও ব্যবহার অতি ভদ্র। সীতারাম নিজে অতি ধার্ম্মিক এবং দাতা। তাঁহার কার্য্যাধ্যক্ষ ভাগিনেয়গণ অতি সুবিচারক, কার্য্যদর্শী এবং সদাশয়। সীতারামের সৈন্য ও সেনানীগণ সকলেই সাহসী, বীর, অস্ত্রশস্ত্রে সুশিক্ষিত এবং সদাশয় প্রভুর একান্ত ভক্ত। স্থানে স্থানেই দেবালয়; তথায় পূজা, অর্চ্চনা অতি ধুমধামে সম্পন্ন হয়। চিকিৎসা বিদ্যার ও শাস্ত্র শিক্ষার উন্নতি জন্যও সীতারামের বেশ যত্ন ও ব্যয় আছে। ফলতঃ সীতারাম দেশের রাজা হইলে যে নবাবী শাসন অপেক্ষা সর্ব্বাংশে মঙ্গলজনক হয়, ইহা রামজীবনের সর্ব্বতোভাবে উপলব্ধি হইল। তিনি দয়ারামকে কহিলেন, "দয়ারাম! আমি সীতারামকে নষ্ট না করিয়া বরং তাহার সহ যোগ দিয়া রাজা হইবার চেষ্টা করিলেই ভাল হয়। বোধ হয় আমার মস্তকে যে সর্পছত্র হইয়াছিল, গণেশ খাঁর ন্যায় স্বাধীন বাদশাহ হওয়াই তাহার অভিপ্রায়। ধর্ম্মশীল সীতারামের এই সুখের রাজ্য নষ্ট করিয়া স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা করা কি উচিত?"

দয়ারাম কহিলেন, "ঠাকুর কর্ত্তা! আপন কি আত্মহত্যার পথ খুঁজিতেছেন! নবাব নাজিম বাদশার পৌত্র। কালক্রমে তিনি বাদশাহ হইবেন। আপনাদের দুই ভ্রাতার উপর তাঁহার একান্ত অনুগ্রহ। তাঁহার কৃপায় আপনি বিনাকষ্টে রাজাধিরাজ হইতে পারিবেন। কিন্তু আপনি বিদ্রোহী হইলে ছোটকর্ত্তার (রঘুনন্দনের) এবং আপনার পরিবারবর্গের ভাগ্যে যে কি ঘটিবে তাহা সহজেই বুঝিতে পারেন। আবার জয়লাভেরও কোন আশা নাই। আপনার সঙ্গে যে ফৌজ আছে তাহারা আপনার চাকর নহে, তাহারা নবাবের চাকর। তাহারা আপনকার হুকুমে বিদ্রোহীর সহ যোগ দিবে না। আর আপনি ও

সীতারাম মিলিত হইয়াই বা কি করিতে পারেন। গণেশ খাঁ যখন বাদশাহ হইয়াছিল তখন বাঙ্গালা স্বতন্ত্র স্বাধীন রাজ্য ছিল। এখন দিল্লীর বাদশাহের এলাকা। আপনি একশত সীতারামকে সহায় পাইলেও দিল্লীর বাদশাহকে পরাজয় করিতে পারিবেন না। তাই আমি বলি আপনি নবাবের বিশ্বাসঘাতী হইবেন না। আপনি নবাবের চাকর, সীতারাম নবাবের বিদ্রোহী। সে ভাল লোক হউক বা মন্দলোক হউক সে কথায় আপনার কোন কাজ নাই। আপনি বিদ্রোহ দমন জন্য আসিয়াছেন, যাহাতে সেই কার্য্য উদ্ধার করিতে পারেন তাহাই করুন।" দয়ারামের কথায় রামজীবনের মতি ফিরিল। তিনি মেনা ধনার বিনাশের উপায় চেষ্টা করিলেন।

মহম্মদপুরে আস্কন্দী নিবারণ জন্য রণসজ্জা হইতেছিল। রামজীবন সাক্ষাতে মেনা ধনার বিক্রম দেখিয়া কোঁড়কদির ভট্টাচার্য্যদের কথার যথার্থতা বুঝিতে পারিলেন। তাঁহারা জানিলেন যে মেনারামের নিদ্রা অতি গভীর, আর ধনারাম লোকালয় হইতে বহুদূরে গিয়া মলত্যাগ করে। ইহা ভিন্ন আর কোন ব্যসন নাই। রামজীবন সেই ব্যসন উপলক্ষেই বীরদ্বয়কে বিনাশ করিবার জন্য দয়ারাম সহ পরামর্শ করিলেন। সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে ধূর্ত্ত দয়ারাম সংবাদ দি[illegible] যে ধনারাম ঝারী হস্তে করিয়া মাঠে যাইতেছে। রামজীবন অমনি ধনু[illegible] ও বিষাক্ত তীর নিজ পৃষ্ঠদেশে গেরুয়া বসনের নীচে সংগোপন করিয়া অলক্ষি[illegible] ভাবে ধনারামের অনুসরণ করিলেন। সুযোগ মতে ধনারামের পৃষ্ঠদেশ শরবিদ্ধ করিয়া রামজীবন দ্রুতবেগে বাসায় গিয়া তুলসী তলায় হরিনাম জপ করিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রতি কেহ কোন সন্দেহ করিল না। ধনারামের অপমৃত্যু হেতু রণযাত্রা তিন দিন স্থগিত থাকিল। রামজীবন এই সময় মধ্যে শিবিরে পৌঁছিলেন।

চতুর্থ দিবসে মেনারাম ও তকী খাঁ সেনাসহ রণযাত্রা করিলেন। অমনি দিবাভাগে শৃগালধ্বনি হইল। সীতারাম এবং তাঁহার হিন্দু সেনাগণ সেই সূচনা দৃষ্টে অত্যন্ত ভীত হইল। কিন্তু মুসলমানেরা কিছুমাত্র নিরুৎসাহ হইল না। তাহাদের সেনা চন্দনা নদীর দক্ষিণ পারে ছাউনী করিল। তখন বর্ষারম্ভ হইয়াছিল। উভয় পক্ষ মধ্যে কোন পক্ষই চন্দনা পার হইয়া অন্যপক্ষকে আক্রমণ করিতে সাহস করিল না। এই ভাবে পাঁচ দিন অতিবাহিত হইল। ষষ্ঠদিবস

অমাবস্যা—ঘোর অন্ধকার রাত্রি। তাহাতে বৃষ্টি হইতেছিল। শীতল বাতাসে মেনারাম গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইল। তাহার সৈন্য সামন্তগণও অনেকেই নিদ্রিত। যাহারা জাগ্রত ছিল তাহারাও শিবিরের মধ্যে গিয়াছিল। বৃষ্টির জন্য বাহিরে কোন লোক ছিল না। দয়ারাম অমনি সেই সংবাদ নিজ প্রভুর নিকট জানাইলেন। রামজীবন সেই রাত্রিতে বিপক্ষ বিনাশ জন্য পূর্ব্ব হইতেই সেনা তৈয়ারী রাখিয়াছিলেন। তিনি দয়ারামের প্রেরিত সমাচার পাইবামাত্র সসৈন্যে নদী পার হইলেন। পাছে বিজলীর আলোকে তাঁহাদের আগমন প্রকাশ হয়, এই ভয়ে তিনি সেনাসহ সকলেই কাল কাপড়ে আচ্ছাদিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা হামাগুড়ি দিয়া মেনারামের শিবিরের নিকট পৌঁছিলেন। মেনারামের তাম্বুর রশি কাটিয়া দিলে যখন তাম্বু পড়িয়া গেল তখন লোকে আক্রমণ টের পাইল। রক্ষীগণ অন্ধকারে বিপক্ষগণকে নিবারণ করিতে পারিল না। তাম্বুর নীচে বর্শাদ্বারা খোঁচাইয়া মেনারাম ও তাহার তিন ভ্রাতাকে হত্যা করা হইল। তৎসঙ্গে বহু সেনা নষ্ট হইল। অবশিষ্ট সেনারা পলায়ন করিতে পারিত। সেই সেনা লইয়া সীতারাম জঙ্গল আশ্রয়ে বহুদিন আত্মরক্ষাও করিতে পারিতেন। কিন্তু তকী খাঁ ও মেনারামের জীবিত ভ্রাতৃত্রয় দুঃসাহসে নির্ভর করিয়া পরদিন যুদ্ধ করিল। তাহাতে প্রায় সমস্ত সেনা নষ্ট হইল। সীতারাম বন্দীভাবে নবাবের নিকট প্রেরিত হইলেন। তথায় তাঁহার প্রাণদণ্ড হইল। সীতারামের পরিবারবর্গও বন্দী হইয়াছিল। রামজীবন তাহাদিগকে সসম্মানে ছাড়িয়া দিলেন।* সীতারামের রাজত্ব শেষ হইল কিন্তু তাঁহার চরিত্র ও মেনা ধনার বিক্রম বাঙ্গালা দেশে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিল।

* কথিত আছে, সীতারামের কতিপয় পুত্রকন্যা পলায়নপূর্ব্বক কলিকাতায় জনৈক আত্মীয়ের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইংরেজ বণিকগণ নবাবের আদেশে তাঁহাদিগকে হুগলির ফৌজদারের হস্তে সমর্পণ করেন। নবাব তাঁহাদিগকে যাবজ্জীবন কারাবাসের আদেশ প্রদান করেন। সীতারাম আনুমানিক ১৭১৪ খৃষ্টাব্দে নিহত হন। আজিম ওশ্মান স্বীয় পুত্র ফরক শিয়রকে প্রতিনিধি স্বরূপ রাখিয়া যান। তিনিই রামজীবনকে ১৭১৬ খৃষ্টাব্দে সীতারামের জমিদারীর সনদ প্রদান করেন। ইংরেজী কাগজ-পত্রে দেখা যায়, ১৭১৪ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ অধ্যক্ষ সীতারামের পুত্রকন্যা প্রভৃতিকে হুগলীর ফৌজদারের হস্তে সমর্পণ করেন।

ষড়বিংশ অধ্যায়

রাণী সর্ব্বাণী।—রামজীবনের সাঁতোড় আক্রমণ।—বাদশাহের নিকট রাণী সত্যবতীর অতিবাদ।—গুণাকর রায়।

নবাব সীতারামের দখলী ১৮ পরগণা রামজীবনকে দিলেন এবং তাঁহাকে মহারাজা উপাধি দিতে সম্রাটের নিকট পত্র লিখিলেন। রামজীবন মহম্মদপুরে বাড়ী করিতে ইচ্ছুক ছিলেন কিন্তু তাঁহার মাতা ও ভ্রাতা তাহাতে সম্মত না হওয়ায় তিনি স্বদেশে বাড়ী করিবার জন্য কিঞ্চিৎ স্থান নবাবের নিকট প্রার্থনা করিলেন। শাহজাদা তাঁহাকে মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত রাজসাহী পরগণা সহ পূর্ব্বেই রাজা উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। সেই পরগণার নাম হইতেই নাটোরের রাজাদের রাজসাহীর রাজা বলিয়া খ্যাতি হইয়াছে। রাজসাহী জেলা ও রাজসাহী বিভাগের নামও সেই পরগণার নামানুসারেই হইয়াছে। কিন্তু এখন সেই রাজসাহী পরগণার কতকাংশ মুর্শিদাবাদ ও কতক বীরভূম জেলার অন্তর্গত হইয়াছে। রামজীবন রাজসাহীর রাজা হইয়া গঙ্গাতীরে বরনগরে বাড়ী করিয়াছিলেন। সেই বাড়ীতে নাটোরের রাজবংশীয় এক শরীক এখনও বাস করেন। রামজীবনের জননী তাঁহাকে আমহাটীতে কিম্বা তৎপার্শ্বে বাড়ী করিতে একান্ত অনুরোধ করায় তিনি আবার জন্মভূমিতে নূতন বাড়ী করিতে কৃতনিশ্চয় হইলেন।

রামজীবন ও রঘুনন্দনের প্রতি নবাব নাজিমের অনুগ্রহ ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতেছিল। যে স্থানে যে কোন পরগণা জব্দ হইত নবাব অমনি তাহা তাঁহাদিগকে দিতেন। আবার দেওয়ানের এজলাসে যে সকল জমিদারী বাকি মালগুজারী জন্য নিলামে উঠিত, রঘুনন্দন তন্মধ্যে ভাল ভাল পরগণা সমস্তই জ্যেষ্ঠের নামে খরিদ করিতেন। মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, যশোহর, বীরভূম, মালদহ, ফরিদপুর, মেদিনীপুর ও মৈমনসিংহ জেলায় তাঁহারা বহুতর পরগণার অধিপতি হইয়াছিলেন। কিন্তু নিজ পৈত্রিক বাসস্থানের নিকট আট বিঘা ব্রহ্মত্র ভিন্ন তাঁহাদের

কোন ভূমি ছিল না। এই অবস্থায় তাঁহারা জননীর অনুরোধে স্বদেশে বাড়ী করিতে চলিলেন। নবাব তাঁহাদিগকে আশ্বাস দিয়াছিলেন যে তাঁহারা যে স্থান নিজ বাড়ীর জন্য মনোনীত করিবেন তাহাই তাঁহাদিগের জমিদারী করিয়া দিবেন। সেই আশ্বাসে নির্ভর করিয়া উভয় ভ্রাতা জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিতগণ সহ সুলক্ষণযুক্ত স্থান নির্ণয়ে বহির্গত হইলেন। তখন ঘোর বর্ষাকাল, এজন্য তাঁহারা নৌকারোহণে আমহাটী ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থানে নিজ বাড়ীর স্থান নিরূপণার্থ বিচরণ করিতে করিতে ভাতঝাড়ার বিলমধ্যে উপস্থিত হইলেন। এই স্থানে তাঁহারা দেখিলেন দুইটি নকুল সাঁতরাইয়া বিল পার হইল। তাহার পর দেখিলেন একটি বৃহৎ ভেক একটি ক্ষুদ্র সর্পকে গ্রাস করিতেছে। তদ্দৃষ্টে দুইটি বালিকা হাততালি দিয়া নৃত্য করিতেছে। পণ্ডিতেরা সেই স্থানটি অতি সুলক্ষণযুক্ত এবং রাজবাড়ীর উপযুক্ত বলিয়া ব্যাখ্যা করিলেন। ঐ স্থানেই রাজধানী করা সকলেরই পছন্দ হইল। রামজীবন জানিলেন যে এই স্থান পুঁঠিয়ার রাজার জমিদারী লস্করপুরের অন্তর্গত। তিনি পুঁঠিয়ার রাজার কোন অনিষ্ট না করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন। তজ্জন্য তিনি নবাবের নিকট ঐস্থান প্রার্থনা না করিয়া রাজা দর্পনারায়ণের নিকট রায়তী স্বত্বে পত্তন হওয়ার প্রার্থনা করিলেন। ব্রাহ্মণের আবাস-বাটীর খাজনা গ্রহণ করা কোন হিন্দু জমিদারের রীতি ছিল না। ভাতঝাড়ার বিলে রাজা দর্পনারায়ণের কেবল ২৭৷/ আনা মাত্র বার্ষিক লভ্য ছিল। তিনি নবোন্নত মহারাজাকে অধিকতর কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে সমস্ত ভাতঝাড়া বিল রামজীবনকে ব্রহ্মত্রদান করিলেন। রামজীবন হৃষ্টচিত্তে ১০০৮টি স্বর্ণমুদ্রা পুরাতন প্রভুকে প্রণামী পাঠাইয়া দিলেন।

ভাতঝাড়া বিল সর্ব্বত্র সমান খাল ছিল না। গ্রীষ্মকালে সমস্তই শুষ্ক হইয়া মাঠ হইত এবং সেই মাঠে গবাদি পশু চরিত। রামজীবন ঐ বিলের নিম্নতর স্থান সমূহে গভীর গর্ত্ত খনন করিয়া চৌকি পুষ্করিণী ও দীঘী নির্ম্মাণ করিলেন। আর তদুদ্ধৃত মাটী দ্বারা উচ্চতর স্থানগুলিকে সমধিক উচ্চতর করিয়া বাসোপযুক্ত করিলেন। এইরূপে তিনি অজস্র অর্থব্যয় করিয়া তিন বৎসর মধ্যে ভাতঝাড়ার বিলটিকে নাটোর নগর রূপে পরিণত করিলেন। যে স্থলে ভেকে সাপ ধরিয়াছিল এবং বালিকাদ্বয় নৃত্য করিয়াছিল ঠিক সেই

স্থলে রাজবাটী নির্ম্মিত হইল। সেই নৃত্য উপলক্ষ করিয়া নূতন নগরের নাম নাট্যপুর বা নাটপুর রাখা হইল। তাহারই সংক্ষেপ হইয়া নাটুর বা নাটোর নাম হইয়াছে।* রামজীবন যখন নাটোরে রাজধানী করিলেন তখন তিনি ৯৮ পরগণার জমিদার এবং মহারাজ উপাধিধারী, কিন্তু সমস্ত সম্পত্তিই দূরবর্ত্তী। স্বীয় রাজধানীর নিকটে তাঁহার কোনও সম্পত্তি ছিল না। নাটোরের চতুষ্পার্শে পুঁঠিয়া, তাহিরপুর, সাঁতোড় ও ভাতুড়িয়ার এলাকা ছিল। পুঁঠিয়ার কোন সম্পত্তি রামজীবন হরণ করিবেন না। তাহিরপুরের জমিদারী মধ্যেও পুঁঠিয়ার এজমালী হিস্যা ছিল বলিয়া তৎপ্রতি হস্তক্ষেপ করিতে রামজীবন অনিচ্ছুক ছিলেন। সুতরাং তিনি সান্যালরাজ্য ও ভাদুড়িরাজ্য সমস্ত বা আংশিক আত্মসাৎ করিতে চেষ্টিত হইলেন। তাঁহার সৌভাগ্য ক্রমে সুযোগও ঘটিয়া উঠিল।

সাঁতোড়ের রাণী সর্ব্বাণী একটাকিয়া রাজবংশের কন্যা এবং মহারাজ রামকৃষ্ণ সান্যালের পত্নী। তিনি একবিংশ বর্ষ বয়সে নিঃসন্তান বিধবা হইয়া ৬৭ বৎসর সাঁতোড় রাজ্য অসাধারণ যোগ্যতা সহ শাসন করিয়াছিলেন। সিংহরাশিতে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল † এবং তাঁহার বল বুদ্ধি ও তেজস্বীতা সিংহের ন্যায় ছিল। রমণীগণসুলভ কোমলতা ও লজ্জাশীলতা তাঁহার ছিল না এবং স্ত্রীজাতির পক্ষে যাহা যাহা সুখকর, তাঁহার ভাগ্যে তাহা কিছুই ঘটে নাই। তাঁহার বাল্যকালের অবস্থা কিছুই জানা যায় না। দশ বৎসর বয়সে তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। তাহার অল্পকাল পরেই বসন্ত রোগে তাঁগার শরীর

* এইরূপ স্থানের নামে 'প' কার লোপ হওয়া অনেক স্থানেই দেখা যায়। তন্মধ্যে রাজসাহী জেলায় ও মান্দ্রাজে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। যথা,—লালপুর (লালোর), তানপুর (তানোর), প্রাঠ (রাঠ), মধুপুরা (মথুরা), বিজনপুর (বিজনোর), করলিপুর (কারালোর), বেলপুর (বেলোর), মঙ্গলপুর (মাঙ্গালোর), বাঙ্গালপুর (বাঙ্গালোর), ত্রিবঙ্কপুর (ত্রিবাঙ্কুর), ইত্যাদি।

† জ্যোতিষ-শাস্ত্র মতে সিংহরাশির ফল—

" সিংহস্থিতে চন্দ্রমসি প্রধানা নারী ভবেৎ শৌর্য্যসমন্বিতা চ।
প্রিয়ামিষা ভূষণবস্ত্রভাজা উদারচেষ্টা সুভগা সুরূপা॥"

অর্থাৎ, সিংহরাশিতে জন্ম হইলে, সে রমণী প্রধানা, তেজস্বিনী, আমিষভক্ষণপ্রিয়া, বসন-ভূষণ-ভূষিতা, উদারচেষ্টান্বিতা, সৌভাগ্যশালিনী এবং রূপবতী হইয়া থাকে।

শ্রীহীন হইয়াছিল। সৌন্দর্য্য ও কোমলতা না থাকায় তিনি স্বামীর প্রেয়সী হন নাই বরং স্বামী সহ সর্ব্বদা কলহ হইত। তাঁহার বৈমাত্র ভ্রাতা সমস্ত পৈত্রিক সম্পত্তির মালিক হইয়াছিলেন। তাঁহার সহ সর্ব্বাণীর ও তাঁহার মাতার সদ্ভাব না থাকায় পিতৃগৃহেও সর্ব্বাণীর সুখ ছিল না। রাজা রামকৃষ্ণের চারি পত্নী সত্বেও তিনি বহু উপপত্নী রাখিয়াছিলেন। লাম্পট্য ও মাতলামি দোষে রামকৃষ্ণ অল্প বয়সেই অবরত হইলেন।

তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভজাত একটি কন্যামাত্র ছিল। সর্ব্বাণী জ্যেষ্ঠা পত্নী বলিয়া তিনিই রাজ্যভার প্রাপ্ত হইলেন। রামকৃষ্ণের অপব্যয় হেতু প্রচুর ঋণ হইয়াছিল। ভৃত্যদের বেতন বাকি ছিল। এবং জ্ঞাতি কুটুম্বদের ভাতা বাকি পড়িয়াছিল। তাহার উপর অল্প বয়স্কা রমণীর রাজত্ব হইল। কর্ম্মচারীরা রাজসম্পত্তি আত্মসাৎ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। কেহ বা রাণীদিগের উপপতি হইতে প্রয়াসী হইল। সকলেই মনে করিল যে সাঁতোড় রাজ্য অচিরে নষ্ট হইবে। কিন্তু একমাস মধ্যে সকলেই রাণী সর্ব্বাণীর প্রতিভার পরিচয় পাইল। মৃত স্বামীর শ্রাদ্ধের ব্যয় এবং সমস্ত জমিদারীর আয়-ব্যয়ের তিনি যেরূপ হিসাব লইলেন, তাহাতে সকলেই বুঝিতে পারিল যে রাণী সর্ব্বাণীকে ঠকাইয়া স্বার্থ সাধন করা অসাধ্য। একজন সুন্দর যুবাপুরুষ চক্ষুঠারিয়া তাঁহার প্রতি কামভাব প্রকাশ করিবামাত্র তিনি উগ্রভাবে শাসন করিলেন এবং অন্দরমহলে পুরুষ প্রবেশ বন্ধ করিয়া দিলেন। তাঁহার বুদ্ধি ও তেজস্বীতা দেখিয়া একমাস মধ্যেই সকলের দুরাশা তিরোহিত হইল।

সাঁতোড়ের রাজারা চৌদ্দ পরগণার জমিদার ছিলেন। রাজস্ব বাদেও তাঁহাদের সাড়ে পাঁচলক্ষ টাকা মুনাফা ছিল। পুরুষ রাজা হইলে তাঁহার নিজ বিলাসিতাতে অনেক লক্ষ টাকা ব্যয় পড়ে। রাণী সর্ব্বাণীর তাদৃশ কোন নিজ ব্যয় ছিল না। সুতরাং তিনি অল্পকাল মধ্যেই স্বামীকৃত দেনা শোধ দিয়া অর্থ সঞ্চয় করিতে পারিলেন। অথচ তিনি কোন সদ্ব্যয় হ্রাস করেন নাই; জ্ঞাতি কুটুম্বদিগের ভাতা বা বৃত্তি হানি করেন নাই। স্বামীর আত্মীয় স্বজনদিগকে তিনি অতি যত্নপূর্ব্বক প্রতিপালন করিতেন। নিজ পিতৃকুলের আত্মীয় স্বজনের প্রতিও ঠিক তদ্রূপ ব্যবহার করিতেন। গুরু-পুরোহিত, কুলীন-কুলজ্ঞ, প্রজা-ভৃত্য প্রভৃতি সকলের প্রতিই তিনি সদ্ব্যবহার করিতেন তথাপি তাঁহার

প্রতিবৎসরই সঞ্চিত অর্থ বৃদ্ধি হইত, কখনও কম হইত না।*

সঞ্চয় বেশী হইলে, তিনি ভাণ্ডার-ঘরে তিন কুঠরী করিয়াছিলেন। তিনি প্রত্যেক বৎসরের প্রথমেই বার্ষিক ব্যয়ের এক বরাদ্দ করিতেন এবং সেই বরাদ্দ মত টাকা প্রথম কুঠরীতে থাকিত; তাহা দ্বারা বার্ষিক ব্যয় নির্ব্বাহ হইত। বরাদ্দের অতিরিক্ত টাকা মধ্যের কুঠরীতে সঞ্চিত হইত। সেই বৎসরের যাহা আয় হইত তাহা তৃতীয় কুঠরীতে রাখা হইত। সে বৎসরে তৃতীয় কুঠরীর টাকা ব্যয় হইত না। বৎসরান্তে তৃতীয় কুঠরীর টাকা হইতে বরাদ্দ মত টাকা প্রথম কুঠরীতে চালান হইত। তদতিরিক্ত যাহা থাকিত তাহা মধ্যের কুঠরীতে চালিত হইত। তখন তৃতীয় কুঠরীতে কিছুই থাকিত না। আরব্ধ বর্ষে যাহা আয় হইত তাহা তৃতীয় কুঠরীতে রাখা হইত এবং যাহা ব্যয় হইত তাহা প্রথম কুঠরী হইতেই বাহির করিয়া দেওয়া হইত। পূর্ব্বে আমলাদের বহুদিন পরে এক এক বার নিকাশ লওয়া হইত। আমলারা অনেকে টাকা ভাঙ্গিয়া বসিত পরে নিকাশে ঠেকিয়া বিপন্ন হইত। রাণী সর্ব্বাণী দৈনিক নিকাশের নিয়ম করিয়াছিলেন। তাঁহার দেওয়ান প্রতিদিন সমস্ত আমলাদের নিকাশ লইতেন এবং সন্ধ্যার পর সেই দিনের আয়ব্যয়ের নিকাশ রাণীর নিকট দিতেন। ইহাতে আমলাদের অনুচিত লাভ হইত না অথচ শেষে কোন বিপদও হইত না।

রাণী সর্ব্বাণী বাঙ্গালা লেখা পড়া উত্তমরূপ জানিতেন। তিনি শেষে কিছু পারসীও শিখিয়া ছিলেন এবং সংস্কৃত শ্লোক অনেক মুখস্থ করিয়াছিলেন। তিনি অত্যন্ত পরিশ্রমী ছিলেন; সমস্ত বিষয়ে নিজে তদন্ত করিতেন। তিনি বহু লোকের পরামর্শ লইতেন কিন্তু কাহারও বশীভূত ছিলেন না। নিজ কর্ত্তব্য তিনি নিজে অবধারণ করিতেন। মুর্শিদকুলী খাঁর মালগুজারী বন্দোবস্তে তাঁহার কোন ক্ষতি হয় নাই বরং তিনি আট পরগণা নিলামে ক্রয় করিয়া সম্পত্তি বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। সকলেই বলিত "রাণী সর্ব্বাণীকে স্ত্রীলোক করিয়া সৃষ্টি করায় বিধাতার ভুল হইয়াছে।"

---

* রাজা রামকৃষ্ণ ডেমরার রায় বংশের সর্ব্বাণী দেবীর পাণিগ্রহণ করেন, এবং দীর্ঘকাল রাজ্য-শাসন করিয়া ১১১৭ শকে (১৭২০ খৃষ্টাব্দে) প্রাণত্যাগ করেন। ইনি বিদ্যোৎসাহ ও পুণ্য-কীর্ত্তির জন্য বিখ্যাত ছিলেন। সুপণ্ডিত জয়দেব, তর্কবিশারদ রামকৃষ্ণ, দিব্যসিংহ, অনন্তরাম, লক্ষ্মীনারায়ণ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণ ইঁহার রাজসভার অলঙ্কার ছিলেন।

রাণী সর্ব্বাণী প্রথমে সূর্য্যকান্ত নামে একটি দত্তক রাখিয়াছিলেন। সেই দত্তক বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে কিয়ৎপরিমাণে কার্য্যভার তাহাকে দিয়াছিলেন। সূর্য্যকান্ত ও তাহার স্ত্রীপুত্র ক্রমে ক্রমে গত হইলে রাণী সর্ব্বাণী চন্দ্রকান্ত নামে আর এক দত্তক রাখিয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে সে দত্তকও সত্যবতী নাম্নী তের বৎসর বয়স্কা এক পত্নী রাখিয়া অকালে গতায়ু হইল। চন্দ্রকান্ত দত্তক রাখিতে অনুমতি দিয়াছিলেন। রাণী সর্ব্বাণী মনস্থ করিয়াছিলেন যে তিনি নিজে আর দত্তক রাখিবেন না, পুত্রবধূর দত্তক রাখিলেই বংশরক্ষা হইতে পারিবে। কিন্তু চন্দ্রকান্তের মৃত্যুর তিন মাস মধ্যেই অষ্টাশীতি বর্ষ বয়সে রাণী সর্ব্বাণীর অভাব হইল। রাজা রামজীবন সেই সংবাদ পাইবামাত্র রঘুনন্দনকে জানাইলেন। রঘুনন্দন নবাব নাজিমের নিকট গিয়া জনাইলেন যে, "সাঁতোড়ের মহারাণী সর্ব্বাণী ওয়ারিশ না রাখিয়া গত হইয়াছেন, তাঁহার বিস্তীর্ণ জমিদারী আমাদের বাড়ীর অতি নিকট। ঐ জমিদারী সমস্ত অথবা কিয়দংশ আমাদিগকে দিলে আমাদের স্বদেশে সম্পত্তি লাভ হয়। ঐ জমিদারীর জন্য অন্য কেহ যে পরিমাণ নজর সেলামী দিবে, আমরা তাহা অপেক্ষা ১০১৲ টাকা বেশী দিব।" শাহজাদা অমনি সমস্ত সাঁতোড় রাজ্য রামজীবনকে দিয়া তাঁহার নামজারী জন্য নবাব দেওয়ানের নামে পরোয়াণা পাঠাইলেন এবং রাজা রামজীবনের নামে বাইশ পরগণা জমিদারীর সনন্দ দিলেন। রামজীবন সেই সনন্দ পাইয়া লোক লস্কর লইয়া সাঁতোড়ে উপস্থিত হইলেন।

কাশীমপুরনিবাসী গুরুগোবিন্দ শর্ম্ম চৌধুরী * এবং বেলঘরিয়া নিবাসী গুণাকর রায় গুপ্ত এই দুই জন রাণী সর্ব্বাণীর প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। রাণী মৃত্যুকালে তাঁহার বালিকা পুত্রবধূর অভিভাবকরূপে সমস্ত সম্পত্তি রক্ষার ভার তাঁহাদের উপর ন্যস্ত করিয়াছিলেন। গুণাকর রায় নাবালিকা রাণী সত্যবতীর নামজারী জন্য ঢাকা গিয়াছিলেন, এমন সময়ে রাজা রামজীবন সসৈন্যে সাঁতোড়ে উপস্থিত হইলেন। গুরুগোবিন্দ স্বয়ং রাজা রামজীবনের সহ সাক্ষাৎ করিলেন এবং সত্যবতীর বিদ্যমানে জমিদারী ওয়ারিশ হীন নহে ইহা জানাইয়া রামজীবনকে ব্রহ্মস্ব হরণে নিষেধ করিলেন। রামজীবন

* কেহ কেহ ইঁহার নাম রামদেব চৌধুরী বলেন। ইনি হরিপুরনিবাসী বারিষ্টার শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরীর পূর্ব্বপুরুষ।

কহিলেন, "সত্যবতীর বিদ্যমান থাকা আমরা কেহ অবগত ছিলাম না। আর পুত্রবধূ শাস্ত্রমত উত্তরাধিকারী নহে, কেবল ভরণপোষণ পাইতে পারে মাত্র। আমি সত্যবতীকে সসম্মানে পালন করিতে সম্মত আছি। এখন নবাব দেওয়ানের যেরূপ দৌরাত্ম্য তাহাতে জমিদারী রক্ষা করা সত্যবতীর সাধ্য নহে। আমার ভ্রাতা নাজিমের রায় রাইয়াঁ সেই জন্য আমি জমিদারী রক্ষা করিতে সাহস করি।" দুইদিন তর্ক বিতর্ক হইবার পর এইরূপ সন্ধি হইল যে, "রাণী সত্যবতী যাবজ্জীবন সাঁতোড় নগরটি নিষ্কররূপে দখল করিবেন এবং রাজা রামজীবনের নিকট হইতে বার্ষিক ১২,০০০৲ টাকা ভাতা পাইবেন। গুরুগোবিন্দ চৌধুরী পরগণা কাশীনপুর জমিদারী স্বত্বে প্রাপ্ত হইবে। অবশিষ্ট সমস্ত জমিদারী রামজীবন পাইবেন। রাণী সত্যবতী দত্তক রাখিতে পারিবেন না।" এই সন্ধি মতে সমস্ত কার্য্য হইতে লাগিল। ইতিমধ্যে গুণাকর ফিরিয়া আসিলেন।

ভাতুড়ীরাজ্যে পাঠানদের যেরূপ আধিপত্য ছিল সান্যালরাজ্যে কায়স্থদিগের তদপেক্ষা বেশী ছিল। পাঠানেরা মূর্খ ও উগ্রস্বভাব ছিল সুতরাং সৈনিক কার্য্য ভিন্ন অন্য কোন কার্য্য করিতে পারিত না। পক্ষান্তরে, সাঁতোড়ের কায়স্থগণ মধ্যে অনেকে বিদ্বান ও বুদ্ধিমান ছিল। রাজকীয় অধিকাংশ উচ্চপদে তাহারা নিযুক্ত ছিল। এজন্য তাহারা পাঠানদের তুল্য বীর না হইলেও সান্যালরাজ্যে তাহাদের প্রাধান্য প্রচুর বেশী ছিল। তাহাদের প্রভুভক্তিও খুব বেশী ছিল। গুরুগোবিন্দ চৌধুরী কৃত সন্ধি তাহাদের মনোমত হইল না। এই সন্ধি সাঁতোড়ের সান্যালদিগেরও মতের বিরুদ্ধ ছিল। গুণাকর রায় প্রত্যাগমন করিলে সান্যালগণ ও কায়স্থগণ গুরুগোবিন্দ কৃত সন্ধি স্বার্থপরতামূলক বলিয়া দোষারোপ করিলেন এবং তাঁহারা সান্যাল-রাজত্ব রক্ষার্থ প্রাণপণ করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন। সাঁতোড়ের সান্যালদিগের, কায়স্থদিগের এবং প্রজা ও ভৃত্যদিগের ঐক্যতায় গুণাকর সন্ধি ভঙ্গ করিয়া যুদ্ধের আয়োজন করিলেন। রঘুনন্দন সেই সংবাদ পাইয়া নবাব নাজিমের নিকট হইতে ৬০০ ছয়শত সুশিক্ষিত সৈন্য লইয়া জ্যেষ্ঠের সাহায্যার্থ পাঠাইলেন। গুণাকর অসাধারণ বুদ্ধিমান ছিলেন কিন্তু বীরপুরুষ ছিলেন না। রাজারাম সান্যাল প্রমুখ সান্যালগণ এবং সুন্দরসিংহ প্রমুখ কায়স্থগণ

প্রাণপণে যুদ্ধ করিল। কিন্তু বীরত্ব অভ্যাসমূলক। সাঁতোড়ের সেনা মধ্যে কেহ যাবজ্জীবন যুদ্ধ করে নাই বা দেখে নাই। যুদ্ধকার্য্য রামজীবনের সেনার অভ্যস্ত বিদ্যা সুতরাং তাহারা জয়ী হইয়া প্রাচীর ভগ্ন করিয়া নগরে প্রবেশ করিল। গুণাকর পূর্ব্বেই যুদ্ধের ফল বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তিনি গুপ্তপথে রাণী সত্যবতীকে লইয়া পলায়ন করতঃ শান্তিপুরে রাণীর মাতুলালয়ে গেলেন। সান্যালেরা কয়েকটি পলায়ন করিয়া বিক্রমপুর ও মুলচরে গিয়া বাস করিলেন। বিক্রমপুরে বা তন্নিকটে নাটোরের কোন এলাকা ছিল না। সাঁতোড়ের সান্যালেরা এই স্থানে চক্রবর্ত্তী উপাধি ধারণ করিয়া যাজনিক ব্যবসায় দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিতেন। কিন্তু তাঁহারা প্রধান কুলীন জন্য বহুদিন ঐ ভাবে থাকিতে হয় নাই। তাঁহাদের সন্তানেরা রাজা জমিদারের কন্যা বিবাহ করিয়া নানা স্থানে গিয়া বাস কবিয়াছে। যাঁহারা এখনও বিক্রমপুরে আছেন তাঁহারাও সঙ্গতিপন্ন হওয়ায় যাজনিক ব্যবসায় করেন না। যে সকল সান্যাল রামজীবনের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল, তিনি তাহাদের প্রতি তর্জ্জন্য গর্জ্জন ভিন্ন আর কোন দণ্ড করেন নাই। কিন্তু যাহারা শূদ্র ও মুসলমান হইয়াছিল, রামজীবন তাহাদের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়াছিলেন এবং অনেকেরই প্রাণদণ্ড করিয়াছিলেন। সাঁতোড়ের জমিদারী বাইশ পরগণা মধ্যে কেবল কাশীমপুর পরগণা গুরুগোবিন্দ চৌধুরী পাইল অবশিষ্ট সমস্তই নাটোররাজ্য ভুক্ত হইল। সুতরাং স্বদেশেও রামজীবনের প্রকাণ্ড সম্পত্তি হইল। তাহার পর তিনি ভাদুড়ীরাজ্য আত্মসাৎ করিতে চেষ্টিত হইলেন।

এ দিকে গুণাকর রায় রাণী সত্যবতীকে মাতুলালয়ে রাখিয়া তিন হাজার টাকা মাত্র সম্বল লইয়া সম্রাটের নিকট অভিবাদ করিতে চলিলেন। সম্রাট ঔরংজীব তখন দাক্ষিণাত্যে ঔরঙ্গাবাদে ছিলেন। গুণাকর একাকী তথায় চলিলেন। পথে মহারাষ্ট্রদের লুণ্ঠনের ভয় ছিল। এজন্য গুণাকর অতি অল্পমাত্র টাকা রাখিয়া বাকি টাকার মোহর খরিদ করিয়া কোমরে বাঁধিলেন এবং বৈরাগী বেশে পদব্রজে ঔরঙ্গাবাদে উপনীত হইলেন। তথায় ঝিঙ্গনলাল নামে এক মুদী সম্রাটের খাদ্য দ্রব্যাদি যোগাইত। ঝিঙ্গনলালের দোকানেই গুণাকর বাসা করিলেন।

সম্রাট ঔরংজীব নামান্তরে আলমগীর অসাধারণ লোক ছিলেন। একদিকে তাঁহার অনেক গুরুতর দোষ ছিল, অন্যদিকে বহুবিধ উচ্চতম গুণ ছিল। আলমগীর স্বার্থপর, মিথ্যাবাদী, প্রবঞ্চক, বিশ্বাসঘাতক, নিষ্ঠুর, পিতৃদ্রোহী ও ভ্রাতৃঘাতক ছিলেন। তাঁহার গোঁড়ামি এবং বিধর্ম্মীদিগের প্রতি অত্যাচার হেতুই মোগল সাম্রাজ্য অচিরে ধ্বংস হইল। পক্ষান্তরে, তিনি বিদ্বান্, বুদ্ধিমান, সাহসী, কার্য্যদক্ষ, পরিশ্রমী, মনোযোগী, গুণগ্রাহী, মিতব্যয়ী ও মিতাচারী ছিলেন। অন্যান্য সম্রাটদিগের নিকট কোন দরখাস্ত করিতে হইলে আমলাবর্গকে প্রচুর ঘুষ দিতে হইত নতুবা কোন দরখাস্ত সম্রাটের পরিজ্ঞানে পৌঁছিত না। কিন্তু আলমগীর কোন বিষয়েই পরপ্রেক্ষী ছিলেন না। ডাক-বাক্সের ন্যায় তাঁহার এক সিন্দুক ছিল। তাহার উপরে ছিদ্র ছিল। তিনি সেই সিন্দুকের তালাবন্ধ করিয়া চাবি নিজে রাখিতেন। যে কেহ ইচ্ছা সেই সিন্দুক মধ্যে নিজ দরখাস্ত ফেলিয়া দিতে পারিত। সম্রাট স্বয়ং সিন্দুক খুলিতেন, সমস্ত দরখাস্ত নিজে পড়িতেন এবং যাহা যোগ্য হুকুম দিতেন। তিনি কাহারও উপর নির্ভর করিতেন না। সুতরাং আমলা-দিগকে ঘুষ দিবার কোন প্রয়োজন হইত না।

গুণাকর রাণী সত্যবতীর পক্ষ হইতে অভিবাদ করিয়া জানাইলেন যে,— "সাঁতোড় বহুদিনের পুরাতন রাজ্য। এই রাজবংশ বরাবর মোগল সাম্রাজ্যের একান্ত অনুগত থাকিয়া পুরস্কার ও প্রশংসা-পত্র পাইয়াছেন। এখন অধীনী (রাণী সত্যবতী) সাঁতোড় রাজ্যের একমাত্র উত্তরাধিকারিণী। বাদশাহজাদা আজিম ওশ্মানের রায় রাইয়াঁ রঘুনন্দন রায় সাহেব বাদশাহজাদার নিকট মিথ্যা প্রবঞ্চনা করিয়া সাঁতোড় রাজ্য বেওয়ারিশ প্রকাশে নিজ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামজীবন নামে সনন্দ লইয়া বলপূর্ব্বক সাঁতোড় রাজ্য দখল করিয়াছে। রঘুনন্দনের কৌশলে নবাব দরবারে অধীনীর নালিশ কার্য্যকারী হইবে না জানিয়া হুজুরালির শ্রীচরণে অভিবাদ করিলাম। অধীনী নিঃসহায়, নাবালিকা ও বিধবা। অধীনীর দত্তক রাখিবার অনুমতি আছে। ধর্ম্মাবতার কৃপা করিয়া অধীনীর হৃতসম্পত্তি পুনরায় দখল দিতে হুকুম প্রকাশে আজ্ঞা হয়।"

বাদশাহী আমলে কোন কোর্ট ফি ছিল না। সম্রাট আলমগীরের আমলে কোন আমলাকে কিছু দিতে হইত না। সুতরাং অভিবাদ দাখিল করিতে

এক পয়সাও ব্যয় হইল না। সম্রাট নিজেই দরখাস্ত পাঠ করিলেন এবং বাঙ্গালার নবাব নাজিম ও নবাব দেওয়ানের নিকট অভিবাদের সত্য ও সুস্পষ্ট কৈফিয়ৎ তলব করিলেন। হুকুম লেখা হইলে সম্রাট গুণাকরকে ডাকিয়া কহিলেন, "তুমি যে দরখাস্ত করিয়াছ আমি তাহার বৃত্তান্ত জানার জন্য সরকারী কৈফিয়ত তলব করিলাম। তুমি এক মাস পর হাজির হইও, কৈফিয়ত আসিলে উভয় পক্ষের প্রমাণ লইব। কিন্তু সাবধান, দরখাস্ত মিথ্যা হইলে কঠিন দণ্ড দিব।" গুণাকর পাঁচ মোহর দিয়া কুর্ণিশ করিলেন। সম্রাট মোহর ফেরত দিয়া কহিলেন, "আমি বিচার বিক্রয় করি না। তুমি আদিষ্ট হইলে হাজির হইও।" গুণাকর কহিলেন, "অধীনের বাড়ী বহুদূর, এই এক মাস আমি এখানেই থাকিব। আমার অন্য কোন কাজ নাই, সুতরাং প্রত্যহ শ্রীচরণ দর্শন করিব।" গুণাকর কৈফিয়ত আসা সাপেক্ষে ঝিঙ্গনের দোকানেই থাকিলেন।

কয়েক দিন পর বাদশাহের খাবাস (অর্থাৎ তাম্বুলপাত্র-বাহক বা কঞ্চুকী) তৃতীয় প্রহর বেলার সময় ঝিঙ্গনের দোকানে আসিয়া একখানা পারসী হাতচিঠা দিল। ঝিঙ্গন পারসী জানিত না। সে চিঠি পড়িবার জন্য গুণাকরের হাতে দিল। গুণাকর চিঠি পাঠ করিয়া বাহককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি কাজ কর?" সে কহিল, "আমি বাদশাহের খাবাস।" গুণাকর পুনরায় কহিলেন, "এই চিঠি লিখিবার পূর্ব্বে বাদশাহ মুখ হইতে পান ফেলিয়া দিয়াছেন?" খাবাস কহিল, "হাঁ।" গুণাকর কহিলেন, "তুমি আধসের ঘৃত খাও, যদি শুদ্ধ ঘৃত খাইতে না পার তবে চিনি ও তেঁতুল মিশ্রিত করিয়া খাও।" খাবাস জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি এইরূপ বলিতেছেন কেন?" গুণাকর কহিলেন, "এই চিঠি মতে এক পোয়া চূণ লইয়া গেলে বাদশাহ তোমাকে সেই চূণ খাইতে বাধ্য করিবেন। তুমি যদি পূর্ব্বে আধসের ঘৃত খাও তবে তোমার বেশী কোন অনিষ্ট হইবে না। নতুবা চূণ খাইয়া তুমি মারা পড়িবে অথবা গুরুতর কষ্ট পাইবে।" ঝিঙ্গন ও খাবাস চমৎকৃত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি ইহা কিরূপে জানিলেন।" গুণাকর কহিলেন, "আমি এই দোকানে থাকিয়া দেখিয়া শুনিয়া জানি যে বাদশাহ কখন নিজ হাতে মুদী দোকানে চিঠি লিখেন না এবং তাহা সম্ভবও নহে। কিন্তু এই চিঠিখানি

বাদশাহের নিজ হাতে লেখা। এক পোয়া চূণের জন্য সম্রাটের স্বহস্তের চিঠি দেখিয়াই আমার সন্দেহ হইল। তাহার পর যখন খাবাসকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে বাদশাহ মুখের পান ফেলিয়া দিয়াছেন তখনই বুঝিলাম যে পানে চূণ বেশী হইয়াছিল। তাহাকে দণ্ড দিবার জন্য বাদশাহ এই ফরমাইস করিয়াছেন।” ঝিঙ্গন ও খাবাস সেই কথা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিল না, তথাপি ঘৃত পানে কোন ক্ষতি নাই জানিয়া খাবাস তাহা পান করিয়া চূণ লইয়া বাদশাহের নিকট উপস্থিত হইল। বাদশাহ অমনি সেই চূণ তাহাকে খাইতে বাধ্য করিলেন। খাবাস সেই চূণ খাইল কিন্তু ক্ষণকাল পরেই বমন হইয়া ঘৃত ও চূণ নির্গত হইল। খাবাসের কোন অনিষ্ট হইল না। তখন খাবাস গুণাকরের কথা স্মরণ করিয়া হাসিল। বাদশাহ ক্রুদ্ধ হইয়া খাবাসের হাস্যের কারণ জিজ্ঞাসা করায় গুণাকরের গুণ প্রকাশ হইল।

আলমগীর গুণাকরকে তলব করিলেন। গুণাকর সম্রাটের নিকট উপস্থিত হইবামাত্র তিনি তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন। অল্পকাল আলাপ করিয়াই তিনি গুণাকরের বিদ্যাবুদ্ধি বুঝিতে পারিলেন এবং তাঁহাকে এলাহাবাদের ফৌজদারী দিতে চাহিলেন। গুণাকর অবনত মস্তকে সেলাম করিয়া কহিলেন, “জনাবালি! আমি রাণী সত্যবতীর কার্য্যোদ্ধার না করিয়া অন্য কোন কাজ করিতে পারি না। এ বিষয়ে অধীনকে মার্জ্জনা করিবেন।” সম্রাট লোভ দেখাইলেন, ভয় দেখাইলেন, কিন্তু কিছুতেই গুণাকরের মতি বিচলিত হইল না। তখন সম্রাট তুষ্ট হইয়া কহিলেন, “আমি তোমার বিদ্যাবুদ্ধি অপেক্ষা তোমার প্রভুভক্তির জন্য প্রশংসা করি। এই গুণের জন্যই আমার পূর্ব্ব পুরুষেরা হিন্দুর অনুরক্ত হইয়াছিলেন।” বাদশাহ গুণাকরকে একখানা কিরিচ এবং স্বহস্ত নির্ম্মিত এক টুপী পুরস্কার দিয়াছিলেন। সেই টুপী ও কিরিচ ধারণ করিয়া গুণাকর যে কোন স্থানে যাইতেন সেখানেই সম্মানিত হইতেন। সকলের পক্ষেই বাদশাহী পুরস্কারের এই ফল ছিল।

আলমগীর যাহার নিকট কৈফিয়ত তলব করিতেন, সে মিথ্যা লিখিতে বা গৌণ করিতে সাহসী হইত না। সত্যবতীর সম্বন্ধে নবাব নাজিম লিখিলেন যে, —“রাণী সর্ব্বাণীর পুত্রবধূ জীবিত থাকা আমি জানিতাম না। হিন্দুশাস্ত্রমতে পুত্রবধূ দায়াদ নহে এবং শরা মহম্মদী মতেও দায়াদ নহে। সুতরাং সাঁতোড়ের

প্রকাণ্ড জমিদারীতে উপযুক্ত কোন ব্যক্তিকে জমিদার করা প্রয়োজন হইয়াছিল। আমার বিবেচনায় রাজা রামজীবন সর্ব্বাপেক্ষা সুদক্ষ জমিদার। দেওয়ানজীর কঠিন নিয়মানুযায়ী মালগুজারী আদায় করা সত্যবতীর ন্যায় বালিকার সাধ্য নহে। রামজীবন একশত পরগণার মালগুজারী যথাসময়ে চালাইতেছে। এমন কি যে সকল মহালের মালগুজারী সংস্থা নাই বলিয়া নিলাম হয় রামজীবন তাহাও খরিদ করিয়া রীতিমত রাজস্ব দেয়। রামজীবন হুজুরালির পুরস্কারপ্রাপ্ত অতি বিশ্বাসী ও কার্য্যদক্ষ ভৃত্য। এই জন্য সাঁতোড়ের জমিদারী রাজা রামজীবন রায়কে দিয়াছি। সত্যবতীকে খোরপোষ দিতে রামজীবন সম্মত আছে। রাণী সর্ব্বাণীর দেওয়ান গুরুগোবিন্দ রামজীবনের চাকরী করিতেছে। গুণাকর প্রার্থনা করিলে তাহাকে রামজীবন চাকরী দিতে সম্মত আছে এবং আমি নিজের অধীনেও তাহাকে চাকরী দিতে পারি। ফলতঃ, সাঁতোড়রাজ্য রামজীবনকে দেওয়ায় সকলেরই মঙ্গল হইয়াছে, কাহারও কোন অনিষ্ট হয় নাই।"

নায়েব দেওয়ান কৈফিয়ত দিলেন যে,—"সাঁতোড়ের রাজারা বরাবর সরকারী হিতার্থী ও অনুগত প্রজা ও ভৃত্য। তাহাদের কোন অপরাধ নাই এবং মালগুজারীও বাকি পড়ে নাই। রাণী সত্যবতী তাহার শাশুড়ীর উত্তরাধিকারিণী নহে নিজ স্বামীর উত্তরাধিকারী। রাণী সর্ব্বাণী কেবল নাবালক দত্তক পুত্রের অভিভাবিকা রূপে জমিদারী চালাইতেছিলেন মাত্র; প্রকৃত মালিক রাজা চন্দ্রকান্তই ছিলেন। সত্যবতী শাস্ত্র ও শরা উভয় মতেই প্রকৃত দায়াদ বটে। তাহাকে বঞ্চিত করা সঙ্গত নহে। আর রামজীবনকে এত বেশী জমিদারী দেওয়া উচিত নহে। সীতারাম আঠার পরগণার মালিক হইয়া প্রবল বিদ্রোহী হইয়াছিল, এখন রামজীবনের জমিদারী তাহার সাতগুণ হইয়াছে। সুতরাং ভাবী আশঙ্কার বিষয় বটে।"

সম্রাট উভয়ের কৈফিয়ত স্বয়ং পড়িলেন। সীতারাম রায়ের বিদ্রোহ সম্বন্ধে নাজিম যে কৈফিয়ত দিয়াছিলেন তাহাও পাঠ করিলেন এবং হুকুম লিখিলেন যে—

(১) রাণী সত্যবতীকে সাঁতোড়ের বাইশ পরগণা জমিদারী পুনরায় দখল দিতে হইবে। গুণাকর রায়কে উক্ত রাণীর অভিভাবক ও সরবরাহকার নিযুক্ত করা গেল। তাঁহার দ্বারা রাণীর সমস্ত কার্য্য উত্তমরূপে চলিতে পারিবে।

(২) সীতারাম রায়ের ওয়ারিশদিগকে তাহাদের পৈতৃক আঠার পরগণা ফেরত দিতে হইবে। কিন্তু তৎপূর্ব্বে বন্দোবস্ত মত মালগুজারী আদায়ের কবুলীয়ত লইতে হইবে।

(৩) দেওয়ান সাহেব জমিদারগণের প্রতি নিষ্ঠুর দণ্ড করিতে ক্ষান্ত হইবেন। মালগুজারী বাকি পড়িলে জমিদারের জমিদারী ক্রোক বা নিলাম করিয়া টাকা আদায় করিবেন। তদ্ভিন্ন অন্যান্য সম্পত্তি ধরিবেন না। আর কোন শারীরিক দণ্ড বা অপমান করিবেন না। *

(৪) জমিদারীর সুমার জমার ⅙ ষষ্ঠাংশ জমিদারের মুনাফা এবং ⅒ দশমাংশ তহশীল খরচা বাবত রাখিয়া বাকি টাকা মালগুজারী ধার্য্য করিবেন। কদাচ তদতিরিক্ত জমা ধার্য্য করিবেন না।

(৫) পুরাতন জমিদারদিগকে সহসা নষ্ট করিবেন না।

সেই হুকুমনামার নকল নাজিমকে এবং দেওয়ানকে পাঠান হইল এবং এক খানা নকল গুণাকরকেও দেওয়া হইল। গুণাকর ষোল মোহর নজর দিয়া কুর্ণিশ করিলেন। এবার নজর গৃহীত হইল। গুণাকর রাণী সত্যবতীকে এবং বিক্রমপুরে লক্ষ্মীকান্ত সান্যালকে ডাকে চিঠি লিখিলেন এবং স্বয়ং সত্বর হইয়া দেশে রওনা হইলেন। বাদশাহী ডাক খুব শীঘ্র চলাচল করিত। রাণী সত্যবতী এক সপ্তাহ মধ্যেই গুণাকরের চিঠি পাইয়া আহ্লাদে গদগদ হইলেন এবং উৎকণ্ঠিত চিত্তে গুণাকরের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। গুণাকরের হাতে প্রচুর টাকা না থাকায় তিনি গাড়ী পাল্কীর ডাক বসাইয়া আসিতে পারিলেন না। দ্রুত ঘোড়া চালাইতে গুণাকর জানিতেন না। তাঁহার দেশে আসিতে প্রচুর গৌণ হইল।

* পূর্ব্বে জমিদার-নির্য্যাতনের জন্য যে 'বৈকুণ্ঠের' উল্লেখ হইয়াছে তাহা 'তারিখ বাঙ্গালা' ও 'রিয়াজ-উস্-সালাতিন' নামক পারসী গ্রন্থে বর্ণিত আছে। তাহা হইতেই যথাক্রমে গ্লাডউইন, স্কট ও গ্রান্ট গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় 'মুর্শিদাবাদ-কাহিনী' সঙ্কলনে বলিয়াছেন যে, ইহার স্থান 'বর্ত্তমান কেল্লার দক্ষিণ তোরণদ্বারের সম্মুখে' নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'বৈকুণ্ঠের' কথা সর্ব্বৈব মিথ্যা। রাজসাহী প্রদেশে কিন্তু ইহার জনশ্রুতি এখনও প্রবল। যাহা হউক, তখন যে জমিদারবর্গ বিশেষ উৎপীড়িত হইতেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

এদিকে রঘুনন্দন বাদশাহী হুকুম জানিয়া অতিশয় চিন্তিত হইলেন। রাণী সত্যবতীর ও সীতারামের জমিদারী প্রত্যর্পিত হইলে, নাটোরের জমিদারীর সারাংশ বাহির হইয়া যায় দেখিয়া রঘুনন্দন ধর্ম্মজ্ঞান পরিত্যাগ করিয়া প্রতিকার চেষ্টা করিলেন। তাঁহার নিকট প্রচুর পুরস্কার পাইয়া রাণী সত্যবতীর মাতুল বিষপ্রয়োগে সত্যবতীকে বিনাশ করিলেন। রাজা রামজীবন সীতারামের পুত্রদিগকে ধরিয়া আনিয়া নাটোরে আটক করিয়া রাখিলেন। গুণাকর দেশে আসিয়া শুনিলেন রাণী সত্যবতী ভেদ-বমি হইয়া মরিয়াছেন। তখন গুণাকর রাজবংশের দুরবর্ত্তী জ্ঞাতি লক্ষ্মীকান্ত সান্ন্যালকে আনিয়া রাজা করিতে চেষ্টা করিলেন। রামজীবন পথিমধ্যে তাঁহাকে ধৃত করিয়া নানারূপ ভয় দেখাইলেন এবং স্বপক্ষ করিবার জন্য বহু অনুরোধ করিলেন, অবশেষে পৈতা দ্বারা গুণাকরের হাত জড়াইলেন। তখন গুণাকর বশীভূত হইলেন। রামজীবন অমনি গুণাকরকে নিজের দেওয়ান নিযুক্ত করিলেন। গুণাকর রামজীবনের বশ্য হইলেই সাঁতোড়ের জমিদারী সম্বন্ধে আর রামজীবনের কোন চিন্তা থাকিল না। এদিকে সীতারামের পুত্রেরা আলমগীর বাদশাহের মৃত্যু পর্য্যন্ত নাটোরে আটক থাকিল। তাহারা জমিদারীর প্রার্থী হইয়া কবুলীয়ত দিতে পারিল না। সুতরাং তাহাদিগকেও কিছুই দিতে হইল না। বাদশাহের আদেশে নবাব দেওয়ানের রাজস্ব আদায়ের কঠোরতা কম হইল। সুবিজ্ঞ গুণাকরের কৃত বন্দোবস্তে নাটোরের রাজকার্য্য অতি সুচারুরূপে চলিতে লাগিল। এই সময়ই রামজীবনের জীবনকালে সর্ব্বসুখময় সময়। *

---

* অনেকে বাহারবন্দের রাণী সত্যবতী এবং সাঁতোড়ের রাণী সত্যবতীকে এক ব্যক্তি বিবেচনা করিয়া বিবিধ ভ্রমে পতিত হন। প্রকৃত পক্ষে বাহারবন্দের রাণী সত্যবতী পৃথক ব্যক্তি এবং প্রায় একশত বৎসরের পরবর্ত্তী লোক।

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

রামজীবনের একটাকিয়ার জমিদারী ক্রয়।—রামজীবন সহ রূপেন্দ্রের সন্ধির চেষ্টা।—উভয়ের যুদ্ধোদ্যম।

নবাব দেওয়ানের কাচারীতে যখন বাকি মালগুজারীর দায়ে জমিদারী তালুকদারী নিলাম হইত, তখন রায় রঘুনন্দন রায় রাইয়াঁ নবাব নাজিমের আট জন চোপদার সহ উপস্থিত থাকিতেন। তিনি যে নিলাম ডাকিতে আরম্ভ করিতেন অন্য কেহ তাহা ডাকিতে সাহসী হইত না। এজন্য তিনি স্বল্প মূল্যে জমিদারী তালুকদারী ক্রয় করিতে পারিতেন। একটাকিয়ার পরগণা কালীগাঁও ও প্রতাপবাজু বাকি মালগুজারীর জন্য নিলাম হইলে অমনি রঘুনন্দন তাহা স্বল্প মূল্যে রামজীবনের নামে খরিদ করিলেন। রাণী পূর্ণিমা সেই সংবাদ শুনিয়া গোকুল ও গৌরচন্দ্রকে ডাকিয়া গৌরকে এক ভিক্ষার করঙ্গ এবং গোকুলকে এক ঝারী ও গামছা পুরস্কার দিলেন। তাঁহারা সেই তিরস্কারের অর্থ বুঝিলেন যে একটাকিয়ার রাজ্য ধ্বংশ হইলে গৌর ভিক্ষা করিবেন এবং গোকুল পরিচারক হইবেন। উভয়ে লজ্জিত হইয়া অধোমুখে বলিলেন, "যাহার সম্পত্তি সে নষ্ট করিলে আমাদের সাধ্য কি?" ছোট রাণী সক্রোধে বলিলেন, "যেমন ভবচন্দ্র রাজা তেমনি গবচন্দ্র মন্ত্রী! সুপুরুষেরা সম্পত্তি বৃদ্ধি করে আর কাপুরুষেরা পৈতৃক সম্পত্তিও রক্ষা করিতে পারে না। যাও, আমার অলঙ্কারগুলি বিক্রয় করিয়া টাকা লইয়া নাটোরে যাও এবং রাজা রামজীবনের হাতে পায়ে ধরিয়া জমিদারী ফেরত লও। যদি সম্পত্তি থাকে তবে আবার অলঙ্কার হবে, যদি না হয় তাহাতেও ক্ষতি নাই। যদি সম্পত্তি না থাকে তবে ভিখারিণীর অলঙ্কার বিড়ম্বনা মাত্র।" এই বলিয়া সমস্তগুলি অলঙ্কার তাঁহাদের সম্মুখে ফেলিয়া দিলেন এবং দুইটি বাটীতে চূণ ও কালী রাখিয়া কহিলেন, "ইহাই রাজার গালে দিও।" উভয়ে অপ্রস্তুত হইয়া মাথা হেঁট করিয়া অশ্রুমুখে কহিলেন, "রাজার গালে

চুণকালী আপনি দিবেন। আমরা চলিলাম, বিক্রীত সম্পত্তি উদ্ধার না করিয়া আর মুখ দেখাইব না।” রূপেন্দ্র মন্ত্রীদের নিকট এবং ছোট রাণীর নিকট তিরস্কৃত হইয়া গম্ভীর হইলেন এবং সম্পত্তি উদ্ধারার্থ একান্ত চেষ্টিত হইলেন। নিলামী মূল্য দিয়া রামজীবনের নিকট জমিদারী পুনরায় পাওয়ার জন্য রামনাথ বাগছিকে পাঠান হইল। রামজীবন ইতস্ততঃ করিয়া সম্মত হইলেন না। তখন রূপেন্দ্র বাহুবলে নিজ দখল বাহাল রাখিলেন। রামজীবনের সেনা বেশী ছিল কিন্তু একটাকিয়ার দুর্দ্দান্ত পাঠানের সমক্ষে তাহারা দাঁড়াইতে পারিল না। দুই বৎসর কাল রামজীবন মালগুজারী দিলেন কিন্তু জমি দখল করিতে পারিলেন না। তখন রামজীবন প্রস্তাব করিলেন যে, “যদি খাঁ সাহেব আমার নিলামী মূল্য, মালগুজারীর টাকা মায় সুদ ও অপর খরচা বুঝিয়া দেন তবে আমি নিলাম খরিদা স্বত্ব ছাড়িয়া দেই।” রূপেন্দ্র কেবল মূল্য ও রাজস্বের টাকা দিতে সম্মত হইলেন আর কিছুই দিতে স্বীকার করিলেন না। ইহাতে উভয় পক্ষ মধ্যে ঘোরতর শত্রুতা উপস্থিত হইল। যাবৎ রূপেন্দ্রের মৃত্যু ও ভাদুড়ীরাজ্য ধ্বংস না হইয়াছিল তাবৎ সেই বিবাদ অবিশ্রান্ত প্রবল বেগে চলিয়াছিল।

রামজীবন একটাকিয়ার জমিদারী খরিদ করিয়া মহা বিপদে পড়িলেন। তিনি রাজস্ব না দিলে নবাব দেওয়ান দণ্ড করেন সুতরাং কিস্তী কিস্তী মালগুজারী দিতে তিনি বাধ্য ছিলেন অথচ তিনি জমি দখল করিতে পারিলেন না। তিনি বৈরনির্য্যাতন জন্য নানাবিধ উপায় চেষ্টা করিলেন। জাগীর ভাদুড়ীয়ার মালগুজারী ও নর্ম্মা ঢাকায় যাইতে ছিল, রামজীবন পথিমধ্যে তাহা লুঠ করিয়া লইলেন। যথা সময় মধ্যে মালগুজারী দাখিল না হওয়ায় চাকলে ভাদুড়িয়া নিলাম হইল। অমনি রঘুনন্দন স্বল্প মূল্যে তাহা জ্যেষ্ঠের নামে ক্রয় করিলেন। গোকুল আহারান্তে আচমন করিতে যাইতেছিলেন সেই সময়ে ভাদুড়িয়ার নিলাম সংবাদ পাইয়া একবারে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। ইটের উপর পতিত হওয়ায় শরীরের নানাস্থানে আঘাত লাগিল এবং মাথায় এক স্থানে ক্ষত হইয়া রক্তপাত হইল। আত্মীয় ও অনুচরগণ ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে শয্যায় শোয়াইয়া নানারূপ সেবা শুশ্রূষা করাতে তাঁহার চৈতন্য হইল।

রাজা রূপেন্দ্র নারায়ণ উপপত্নীগণ লইয়া প্রমোদ উদ্যানে আমোদ করিতে ছিলেন, এমন সময়ে ভাদুড়ীচক্র নিলাম ও গোকুলের মূর্চ্ছা সমাচার পাইলেন। তিনি অমনি খালি গায় খালি পায় দৌড়িয়া গিয়া জীন লাগাম পরিশূন্য ঘোড়ার উপর লম্ফ দিয়া উঠিলেন এবং নক্ষত্রবেগে গোকুলের বাড়ীতে পৌঁছিলেন। গোকুল তখন ক্ষত স্থানে জলপটী দিয়া তাকিয়া হেলান দিয়া বসিয়া ছিলেন। তিনি রাজাকে দেখিয়া উঠিতে পারিলেন না, কেবল হাত তুলিয়া প্রণাম করিলেন এবং বলিলেন, "পদধুলি দিন্।"

রামদয়াল পালঙ্গের উপর গদী পাড়িয়া তদুপরি মখমলের তাকিয়া প্রভৃতি সাজাইল। খাঁ সাহেব তদুপরি বসিলেন। ভৃত্যেরা পা ধোয়াইয়া দিল, কেহ তামাক দিল, কেহ বাতাস দিতে লাগিল। রূপ খাঁ ঈষৎ স্থূলকার যুবা পুরুষ। গ্রীষ্মকালে মধ্যাহ্নসময়ে খালি গায় আধক্রোশ যাওয়াতে শরীরে ঘর্ম্ম হইতেছিল। রামদয়াল গোলাপজলে রুমাল ভিজাইয়া তদ্দারা রাজার শরীর মুছিলেন। তিনি সুস্থির হইলে গোকুল কহিলেন, "আমার শরীর কতক ভাল হইয়াছে কিন্তু মন বড়ই অস্থির।" রূপেন্দ্র সতেজে কহিলেন, "আপনি কোন চিন্তা করিবেন না। আমি জীবিত থাকিতে আমার রাজ্য কেহ দখল করিতে পারিবে না। আমার অভাবে যার কপালে যা হয় হবে। আমি আপনার ক্ষত দেখে যত কষ্ট পাইয়াছি ভাদুড়িয়ার নিলাম সংবাদে তত কষ্ট হয় নাই।" গোকুল কহিলেন, "সেই জন্যই তোমার রাজত্ব যাইবার ভয়ে গোকুল মরণাপন্ন, যদি আমি বাঁচিয়া থাকিতেই একটাকিয়ার রাজত্ব যায় তাহার চেয়ে আগে মরাই আমার ভাল।"

ইতিমধ্যে কবিরাজ আসিল। বৈদ্যপ্রবর ক্ষত দেখিলেন এবং ক্ষত হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া লইলেন। তাহার পর কালগন্ধরাজের জড় একটু জল দিয়া কাল পাথরে ঘসিয়া ক্ষত স্থানে তাহারই পটী দিলেন। ঔষধের এমনি চমৎকার গুণ যে পটী দিবামাত্র রক্তপাত বন্ধ হইল, বেদনা কম হইল।

রাজা। কেমন গোকুল দাদা! এখন কিছু ভাল হ'য়েছ?

গোকুল। শরীর কিছু ভাল হচ্ছে কিন্তু মন ক্রমেই মন্দতর।

বৈদ্য। আপনার মন খারাপ হচ্ছে কেন? বিষয় কি?

গোকুল। রামজীবন রায় নাটোরে নূতন রাজা হইয়াছে, আমাদের মহারাজের সহ তাহার মনোবাদ হওয়ায় সে আমাদের মালগুজারীর টাকা লুঠ ক'রে জমিদারী জাগীর সব নিলাম করিয়া নিজে কিনিয়াছে। সেই জন্যই দুশ্চিন্তা—"চিন্তাজ্বরো মনুষ্যানাং।"

বৈদ্য। আমাদের খাঁ সাহেবের পক্ষে তো সেটা ভাল কথা। জমিদারী তিন বৎসর যাবৎ নীলাম হইয়াছে, রাজা রামজীবন খরিদ করিয়া মালগুজারী দিয়াছে অথচ খাঁ সাহেব পরম সুখে ভোগ করিতেছেন। যদি ভাদুড়িয়ার রাজস্বও রাজা রামজীবনের উপর চাপাইতে পারেন তবে আরো ভাল। কথায় বলে,—

"পরের মাথায় কাঁঠাল রেখে যদি খেতে পাই,
তার বাড়া সুখ আর ত্রিভুবনে নাই।"

গোকুল। তা কি আর বরাবর চলে। একটা কিয়ার সঙ্গে বিবাদ করা কোন জমিদারের সাধ্য নাই। কিন্তু যদি নবাব সরকার হইতে দখল দেয় তবেই মুস্কিল। নবাব বাদশাহের সঙ্গে যুদ্ধ করি এখন ক্ষমতা এখন একটাকিয়ার নাই।

বৈদ্য। নবাব সরকার হইতে দখল না দেয় এমন কি কোন উপায় নাই?

গোকুল। যখন মরি নাই তখন উপায় করিতেই হইবে। টাকা সংগ্রহ করিয়া লইয়া নিলাম রদ করিতে হইবে। তাহা হইলে আর নবাবী সাহায্য হইবে না। তখন কেহ জোর করিয়া আমাদের জমিদারী দখল করিতে আসিবে না। সব মিটিয়া যাইবে। কিন্তু চাই টাকা। তাহাই আমাদের একান্ত অভাব।

বৈদ্য। কত টাকা আবশ্যক?

গোকুল। নিলাম রদ করিতে হইলে, জমিদারী জাগীর সমস্ত নিলাম রদেরই প্রার্থনা করিতে হয়। তাহাতে প্রায় দুই লক্ষ টাকা আবশ্যক।

বৈদ্য। একটাকিয়ার বাদশাহী ঘর। তাহাতে কি দুই লক্ষ টাকা যুটিবে না? যদি রাজার ঘরে না হয় তবে প্রজাদের উচিত যে হারাহারি করিয়া সে অভাব পূরণ করে। এরূপ হিতার্থী প্রভু আর পাওয়া কঠিন। আমরা সকলে এই রাজ সরকারের পুরুষানুক্রমে আশ্রিত প্রতিপালিত প্রজা এবং ভৃত্য।

আমাদের শরীর একটাকিয়ার অন্নে গঠিত। রাজার এই বিপদে আমাদের ধন প্রাণ সমস্তই অকাতরে দেওয়া উচিত। ব্রাহ্মণ রাজা চিরপ্রতিপালক, তাঁহার জন্য আমার যাহা কিছু আছে তাহা সমস্তই আমি দিতে প্রস্তুত আছি।

গোকুল। আপনি মহাশয় লোক, তাই উপযুক্তই বলিলেন। কিন্তু সকলের মন ত সমান নয়। অনেকে হয়ত মনে করিয়াছে যে এই সময়ে রাজার কিছু সম্পত্তি আত্মসাৎ ক'রে পলায় অথবা তাঁহার শত্রু সহ যোগ করিয়া কিছু স্বার্থ সিদ্ধি করে।

রতন সেখানে বসিয়া রাজার, গোকুলের এবং বৈদ্যের কথা শুনিতেছিল এবং চিন্তা করিতে ছিল যে, "খাঁ সাহেব অতি উন্নত প্রকৃতি প্রভু আর এই গোকুল ও বৈদ্যরাজ অতি উন্নত চরিত্র ভৃত্য। আমরা গোকুলের বিরুদ্ধে কত কথা বলিয়াছি। রাজা তাহার গুণ জানেন তাই তিনি বিচলিত হন নাই এবং গোকুল তিরস্কার করিলে রাজা মাথা নামাইয়া থাকেন। আমি কি কৃতঘ্ন! আমি রাজার এই বিপদে নিজে টাকা কড়ী লইয়া পলাইতে চেষ্টা করিতেছি। খিজমত চুরি করিয়া পলাইয়াছে; আমিও অন্তরে চোর। না—না, তাহা হইবে না। এই রাজার অনুগ্রহেই আমার সমস্ত উন্নতি। আমাদ্বারা তাঁহার কোনই উপকার হয় নাই। এখন রাজার বিপদে ধন প্রাণ সমস্তই দিব। ইহাই আমার প্রায়শ্চিত্ত।" এই প্রকার চিন্তা করিয়া রতন প্রকাশ্যে বলিলেন, "দুইলক্ষ টাকা বেশী কি? আমরা সকলে এই রাজার ধনে ধনী, আমরা যদি যথাসাধ্য সাহায্য করি তবে রাজার নিজ ঘর হইতে কিছুই দিতে হয় না। তাই বলি, গোকুল সাহেব, প্রজাদের উপর চাঁদা করুন।"

গোকুল রতনকে নিতান্ত ঠগ বলিয়া মনে করিতেন। তিনি চালাকী করিয়া কহিলেন, "হাঁ হে রতন! তুমি তো খুব প্রভুভক্ত লোক। তুমি কি দিতে পার তাই আগে আন তো দেখি।" রতন কহিল, "এ তো ঠিক কথা। আমি, আপনি আর কবিরাজ মহাশয়—যদি আপনাপন সম্পত্তি রাজার উপকারার্থ দিয়া দৃষ্টান্ত দেই তবেই অন্যলোকে দিবে নতুবা কেহ দিতে চাহিবে না। এই আমি যাচ্ছি, আমার যথাসাধ্য আমি গিয়ে নিয়ে আসছি।" এই বলিয়া রতন প্রস্থান করিল। রতন নিজ বাড়ীতে গিয়া যথাসাধ্য নিজের টাকা ও জিনিস-পত্র গাড়ীতে বোঝাই করিল। তাহার পত্নীদিগের নিকট অলঙ্কার

খুলিয়া দিতে বলিল। (দক্ষিণ বাঙ্গলার স্ত্রীলোকেরা অতিশয় অলঙ্কার প্রিয়। তাহাদের স্বামী মরুক, পুত্র মরুক, অথবা পৃথিবী শত খণ্ড হউক তথাপি তাহারা অলঙ্কারের মায়া ছাড়িতে পারে না) রতনের পত্নীরা কিছুই দিল না বরং রতনকে তিরস্কার করিয়া বিদায় করিল। রতন রূপেন্দ্রের উপপত্নীদের নিকট সাহায্য চাহিল। তাহারা নিরাপত্তে নিজ নিজ অলঙ্কার, টাকা এবং মূল্যবান দ্রব্যাদি দিল। রতন দুই ঘণ্টা মধ্যে তিন গাড়ী বোঝাই করিয়া সমস্ত দ্রব্যাদি সহ গোকুলের বাড়ীতে উপস্থিত হইল। তাহার কিছু পূর্ব্বেই কবিরাজ কিছু টাকা ও সোনারূপা লইয়া আসিয়াছিল। রতন বাসায় যাওয়ার পর অনেকেই তাহার সম্বন্ধে নানারূপ উপহাস করিতেছিল। গোকুল নিজেও অস্পষ্ট ভাবে সেই কথার সায় দিতে ছিলেন। এখন তাঁহারা রতনের কার্য্য দৃষ্টে চমৎকৃত হইলেন।

রতন ও কবিরাজের প্রভুভক্তি দেখিয়া গোকুলের মনে আত্মগ্লানি হইল। তিনি চিন্তা করিলেন, "ইহারা রাজার নিকট অল্পদিন হইল অল্প উপকার পাইয়া তাঁহার হিতার্থে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিল। ইহাদের তুলনায় আমি কিছুই করি নাই। আমি প্রকৃতই গোলাম; আমার নজর অতি ছোট। আমার যাহা কিছু আছে সমস্তই রাজার সম্পত্তি। এই একটাকিয়ার অনুগ্রহেই আমি সমস্ত রাজ্য ভোগ করি। আমি যদি নিজের টাকা দ্বারা জমিদারীর মালগুজারী চালাইতাম তবে জমিদারী নিলাম হইত না; কোন বিবাদ বা বিপদও হইত না। আমার প্রদত্ত টাকাও ক্রমে আদায় হইতে পারিত। রাজার ভাণ্ডারে টাকা নাই বলিয়া আমি জমিদারীর রাজস্ব না দেওয়াতেই রাজার সর্ব্বস্বান্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে। আমি রতনকে ঠগ বলি কিন্তু সে আমার অপেক্ষা সহস্র গুণ উত্তম লোক। আমি মহাপাপী, নরাধম, নরকের কীট। আমি ধন প্রাণ সর্ব্বস্ব দিয়া রাজার রাজ্য রক্ষা করিতে পারিলেই আমার সেই পাপোদ্ধার, নতুবা আর আমার উদ্ধার নাই। কিন্তু আমার গুপ্ত পাপ প্রকাশ করিব না।" তখন গোকুল প্রকাশ্যে বলিলেন, "রামদয়াল! এই যে কবিরাজ মহাশয় ও মুখুযো ঠাকুর (ইতি পূর্ব্বে গোকুল কখন রতনকে ঠাকুর কিম্বা মহাশয় বলিতেন না) যা এনেছেন তাহা সরকারে জমা করিয়া লও, আর আমার নিজ ঘরে যাহা কিছু আছে সমস্তই বাহির করিয়া

সরকারে জমা কর। আমার নিজের কিছুই নাই সমস্তই রাজার। তিনি আমাকে ভোগ করিতে দিয়াছেন তাই আমি ভোগ করি। এখন আমাদের দুর্ভাগ্যের সময়। এখন ধন প্রাণ সর্ব্বস্ব রাজার হিতার্থে দিতে প্রস্তুত হও। মাটীর হাঁড়ীতে পাক হবে, কলার পাতে খেতে হবে, বাঁশের চোঙ্গায় জল খাওয়া হবে; ধাতুপাত্র মাত্র সকলই বাহির করিয়া দেও; শাল, রুমাল, বনাত সব দেও। গৃহিণীকে বল অলঙ্কার, শাড়ী প্রভৃতি যে কোন মূল্যবান জিনিস আছে সমস্ত বাহির করিয়া দেয়। ইহাতে যে কেহ আপত্তি করিবে, কি চালাকী করিবে তাহাকে তৎক্ষণাৎ এই রাজ্য হইতে দূর করিয়া দেও। রাজার রাজ্য থাকিলে সব হইবে নতুবা কিছুই প্রয়োজন নাই। কিন্তু বাবা! দেখ, যেন গৌণ না হয়। মুখুয্যে মহাশয় যেমন শীঘ্র শীঘ্র কাজ কল্লেন তুমিও সেইরূপ তাড়াতাড়ি কার্য্য কর। আমার সেবা করিবার জন্য কোন লোক জন আবশ্যক নাই। আমার দুশ্চিন্তা দূর হ'লেই সব ব্যারাম আরাম হবে।"

গোকুলের আদেশ শুনিয়া সকলেই ধন্য ধন্য করিল। কবিরাজ মহাশয় বলিলেন, "এই গুণ না থাক্‌লে লালা সাহেব রাজার উপর কর্তৃত্ব করিতে পারিতেন না।" রামদয়াল আদেশ প্রাপ্তিমাত্র সমস্ত সম্পত্তি সংগ্রহ করিতে লাগিল। গোকুল যেমন উপার্জ্জন করিতেন তেমনি প্রচুর ব্যয় করিতেন। গোকুলের ঘরে নগদ টাকা বেশী ছিল না। কিন্তু বহুমূল্য দ্রব্যাদি অনেক ছিল। নগদে জিনিসে গোকুলের ঘর হইতে প্রায় লক্ষ টাকার সংস্থা হইল। তদ্দর্শনে অন্যান্য প্রজারাও চাঁদা দিল। দুই দিন মধ্যেই সওয়া পাঁচ লক্ষ টাকা রাজার তহবিল হইল। তখন গোকুল কহিলেন, "এখন নিলাম রদ করান কঠিন হইবে না। কিন্তু অগ্রে রাজা রামজীবন সহ আপোষে মিটাইতে চেষ্টা করা উচিত।" রূপেন্দ্র আপোষের চেষ্টা করা সঙ্গত বোধ করিলেন না। গৌরচন্দ্র কহিলেন, "রামজীবনের ভাই নবাব নাজিমের রায় রাইয়াঁ। তাহার সহ বিবাদ না হয় সেজন্য আগে আপনার চেষ্টা করাই উচিত।" শেষে খাঁ সাহেব তাঁহাদের পরামর্শই গ্রাহ্য করিলেন। রামরত্ন মুখোপাধ্যায় অনুযাত্রিক-দের নেতা হইয়া নাটোরে চলিলেন।

রাজা মহেশ্বর রায় তখন নাটোরে ছিলেন। রতনের দৌত্যকার্য্য যাহাতে ব্যর্থ হয় মহেশ্বর তাহাই চেষ্টা করিতে লাগিলেন। রাজা রামজীবন যে

টুকু নম্র হইতেন মহেশ্বরের প্রবর্ত্তনায় তাহাও হইলেন না। তিনি অতি উগ্রভবে রতনকে বলিলেন, "এখন আবার আপোষ কেন? আমি যখন আপোষের প্রস্তাব করিয়াছিলাম তখন রূপ খাঁ সগর্ব্বে আমার প্রতিনিধিকে বলেছিলেন যে, 'তোমাদের নব্য রাজাকে বলিও, সূচ্যগ্রনপি ন দাস্যামি বিনা যুদ্ধেন কেশব!' আমি নব্য রাজা, রূপ খাঁও তাই। একটাকিয়ার ঘর অতি পুরাতন বটে কিন্তু তিনি তো রাজপুত্র হইয়া জন্মেন নাই। গরীবের ছেলে দত্তক হয়ে রাজপুত্র হয়েছেন। তার চেয়ে যারা নিজ ক্ষমতায় রাজা হয়, তারা সর্ব্বাংশেই শ্রেষ্ঠ। তা যা হউক, এখন বিবাহ ব্যাপার নহে সুতরাং কুলের পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। এখন যুদ্ধ বিবাদ উপস্থিত, বাণে বাণে পরিচয়। আপনাদের পোষ্য রাজাকে বলিবেন যে আমি টাকা দিয়া নিলামে যাহা কিনিয়াছি তাহার পরমাণুমেকমপি ন দাস্যামি বিনা যুদ্ধেন কেশব।"

রাজা মহেশ্বর কহিলেন, "মহারাজ যা বল্লেন সমস্তই উচিত কথা। যাহারা পৈত্রিক সম্পত্তি ভোগ করে তাহারা ভাগ্যবান, যাহারা নিজে উপার্জ্জন করিয়া ভোগ করে তাহারা গুণবান, আর যাহারা পৈত্রিক সম্পত্তি নষ্ট করে তাহারা নরাধম। কালা বামুন, কটা শূদ্র, বেঁটে নেড়ে, পোষ্য পুত্র এগুলি প্রায়ই অতি দুর্ব্বৃত্ত হয়। রূপ খাঁ পোষ্যপুত্রের আদর্শ। সে দত্তক হয়ে মা'কে কয়েদ ক'রে, ভগ্নীর সর্ব্বস্বান্ত ক'রে, রাজা হয়েছে। তার পর নানারূপ অসদ্ব্যয় ক'রে বাদশাহী ভাণ্ডার উড়ায়ে দিয়াছে। মালগুজারী দিতে না পারায় সমস্ত সম্পত্তি নিলাম হয়েছে। এখন অনর্থক লড়াই আর ডাকাতী সার হয়েছে। সেই নরাধম এখন একটাকিয়ার বাদশাহী ভিটায় ঘুঘু না চরায়ে ছাড়িবে না। তেমনি তার মন্ত্রী হয়েছে একটা কটা কায়েত, সে হারামজাদার মুখ দেখ্‌লে অযাত্রা হয়।"

গুণাকর রায় আপোষে নিষ্পত্তি করিতেই পরামর্শ দিলেন। কিন্তু দয়ারাম ও মহেশ্বর একান্ত বিরোধী হইলেন। রাজা রামজীবন সন্ধির প্রস্তাব একবারে অগ্রাহ্য করিলেন। রামরত্ন মুখোপাধ্যায় নমস্কার করিয়া বিদায় হইলেন। তিনি নারদ নদের তীরে আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার নৌকা লুণ্ঠিত হইয়াছে, অনুচরগণ কয়েদ হইয়াছে, কেবল একজন ব্রাহ্মণ সঙ্গী ছিল সে-ই মাত্র নদের ধারে ঘুরিতেছে। রতন নৌকা ভাড়া করিতে চেষ্টা করিলেন।

কেহ তাঁহাকে ভাড়া দিল না। তিনি সঙ্গী ব্রাহ্মণ সহ হাঁটিয়া লালোর গেলেন। তথা হইতে নৌকা ভাড়া করিয়া সাতগড়ায় পৌঁছিয়া, সন্ধির সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন। রূপেন্দ্র ক্রোধে অধীর হইলেন। তিনি কখন গৌর ও গোকুলকে মাথা তুলিয়া কথা বলিতেন না। কিন্তু অদ্য প্রচুর তিরস্কার করিলেন এবং সেনাপতিগণকে ডাকিয়া অগৌণে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতে আদেশ করিলেন। গোকুল মাথা নামাইয়া কহিলেন, "হুজুরের মাতুল উপস্থিত না থাকিলে বোধ হয় সন্ধি হইত; নিতান্ত পক্ষে এতদূর অপমান কদাচ হইত না। তিনি যে নাটোরে আছেন আমি তা জান্তাম না সেই জন্যই সন্ধির চেষ্টা কর্‌তে পরামর্শ দিয়াছিলাম। এখন নিলাম রদের এবং প্রতিহিংসার জন্য সত্বর হওয়াই কর্ত্তব্য।" গৌর কহিলেন, "এটা ভাল হয়েছে। হুজুরের জমিদারী নিলাম হ'লো, রামজীবন কিনিলেন। কিন্তু আপনি জোর করে দখল দেন না। এ দোষ আপনার উপরেই ছিল। পরে রামজীবন অন্যায়রূপে ভাতুড়িয়া নিলাম করাইয়াছে এবং সন্ধির জন্য যে দূত গিয়াছিল তার উপর দৌরাত্ম্য ক'রে মহাপাপ করেছে। এখন তারই দোষ বেশী হয়েছে। এখন লালা কাকা নিলাম রদের জন্য ঢাকা যান। আর আমরা নাটোর পর্য্যন্ত লুঠ করে রামজীবনের দর্পচূর্ণ করি। আর তোমার মাতুল কাল শনি। সে শালাকে বেঁধে এনে ঘোড়ার ঘাস কাটান, এ ভার আমার উপর থাকুক।"

ইতিমধ্যে পাঠান সর্দ্দার কাম্‌তার খাঁ, বক্তিয়ার খাঁ ও কাশীম খাঁ রাজসভায় আসিল। আর ভোজপুরিয়া সিপাহীদের সর্দ্দার মদন সিংহ ও তেজ সিংহ তলব মত হাজির হইল। রূপেন্দ্রের পূর্ব্বাবধিই যুদ্ধের ইচ্ছা প্রবল ছিল। কেবল গৌর ও গোকুলের পরামর্শে কতক শান্ত ভাবে ছিলেন। অদ্য সর্ব্বসম্মতি ক্রমে যুদ্ধে ব্রতী হইলেন।

রূপেন্দ্র সর্ব্বাগ্রে কাম্‌তার খাঁকে যুদ্ধ বিষয়ে ইতি কর্ত্তব্যতা জিজ্ঞাসা করিলেন। কামতার খাঁ বলিলেন, "আমরা পাঠান, যুদ্ধই আমাদের ব্যবসায়। তজ্জন্য আমরা সর্ব্বদাই প্রস্তুত আছি, নূতন তৈয়ারী হওয়া অনাবশ্যক। আমরা লেখাপড়া শিখি না, রাজনীতি ও পাকচক্রের কথায় আমরা কোন পরামর্শও দিতে পারি না। লড়াইএর পরামর্শ খুব দিতে পারি। পাঠানের বাচ্ছা তলোয়ার খুলিয়া বসিলে মারিতেও মায়া নাই মরিতেও ভয় নাই।

আমার এগার পুরুষ তোমার অন্নে প্রতিপালিত। তোমার জন্য প্রাণপণ করিতে কদাচ ত্রুটি করিব না। বিধর্ম্মীর পক্ষ হইয়া মুসলমান সহ যুদ্ধ করা আমাদের ধর্ম্ম বিরুদ্ধ। কিন্তু আমার পূর্ব্বপুরুষেরা তোমার পূর্ব্বপুরুষের খাতিরে তাহাও করিয়াছেন। আমি বৃদ্ধ হইয়াছি বটে কিন্তু দুর্ব্বল হই নাই। নাটোরের রাজা তিন বৎসর চেষ্টা করিয়া কালীগাঁও কি প্রতাপ-বাজুর এক অঙ্গুলি জমি দখল করিতে পারে নাই। তুমি নিশ্চয় জানিও আমার নিঃশ্বাস যাবৎ থাকিবে তাবৎ একটাকিয়ার জমিতে কোন শালাও পা রাখিতে পারিবে না।" বক্তিয়ার খাঁ ও কাশীম খাঁ তদনুযায়ী নিজ মত ব্যক্ত করিল।

মর্দ্দন সিংহ কহিল, "আগে যুদ্ধের উদ্যোগ না করে নিলাম রদের চেষ্টা করাই উচিত। নিলাম রদ হ'লে একটাকিয়ার জাগীর ও জমিদারী কেহ জোর করিয়া দখল করিতে আসিবে না, সুতরাং যুদ্ধ আবশ্যকও হবে না। যদি নিলাম বাহাল থাকে, তবে নবাব সরকার হ'তে দখল দিবে। তখন আমাদের বাহুবলে সম্পত্তি রক্ষা করার চেষ্টা বৃথা।"

তাহার কথা শেষ না হইতেই কামতার খাঁ ভ্রুকুটি করিয়া কহিল, "কখন কোন যুদ্ধ বিগ্রহ কর্‌তে হয় নাই, শুধু বসে বসে খাও, বেতন নেও আর সিপাহী নাম করে বেড়াও। এখন লড়াইর নাম শুনেই ভয় হয়েছে। আমি তোর মত কাপুরুষের সাহায্য চাই না। তুই গিয়া ঘোড়ার ঘাস কাট, আমি একাকীই যুদ্ধ চালাব।"

মর্দ্দন সক্রোধে কহিল, "এখন যুদ্ধ উপস্থিত হয় নাই তাই সৎপরামর্শ দিলাম। যুদ্ধকালে মর্দ্দন তোমার চেয়ে কম নয়। আমি ক্ষত্রিয়, কাজের বীর; কিন্তু বৃথা মুখের বড়াই করি নাই। যদি পাঠানের ভয়ই না থাক্‌তো তবে পাঠানের মুলুক মোগলে নিলে কেন? তুই গিয়া ঘাস কাট, আমি যুদ্ধ চালাবো।"

সেই কথা শুনিবামাত্র কামতার খাঁ তলোয়ার খুলিয়া লম্ফ দিয়া মর্দ্দনের সম্মুখে পড়িল। মর্দ্দনও ঢাল তলোয়ার লইয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে উভয়ের মধ্যে ঘোরতর দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইল। ব্রূপেন্দ্র উভয়কে ক্ষান্ত হইতে আদেশ করিলেন কিন্তু তাহারা শুনিল না। উভয়ে যেরূপ বেগে অস্ত্র সঞ্চালন করিতেছিল, কেহ তাহাদের নিকটে যাইতে পারিল না। তখন

গৌরচন্দ্র ও বক্তিয়ার খাঁ দুইখানি শক্ত কপাটের পাল্লা লইয়া উভয় দ্বন্দ্বীর মধ্যে দাঁড়াইলেন। তখন তলোয়ার থামিল। অমনি অপর সকলে ধরিয়া দ্বন্দ্বীদ্বয়কে তফাৎ করিল। তখন রূপেন্দ্র তাহাদিগকে নিজ সম্মুখে রাখিয়া মিষ্ট ভৎ'সনা করিয়া কহিলেন,—"দাদাজী ও সিংজী, আপনারা উভয়েই মহাবীর এবং আমার প্রধান সহায়। আমার এখন ঘোর বিপদ উপস্থিত, এই সময়ে কি আপনাদের পরস্পর কাটাকাটি লড়াই করা উচিত? আপনারা কেহই কম নয়। আপনাদের মধ্যে যুদ্ধ হইলে একজন হত এবং অন্য জন নিশ্চয়ই আহত হইবেন। ফলতঃ, দুই জনের মধ্যে এক জন দ্বারাও আমার কোন উপকার হইতে পারিবে না। তাহাই যদি আপনাদের অভিপ্রায় হয় তবে বলুন আমি আগে সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হই, তাহার পর আপনারা খুনাখুনি করুন বা যা ইচ্ছা তাই করুন।" তাঁহার কথা শেষ হইবামাত্র গৌর ও গোকুল উভয়কে অনেকরূপ বুঝাইলেন, প্রশংসা করিলেন, মিষ্টভৎ'সনা করিলেন অনুযোগ ও অনুরোধ করিলেন। তাঁহারা কহিলেন, "আপনাদের বীরত্ব প্রকাশের সময় এখন আগতপ্রায়। এ সময় আপনারা মহারাজের অরাতিগণকে যিনি বেশি নষ্ট করিবেন আমরা তাঁহাকেই বড় বীর মানিব। ইহাই আপনাদের বীরত্ব প্রকাশের প্রকৃষ্ট উপায়।" কামতার খাঁ মাথা নামাইয়া বলিল, "শত্রুকে যাবৎ বিনাশ বা পদানত না করি তাবৎ শান্ত, ক্ষান্ত হওয়া পাঠানের রীতি নাই। কিন্তু আপনাদের অনুরোধে সময়ের গতিকে আমি ক্ষান্ত হ'লাম। আমি মহারাজের শত্রু কাটিয়াই নিজ বীরত্ব দেখাইব।" মর্দন সিংহ কহিল, "আমি সমস্ত অবস্থাই জানি এবং এ সময়ে যে আপনা-আপনি লড়াই অকর্ত্তব্য তাহাও বুঝি, কিন্তু সর্দার সাহেব যখন অকারণ আমাকে অবজ্ঞা করিল এবং যুদ্ধার্থ আসিল তখন বিমুখ হওয়া ক্ষত্রধর্ম্ম বিরুদ্ধ, কাজেই আমিও যুদ্ধার্থ অস্ত্র ধারণ করিলাম। শত্রুকে হত কিম্বা নত না করিয়া ক্ষমা করা আমারও জাতীয় ধর্ম্ম নহে, তথাপি ব্রাহ্মণ রাজা চিরপ্রতিপালক, একটাকিয়ার বিপদ দেখিয়া আপনাদের অনুরোধে আমি ক্ষান্ত হইলাম। আমিও মহারাজের শত্রু কাটিয়াই নিজ বীরত্বের পরিচয় দিব।" পাছে এক স্থানে থাকিলে আবার কথান্তর হয় এই ভয়ে গোকুল নানা উপলক্ষে উভয়কে ভিন্ন ভিন্ন দিকে পাঠাইলেন।

অবিলম্বে ইতিকর্ত্তব্যতা নির্দ্ধারণ জন্য সভা হইল। রূপেন্দ্র সর্ব্বপ্রকার বিলাস ব্যসন পরিত্যাগ করিয়া গম্ভীরভাবে দরবারে আসীন। গোকুল, গৌর, রামনাথ বাগছি, রতন মুখোপাধ্যায়, কামতার খাঁ, কাশীম খাঁ, বক্তিয়ার খাঁ, মর্দন সিংহ, তেজ সিংহ, সকলেই স্থিরভাবে উপবিষ্ট হইলেন। মৃত বাচস্পতি ঠাকুরের পুত্র রাজপুরোহিত হরি সিদ্ধান্ত ও নীলকণ্ঠ পঞ্চানন এবং রাণী পূর্ণিমার ভ্রাতা কুমার সুরেশ্বর রায় রূপেন্দ্রের দক্ষিণ দিকে উপবেশন করিলেন। সর্ব্বাগ্রে পুরোহিত ঠাকুর বলিলেন, "আমি তিন দিন জয়কালীর নিকট ধন্না দিয়া স্তব স্তুতি করায় দৈববাণী হইয়াছে যে, "যুদ্ধ নিশ্চয় হইবে, রামজীবন রঘুনন্দন নির্ব্বংশ হইবে, এবং একটাকিয়ার সন্তান নাটোরে রাজত্ব করিবে।" ইহা দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যায় যে যুদ্ধে আমাদের খাঁ সাহেবের জয়লাভ হইবে। সাম, দান, ভেদ, দণ্ড এই চারি প্রকার উপায় শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে। তন্মধ্যে সাম ও দান দ্বারা আপোষে মীমাংসার চেষ্টা উভয় পক্ষ হইতেই হইয়াছে কিন্তু কোন সুফল হয় নাই। রাজা রামজীবনের ভ্রাতা রঘুনন্দন, দেওয়ান গুণাকর রায়, মন্ত্রী দয়ারাম, সেনাপতি কাশী শুকুল এবং এলদোস খাঁ সকলেই তাহার একান্ত বাধ্য, অনুগত ও হিতার্থী। তাহাদের মধ্যে ভেদ জন্মান অসম্ভব এবং অসাধ্য। রায় রাইয়াঁ রঘুনন্দন নবাব নাজিমের অতিমাত্র প্রিয়পাত্র। তাহার প্রভাবে কেহ রামজীবনের বিপক্ষ হইতে সাহসী হয় না। সুতরাং এখন শেষ উপায় যে দণ্ড অর্থাৎ যুদ্ধ তাহাই এক মাত্র অবলম্বনীয়। যখন যুদ্ধই কর্ত্তব্য তখন আর বিলম্বের প্রয়োজন নাই। কিন্তু যাহাতে নবাব সরকার হইতে রামজীবনের সাহায্য না হয় তদ্বিষয়েও চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। গত তিন বৎসর যাবৎ যেরূপ লড়াই চলিয়াছে, তাহাতে উভয় পক্ষ মধ্যে কেহই প্রাণপণে যুদ্ধ করেন নাই বটে, তথাপি তাহার ফল দৃষ্টে অনুমান হয় যে, নবাবী সাহায্য ব্যতীত একটাকিয়ার সমকক্ষতা করা রামজীবনের সাধ্যায়ত্ত নহে। অতএব যুদ্ধের সুফলপ্রেক্ষু হইলে কার্য্য চারি ভাগ করা কর্ত্তব্য। প্রথমতঃ দেবার্চ্চনার ভার আমার ও রাণী জগদম্বার উপরে থাকুক। দৈববল সকল বলের শ্রেষ্ঠ। সেই দিক্ সর্ব্বাগ্রে দ্রষ্টব্য। দ্বিতীয় কর্ত্তব্য, নবাব দর্বার ঠাণ্ডা রাখা। এই কার্য্যের ভার লালা গোকুল সাহেব এবং রামরত্ন মুখোপাধ্যায় মহাশয় গ্রহণ করুন। তৃতীয় কার্য্য, স্বরাষ্ট্র সংরক্ষণ। এই কার্য্য রাজা স্বয়ং বাগছি সাহেবকে

ও মর্দন সিংহ, তেজ সিংহকে লইয়া ব্রতী হউন। চতুর্থ কার্য্য, পররাষ্ট্র আক্রমণ। সেই কার্য্যে কুমার গৌরচন্দ্র সাহেব, সর্দার কামতার খাঁ সাহেব আপনাপন সেনা লইয়া অগ্রসর হউন। এইরূপে প্রত্যেক কার্য্যের ভার নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তি বিশেষের উপর থাকিলে সমস্ত কাজ বেশ সুবিধা মত সম্পন্ন হইতে পারিবে। আমার জ্ঞান বুদ্ধিতে যাহা আসিল তাহা বলিলাম এখন আপনারা যেরূপ বিবেচনা হয় তাহাই করুন।"

গোকুল কহিলেন, "আমাদের পূজনীয় পঞ্চানন ঠাকুর যাহা বলিলেন তাহা শাস্ত্রসম্মত এবং যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু লোকচরিত্র বিষয়ে তাঁহার অভিজ্ঞতা কম। তজ্জন্য কার্য্য নিয়োগ বিষয়ে আমি কিছু কিছু পরিবর্ত্তন আবশ্যক বোধ করি। যুদ্ধ অবশ্যই হইবে। এ বিষয়ে দৈববাণীও হইয়াছে এবং অবস্থা দৃষ্টেও স্পষ্ট জানা যাইতেছে। যাহা করিতেই হইবে তদ্বিষয়ে গৌণ করা অনুচিত। সেই কার্য্যের পুরোহিত ঠাকুর যে চারি ভাগ করিয়াছেন তাহা অতি উত্তম। পঞ্চানন ঠাকুর যেমন পণ্ডিত তেমনি ধার্ম্মিক। রাণী জগদম্বাও পরম সাধ্বী, পরম পবিত্রা। তাঁহারা ডাকিলে মা কালী অবশ্যই দয়া করিবেন। সুতরাং দেবার্চ্চনার ভারগ্রহণ তাঁহাদেরই উপযুক্ত। নাজিম ও দেওয়ানের নিকট দরবার করিতে হইলে পারসী জানা আবশ্যক। রতন ঠাকুর বুদ্ধিমান এবং মিষ্টভাষী বটে কিন্তু পারসী না জানা হেতু তাঁহা দ্বারা কাজ চলিবে না। এই কাজে আমি ও রামদয়াল যাইব। আমাদের মহারাজা সাহসী, বলবান, বীর পুরুষ কিন্তু নানারূপ অভ্যাসদোষ আছে, তিনি সাতগড়ায় থাকিলে ব্যয়বাহুল্য ও কার্য্যহানি হইবে। তিনি বিপক্ষ পক্ষের জমিদারী আক্রমণে নিরত থাকিলে, তিনিও মনোযোগী বেশী হইবেন এবং অনুচরবর্গও বেশী মনোযোগ করিয়া সমস্ত কার্য্য করিবে। নিজ জমিদারীরক্ষার্থ গৌর বাবাজী থাকিলেই বেশ চলিবে। আমি যে টাকা লইয়া নিলাম রদের চেষ্টায় যাইতেছি একথা বিপক্ষেরা অবশ্যই জানিতে পারিবে এবং পথে বাধা দিতেও চেষ্টা করিবে। সুতরাং আমার সঙ্গেও কিছু সৈন্য লইয়া যাওয়া আবশ্যক। ঢাকায় পৌঁছিলে বেশী লোক রাখা আমার আবশ্যক হইবে না। কিন্তু সেখানেও রঘুনন্দনের ভয়ে অন্ততঃ এক শত লোক রাখা আবশ্যক। আর আমার যাত্রাকালে সঙ্গে তিন শত যোদ্ধা নিতান্ত পক্ষে চাই। আমার বিবেচনায় মর্দন সিংহ অথবা বক্তিয়ার

খাঁ সেই তিন শত সৈন্য লইয়া আমার রক্ষীরূপে গেলে ভাল হয়। অতএব এই সকল বিষয়ে বিবেচনা করিয়া উপযুক্ত ব্যক্তিগণকে কার্য্যে নিযুক্ত করাই কর্ত্তব্য।”

সুরেশ্বর রায় কহিলেন, “বিপক্ষের জমিদারী আক্রমণ করিতে যাওয়াই সর্ব্বাপেক্ষা সতর্কের বিষয়। সেই কার্য্যে রাজার নিজে যাওয়া কর্ত্তব্য নহে।” অন্যান্য সভ্যগণও তাঁহার আপত্তি সমর্থন করিল। তখন রূপেন্দ্র কহিলেন, “সুদীর্ঘ তর্কবিতর্কে সময় ক্ষেপণ করা অনুচিত। আমি কোন শঙ্কট দেখিয়া ভয় করি না। আমি স্বয়ং সর্দার দাদাকে (কামজার খাঁকে) ও মর্দন সিংহকে লইয়া বিপক্ষদিগকে আক্রমণ করিতে যাইব। তাহারা উভয়ে জেদাজিদি করিয়া বীরত্ব দেখাইবে। তাহাতে আমাদের জয়লাভের সম্পূর্ণ সুবিধা হইবে। বক্তিয়ার খাঁ ও বাগছি দাদা উভয়ে গোকুল দাদার সহ ঢাকায় যাউন। গৌর বাবাজী, রামদয়াল, রতন ও তেজ সিংহকে লইয়া নিজস্ব রক্ষার্থ থাকুন। পঞ্চানন ঠাকুরের উপদেশ মত রাণীরা দেবসেবা করুন। “নোৎসুকস্য বিলম্বনং”—কর্ত্তব্য কার্য্যে গৌণ করা হইবে না। অতএব বিতর্ক ত্যাগ করিয়া সকলেই নিজ নিজ কর্ত্তব্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হউন।” ইতি কর্ত্তব্যতা স্থির হইবামাত্র সকলে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। রাজা এবং সমস্ত কর্ম্মচারীগণ অনন্যমন হইয়া কার্য্যসিদ্ধির চেষ্টা করিতে লাগিলেন। রূপেন্দ্র বিলাস ব্যসন সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিয়া গৌর ও গোকুলের উপদেশ মত সমস্ত কার্য্য অবিশ্রান্ত স্বয়ং পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। কর্ম্মচারী-গণ মধ্যে পরস্পর যে সকল বৈরভাব ছিল তাহা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইল। লোকের ভাব পরিবর্ত্তন এবং একান্ত রাজভক্তি দর্শনে সুরেশ্বর বিমোহিত হইলেন। তিনি ভগিনীপতির সাহায্যার্থে কিছু সৈন্য ও অর্থ সংগ্রহ জন্য তাহিরপুর চলিলেন। উত্তরবঙ্গের নৌকাগুলি যুদ্ধের অনুপযুক্ত জন্য গোকুল পূর্ব্ববঙ্গ হইতে ভাল ভাল জলকার, পালোয়ার, পানসী, জোং নৌকা সংগ্রহ করিয়া আনিলেন। রূপেন্দ্র নৌকা দৃষ্টে হৃষ্টচিত্তে ৩০০০ তিন হাজার সেনা লইয়া সর্ব্বাগ্রে চাটমহর আক্রমণ করিতে চলিলেন।

চাটমহরে রাজা মহেশ্বর রায়ের বাড়ী ছিল। মহেশ্বর রায় ক্ষুদ্র রাজা। তাঁহার কোন দুর্গ বা পরিখা ছিল না। যুদ্ধের কোন আয়োজন না থাকায়

২০।২৫ জন লাঠিয়াল ভিন্ন তাঁহার আর কোন সৈন্য সামন্ত ছিল না। চাটমহর বড়োল নদের ধারে সমৃদ্ধ বন্দর ছিল। রূপ খাঁ তথায় ডঙ্কা পিটিয়া লুঠ আরম্ভ করিলে সকল লোক ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। মহেশ্বর সংবাদ পাইয়া দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণপূর্ব্বক পলায়ন করিলেন। চাটমহর লুণ্ঠন করিতে কিছু মাত্র অস্ত্রচালনা বা রক্তপাত হইল না। তাহার পর রূপেন্দ্র মহেশ্বরের বাড়ী আক্রমণ করিলেন। কেহ তাঁহাকে কোন বাধা দিল না। তিনি বাহির বাড়ী লুঠ করিয়া ভিতর বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন। স্ত্রীলোকেরা ভয়ে রোদন আরম্ভ করিল। মহেশ্বরের পত্নী দোতলার ছাদ হইতে রূপেন্দ্রকে দেখিয়া কহিলেন, "কি বাবা! একি?" রূপ খাঁ হাত তুলিয়া প্রণাম করত কহিলেন, "মামী মা, আমার শত্রু অনেক হইয়াছে, অস্ত্রধারণ ব্যতীত ধন মান রক্ষার উপায় নাই। কিন্তু সর্ব্বাগ্রে মাতুল বংশ ধ্বংশ করা আবশ্যক। সেই জন্যই এখানে আসিয়াছি। আমার জেঠা আগে মাতুল বধ করিয়া পরে মাতুলানীকে সসম্মানে পালন করত শান্তি লাভ করিয়াছিলেন। আমিও তাহাই করিব। আপনি কোন ভয় করিবেন না।" যে ঘরে স্ত্রীলোকেরা ছিল রূপেন্দ্র তাহাতে প্রবেশ করিলেন না। অন্য সমস্ত ঘর বাড়ী লুঠ করিয়া প্রস্থান করিলেন। তিনি একদিন মাত্র সাতগড়ায় থাকিয়া সিংড়ার বন্দর লুঠ করিতে চলিলেন। গুণাকর রায় গোকুল অপেক্ষাও বিদ্বান, বুদ্ধিমান এবং অনুসন্ধানী ছিলেন। তাঁহার পরামর্শ মত রামজীবন সিংড়া রক্ষার্থ প্রচুর সৈন্য পাঠাইলেন। কিন্তু তাঁহার সেনামধ্যে কাসতার খাঁ, বক্তিয়ার খাঁ, গৌর ও মর্দ্দন সিংহের সমকক্ষ বীর কেহ ছিল না। রূপ খাঁ সিংড়া আক্রমণ করিলে নাটোরীয় সেনাদল তাহা নিবারণ করিতে পারিল না। কিন্তু আক্রমণের সংবাদ পূর্ব্বে প্রচার হওয়ায় ধনীলোকেরা ধন সহ পলায়ন করিয়াছিল; তজ্জন্য রূপেন্দ্র আশানুরূপ অর্থলাভ করিতে পারিলেন না। তিনি সমৃদ্ধ সিংড়া লুঠ ও ভস্ম করিয়া চলিয়া আসিলেন। এই দুই লুণ্ঠন দ্বারা রূপ খাঁর অর্থাভাব কতক দূর হইল। প্রজা ও ভৃত্যগণ তাঁহার সাহায্যার্থ যে সকল ধন দিয়াছিল তিনি তন্মধ্যে স্ত্রীলোক ও বালকদের অলঙ্কার ফেরত দিতে আদেশ করিলেন।

সিংড়া লুঠের প্রতিফল দিবার জন্য রামজীবন প্রতাপবাড়ী আক্রমণ করিলেন।

রামনাথ বাগছি তেজ সিংহ ও বক্তিয়ার খাঁকে লইয়া আক্রমণ নিবারণে ব্যর্থ চেষ্টা করিলেন। তেজ সিংহ যুদ্ধে হত হইল, বক্তিয়ার খাঁ আহত হইয়া পলায়ন করিল। রামনাথ বন্দীভাবে নাটোরে প্রেরিত হইলেন। রূপেন্দ্র সংবাদ পাইবামাত্র স্বয়ং দলবল লইয়া প্রতাপবাজুতে গেলেন। রামজীবন তৎপূর্ব্বেই ঐ স্থান লুণ্ঠন ও দগ্ধ করিয়া প্রস্থান করিয়াছিলেন। সুতরাং বিনা যুদ্ধেই ঐ স্থান পুনরায় রূপ খাঁর হস্তগত হইল বটে কিন্তু কোন রাজস্ব আদায়ের সম্ভাবনা থাকিল না। এইরূপে দুই বৎসর কাল ঘোরতর যুদ্ধ ও বিবাদে উভয় পক্ষের সৈন্যক্ষয় এবং প্রজাদের সর্ব্বস্বান্ত হইতে লাগিল। সম্মুখযুদ্ধে একটাকিয়ার পক্ষই সর্ব্বত্র জয়লাভ করিতে লাগিল। রামজীবন সকল পরগণার রাজস্ব দিতেন কিন্তু চলন বিলের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী আট পরগণা হইতে কিছুই আদায় হইত না। অধিকন্তু ঐ সকল স্থান রক্ষার্থ যুদ্ধব্যয়ে তিনি ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন।

রামজীবন রঘুনন্দনকে সমস্ত অবস্থা জানাইয়া লিখিলেন যে, "যদি তুমি নবাব সরকার হইতে সৈন্য সাহায্য না পাও তবে শত্রু পীড়িত আট পরগণা এস্তাফা করা আবশ্যক। নতুবা মালগুজারী বাকির জন্য রেজা খাঁর নরক-কুণ্ডে পড়িতে হইবে।" রঘুনন্দন চেষ্টা করিয়া নবাব নাজিমের নিকট সাহায্যের হুকুম বাহির করিলেন এবং পাঁচ হাজার পদাতিক এবং তিন শত অশ্বারোহী পাঠাইয়া দিলেন। এদিকে গোকুলও চেষ্টা করিয়া নবাব দেওয়ানের তুষ্টি সাধন করিলেন। মুর্শিদকুলী খাঁ নিলামী পনের টাকা এবং গত কালের মালগুজারীর বাবত প্রদত্ত টাকা, সরকারী নজর পঁচিশ হাজার এবং নিজ নজর পাঁচ হাজার টাকা পাইলে নিলাম রদ করিতে স্বীকার করিলেন। গোকুল অর্দ্ধেক টাকা আমানত করিয়া দিয়া নিলাম খরিদদারের দখল স্থগিতের প্রার্থনা করিলেন। নবাব দেওয়ান প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়া নবাব নাজিমকে জানাইলেন যে, "নিলাম সম্বন্ধে চূড়ান্ত আদেশ না হওয়া পর্য্যন্ত ক্রেতাকে দখল দিবেন না এবং কোন সাহায্য করিবেন না।" নাজিম দেওয়ানের সে কথায় কিছুমাত্র মনোযোগ করিলেন না। এদিকে রঘুনন্দন সুশিক্ষিত নবাবী সেনা, চারিটা কামান ও বহুসংখ্যক গোলন্দাজ লইয়া নাটোরে উপস্থিত হইলেন। গোকুল নবাব দেওয়ান দ্বারা সম্রাটের নিকট নাজিমের

অন্যায় পক্ষপাতের রিপোর্ট পাঠাইয়া স্বয়ং সাতগড়ায় প্রত্যাগমন করিলেন।

গোকুল সাতগড়ায় পৌঁছিলে ইতি কর্ত্তব্যতা অবধারণ জন্য মহতী সভা হইল। সেই সভায় লালা সাহেব কহিলেন যে, "রাজা রামজীবন যে মাল-গুজারীর টাকা লুঠ করিয়া ভাহুড়িয়া নিলাম করাইয়াছেন এবং স্বয়ং খরিদ করিয়াছেন তাহা প্রকাশ হওয়ায় নবাব দেওয়ান আমাদের সমস্ত জাগীর ও জমিদারী নিলাম রদ করিতে আদেশ দিয়াছেন এবং মহলে দখল দিতে কোনরূপ সাহায্য না করিবার জন্য নাজিমকে অনুরোধ করিয়াছেন। কিন্তু নাজিম সে অনুরোধ না মানায় দেওয়ানজী বাদশাহের নিকট রিপোর্ট দিয়াছেন। সম্রাট আলমগীরের নিকট কাহারও কোন কৌশল কার্য্যকারী হয় না। তিনি নিজে সমস্ত দরখাস্ত ও রিপোর্ট (বিজ্ঞাপনী, রোয়দাদ) পড়িয়া তদন্ত করেন এবং অতি শীঘ্র বিহিত হুকুম দেন। তাঁহার আদেশ অবিলম্বে প্রতিপালিত হয় কি না তাহাও তিনি সন্ধান লয়েন। কোন ব্যক্তি সে আদেশ পালনে কিছুমাত্র গৌণ বা অবহেলা করিলে সম্রাট তাহার প্রতি কঠিন দণ্ড বিধান করেন এবং নিজ হুকুম কার্য্যে পরিণত করাইয়া থাকেন। বোধ হয়, সম্রাট এক মাস মধ্যেই নিলাম রদ স্বীকার করিয়া বাদশাহী রেশালা ফেরত লইতে হুকুম দিবেন। এক মাস কাল যুদ্ধ না করিয়া স্থানান্তরে থাকাই উচিত। বাদশাহী সেনা যেরূপ অনিবার্য্য আগ্নেয় অস্ত্রে সুসজ্জিত তাহাদের সহ যুদ্ধ করা অসাধ্য।" রতন গোকুলের পরামর্শই সমর্থন করিলেন। কিন্তু তাঁহাদের পরামর্শ রাজার ও অপর পারিষদগণের মনোমত হইল না।

কুমার গৌরচন্দ্র কহিলেন, "লালা কাকার সহ আমার মতান্তর প্রায় হয় না। কিন্তু এবার তাঁহার মত আমার মতের সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি বিদ্বান, বুদ্ধিমান বটেন কিন্তু অতিশয় ভীরু। তাঁহার বর্ত্তমান পরামর্শ ও যুক্তি সমস্তই সেই ভীরুতামূলক। "বীরভোগ্য বসুন্ধরা" ইহা সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে প্রসিদ্ধ। নিজের বিক্রম না থাকিলে কেহ কেবল বাদশাহী বা নবাবী হুকুমে রাজত্ব ভোগ করিতে পারে না। সাঁতোড় ও ভূষণার রাজত্ব পুনরায় দিতে এই সম্রাট আলমগীর স্পষ্ট হুকুম দিয়াছেন কিন্তু তাহাতে কোনই ফল হয় নাই। আমরা যুদ্ধ না করিয়া স্থানান্তর গেলে আমাদের দলবল ভাঙ্গিয়া যাইবে।

ধনবল জনবল পরিহীন হইয়া আমরা কদাচ পুনরায় রাজত্বলাভ করিতে পারিব না। বাদশাহ এক্ষণে দাক্ষিণাত্যে আছেন। বর্গীগণ চারিদিকে লুঠপাট করিতেছে। এ সময় নবাব দেওয়ানের বিজ্ঞাপনী বাদশাহের নিকট পৌছিবে কি না তাহা অনিশ্চিত, তাহাতে কি হুকুম হইবে তাহাও অনিশ্চিত; সেই হুকুম নবাব নাজিমের নিকট পৌছিবে কি না তাহাও অনিশ্চিত এবং কতকাল গৌণ হইবে তাহাও অনিশ্চিত। সেই ভরসায় রাজ্য ছাড়িয়া দিয়া বেদখল হওয়া কদাচ কর্ত্তব্য নহে। যদি এক মাস মধ্যেই দেওয়ানজীর আদেশ মত সমস্ত কার্য্য হয় তবে সেই এক মাস আমরা রাজ্যরক্ষা করিতে পারিব। সে ভার আমি লইতে সম্মত আছি। সাতটি দুর্গ ও গভীর পরিখা দ্বারা সুরক্ষিত এই রাজধানী একমাস কাল রক্ষা না করিতে পারি এমন দুর্ব্বল আমরা নহি। যাবৎ আমি ও পাঠান চাচা জীবিত থাকিব তাবৎ পলায়ন করা হইবে না। জলপথ খোলা আছে আমাদের অভাবে যাহার ইচ্ছা সে পলায়ন করিতে পারিবে। পূর্ব্বে মহারাজ বলিয়াছেন, বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্র ভূমিও দিব না। এতদিন বাহুবলেই রাজ্যরক্ষা করিয়াছি বরং বেশী দখল করিয়াছি। এখন কাপুরুষের মত পলাইব না। ভাগ্যে যাহা থাকে তাহাই হইবে।"

কাম্‌তার খাঁ গৌরকে বক্ষে ধারণ করিয়া কহিল, "বাবাজীর যে মত আমারও তাই। যাহার ভয় হয় সে পলায়ন করুক। আমি ও কুমার সাহেব কদাচ পলাইব না এবং বিনা যুদ্ধে এক অঙ্গুলি ভূমিও ছাড়িয়া দিব না।"

মর্দনসিংহ এবং বক্তিয়ার খাঁ সেই মতের পোষকতা করিল। পুরোহিত ঠাকুর বলিলেন, "রাণীদেরও এই মত, বিশেষতঃ ছোটরাণী জিদ করিয়া বলিয়াছেন, যদি সকলে পলায় তথাপি তিনি নগর ছাড়িবেন না। তিনি যুদ্ধ করিয়া মরিবেন তথাপি পলাইবেন না। আমি বিবেচনা করি যে পাঁচ হাজার নবাবী রেশালা পাইয়া রামজীবনের শক্তি খুব বেশী হয় নাই। এতদিন নাটোরীয় সেনা একটাকিয়ার নিকট পদে পদে পরাস্ত হইয়াছে এখন তাহারা সমকক্ষ হইবে অথবা কিছু প্রবল হইবে। কিন্তু তাহাদের বিরুদ্ধে এই সুরক্ষিত পুরী রক্ষা করা অসাধ্য হইবে না। সুতরাং নগর রক্ষা করাই উচিত। রাজ্য ত্যাগ করিলে আর পাওয়া যাইবে না। দৈববাণী আমাদের অনুকূল। অতএব যুদ্ধ বা সন্ধি কর, কদাচ পলায়ন করা কর্ত্তব্য নহে।"

রূপ খাঁ সেনাপতিগণের মত শুনিয়া পরম সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি মহোৎসাহে যুদ্ধের আয়োজন করিতে আদেশ দিলেন। তিনি দুই বৎসর যাবৎ সমস্ত ব্যসন ত্যাগ করিয়াছিলেন এখন কার্য্যদক্ষ বীরপুরুষের ন্যায় নিজে সমস্ত গুরুতর কার্য্যে ব্রতী হইতে প্রতিজ্ঞা করিলেন। তিনি গোকুল ও রতনকে ভীতজ্ঞানে স্থানান্তর গমনে অনুমতি দিলেন। তাঁহারা লজ্জিত হইয়া কহিলেন, "আমাদের জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে যাহা মহারাজের হিতকর তাহাই বলিয়াছি। আমরা আত্মজীবনের জন্য ভীত নহি। যদি যুদ্ধ করাই স্থির হইল তবে আমরাও যুদ্ধকার্য্যেই ব্রতী হইব। সর্দার সাহেব বা কুমার সাহেবের ন্যায় আমরা মহাবীর নহি বটে তথাপি আমাদের ক্ষুদ্র সাধ্যে যতদূর পারি চিরা প্রতিপালক মহারাজের সাহায্য করিব। যুদ্ধে প্রাণ দিব তথাপি মহারাজকে ছাড়িয়া কুত্রাপি যাইব না।

যুদ্ধ করা নিশ্চিত হওয়ায় তদনুরূপ আয়োজন হইতে লাগিল। দুর্গ ও প্রাচীর সম্পূর্ণ মেরামত করিয়া দৃঢ়ীভূত করার জন্য কার্য্যদক্ষ লোক নিযুক্ত হইল। পরিখা সংস্কার করা হইল। তদুপরিস্থ পুল ভাঙ্গিয়া ফেলা হইল। নগরের উপকণ্ঠবর্ত্তী চড়াতে যে সকল সামান্য কুটীর বা গৃহাদি ছিল তাহা স্থানান্তর করিয়া সমস্ত চড়া শূন্যমাঠ করা হইল। অস্ত্র, বস্ত্র, খাদ্য প্রচুর সংগ্রহ করা হইল। জলপথে রসদ, সেনাসংগ্রহ ও সমাচারচালন জন্য পূর্ব্ববঙ্গ হইতে চল্লিশখানা সুদৃঢ় ও দ্রুতগামী নৌকা আনিয়া রাখা হইল। গোকুল বৃদ্ধ কালে সিপাহী সাজিলেন। রাজা রূপেন্দ্রনারায়ণ সর্ব্বপ্রকার বিলাস ব্যসনাদি ত্যাগ করিয়া দিবারাত্র কঠিন পরিশ্রমপূর্ব্বক সর্ব্ব কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। গৌর ও গোকুল যথাসাধ্য সমস্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য আয়োজন করিতে লাগিলেন। গোকুলের সহ সদ্ভাব হইবার পর রতন 'মুখ্যা সাহেব' উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। তিনিও প্রাণপণে রাজার সাহায্য করিতে লাগিলেন। সেনাপতি বক্তিয়ার খাঁ, কামতার খাঁ, মর্দন সিংহ স্ব স্ব সেনা লইয়া নাটোরের জমিদারী ছারখার করিতে লাগিল এবং অবসর মত সৈন্যগণকে নূতন নূতন যুদ্ধকৌশল শিক্ষা দিতে লাগিল। ধুমধামে দেবসেবা চলিল। পুরোহিত ও রাণীরা দিবারাত্রি তপস্যা করিতে লাগিলেন; দর্গা মস্‌জীদে মুসলমান মোল্লা, খোন্দকার ও ফকীর দরবেশগণ রাজার মঙ্গলার্থে কোরাণ পাঠ ও সিন্নিদান

করিতে লাগিল। কোন বিষয়েই কোন ত্রুটি সাধ্যমত রাখা হইল না। নির্ব্বাণ-কালীন দীপশিখার ন্যায় একটাকিয়ার প্রভাব ঝাঁকিয়া উঠিল।

একদিন বৈকালে হঠাৎ সাতগড়ার উত্তর দিকে বিলের মধ্যে অনেকগুলি নৌকা দৃষ্ট হইল। বিপক্ষেরা নৌকাপথে আসিতেছে বিবেচনায় নগরে মহা কোলাহল হইল। ক্ষণমধ্যে সেনারা দুর্গের বুরুজে উঠিয়া বিপক্ষের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। জলকারসমূহও সৈন্যে বোঝাই হইল। ইতিমধ্যে আগন্তুক নৌকার বহর হইতে একখানি মাত্র নৌকা শ্বেত নিশান উড়াইয়া দ্রুতবেগে নগরের দিকে আসিল। রূপ খাঁর জলকার মধ্য হইতেও একখানি গোকুলের আদেশমত সেই নৌকার নিকট গেল। তখন জানা গেল যে, যুদ্ধ অপরিহার্য্য জানিয়া তাহিরপুরের রাজা একশত নৌকা বোঝাই করিয়া তিন হাজার সৈন্য এবং নানাবিধ যুদ্ধসামগ্রী ভগিনীপতির সাহায্যার্থে পাঠাইয়াছেন। শ্বেত নিশান উচ্ছ্রিত অগ্রবর্ত্তী নৌকায় কুমার সুরেশ্বর রায় স্বয়ং আছেন। তখন যুদ্ধের হুহুঙ্কার থামিল। বিপদের প্রাক্কালে এরূপ অপ্রার্থিত সাহায্য লাভে রূপ খাঁ পরম সন্তোষলাভ করিলেন। সমস্ত নগরে আনন্দধ্বনি হইল। স্বয়ং লালা সাহেব এবং কুমার গৌরচন্দ্র অগ্রসর হইয়া সুরেশ্বরের যথোচিত অভ্যর্থনা করিলেন। রূপেন্দ্র ও কামতার খাঁ রাজবাটীর দ্বারদেশে আসিয়া সুরেশ্বরের সহ কোলাকুলি করিলেন। বাদ্যধ্বনি ও জয়ধ্বনিতে সমস্ত নগর প্রতিধ্বনিত হইল এবং দিগ্বিদিগ্ পরিপূর্ণ হইল। মিত্রসেনা সমাদরে গৃহীত হইল। তাহাদের নেতা কালীপ্রসাদ তেওয়ারীকে রূপ খাঁ নিজ দলবল সহ প্রচুর সম্মান করিলেন। নানারূপ আনন্দ উৎসাহে রাত্রিকাল অতিবাহিত হইল।

পরদিন প্রাতঃকৃত্য সম্পন্ন করিয়া সুরেশ্বর সমরচর্চ্চায় বাহির হইলেন। তিনি সমস্ত নগর, দুর্গ, প্রাচীর, পরিখা, ভাণ্ডার, সৈন্য, অস্ত্র, বস্ত্র, খাদ্য, বাদ্য, প্রকাশ্য ও গুপ্ত সমস্ত স্থান দেখিলেন। তিনি সৈন্যসামন্ত, প্রজাভৃত্য, সমস্ত লোকের মতি গতি পরীক্ষা করিয়া পরম সন্তোষ লাভ করিলেন। তিনি দেখিলেন কোন বিষয়েই উদ্যোগের কোন ত্রুটি নাই। রাজা রূপেন্দ্রনারায়ণ সর্ব্বপ্রকার বিলাস ব্যসন ত্যাগ করিয়া অবিশ্রান্ত নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতেছেন। পারিষদগণ মধ্যে পূর্ব্বে যে অনৈক্য ও দলাদলি ছিল এখন তাহার লেশ মাত্র

নাই। সকলেই একান্ত মনে মহোৎসাহে প্রভুর হিতসাধনে ব্রতী হইয়াছে। সমস্ত প্রজা ও ভৃত্যগণ রাজার জন্য ধন প্রাণ সর্ব্বস্ব দিতে প্রস্তুত। সৈন্য ও সেনানীগণ সকলেই সুসজ্জিত, রণদক্ষ, উৎসাহী এবং একান্ত প্রভুভক্ত। সুরেশ্বর আনন্দে গদগদ হইয়া সকলকে ধন্যবাদ করিলেন। তিনি স্পষ্ট বলিলেন, "যেমন একটাকিয়ারা বংশানুক্রমে সুযোগ্য প্রভু তেমনই তাঁহাদের সুযোগ্য প্রজা ও ভৃত্য। ইহাদের ভরসাতেই খাঁ সাহেব যুদ্ধের পক্ষপাতী। এ সৈন্য পরাজয় করা রাজা রামজীবনের সাধ্য নাই। পাঁচ ছয় হাজার নবাবী সৈন্য সহায় হইলেও তিনি একটাকিয়ার বিক্রম খর্ব্ব করিতে পারিবেন না। আমার একমাত্র ভয় এই যে, নবাব নাজিম যদি তাঁহার সমস্ত সেনা দ্বারা নাটোর রাজের সহায়তা করেন তবেই অসাধ্য বিপদ হইবে নতুবা কোন ভয় নাই।" তাহার পর সুরেশ্বর ঠাকুরবাড়ী গিয়া পুরোহিত ও রাণীদের নিকট যুদ্ধের আয়োজনের প্রশংসা করিয়া খুব ভক্তিপূর্ব্বক দেবসেবা করিতে বলিলেন। নিজেও পূজা দিলেন এবং ভাবী বিজয়ের জন্য পূজা মানস করিলেন।

রূপ খাঁ চাটমহর লুঠ করার পর মহেশ্বর রায় জমিদারীর মালগুজারী চালাইতে পারিলেন না। তাঁহার পরগণা সোণাবাজু নিলাম হওয়ায় অমনি রঘুনন্দন তাহা রামজীবনের পক্ষে খরিদ করিলেন। রাজা রামজীবন তাহা অনায়াসেই দখল করিলেন। রূপেন্দ্রকে প্রতিহিংসা করার জন্য মহেশ্বর রামজীবনের শরণাগত হইলেন। দয়ারাম জানিতেন মহেশ্বর একটাকিয়ার গৃহভেদী শত্রু। এজন্য তিনি নিজ প্রভুকে মহেশ্বরের জন্য সুপারিস করিলেন। মহেশ্বর নাটোররাজ কর্ত্তৃক সমাদরে গৃহীত হইয়া বিবিধ প্রকারে একটাকিয়ার অনিষ্ট চেষ্টা করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মীকান্ত সান্যাল, সাঁতোড়ের প্রভুভক্ত কায়স্থদের সাহায্যে ১২০০ সৈন্য সংগ্রহ করিয়া রূপ খাঁর সহ যোগ দিলেন; মহেশ্বর একদল নাটোরীয় সৈন্য লইয়া পথিমধ্যে লক্ষ্মীকান্তকে আক্রমণ করিলেন। তিনি লক্ষ্মীকান্ত ও তাঁহার অনুযাত্রী ব্রাহ্মণদিগকে বন্দী করিয়া নাটোরে আনিলেন। কিন্তু অপর সমস্ত লোকদিগকে অতি নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করিলেন।

রঘুনন্দন কামান বন্দুকাদি আগ্নেয় অস্ত্রে সুসজ্জিত নবাবী রেশালা সহ

নাটোরে পৌঁছিলেন। রামজীবন হৃষ্টচিত্তে কনিষ্ঠের নিকট আনুপূর্ব্বিক সমস্ত অবস্থা বলিলেন। সেই দিনই সন্ধ্যার পর ইতি কর্ত্তব্যতা নির্দ্ধারণ জন্য একটি গুপ্ত সভা হইল। তাহাতে মহারাজ রামজীবন, রঘুনন্দন, গুণাকর রায়, দয়ারাম এবং মহেশ্বর রায় এই পাঁচ জন ভিন্ন অন্য লোক কেহ থাকিল না। রঘুনন্দন কহিলেন, "উভয় পক্ষ হইতেই সন্ধির প্রস্তাব হইয়াছিল। তাহাতে কুফল সুফল হয় নাই। এক্ষণে তাহিরপুরের রাজা এক প্রকার সন্ধির প্রস্তাব করিয়াছেন। তাঁহার দেওয়ান রামানন্দ মৈত্র, ঘটক ও পুরোহিত সহ আমার নিকট গিয়া রাজার চিঠি দিয়া বলিলেন যে, 'উভয় পক্ষ ব্রাহ্মণ আপনাদের মধ্যে যেরূপ যুদ্ধ, বিবাদ দাঙ্গা চলিতেছে তাহাতে ব্রহ্মহত্যাদি মহাপাপ অবশ্যই হবে। তদপেক্ষা যদি সসম্মানে সন্ধি হইতে পারে তাহাই কর্ত্তব্য।' আমি বলিলাম, প্রথমাবধিই সন্ধির চেষ্টা হইয়াছে কিন্তু সন্ধি হয় নাই। এখন বিবাদ বেশী হইয়াছে পরস্পরের অনিষ্ট ও অপমান যথেষ্ট করা হইয়াছে। এখন সন্ধি অসম্ভব। পুরোহিত ঠাকুর কহিলেন, 'এখনই সন্ধির উপযুক্ত সময়। এখন উভয় পক্ষই বুঝিয়াছেন যে বিপক্ষ অতি প্রবল তাহাকে নিরস্ত করা সহজ নহে। সুতরাং মানহানি বিনা সন্ধি হইতে পারিলে উভয়েই সম্মত এবং সুখী হইবেন।' আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, কি পণে সন্ধি করিতে আপনাদের অভিপ্রায়? ঘটক ঠাকুর বলিলেন, 'বৈবাহিক সম্বন্ধ দ্বারা। কাটাকাটি, দাঙ্গা হাঙ্গামা এসব অনেক হইয়াছে বটে কিন্তু সমস্তই চাকরের উপর দিয়া গিয়াছে, অর্থহানিও হইয়াছে অথচ ইহাতে কোন রাজার বা তাঁহাদের কোন আত্মীয়ের গায়ে আঘাত লাগে নাই। অথচ উভয় পক্ষই বুঝিয়াছেন যে যুদ্ধ চলিতে থাকিলে ব্রহ্মহত্যাদি মহাপাপ ব্যতীত এ যুদ্ধের শেষ নাই। সুতরাং এই সময়ে বৈবাহিক সম্বন্ধ দ্বারা বিবাদানল স্নিগ্ধ করা উভয় পক্ষেরই মঙ্গল। আপনাদের বৈষয়িক উন্নতির পরাকাষ্ঠা হইয়াছে। এক্ষণে কুলমর্য্যাদা বৃদ্ধি করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। যদি কুলপতি নৃসিংহ সান্যালের পুত্র কাশীদাসের সহ আপনকার কন্যার শুভ বিবাহ দিতে ইচ্ছা করেন তবে আমরা তাহা ঘটাইতে পারি এবং সেই সঙ্গে সমস্ত বিবাদ মিটাইতে পারি।' ঘটক ঠাকুরের প্রস্তাব আমার মনঃপূত হইল। আমি মহারাজের অনুমতি সাপেক্ষে তাঁহাদিগকে বিদায় দিয়াছি। আমি নবাব নাজিমের নিকট হইতে যে জঙ্গী ফৌজ লইয়া আসিয়াছি

তাহাদের সাহায্যে একটাকিয়ার দুর্দান্ত সেনা পরাজয় করা যাইবে কিন্তু সাতগড়া দখল করা বড় সহজ কথা নয়। বিশেষতঃ নবাব দেওয়ান একটাকিয়ার পক্ষ হইয়াছেন। তিনি লালা গোকুলের নিকট প্রচুর টাকা ঘুষ খাইয়াছেন, তাহাকে প্রচুর আশ্বাসও দিয়াছেন। যুদ্ধের শেষ ফল আমার বিবেচনায় ভাল নয়। যদি এত বড় একটা কুলকার্য্য করিয়া এই বিবাদ মিটাইতে পারি তবে তাহাই সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। এখন মহারাজের অনুমতি হইলেই তাহিরপুরে দূত পাঠাইতে পারি।"

লক্ষ্মীকান্ত সান্যালকে মুক্ত করার জন্য গুণাকর রায় অতিমাত্র ব্যগ্র ছিলেন। তিনি শান্তিময় রাজ্য সুশাসনে যেমন পটু ছিলেন যুদ্ধকার্য্যে তেমন সুদক্ষ ছিলেন না। সুতরাং তিনি উক্তরূপ সন্ধির প্রস্তাব সম্পূর্ণ সমর্থন করিলেন।

মহেশ্বর রায় দেখিলেন সন্ধি হইলে তাঁহার সকল উদ্দেশ্যই বিফল হইবে। যুদ্ধ চলিলে তিনি রূপেন্দ্র ও গোকুলের বিবিধ প্রকার অনিষ্ট করিয়া নিজ অধঃপতনের প্রতিফল দিতে পারিবেন এবং মহারাজা রামজীবনের অনুগ্রহে কিছু জমিদারী তালুকদারী লাভ করিয়া স্বচ্ছন্দে জীবিকানির্ব্বাহ করিতে পারিবেন। নতুবা চাকরী কিম্বা ভিক্ষা ব্যবসায় করিতে হইবে। এজন্য যাহাতে সন্ধি না হয়, তিনি প্রাণপণে তাহাই চেষ্টা করিলেন। তিনি কহিলেন, "নৃসিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্র কাশীদাস স্বর্গীয় উপেন্দ্রনারায়ণ খাঁর দৌহিত্র নহে। সে নরোত্তম লাহিড়ীর দৌহিত্র। তাহার সহ রায় রাইয়াঁ সাহেবের কন্যার বিবাহ দিলে বিবাদ মীমাংসা হওয়ার আশা নাই। বিশেষতঃ রূপ খাঁর মহামন্ত্রী একটা কটা কায়েত আছে। সেই হারামজাদাই সকল অনিষ্টের মূল। সর্ব্বমঙ্গলাকে স্বর্গীয় খাঁ সাহেব কিঞ্চিৎ সম্পত্তি দিয়াছিলেন। গোকুল তাহা কাড়িয়া লইয়াছে। রূপেন্দ্র নির্ব্বোধ এবং গোঁয়ার। সে নাম মাত্র রাজা, ঐ সয়তান কায়েতটাই সমস্ত কার্য্যকর্ত্তা। যখন খোদ সর্ব্বমঙ্গলার সঙ্গেই এইরূপ ভাব তখন তার সপত্নীপুত্রের সহ বৈবাহিক সম্বন্ধ দ্বারা সদ্ভাব স্থাপন অসম্ভব। এখন নবাবী রেশালা আপনকার সাহায্যার্থ আসিয়াছে দেখিয়া গোকুল শান্তভাব ধারণ করিতে পারে কিন্তু সে ফৌজ ফিরিয়া গেলে নিশ্চয়ই আবার বিবাদ আরম্ভ হইবে। তখন পুনরায় নবাবী সাহায্য পাইবেন না। তখন বহু ক্ষতি, বহু অনিষ্ট হইবে। রামানন্দ মৈত্র অতি কুটিল লোক।

বোধ হয়, সে গোকুলের পরামর্শ মতেই এই প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছে। *আমি যাহা অনুমান করিলাম বোধ হয়, তাহাদের অভিপ্রায়ও তদ্রূপ। এখন কাশীদাসের অন্য অভিভাবক নাই। সর্ব্বমঙ্গলাই তাহার অভিভাবিকা। সে আমার ভাগিনেয়ী। যদি কুলপতির ঘরে কন্যাদান করাই ইচ্ছা হয় তবে আমি তাহা ঘটাইয়া দিব। অন্য কাহারও কোন সাহায্য নিষ্প্রয়োজন। বরং একটাকিয়ার বিক্রম অব্যাহত থাকিলে অনেক বিঘ্ন হইতে পারে। যখন গোকুল ও পাঠান সর্দারগণ বিনষ্ট হইবে তখন রূপ খাঁর গর্ব্ব চূর্ণ হইবে, আপনাদের প্রভুত্ব বর্দ্ধিত হইবে, তখন একটাকিয়ার বংশ এবং কুলপতি বংশ সকলেই আপনাদের সহ কুটুম্বিতা করিতে আগ্রহ করিবে। আমি বিবেচনা করি বৈবাহিক সম্বন্ধ করার সেইটি উপযুক্ত সময়, এখন প্রকৃত সময় নহে।

রঘুনন্দন কিঞ্চিৎ বিরক্তভাবে কহিলেন, "কেহ শত্রু হউক বা মন্দ লোকই হউক রাজসভায় তাহাকে অনাবশ্যক গালি দেওয়া সুনীতি বিরুদ্ধ। লালা গোকুল অতি সম্ভ্রান্ত বড়লোক। তিনি বিদ্বান, বুদ্ধিমান, কার্য্যদক্ষ এবং অতিশয় দাতা। তাঁহাকে সকলেই জানে এবং মানে আমরাও খুব জানি। পূর্ব্বে গোকুল সাহেব আমাদেরও অনেক উপকার করেছেন। তাঁকে অকারণ গালি দেওয়া সর্ব্বথা দূষ্য। তিনি একটাকিয়ার মৌরসী চাকর সুতরাং নিজ প্রভুর হিতসাধন তাঁহার একান্ত কর্ত্তব্য কার্য্য। সেই উদ্দেশ্যে তিনি আমাদের অনিষ্ট করিলে আমরা তাহা অপকর্ম্ম বলিতে পারি না। অতএব তাঁহাকে গালাগালি না দেওয়াই সঙ্গত। আমি বলি, গালাগালি না দিয়া কি পরামর্শ হয় না?"

দয়ারাম রায় কহিলেন, "অবস্থা পরিবর্ত্তনে রাজা সাহেবের মন খারাপ হইয়াছে। সেই জন্য অনিষ্টের মূলীভূত লালা গোকুলকে উগ্র বাক্য বলেছেন, এজন্য তাঁহাকে ক্ষমা করাই উচিত। তদ্ভিন্ন তিনি অন্যান্য পরামর্শ যাহা দিলেন তাহা বেশ যুক্তি সঙ্গত। এই সুযোগে একটাকিয়ার দুর্দ্দান্ত পাঠানগুলিকে বিনষ্ট না করিলে পরে বহুল অনিষ্ট হইবে। কাশীদাসের সহ কন্যার বিবাহ দিলে বিবাদ নিবৃত্তির কোনই কারণ নাই। এরূপ কুলকার্য্য খুব ভাল বটে। কিন্তু তাহা কিছুদিন পরেও করা যাইতে পারে। পাত্র

ও কন্যা উভয়েরই বয়স অল্প। ব্রাহ্মণকন্যার বিবাহ একটু বেশি বয়সে দেওয়াই ভাল। এজন্য আমার পরামর্শ এই যে আগে একটাকিয়ার গর্ব্ব থর্ব্ব করিয়া তাহার পর কন্যার বিবাহ দিবেন। নাজিমের রেশালা আনিতে বহুব্যয় পড়িয়াছে। তাহারা একবার ফিরিয়া গেলে আর আনাইতে পারিবেন না। তখন রূপ খাঁ নাটোর পর্য্যন্ত লুঠ করিবে কেহ ঠেকাইতে পারিবেন না। একটাকিয়ার সহ বিবাদ হেতু কাশীদাসের সহ কন্যার বিবাহ দিতে কোনই বাধা হইবে না। বিশেষতঃ রাজা মহেশ্বর, ঠাকুর রামনাথ বাগছি, ঠাকুর লক্ষ্মীকান্ত সান্যাল আমাদের হাতে আছেন। আমি তাঁহাদের সাহায্যেই বিবাহ কার্য্য পরম সুখে সম্পাদন করিতে পারিব। অন্য কেহ বিরোধী হইয়াও কিছু করিতে পারিবে না।"

রূপেন্দ্র যেরূপ গোকুলের বাধ্য ছিলেন, রামজীবনও তদ্রূপ দয়ারামের বাধ্য ছিলেন। বিশেষ এই যে রূপেন্দ্র গোকুলকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় মান্য করিতেন, রামজীবন দয়ারামকে সন্তানের ন্যায় বাৎসল্য করিতেন। দয়ারাম যাহা বলিলেন রামজীবন তাহাই পছন্দ করিলেন। কিন্তু রঘুনন্দনের মতের বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে একবারেই আদেশ না দিয়া, তিনি কহিলেন, "যাহা রাজা মহেশ্বর ও দয়ারামের মত আমার বিবেচনায় তাহাই ঠিক। নবাবী রেশালা আমাদের পক্ষে সাহায্যার্থ আসিতেছে শুনিয়া রামানন্দ ও গোকুল শান্তিস্থাপনের ভাণ করিয়াছে। কাশীদাসের সহ কন্যার বিবাহ দেওয়া আমিও খুব পছন্দ করি। কিন্তু তদ্দ্বারা একটাকিয়ার সহ কোন গুরুতর কুটুম্বিতা হইবে না। সুতরাং স্থায়ী সন্ধিও হইবে না। নবাবী ফৌজ ফিরিয়া গেলেই অমনি রূপ খাঁ আবার দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিবে। আমার সৈন্য সংখ্যা অধিক বটে কিন্তু তাহারা একটাকিয়ার দুর্দ্দান্ত পাঠান-দিগকে নিবারণে অসমর্থ ইহা বারম্বার প্রত্যক্ষ পরীক্ষা করা হইয়াছে। রূপ খাঁ যদি গোকুল ও কামতার খাঁকে প্রতিভূ স্বরূপ দেন তবে আমি মৈত্রজীর প্রস্তাবিত ক্ষতিপূরণ লইয়া ভাদুড়ীচক্র ছাড়িয়া দিতে পারি অথবা কোন ক্ষতিপূরণ ব্যতীত অর্দ্ধ জাগীর ছাড়িয়া দিতে সম্মত আছি। আমি ঐ দুই জনকে এখানে নজরবন্দী আটক রাখিলে সন্ধি ও শান্তি স্থায়ী হইতে পারে। নতুবা আমি কোন সন্ধির উপর বিশ্বাস করিয়া নিজ সুযোগ হারাইব না।"

রাজার অভিপ্রায় অনুযায়ী প্রস্তাব সুযোগ্য দূতযোগে তাহিরপুরে প্রেরিত হইল। এদিকে নাটোরে ধূমধামে জয়কালীর পূজা দিয়া দৈববাণী প্রতীক্ষা করা হইল। তিন দিন ধন্না দিয়া থাকার পর দৈবপ্রত্যাদেশ হইল যে, "যুদ্ধ অবশ্য হইবে, একটাকিয়ার নাম ও রাজপাট বিলুপ্ত হইবে, ভাদুড়ীরাজ্য নাটোর রাজ্যের সামিল হইবে, কোন পক্ষেরই সুমঙ্গল হইবে না।" পরদিনই তাহিরপুর হইতে দূত ফিরিয়া আসিল। আনীত প্রত্যুত্তরে জানা গেল যে রূপেন্দ্র প্রতিভূ দিয়া সন্ধি করিতে সম্মত হন নাই। সুতরাং যুদ্ধ অপরিহার্য্য জানিয়া মহারাজা রামজীবন সমস্ত লস্করদিগকে প্রস্তুত হইতে আদেশ দিলেন।

রঘুনন্দন, গুণাকর বা দয়ারাম কেহই বীরপুরুষ ছিলেন না। মহেশ্বরের পরামর্শ মত মহারাজ তাহাদিগকে যুদ্ধক্ষেত্রে না লইয়া নাটোরে রাখিয়া গেলেন। জমিদারী শাসন, মালগুজারী পরিশোধ, প্রয়োজনীয় সমাচার চালান এই তিন কার্য্যভার রঘুনন্দন ও গুণাকরের প্রতি অর্পিত হইল। অস্ত্র, বস্ত্র, খাদ্য, বাদ্য, যান ও বাহন সংগ্রহের ভার দয়ারামকে দিলেন। প্রায় চল্লিশ হাজার যোদ্ধা লইয়া মহারাজ স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহার সেনানী মধ্যে রঘুনন্দনের পুত্র কুমার ভবানীপ্রসাদ রায়, ভূমিশূন্য রাজা মহেশ্বর রায়, আনন্দরাম শুকুল (শুক্ল), বাহাদুর সিংহ, গাজী খাঁ, এলদোস খাঁ এবং বাল্লক সর্দার প্রসিদ্ধ। আর নবাবী সেনার অধ্যক্ষ হাইদর খাঁ উৎকৃষ্ট কামান বন্দুকাদি আগ্নেয় অস্ত্রে সজ্জিত নবাবী রেশালা লইয়া মহোৎসাহে চলিল। বাল্লক সর্দার জাতিতে চণ্ডাল। সে মেনা-ধনার ভগিনীপতি। সে পূর্ব্বে সীতারাম রায়ের পক্ষে ছিল। সীতারাম বন্দী হইলেও বাল্লক সর্দার রাজা রামজীবনের বিরুদ্ধে তিন বৎসর যুদ্ধ চালাইয়াছিল। রামজীবন তাহার বীরত্ব দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া তাহাকে নিজের সেনাপতি হইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। উভয়ে গঙ্গাজল হস্তে লইয়া পরস্পরের হিতার্থী হইতে প্রতিজ্ঞা করিলেন। তদবধি যশোহরের চণ্ডাল সৈন্য লইয়া বাল্লক সর্দার রামজীবনের সেনাপতি হইল। তাহারই বিক্রমে রামজীবন নাটোর নগর রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন। নতুবা একটাকিয়ার পাঠানে নাটোর পর্য্যন্ত দখল করিত; কোন হিন্দুস্থানী বা মুসলমান সিপাহী কামতার খাঁর সম্মুখে দাঁড়াইতে পারিত

না। ইংরেজেরা বিবেচনা করেন যে, বাঙ্গালী হিন্দুরা নিতান্ত দুর্ব্বল ও ভীরু ছিল, তাহা ভুল। বাঙ্গালী শড়্‌কিওয়ালা, লাঠিয়াল ও তীরন্দাজগণ বিলক্ষণ যোদ্ধা ছিল। তখনকার বন্দুক আধুনিক বিলাতী বন্দুকের ন্যায় উৎকৃষ্ট ছিল না। তখন তীরন্দাজ, লাঠিয়াল এবং শড়্‌কিওয়ালারা বন্দুকধারীদিগকে ভয় করিত না। বরং অনেক সময়েই তাহাদিগকে পরাস্ত করিতে পারিত।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়

রামজীবনের সাতগড়া আক্রমণ।—রূপেন্দ্রের সহ যুদ্ধ।—রূপেন্দ্রের মৃত্যু।—গোকুলের বন্দীদশা।

মহারাজা দীর্ঘকায় * রামজীবন এখন আর খণ্ডযুদ্ধ না করিয়া একবারে সাতগড়া আক্রমণ করিয়া যুদ্ধ শেষ করিতে মনস্থ করিলেন। তাঁহার সেনাদল পূর্ব্ব পরাজয়ের প্রতিশোধ দিবার জন্য মহোৎসাহে অগ্রসর হইল। তাহারা সাতগড়ার নিকটবর্ত্তী স্থলভাগে গিয়া ছাউনী করিল। গোকুল বিপক্ষের অভিপ্রায় বুঝিয়া রূপ খাঁকে সমস্ত সেনা সাতগড়ায় একত্র করিতে পরামর্শ দিলেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে তাহাই করা হইল। নাটোরীয় সেনা দুই দিন পর্য্যন্ত চেষ্টা করিয়া সাতগড়ার বিল পার হইতে পারিল না এবং পরেও পারিত না। কিন্তু গৃহভেদী শত্রু মহেশ্বর রায় পথ দেখাইলেন। আস্কন্দীরা সেই পথে পার হইয়া সাতগড়ার পশ্চিম পার্শ্বের চড়াতে উপস্থিত হইল। সেনাদল বিল পার হইয়া অতিশয় শ্রান্ত হইয়াছিল। রামজীবন সৈন্যদিগকে বিশ্রাম

* রাজসাহীর কালেক্টারীতে "মহারাজা রামজীবনের হাতকাঠির" একটি মাপ আছে, তাহা ২২ ইঞ্চি। তাহাই যদি প্রকৃতপ্রস্তাবে রামজীবনের হাতের মাপ হয়, তবে তিনি যে সবিশেষ "দীর্ঘকায়" ছিলেন, তাহা সকলেরই স্বীকার করিতে হইবে।

করিতে সময় দিলেন। ছাউনী করা হইল এবং তৎসঙ্গে নগর আক্রমণের উদ্যোগ ও পরামর্শ করা হইল। হাইদর খাঁর অধীনে নবাবী সেনা মধ্য-ভাগ আক্রমণ জন্য মধ্যস্থানে স্থাপিত হইল। রামজীবনের নিজ সেনা দুইভাগ করা হইল। মহেশ্বর রায় অর্দ্ধভাগ সহ নবাবী সেনার দক্ষিণে এবং ভবানী রায় অপরার্দ্ধ সহ নবাবী সেনার বামপার্শ্বে ধাবিত হইলেন। মহারাজ রামজীবন একশত অশ্বারোহী সহ সমস্ত দিক পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার সেনাগণ মহোৎসাহে হুহুঙ্কার করত জয়ধ্বনিতে দিগ্দেশ প্রকম্পিত করিল।

এদিকে রূপ খাঁও নিশ্চিন্ত ছিলেন না। তিনি সমস্ত সৈন্য ও সেনাপতি-গণকে সমবেত করিয়া অতি গম্ভীর স্বরে কহিলেন, "প্রভুভক্ত বীরগণ! আজ একটাকিয়ার ধন, মান, প্রাণ রক্ষার জন্য তোমাদের বাহুবলের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর। বিগত তিন বৎসর তোমরা যেরূপ বীরত্ব ও প্রভুভক্তি দেখাইয়াছ এবং যেরূপ দৈববাণী হইয়াছে তাহাতে আমাদের বিজয়ের সম্বন্ধে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। অল্প কিছু নবাবী সেনা বিপক্ষে আসিয়াছে শুনিয়া তোমরা কিছুমাত্র ভীত হইও না। সে সংবাদও সত্য বলিয়া বোধ হয় না। যদি সত্যই হয় তাহাতেও কোন ভয়ের কারণ নাই। ঘাটে নৌকা তৈয়ারী আছে যদি কেহ ভীত হইয়া থাকে সে এখনই পলায়ন করুক তাহাতেও আমার কোন আপত্তি নাই, কিন্তু যুদ্ধকালে কেহ ভঙ্গ দিলে অবশ্যই প্রাণদণ্ড হইবে।" তাঁহার পর গোকুল ও সুরেশ্বর যোদ্ধৃগণকে উৎসাহবর্দ্ধক বক্তৃতা করিলেন। অবশেষে কামতার খাঁ জলদগম্ভীর নিনাদে কহিল, "সিপাহী ও সর্দ্দারগণ! এই রাজবংশ আমাদের পুরুষানুক্রমে প্রতিপালক। আমাদের রক্ত, মাংস, অস্থি, মজ্জা, সমস্ত শরীর একটাকিয়ার অন্নে গঠিত। লোকের বিপদ সর্ব্বদা হয় না। কিন্তু বিপদের আশঙ্কায় লোকে সর্ব্বদা সৈন্য পোষণ করে। আজ সকলে প্রভুভক্তি দ্বারা চালিত হইয়া প্রাণপণে এই বিপদে চিরপ্রতিপালক মহারাজের প্রত্যুপকার কর। ইহাতে ত্রুটি করিলে তোমাদের ইহকাল ও পরকাল নষ্ট হইবে। আমি সকলের অগ্রবর্ত্তী হইয়া যুদ্ধ করিব, কাহারও কোন ভয় নাই। সৈন্য মধ্যে যদি কেহ নিমকহারাম হারামজাদা থাকে তবে সে এখনই পলায়ন করুক। যুদ্ধকালে যে এক পা হটিবে আমিই তাহাকে অমনি খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিব।" গৌরচন্দ্র মহোৎসাহে জয়ধ্বনি করিলেন।

অমনি সমস্ত সেনা হুহুঙ্কারপূর্ব্বক জয়ধ্বনি করিল। সঙ্গে সঙ্গে রণবাদ্য হইল। জয়ধ্বনি, বাদ্যধ্বনি ও গর্জ্জনে সমস্ত নগর প্রতিধ্বনিত হইল।

রূপেন্দ্র সিংহাসন হইতে উঠিয়া সেনাপতিগণকে পাণচিনি বিতরণ করিলেন। তাহারা নিজ নিজ অধীন যোদ্ধৃগণকে পাণচিনি দিল। প্রয়োজন অনুযায়ী কার্য্যভার দিয়া সেনা ভাগ করা হইল। পশ্চিমদিকের মধ্যম দুর্গরক্ষার ভার কামতার খাঁর উপর অর্পিত হইল। অপর দুই দুর্গ রক্ষার জন্য গৌর ও বক্তিয়ার খাঁ নিয়োজিত হইলেন। দক্ষিণদিকের দুই দুর্গে মর্দন সিংহ ও রতন নেতা হইলেন। উত্তরের দুর্গ ও রাজবাটী রক্ষার ভার সুরেশ্বর লইলেন। পূর্ব্বদিকের দুর্গ রক্ষার্থ কালীপ্রসাদ তেওয়ারী প্রেরিত হইলেন। রূপ খাঁ ও গোকুল সমস্ত দিকে পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। সকলেই মহোৎসাহে স্ব স্ব নিয়ত কার্য্যে ব্রতী হইল। রণবাদ্য ও জয়ধ্বনিতে নগর পরিপূর্ণ হইল। রক্ষীগণ শত্রুর আক্রমণ প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। গোকুল মনে মনে যুদ্ধের শেষ ফল মন্দ নিশ্চয় করিয়া নিজ পরিবারগণকে দিনাজপুর পাঠাইতেছিলেন। দয়ারাম তাহা জানিতে পারিয়া রামজীবনের নিকট সংবাদ পাঠাইলেন। মহেশ্বর রায় তাহাদের আটক করার জন্য অবিলম্বে অশ্ব ও উষ্ট্রবাহী সাদী পাঠাইতে পরামর্শ দিলেন। ভবানী রায় গাজী খাঁ এবং এলদোস খাঁও সেই পরামর্শেই সায় দিলেন। কিন্তু মহারাজ রামজীবন প্রকৃত বীরপুরুষ ছিলেন। তিনি কহিলেন, "আমি স্ত্রীলোক ও বালকের সহ যুদ্ধ করি না। সীতারাম রায়ের পরিবার বন্দীভাবে আমার নিকট আনীত হইলে আমি সসম্মানে তাহাদিগকে মুক্ত করিয়াছি। সম্মুখযুদ্ধে যাহা হয় তাহাই ভাল। আমি লালা গোকুলের পরিবারগণকে কোনরূপ আটক বা বিড়ম্বনা করিব না।"

রাত্রি প্রভাতমাত্র যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কিন্তু অবিরত তিন দিন যুদ্ধ করিয়াও আস্কন্দীরা পশ্চিমদিকে কিছুমাত্র সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিল না। রামজীবন মহেশ্বরের নিকট ইতিকর্ত্তব্যতা জিজ্ঞাসা করিলেন। মহেশ্বর কহিলেন, "নগরের পশ্চিম ও দক্ষিণে বহুদিন যাবৎ চড়া পড়িয়াছে। সেই দিক দিয়া শত্রুর আক্রমণ সম্ভব জন্য ভূতপূর্ব্ব একটাকিয়া রাজারা উক্ত দুই দিকের পরিখা ও প্রাচীর অতিশয় দুর্ভেদ্য করিয়াছিলেন। এই দুই দিকে

দুর্গের সংখ্যাও বেশী। সুতরাং এই দুই দিক দিয়া অভ্যন্তর প্রবেশ করা সহজ ব্যাপার নহে। উত্তরদিকে প্রাচীরের নীচেই গভীর জল সে দিকেও আক্রমণ করিয়া কোন ফল নাই। কেবল পূর্ব্বদিক দিয়া হানা দিলেই নগরে প্রবেশ করা যাইতে পারে। নগর উত্তর দক্ষিণে লম্বা সুতরাং পূর্ব্বদিকের প্রাচীর প্রায় তিন পোয়া ক্রোশ লম্বা। অথচ পূর্ব্বদিকে কেবল একটি মাত্র দুর্গ আছে। পূর্ব্বে পূর্ব্বদিকে গভীর জল থাকিত এজন্য সে দিকের দুর্গ ও প্রাচীর তত দৃঢ় করা হয় নাই। পূর্ব্বদিকে কোন পরিখাও নাই। কিন্তু এখন পূর্ব্বদিকে স্থানে স্থানে কাঁচি চড়া জাগিয়া উঠিয়াছে, কোথাও বা জল অতি অল্প থাকে, গভীর জল প্রায় নাই। গোকুল অন্যান্য কাজে যেমন চতুর, যুদ্ধকার্য্যে সেরূপ নহে। আমি যতদূর জানি পূর্ব্বদিক এ পর্য্যন্ত দৃঢ় করিতে কোন চেষ্টা হয় নাই। সুতরাং সেই দিকে হানা দিলেই পাষণ্ডদিগের সহজেই দমন হইবে। কিন্তু পূর্ব্বদিকে যাওয়া বড়ই কঠিন। অন্ধকার রাত্রিতে অতি সঙ্গোপনে নিঃশব্দে দক্ষিণদিক ঘুরিয়া পূর্ব্বদিকে যাইতে হইবে। মহারাজ অর্দ্ধসেনা লইয়া একবার সে দিকে গেলেই নিশ্চয়ই জয়লাভ হইবে।"

এই পরামর্শ মহারাজ রামজীবন মনোনীত করিয়া নিজ অমাত্য ও সেনাপতিগণের মতামত জিজ্ঞাসা করিলেন। কুমার ভবানীপ্রসাদ রায় কহিলেন, "চুরি বিদ্যা বড় বিদ্যা যদি না পড়ে ধরা।" এলদোস খাঁ অমনি সঙ্গে সঙ্গেই বলিল, "কুমার বাহাদুর ঠিক বলেছেন। চুরি বিদ্যায় যত শীঘ্র রোজগার হয় তত অন্য কোন বিদ্যায়ই হয় না। কিন্তু ধরা পড়িলেই মুস্কিল। পূর্ব্বদিক দিয়া হানা দিবার সুবিধা খুব বটে কিন্তু পথে দক্ষিণ দুর্গের নিকট সংকীর্ণ স্থানে যদি বিপক্ষেরা টের পায় তবে নিশ্চয়ই সমস্ত সৈন্য মারা যাইবে।" রামজীবন নিজ কপালে হাত দিয়া কহিলেন, "তোমরা আমার ভাগ্যের উপর নির্ভর করিয়া চল, অদ্য রাত্রিতেই পূর্ব্বদিকে হানা দিব।" সেই পরামর্শ অন্যের নিকট ব্যক্ত করা হইল না। রাত্রি অন্ধকার ছিল। মেঘ হওয়ায় সেই আঁধার আরও ঘনীভূত হইল। রামজীবন কাল কাপড়ে যোদ্ধৃগণকে আবৃত করিলেন। তাহার পর নিজ উদ্দেশ্য প্রকাশ করিলেন। ভবানী রায় অল্পমাত্র সেনা সহ পশ্চিমে থাকিয়া কোলাহল করিতে লাগিলেন। রামজীবন

অধিকাংশ সেনা লইয়া নিঃশব্দে পূর্ব্বদিকে উপস্থিত হইলেন। রক্ষী সেনারা কিছুই টের পাইল না।

গৃহভেদী মহেশ্বর যাহা বলিয়াছিলেন, রামজীবন তাহাই প্রত্যক্ষ করিলেন। পূর্ব্বদিকে রক্ষী সেনা অল্প ছিল, প্রাচীর দুর্ব্বল ছিল এবং পরিখা ছিল না। আস্কন্দীরা পূর্ব্ব দুর্গের উত্তরে ও দক্ষিণে প্রাচীর ভগ্ন করিয়া স্রোতের ন্যায় নগরে প্রবেশ করিতে লাগিল। নগরে কোলাহল পড়িয়া গেল। তিনদিক হইতে কাতার কাতার রক্ষীসেনা পূর্ব্বদিকে চলিল। এদিকে হাইদর খাঁ ও বাল্লক সর্দার প্রচণ্ড বেগে পূর্ব্বগড় আক্রমণ করিল। কাশী তেওয়ারী নিহত হইলেন। পূর্ব্ব গড় রামজীবনের অধিকৃত হইল। রূপেন্দ্র স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে চাহিলেন। কামতার খাঁ ধমক দিয়া বলিলেন, "হঠে রহো, তুমি রাজা, তুমি মারা গেলে যত ক্ষতি হইবে, দশহাজার ফৌজ মরিলে তত ক্ষতি হইবে না।" তখন রূপ খাঁ, গোকুল ও সুরেশ্বর সহ কিছু দূরে থাকিয়া যোগান দিতে লাগিলেন। কামতার খাঁ ও গৌরচন্দ্র এক একদল সেনা সহ অগ্রসর হইলেন। কামতার খাঁ দক্ষিণ ফাঁড়ি হইতে এবং গৌর উত্তর ফাঁড়ি হইতে শত্রু নিষ্কাশিত করিতে লাগিলেন।

আধুনিক যুদ্ধে সেনানীরা বহুদূরে থাকিয়া কেবল হুকুম দেন মাত্র। তাঁহারা স্বয়ং অস্ত্র স্পর্শও করেন না। কিন্তু পূর্ব্বে সেনানীরা স্বয়ং যুদ্ধ করিতেন। ঘোর বিপদের সময় তাঁহারা স্বয়ং অগ্রসর হইয়া অধীন যোদ্ধাগণের সাহস বৃদ্ধি করিতেন। কামান বন্দুকাদি আগ্নেয় অস্ত্রের উন্নতি হওয়ায় পুরাতন বীরত্ব বিলুপ্ত হইয়াছে। আধুনিক যুদ্ধে শারীরিক বলের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। কামান বন্দুক পরিচালক দুর্ব্বল হউক বা সবল হউক গোলা-গুলি সমানই চলে। গোলা-গুলির বেগ ও বলের যে কিছু কম বেশী হয় সে কেবল বন্দুকাদির গুণে হয়, চালকের গুণে বা বিক্রমে কিছুই হয় না। অস্ত্রমুখ হইতে পলায়ন করা পূর্ব্বে কাপুরুষের লক্ষণ ছিল এবং বিপক্ষের অস্ত্রের প্রতিঘাত করাই বীরের কর্ত্তব্যকার্য্য ছিল। আধুনিক অমোঘ আগ্নেয় অস্ত্র প্রতিঘাত দ্বারা নিবারণ অসাধ্য। এজন্য আধুনিক যোদ্ধারা বিপক্ষের গুলির আঘাত এড়াইবার জন্য মাটীতে উপুড় হইয়া শুইয়া থাকে, প্রতিঘাতের কোন চেষ্টা করে না। যে কেহ বিপক্ষের আঘাত হইতে যত

শীঘ্র পলাইতে পারে আধুনিক যুদ্ধে সেই মহাবীর বলিয়া গণ্য হয়।

বর্ণনীয় সময়ে কামান বন্দুক ছিল বটে কিন্তু তাহার অবস্থা ও প্রয়োগ তত উত্তম ছিল না। তীর তরবারি দ্বারা তখনও গোলন্দাজদিগকে পরাজয় করা যাইত। কামতার খাঁ যখন 'আলি! আলি!' শব্দ করিয়া ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের ন্যায় লম্ফ দিয়া শত্রুব্যূহের মধ্যে পড়িলেন তখন তীরন্দাজ ও গোলন্দাজগণ স্বপক্ষ বিনাশ ভয়ে তাঁহার প্রতি তীর গুলি চালাইতে পারিল না। অথচ তাঁহার সুদীর্ঘ তরবারির চোটে দুই তিন জন লোক কাটা পড়িতে লাগিল। তাঁহার দৃষ্টান্তে প্রদীপ্ত হইয়া তাঁহার অনুচরগণও অসাধারণ বীরত্ব প্রকাশ করিল। আস্কন্দীগণ নগর মধ্যে তিষ্ঠিতে না পারিয়া ফাঁড়ির বাহিরে সরিয়া পড়িল। গৌরচন্দ্রও সেইরূপ শত্রুদিগকে নগর হইতে তাড়াইয়া দিলেন। যুদ্ধে সমস্ত দিন অতিবাহিত হইল। সন্ধ্যার পর রক্ষীগণ ভগ্ন প্রাচীর মেরামত করিতে লাগিল। ঠিক সেই সময়েই গৌর ও কামতার খাঁ পূর্ব্বগড় পুনরাধিকার করিতে চেষ্টিত হইলেন। হাইদর খাঁ ও বাল্লক সর্দার জানিলেন যে এখন স্বপক্ষীয় কেহ নগরের অভ্যন্তরে নাই সুতরাং অবিশ্রান্ত গুলি ও তীর চালাইতে লাগিলেন। এদিকে ফাঁড়ির মুখেও ঘোরতর যুদ্ধ চলিতেছিল। আস্কন্দীরা দুর্গের নিকট আরও একস্থানে প্রাচীর ভাঙ্গিয়া নূতন ফাঁড়ি করিল। কামতার খাঁ অতি দ্রুত সেই দিকে গিয়া শত্রুদিগকে তাড়াইয়া প্রাচীরের বাহির পর্য্যন্ত সদলে অগ্রসর হইলেন। রামজীবন ও মহেশ্বর এই অন্ধকারময়ী রাত্রিতে নক্ষত্র প্রসূত তুচ্ছ আলোকে দেখিতে পাইলেন যে একটি লোকের মস্তক সমস্ত সেনার মাথার উপর আধ হাত উচ্চ হইয়া রহিয়াছে। মহেশ্বর কহিলেন, "ঐ ব্যক্তিই কামতার খাঁ, উহাকে বিনাশ করিতে পারিলেই একটাকিয়ার অর্দ্ধেক বিক্রম কমিয়া যাইবে।" রামজীবনের হাতে একটি বিলাতি বন্দুক ছিল, তিনি তাহাতে গুলি ভরিলেন। মহেশ্বর একটি বিষাক্ত তীর ধনুকে যুড়িলেন। উভয়ে জলমধ্যে গলা পর্য্যন্ত ডুবাইয়া অতি গুপ্তভাবে কিছু দূর অগ্রসর হইলেন। কামতার খাঁ নিকটবর্ত্তী হইলে উভয়েই 'কালী কালী' বলিয়া শস্ত্র ছুড়িলেন। দুই আঘাতই কামতার খাঁর শরীরে লাগিল। আঘাতকের দিক লক্ষ্য করিয়া তাঁহার অনুচরেরা দ্রুত অগ্রসর হইয়া নানারূপ অস্ত্র

শস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিল। মহেশ্বর নানা স্থলে আহত হইয়া জীবন মধ্যেই জীবন ত্যাগ করিলেন। কিন্তু রামজীবন জল তলে ডুবিয়া থাকিয়া অক্ষত শরীরেই সরিয়া গেলেন। রূপেন্দ্র ও গৌর আহত কামতার খাঁকে লইয়া তাঁহার বাড়ীতে গেলেন। গোকুল ও সুরেশ্বর প্রাচীর মেরামত করিতে থাকিলেন। রাত্রি অধিক হইয়াছিল। উভয় পক্ষ অতিমাত্র শ্রান্ত হইয়াছিল। সকলে বিশ্রাম করিতে লাগিল। যুদ্ধ ক্ষান্ত থাকিল।

রূপেন্দ্র বৈদ্য ডাকিয়া কামতার খাঁর ক্ষত পরীক্ষা করিতে বলিলেন। সেই ক্ষত প্রথমে বিশেষ গুরুতর বোধ হয় নাই। সকলেই মনে করিয়াছিলেন, সামান্য আঘাত সহজেই আরাম হইবে। কিন্তু বৈদ্যরাজ পরীক্ষা করিয়া হতাশ্বাস হইলেন। তিনি অতি বিমর্ষ ভাবে কহিলেন, "আঘাত সামান্য বটে কিন্তু তীরের ফলাতে অতি তীব্র হলাহল ছিল। সেই বিষ শিরার মধ্যে প্রবেশ করিয়া রক্ত দূষিত করিয়াছে, এখন আর শোধনের উপায় নাই, তবে আমার সাধ্যমত চেষ্টা করিব কিন্তু সুফল অসম্ভব।" সেই কথা শুনিবামাত্র রূপেন্দ্র মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার সুবর্ণকান্তি মুখশ্রী মলিন হইয়া গেল। বহু যত্নে রাজার মূর্চ্ছা শান্তি হইল কিন্তু মানসিক কষ্টের শান্তি হইল না। তিনি নিশ্চয় জানিলেন যে এতদিনে একটাকিয়ার রাজপাট বিলুপ্ত হইল। কামতার খাঁর শরীরে বিষের জ্বালা উপস্থিত হইল। বৃদ্ধ পাঠান সেই জ্বালাতে যত কষ্ট বোধ করিলেন, চিরপ্রতিপালক রাজার কষ্ট দেখিয়া তদধিক কষ্ট বোধ করিলেন। কামতার খাঁর পুত্র সন্তান ছিল না। তিনি নিজ জামাতা কাশীম খাঁকে ডাকিলেন এবং গৌরচন্দ্র, বক্তিয়ার খাঁ ও মর্দন সিংহকে নিজের সম্মুখে আসিতে বলিলেন। আদেশমাত্র সকলেই সম্মুখে উপস্থিত হইল।

কামতার খাঁ সর্ব্বাগ্রে গৌরচন্দ্রকে বলিলেন, "বাবাজী! আমরা একটাকিয়ার চাকর, তুমি তাঁহার শরীক। আমি চোরাগুলিতে মারা গেলাম। এখন রাজবংশের গৌরব রক্ষার ভার সম্পূর্ণই তোমার উপর। তুমি বীর, ধীর এবং সর্ব্বাংশেই সুযোগ্য লোক। আমি তোমার উপর যতদূর ভরসা করি এত আর কাহারও উপরেই করি না। তুমি আমার এই সমশের খানি ধর এবং যাহাতে রাজার রক্ষা হয় তাহা কর।" গৌরচন্দ্র সাশ্রুমুখে

কহিলেন, "চাচা সাহেব! আমি তো তোমার তুল্য বীর নহি, তথাপি আমার যতদূর সাধ্য তাহা অবশ্য করিব। আপনার অভাবে আমরা নিরাশ্রয় হইলাম। তথাপি যাবৎ আমার শ্বাস থাকিবে ততদিন ভাদুড়ী-রাজ্য রক্ষা করিব ইহা আমার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা।" কামতার খাঁ হাত বাড়াইয়া নিজের সুদীর্ঘ সমসের গৌরের হাতে দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। গৌর নতভাবে সেলাম করিয়া অস্ত্র গ্রহণ করিলেন।

তাহার পর বক্তিয়ার খাঁকে ডাকিয়া কামতার খাঁ কহিলেন, "বাবা বক্তিয়ার! তোমার বাপ রোশন খাঁ আমার বড় ভাই ছিলেন এবং আমার অপেক্ষাও বড় বীর ছিলেন। তুমি বাপের যোগ্য পুত্র হও এবং প্রাণপণে প্রভুর রক্ষা কর। আমরা পুরুষানুক্রমে একটাকিয়ার প্রতিপালিত। আমাদের রক্ত-মাংস, অস্থি-মজ্জা সমস্ত শরীর একটাকিয়ার অন্নে গঠিত। আজ সেই প্রতিপালকের ঘোর বিপদ। আমি চোরা বাণে মারা গেলাম। দেখিও যেন তুমি থাকিতে রাজার রাজ্য না যায়। আমার এই ঢাল তুমি ধারণ কর এবং রাজার রাজ্য রক্ষা কর।" বক্তিয়ার খাঁ কহিল, "আপনকার তুল্য ক্ষমতা আমার নাই। তবে এ পর্য্যন্ত আমার প্রতিজ্ঞা যে আমার জীবন থাকিতে কেহ একটাকিয়ার এক অঙ্গুলী ভূমিও দখল করিতে পারিবে না। আপনি আশীর্ব্বাদ করুন যেন কল্য আপনকার অপহত্যার প্রতিফল পাপিষ্ঠ শত্রুদিগকে দিতে পারি।" কামতার খাঁ আশীর্ব্বাদ করিলেন, বক্তিয়ার খাঁ নতভাবে সেলাম দিয়া ঢাল লইল।

কাশীম খাঁকে ডাকিয়া কামতার খাঁ বলিলেন, "বাবা কাশীম! আমার পুত্র নাই তুমি আমার ভাগিনেয় এবং জামাতা বিধায় সর্ব্বথা পুত্র তুল্য। এই একটাকিয়া রাজবংশ আমার এবং তোমার এগারপুরুষের প্রতিপালক। তুমি আমার পাগড়ী, কোমরবন্দ্, তলোয়ার এবং কোরাণ লও এবং আমার প্রতিভূ হইয়া একটাকিয়ার প্রত্যুপকার কর।" কাশীম শ্বশুরের পা ধরিয়া কহিল, "হজরৎ! আপনার প্রতিভূ হই এত বড় সাধ্য আমার নাই। তথাপি আপনার আশীর্ব্বাদে যাবৎ এ দেহে প্রাণ থাকিবে তাবৎ আপনার মৃত্যুর প্রতিফল দিতে এবং রাজার পরিচর্য্যা করিতে কোন মতে ত্রুটি করিব না।" সে তিন সেলাম দিয়া শ্বশুরের প্রদত্ত পুরস্কারী লইল। কামতার খাঁ জামাতাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া

নৃপেন্দ্রকে কহিলেন, "রাজা সাহেব! আর চিন্তা নাই। এই তিনটি বালক দ্বারা তোমার তিন কামতার খাঁর কাজ হবে। তুমি তাহাদের সম্মান কর।" নৃপেন্দ্র অমনি উঠিয়া গৌর, বক্তিয়ার ও কাশিমের সহ কোলাকুলি করিলেন। তাহারা রাজাকে নতশিরে বন্দনা করিল।

সর্ব্বশেষে কামতার খাঁ মর্দন সিংহকে ডাকিয়া কহিলেন, "সিংহজী! তুমি সগর্ব্বে বলে ছিলে যে তুমি আমার অপেক্ষা বড় বীর, এখন যেন সেই কথা ঠিক থাকে। ঘরকা শের লড়াইকা মেড়া (ঘরে বসিয়া সিংহের মত গর্জ্জন করা এবং যুদ্ধের সময় ভেড়ার মত ভীত) হওয়া বড়ই দূষ্য।" মর্দন কহিল, "সর্দার সাহেব! আপনকার অন্তিম সময়ে আমি কোন অহঙ্কার করিতে চাহি না। ক্ষত্রিয়ের কথাই প্রতিজ্ঞা। আমি পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি তাহাই করিব।" বৃদ্ধ পাঠান সেলাম দিয়া কহিলেন, "তাহা হইলেই আমি তোমাকে ওস্তাদ (গুরু) বলিয়া স্বীকার করি।" মর্দন অবনত শিরে সেলাম করিল।

এদিকে উচ্চ রোদন ধ্বনি হইল। দাসী আসিয়া সংবাদ দিল, সর্দার সাহেবের স্ত্রী, কন্যা এবং রাণীরা তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছেন। অপর লোক সরিয়া গেল। তাঁহারা নিকটে আসিলে, কামতার খাঁ কহিলেন, "জন্মিলে অবশ্যই মরিতে হইবে; চিরজীবী কেহই নহে। আমার বয়স ৭৩ বৎসর হইয়াছে। এ বয়সে মরিতে কোন দুঃখ নাই। আমি চোরা আঘাতে মারা গেলাম, রাজার যথোচিত উপকার করিতে পারিলাম না, ইহাই আমার একমাত্র দুঃখ থাকিল।" পাঠানের কন্যা ও পত্নী পা ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। রাণীরা স্বহস্তে বাতাস দিলেন। বিষে শরীর জারিত হইল। আহত পাঠান "আল্লা আল্লা" ধ্বনি করিলেন। চারি দিকে সকলেই 'আল্লা আল্লা' বলিয়া উচ্চধ্বনি করিল। কামতার খাঁ সেই মৃত্যু যাতনাতেও একটি কাতর শব্দ করিলেন না; ঈশ্বরের নাম করিতে করিতে চিরনিদ্রিত হইলেন। রোদনে ও হাহাকার শব্দে সাতগড়া পরিপূর্ণ হইল। রাজা স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া বৃদ্ধ সেনাপতির যথোচিত সমাধিকার্য্য সুসম্পন্ন করাইলেন।

গোকুল ও সুরেশ্বর প্রাচীর মেরামত কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। তাঁহারা ভদ্রাভদ্র সমস্ত লোকদিগকে সেই কার্য্যে সাহায্য করিতে অনুরোধ করিয়া কহিলেন, "স্বদেশের এবং প্রভুর ঘোর বিপদকালে ঈদৃশ কার্য্যে কাহার সম্মান

বুদ্ধি ভিন্ন থর্ব্ব হইবে না।" অধিকাংশ ভদ্র সন্তান কুলীর ন্যায় ইট ও মাটি বহন করিতে প্রথমে অস্বীকার করিল। তখন লালা গোকুল সাহেব এবং কুমার সুরেশ্বর রায় স্বয়ং ইটের বোঝা ঘাড়ে লইলেন। তদ্দৃষ্টে আর কেহ কোন আপত্তি করিতে পারিল না। রাত্রি প্রভাত না হইতেই প্রাচীরের ফাঁড়ি সমুদায় মেরামত শেষ হইল। কিন্তু পূর্ব্ব গড়টি শক্রর হাতেই থাকিল।

সেই দিনের যুদ্ধে রূপেন্দ্রের যত সৈন্য নষ্ট হইয়াছিল রামজীবনের তদপেক্ষা বেশি বই কম হয় নাই। একপক্ষে যেমন কাশী তেওয়ারী ও কামতার খাঁ নষ্ট হইয়াছিল অন্য পক্ষেও তেমনি গাজী খাঁ ও মহেশ্বর রায় হত হইয়াছিল। কাশী তেওয়ারী ও গাজী খাঁ বিশেষ প্রতিপন্ন বা প্রয়োজনীয় লোক ছিল না। তাহাদের মৃত্যুতে তাহাদের প্রভুরা বিশেষ ক্ষতি বোধ করিলেন না। মহেশ্বর রায়ের দ্বারা রামজীবনের যে যে উপকার হইতে পারিত তাহা প্রায় সমস্তই হইয়াছিল। তিনি জীবিত থাকিলে তাঁহাকে প্রচুর পুরস্কার দিতে হইত। তাঁহার অভাব হওয়ায় রামজীবন সেই দায় হইতে মুক্ত পাইলেন। পক্ষান্তরে কামতার খাঁ রূপেন্দ্রের একান্ত অনুরক্ত সর্ব্ব প্রধান সেনাপতি ছিলেন। তদভাবে একটাকিয়ার অর্দ্ধেক বিক্রম নষ্ট হইল। এইজন্য রূপ খাঁ বিষাদসাগরে মগ্ন হইলেন এবং রামজীবন উল্লাসে উৎসাহিত হইলেন।

প্রভাত হইবামাত্র পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ হইল। আক্রন্দীরা মনে করিয়াছিল যে কামতার খাঁর অভাবে সেনা একবারে নির্বীর্য্য হইয়া পড়িয়াছে কিন্তু কার্য্যতঃ দেখিল যে তাহারা কিছু মাত্র পৌরুষহীন হয় নাই। কামতার খাঁর নামেই শক্রগণ ভীত হইত এখন আর তাদৃশ ভয় থাকিল না। উভয় পক্ষই সতেজে যুদ্ধ করিতে লাগিল। রক্ষীগণ প্রাচীর রক্ষা করিল। আক্রন্দীরা বারম্বার হানা দিল কিন্তু প্রাচীর ভেদ করিতে পারিল না। হাইদর পূর্ব্ব গড় হইতে অগ্নিবৃষ্টি করায় রক্ষীরা নিকটবর্ত্তী হইতে পারিল না। সেই গড়ের নিকটস্থ দেওয়ালে ফাঁড়ি করিয়া আক্রন্দী সেনা নগরে প্রবেশ করিল। তখন ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। মর্দ্দন সিংহ ও বক্তিয়ার খাঁ প্রতিজ্ঞামত পৌরুষ সহ যুদ্ধ করিতে করিতে বীরশয্যাশায়ী হইল। তখন রক্ষীগণ বাহিনী নগর রক্ষা করা অসাধ্য বুঝিয়া দুর্গে আশ্রয় লইল। রামজীবন নগর অধিকার করিয়া দক্ষিণের দুই দুর্গ আক্রমণ করিলেন। রাত্রি হইল কিন্তু যুদ্ধের নিবার হইল না। রতন ও

কাশীম খাঁ হত হইলে দক্ষিণের দুই দুর্গ রামজীবনের হস্তগত হইল। এই দিন নাটোরীয় সেনার প্রায় অর্দ্ধভাগ নষ্ট হইয়াছিল এবং সেনাপতি বাহাদুর সিংহ ও বাল্লক সর্দার নিহত হইয়াছিল।

সুরেশ্বর রায় কহিলেন,"এখন পলায়ন করাই কর্ত্তব্য।" গোকুল কহিলেন,"গত দুই দিনে আমাদের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ সেনা রণশায়ী হইয়াছে। এখন আর জয়ের আশা নাই। প্রধান প্রধান সেনাপতি সমস্তই নিপাতিত হইয়াছে। যে দুর্দ্দান্ত পাঠান বংশ চিরকাল একটাকিয়ার বিক্রমের মূলীভূত ছিল তাহারা প্রায় সমস্তই হত হইয়াছে। এজন্য আমি রায় সাহেবের মতেরই পোষকতা করি। নিষ্ফল বীরত্ব দেখাইয়া মারা যাওয়া আমার মতে দুঃসাহসিকতা মাত্র। বিজ্ঞ লোকেরা সকল কাজেরই যথোচিত সময় প্রতীক্ষা করিয়া থাকেন। আমাদেরও তাহাই কর্ত্তব্য।"

গৌরচন্দ্র পোড়া কাপড়ে গিরা দিয়া কহিলেন, "যাহার ভয় হয় সে পলাক। আমি পলাইব না এবং রাজাকেও পলাইতে দিব না। আমাদের যেমন বহু সৈন্য মরিয়াছে বিপক্ষের বরং সমধিক মরিয়াছে। আমাদের সেনাপতিগণ ও যোদ্ধাগণ কেহই বহু শত্রু না কাটিয়া মরে নাই। এখনও আমাদের প্রচুর সৈন্য আছে। তাহাদের বেতন দিবার যোগ্য অর্থ আছে। অস্ত্র, বস্ত্র, খাদ্য প্রস্তুত আছে, চারিটি সুদৃঢ় দুর্গ আছে; এত থাকিতে পলায়ন অকর্ত্তব্য। আমি আশা করি যে এখনও সেই সকল দুর্গ রক্ষা করিতে পারিব। আমি কদাচ পলাইব না।" রূপেন্দ্র গৌরের মতেই মত দিলেন। সুরেশ্বর আর প্রতিবাদ না করিয়া গৌরচন্দ্রকে কহিলেন, "বাবাজী! দেখিও যেন এই বীরত্ব বরাবর ঠিক থাকে।" গৌর কহিলেন, "আমি দুঃসাহস করি না। যদি গৃহভেদী মহেশ্বর রায় পথ না দেখাইত তবে সাতগড়া প্রবেশ করা রামজীবনের সাধ্য হইত না। যাহা হউক, বর্ত্তমান চারি দুর্গ আমি যাবজ্জীবন রক্ষা করিব। পলায়ন জন্য জলপথ খোলসা আছে এবং থাকিবে। যদি আমার অভাব হয় তখন তোমরা জলকার যোগে পলায়ন করিও। আমি কামতাব খাঁর সম্মুখে যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছি তাহা রক্ষা করিব।" রূপেন্দ্র কহিলেন, "আমার ও গৌর খুড়ার অভাবে তোমরা স্ত্রীলোক ও বালকদিগকে লইয়া পলায়ন করিও। আমরা জীবিত থাকিতে গৌড় বাদশাহের বংশের কদাচ কলঙ্ক হইতে দিব না।"

রাত্রি প্রভাত হইবামাত্র আক্রমণকারীরা একবারে পশ্চিমদিকের দুর্গ আক্রমণ করিল। উত্তরের দুর্গেও আক্রমণের ভয় ছিল। রূপেন্দ্র ও গোকুল উত্তরের দুর্গবদ্ধ রাজবাটী রক্ষার্থ থাকিলেন। পশ্চিমের তিন গড় রক্ষার্থ গৌরচন্দ্র অধ্যক্ষ থাকিলেন। সুরেশ্বর এবং দুইজন পাঠান সর্দার গৌরের অধীনে প্রত্যেক দুর্গে সেনানী থাকিলেন। সমস্ত দিন যুদ্ধ হইল। পশ্চিমদিকের সর্ব্ব দক্ষিণ গড় হাইদর খাঁ অধিকার করিল। গৌর অতি দক্ষতার সহিত অন্য দুই গড় রক্ষা করিলেন। সন্ধ্যা হইলে যুদ্ধের অবহার হইল। শেষরাত্রিতে গৌর সংবাদ পাইলেন যে শত্রুরা মধ্যম গড়ে কুল্যা খনন করিতেছে। গৌর প্রতিকুল্যা খনন জন্য যেমন মধ্যম গড়ের পূর্ব্ব প্রান্তে উপস্থিত হইলেন, অমনি কুল্যা ফুটিয়া উঠিল, দুর্গের দেউল সহ গৌরচন্দ্রের দেহ উড়িয়া গেল। গৌর সশরীরে স্বর্গ লাভ করিলেন। সেই ফাঁড়ি দিয়া আক্রমণকারীরা স্রোতের ন্যায় দুর্গে প্রবেশ করিল। গৌরের অভাবে রক্ষীসেনা একবারে নিঃসহায় হইয়া পড়িল। সুরেশ্বর রায় ভগ্ন সেনা সমবেত করিতে চেষ্টা করিলেন। তাঁহার চেষ্টা বিফল হইল। তিনি নিজে ক্ষত বিক্ষত হইয়া উত্তর গড়ে পলায়ন করিলেন। পশ্চিমের সমস্ত দুর্গই রামজীবনের হস্তগত হইল। তিনি উত্তর গড় আক্রমণ করিলেন।

গোকুল দেখিলেন সতর হাজার সিপাহী মধ্যে এখন কেবল বারশত মাত্র অবশিষ্ট আছে। তাহারাও অধিকাংশ আহত, বিক্ষত এবং ভগ্নোৎসাহ। তিনি রাজাকে পলায়ন জন্য অনুরোধ করিলেন। রাণী জগদম্বা বরাবর সন্ধির পক্ষপাতিনী ছিলেন। রাণী পূর্ণিমা পূর্ব্বে যুদ্ধেই উৎসাহ দিতেন, গৌরের অভাব হওয়ায় তিনিও এখন পলায়নই কর্ত্তব্য জ্ঞান করিলেন। গোকুল ও সুরেশ্বর অনেক বুঝাইলেন এবং বহু অনুরোধ করিলেন; রাণীরা স্বামীর পা ধরিয়া কাঁদিলেন; ভৃত্যগণ বহু অনুনয় করিল কিন্তু রূপেন্দ্র কিছুতেই পলায়নে সম্মত হইলেন না। তিনি বিষণ্ণ বদনে গম্ভীর বাক্যে কহিলেন, "আমি সর্ব্বস্ব খোয়াইয়া এক্ষণে পরাশ্রিত হইব না। বরং যেখানে মহাবীর কাম্‌তার খাঁ ও কুলতিলক গৌরচন্দ্র গিয়াছে, সেই খানে যাওয়াই আমার মঙ্গল—, সেইখানেই আমার সুখ ও শান্তি। এখন এই দুর্গ রক্ষা করা অসাধ্য সুতরাং অন্যান্য সকলে রাণীদিগকে লইয়া

সুরেশ্বর রায়জীর সহ প্রস্থান করুক। আমার এই মতিগতি ফিরিবে না সুতরাং কেহ তদ্বিরুদ্ধে অনুরোধ করিও না। আমি এখনও তোমাদের রাজা আছি, তোমরা আমার হুকুম অমান্য করিও না। সকলে সাবধানে অগৌণে প্রস্থান কর।"

তাঁহার কথা শুনিয়া চারিদিকে সকলে কাঁদিয়া উঠিল কিন্তু কেহ প্রতিবাদ করিতে সাহস পাইল না। গোকুল এবং একশত পঁচাশী জন পুরাতন ভৃত্য তাঁহার সঙ্গে জীবন সমর্পণ করিতে প্রতিজ্ঞা করায় কেবল তাহারাই থাকিল। অবশিষ্ট সমস্ত লোক সুরেশ্বরের অনুজ্ঞাচারী হইয়া নৌকায় উঠিল। রূপেন্দ্র নিজ পুত্র কন্যাদিগকে একে একে বক্ষে ধারণ করিয়া শেষ আশীর্ব্বাদ দিয়া বিদায় করিলেন। রাণীদ্বয়ের নিকট এবং সুরেশ্বরের নিকট শেষ বিদায় লইলেন। নিজে তিনি কোন কাতরোক্তি বা রোদন করিলেন না। ক্রন্দমানা রাণী-দিগকে ধরাধরি করিয়া নৌকায় উঠান হইল। সুরেশ্বর অশ্রুপূর্ণ নয়নে শেষ বিদায় লইয়া নৌকায় উঠিলেন। রূপেন্দ্র স্নান করিয়া গঙ্গামৃত্তিকা দ্বারা শরীরে ঈশ্বরের নাম লিখিলেন। তাঁহার শেষ অনুচরগণও তদ্রূপ করিল। তাঁহারা সশস্ত্রে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকিলেন।

এদিকে বিজয়ী আক্রমণকারীগণ মহোৎসাহে দুর্গবদ্ধ রাজবাটীর প্রাচীর ভাঙ্গিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। রূপেন্দ্রের বর্ত্তমান অনুচর কেবল ১৮৫ জন মাত্র, আবার তাহারাও আহত বিক্ষত। কিন্তু তাহারা মরণের জন্য কৃতসংকল্প, সুতরাং সম্পূর্ণ নির্ভীক। রূপেন্দ্র ও গোকুল সেই ভগ্নাবশিষ্ট সেনা সহকারে আস্কন্দীগণের বেগ প্রতিরোধ করিতে চেষ্টা করিলেন। রক্ষীগণ বিপুল বিক্রমের সহিত যুদ্ধ করিয়া একে একে ধরাশায়ী হইতে লাগিল। গোকুল শরবিদ্ধ হইয়া অজ্ঞান অবস্থায় বন্দী হইলেন। রূপেন্দ্র চতুর্দ্দিকে অরাতি পরিবেষ্টিত হইয়াও অমিত বিক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহার দেহ নানাস্থানে শস্ত্রবিদ্ধ হইয়া শোনিত স্রোত নিঃসারণ করিল। তথাপি তিনি এত বেগে সমসের ঘুরাইতে লাগিলেন যে তাঁহার নিকটস্থ হইতে কেহই সাহসী হইল না। তাঁহাকে জীবিতাবস্থায় ধরা অসাধ্য বুঝিয়া শত্রুগণ দূর হইতে তীর ও গুলি চালাইতে লাগিল। তন্মধ্যে একটা গুলি তাঁহার বিশাল বক্ষঃস্থল ভেদ করিল। প্রাণবায়ু সেই নূতন পথ দিয়া

নির্গত হইল। জড়দেহ ভূতলে পড়িল। বিপক্ষেরা মহোল্লাসে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। যুদ্ধ শেষ হইল। সেই সঙ্গে একটাকিয়ার রাজপাট নিঃশেষ হইল। মহারাজ রামজীবন অগ্রসর হইয়া রূপেন্দ্রের মৃতদেহ দেখিলেন। তিনি চিন্তা করিলেন যে, "যখন এই রূপ খাঁর বিবাহ তখন আমি সাত টাকা বেতনে রাজা দর্পনারায়ণের মহরের ছিলাম এবং রাজার সঙ্গে বিবাহ দেখিতে আসিয়াছিলাম। তখন একটাকিয়ার রাজাকে দর্শন পাওয়া আমার মত লোকের পক্ষে কঠিন ছিল। আজ তাঁহার এই দশা হইয়াছে। লক্ষ্মী চঞ্চলা—ভাগ্য প্রতি মুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তন হইতেছে। আমার ভাগ্যে শেষে কি হইবে তাহা কে বলিতে পারে।" রূপ খাঁর সেই পরম সুন্দর মূর্ত্তি মৃত দেহেও অবিকৃত ছিল। তদ্দৃষ্টে রামজীবনের হৃৎকম্প হইল। তিনি ব্রাহ্মণ দ্বারা রূপ খাঁর শবদাহ করাইলেন। চিতাগ্নিতে নিজে সপ্তকাষ্ঠ দিলেন। ব্যাজ কৃত ব্রহ্মহত্যা জনিত পাপ ধৌত জন্য গঙ্গাস্নানে চলিলেন। তাঁহার ভ্রাতৃপুত্র ভবানী প্রসাদ নামান্তরে দেবী প্রসাদ রায় সাতগড়া লুণ্ঠন করিলেন, এবং বহুমূল্য দ্রব্যাদি সহ একটাকিয়ার বাদশাহী সিংহাসন লইয়া জয়োল্লাসে নাটোর চলিলেন। বন্দীভূত গোকুলকে তিনি জয়-কালীর বাড়ীতে বলি প্রদানের আদেশ করিলেন। কিন্তু গুণাকর ও দয়ারাম অনুরোধ করায় মহারাজ রামজীবনের প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত বলিদান কার্য্য স্থগিত থাকিল।

সান্যাল রাজ্য ও ভাদুড়ী রাজ্য একই সময়ে শাহ সমসুদ্দীন কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। প্রায় তিন শত বৎসর এই দুই রাজ্য বাঙ্গালা দেশের সর্ব্ব প্রধান ছিল। এক এক সময়ে ইহার রাজগণ সম্রাট পদস্থও হইয়াছিলেন। অবশেষে এই উভয় রাজ্যই প্রায় একই সময়ে একই ব্যক্তি রাজা রামজীবন কর্ত্তৃক নাটোরের জমিদারীভুক্ত হইল। বড়োল নদের ধারে সাঁতোড়ের ভগ্নাবশেষ এখনও দেখা যায়। সাঁতোড়ের রাজবাটী এখন জঙ্গল হইয়াছে এবং সেই রাজধানী এখন একখানি গণ্ডগ্রাম হইয়াছে। সাতগড়ার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী বিল এখন ভরট্ট হইয়া কৃষিক্ষেত্র নিম্নভূমি হইয়াছে। সাতগড়ার অট্টালিকাসমূহ ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়াছে। তদুপরি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লীগ্রাম ও কৃষিক্ষেত্র স্থাপিত হইতেছে। উত্তর বঙ্গ রেলওয়ের আত্রাই ষ্টেশন হইতে পূর্ব্বদিকে তিন ক্রোশ গেলে সপ্তদুর্গাপুরীর

কয়েকটি বৃক্ষ এখনও দৃষ্ট হয়। তদ্ভিন্ন সেই রাজধানীর আর কোন চিহ্ন এখন প্রকাশ্য নাই। কিন্তু ভূমি খনন করিলে এখনও স্থানে স্থানে পুরাতন অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ দেখা যায়।

ঊনত্রিংশ অধ্যায়।

সর্ব্বমঙ্গলার নাটোর যাত্রা।—গোকুলের বন্দীত্বমোচন।—কাশীদাসের সহ রঘুনন্দনের কন্যার বিবাহ।—রামদয়ালের কর্ম্ম প্রাপ্তি।—গোকুলের বৈরাগ্য অবলম্বন।

গোকুলের বন্দীদশা শুনিয়া তাঁহার পরিবারবর্গ দুশ্চিন্তায় মগ্ন হইল। দক্ষিণা অতি সত্বরে দামনাশে গিয়া সর্ব্বমঙ্গলার পা ধরিয়া স্বামীর উর্দ্ধারার্থ সদুপায় করিতে অনুনয় করিল। রাণী জগদম্বাও তথায় ছিলেন। তিনিও সর্ব্বমঙ্গলাকে অনুরোধ করিলেন। উভয়ের প্রার্থনায় সর্ব্বমঙ্গলা নৌকাপথে নাটোর চলিলেন। যে সমস্ত বালক বালিকা তাঁহার প্রতিপাল্য ছিল তন্মধ্যে তাঁহার সপত্নীর কনিষ্ঠ পুত্রটি সকলের ছোট ছিল। মঙ্গলা তাহাকে সঙ্গে লইলেন। তখন বড়োল নদ, নারদ নদ এবং ঝলমলিয়া নদী ও মুষাখালি বার মাস প্রবাহিত ও সুনাব্য ছিল। মঙ্গলা নাটোরে পৌঁছিয়া পালকীযোগে রাজবাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। বিনা অনুমতিতে অন্তঃপুরে প্রবেশ নিষিদ্ধ। মঙ্গলা অনুমতি লইয়া রাণীর সহ সাক্ষাৎ করিলেন। রাণী দাসী দ্বারা রাজা রামজীবনকে ডাকাইয়া অন্দরমহলে আনাইলেন। মঙ্গলা ঘোমটা দিয়া কুঠরী মধ্যে একখানা পশমী আসনে বসিলেন। রাণী রাজাকে কহিলেন, "কুলপতি নরসিং সান্যালের ব্রাহ্মণী তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন।" রাজা রামজীবন তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বারান্দায় চৌকীতে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কুলদেবি! আপনার আগমনের হেতু কি?" রাজা মনে করিয়াছিলেন যে সর্ব্বমঙ্গলা কোন সম্পত্তি প্রার্থনায় আসিয়াছেন। কিন্তু মঙ্গলা কোন অর্থ সম্পত্তি প্রার্থনা করিলেন না। তিনি মিষ্ট গম্ভীর স্বরে কহিলেন, "মহারাজ! লালা গোকুল আমার পিতার এবং ভ্রাতার অতি প্রিয় মন্ত্রী ছিল। সে নিজ প্রভুর হিতার্থে যথোচিত

চেষ্টা করিয়াছে। ইহা তাহার দোষ নহে বরং মহৎ গুণ। সেই উদ্দেশ্যে সে যেমন আপনকার অনিষ্ট করিয়াছে তেমনি আমারও অনিষ্ট করিয়াছে। আমি প্রার্থনা করি যে মহারাজ তাহাকে ক্ষমা করুন। ঈশ্বর আপনাকে অতি উচ্চ পদ দিয়াছেন। গোকুলের প্রাণদণ্ড করা আপনকার মর্য্যাদার অযোগ্য। আমি তাহার জীবন ভিক্ষা চাই এবং মুক্তি প্রার্থনা করি।" তাঁহার প্রার্থনা শুনিয়া রামজীবনের মনে পূর্ব্ব কথা উদয় হইল। লালা গোকুল সাহেব খুব বড় লোক ছিল। রামজীবনের পিতা অনেকবার ভিক্ষার্থী হইয়া গোকুল সাহেবের বাড়ী গিয়াছেন, একবার রামজীবন নিজেও পিতার সঙ্গে গিয়াছিলেন। রাজা নম্রভাবে বলিলেন, "আপনকার আদেশ আমার শিরোধার্য্য। আমি নিজে গোকুলের কোন দণ্ডাজ্ঞা করি নাই। যদি আমার কোন কার্য্যকারক কোন দণ্ড দিতে হুকুম দিয়া থাকে তবে আমি তাহা রহিত করিব এবং গোকুলকে সসম্মানে মুক্তি দিব।" মঙ্গলা কহিলেন, "এরূপ মহদ্‌গুণ না হইলে বিধাতা আপনাকে এতদূর উন্নতি দিতেন না। আমি কৃতার্থ হইলাম।" রাজা পুনরায় বিনীতভাবে কহিলেন, "কুলদেবি! আপনার যদি আর কোন প্রয়োজনীয় বিষয় থাকে তবে তাহাও আদেশ করুন।" মঙ্গলা কহিলেন, "আমার মাসতুতো ভাই রামনাথ বাগছি, আমার ভাসুর বিক্রমপুরের সান্যাল এবং আরো কয়েকটি ব্রাহ্মণ মহারাজের নিকট আটক আছেন। এখন যুদ্ধ শেষ হইয়াছে আপনি এখন তাঁহাদিগকেও মুক্তি দিন।" রাজা কহিলেন, "যে সকল ব্রাহ্মণ আটক আছে তাহাদের কোন দণ্ডই হইবে না। আমি কিছুদিন পর তাহাদিগকে খালাস দিতাম। যাহা হউক আপনকার হুকুমে তাহাদিগকে অদ্যই মুক্তি দিব। আর যদি ধন সম্পত্তি কিছু প্রার্থনা থাকে একবারে তাহাও বলুন, আমি যথাসাধ্য আপনকার আজ্ঞা পালন করিব।" মঙ্গলা কহিলেন, "কুলপতির সন্তানেরা কখন ভিক্ষা করে না। আমার পিতৃকুলও রাজা ছিলেন কখন ভিক্ষা করেন নাই। আমার নিতান্ত দরিদ্র অবস্থা নহে। আমি কোন অর্থ ভিক্ষা চাই না। মহারাজ আমাকে যে ভিক্ষা দিলেন আমি তাহাতেই পরম কৃতার্থ হইলাম।" রাজা কহিলেন, "আচ্ছা, আপনি ভিক্ষা না নিন্ আমাকে কিছু ভিক্ষা দিয়া যান।" মঙ্গলা

কহিলেন,"যদি আমার সাধ্য থাকে তবে অবশ্যই মহারাজের আদেশ পালন করিব।" রাজা কহিলেন, "আপনকার পুত্র কাশীদাসের সহ আমার ভ্রাতৃকন্যার শুভ সম্বন্ধ করা আমাদের একান্ত ইচ্ছা। আপনি সেই বিষয়ে সম্মতি দেন।" মঙ্গলা কহিলেন,"এ বিষয়ে সম্মতি দেওয়া স্ত্রীলোকের অসাধ্য। জ্ঞাতি, কুটুম্ব, ঘটক, পুরোহিতগণকে জিজ্ঞাসা না করিয়া আমি সম্মতি দিতে পারি না। আপনি বিজ্ঞ, পণ্ডিত তাহা বুঝিতে পারেন। তবে আমি এই মাত্র বলিতে পারি যে আমি এ বিষয়ে যথাসাধ্য মহারাজের সপক্ষতা করিব। আর কন্যাটি এখানে থাকিলে তাহাও আমি দেখিয়া যাইতে পারি।" রাজা কন্যাটিকে সুসজ্জিত করিয়া আনিতে বলিলেন। রাণী নিজে কন্যার হাত ধরিয়া সর্ব্বমঙ্গলার নিকটে আনিলেন। কুমারী দুই মোহর ভাবী শ্বাশুড়ীর পায়ে রাখিয়া প্রণাম করিল। মঙ্গলা কন্যাটির আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। সর্ব্বমঙ্গলার পুত্র ঝড়ু বড়ই উৎপাত করিতে লাগিল। মঙ্গলা তাহাকে শান্ত রাখিবার জন্য কহিলেন, "ঠিক হয়ে চুপ করে থাক্, নৈলে রাজা মারবে।" ঝড়ু কহিল,"কৈ মা রাজা কোথায়?" মঙ্গলা কহিলেন, "ঐ যে বারাণ্ডায় চৌকির উপরে।" শিশু মনে করিল "রাজা" কোন অদ্ভুত জন্তু বিশেষ তাই কৌতূহলী হইয়া দরজার সম্মুখে গেল এবং রাজা রামজীবনকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল। সে মনে করিল, "মা কুঠরীর ভিতর হইতে দেখিতে পান নাই তাই মানুষকে রাজা বলিয়া ভ্রম হইয়াছে।" অতএব ভ্রম সংশোধন জন্য কহিল, "না মা রাজা না, মানুষ।" তাহার কথা শুনিয়া সকলেই হাসিয়া উঠিলেন। রাজা রাণী সর্ব্বমঙ্গলাকে প্রজ্ঞাপন করায় তিনি কহিলেন, "এই শিশু আমার সতীনের সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র আর কাশীদাস আমার সতীনের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ পুত্র, আর আমার দুই পুত্র তাহাদের মধ্যম। ঝড়ুর পাঁচ মাস বয়সে তাহার জননী সহ-মৃতা হইয়াছে। আমাকেই সে মা বলিয়া জানে, আমাকে ছাড়িয়া এক দিনও থাকিতে পারে না। এই জন্য আমি তাহাকে সঙ্গে আনিয়াছি।" বৃত্তান্ত শুনিয়া সকলেই মঙ্গলার প্রশংসা করিল। রাজা কহিলেন, "অনেকেই বিমাতাকে শত্রু বলে কিন্তু এইরূপ বিমাতাই প্রকৃত সৎ-মা। আহা! এরূপ মহামায়া না হইলে কুলপতির ঘরের শোভা হয় না।" রাজা রাণী এবং সমস্ত পুরস্ত্রীগণ সর্ব্বমঙ্গলাকে আহার করিতে অনুরোধ করিলেন। মঙ্গলা পরান্ন

গ্রহণে সম্মতা হইলেন না তথাপি তাঁহাদের অনুরোধে কিঞ্চিৎ কাঁচা দুধ ও ডাবের জল পান করিয়া বিদায় হইলেন। তিনি যাইতে যাইতে পথিমধ্যে চিন্তা করিলেন যে, "পিতা এই জন্যই ছোটঘরে আমার বিবাহ দিতে সম্মত হন নাই। আমি কুলপতির ঘরের বধূ না হইলে আজ আমাকে মহারাজ এত সম্মান করিতেন না এবং আমার সমস্ত প্রার্থনা পূরণ করিতেন না। ধন-গৌরব অপেক্ষা কুলগৌরবই শ্রেষ্ঠ এবং স্থায়ী। আমার এখন ধনগৌরব নাই তথাপি কুলগৌরব জন্য সর্ব্বত্র সম্মান পাইতেছি।"

লালা গোকুল এবং রামনাথ বাগছি, লক্ষ্মীকান্ত সান্যাল প্রভৃতি বন্দী ব্রাহ্মণগণ মুক্তি লাভ করিলেন। মহারাজ গোকুলের সহ নানা বিষয় আলাপ করিয়া তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধি, শিষ্টাচার এবং প্রভুভক্তি দৃষ্টে তাঁহাকে চাকলে ভাতুড়িয়ার নায়েবী কর্ম্ম দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। গোকুল করযোড়ে কহিলেন, "মহারাজ! আমি বৃদ্ধ হইয়াছি এখন চাকরী করিবার সামর্থ্য নাই। বিশেষতঃ একটাকিয়া রাজবংশের পতনে আমার মনে বৈরাগ্য জন্মিয়াছে। আমি বৈষয়িক চিন্তা ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবন গমনে মনস্থ করিয়াছি। মহারাজ, এ দাসকে বিদায় দিন। যদি অনুগ্রহ হয় তবে আমার পুত্র রামদয়ালকে এই কর্ম্মে নিযুক্ত করিলে, কাজ উত্তমরূপে চলিতে পারিবে।"

রাজা রামদয়ালকে আনাইতে আদেশ দিলেন। রামদয়াল আসিলে রাজা, দয়ারাম এবং গুণাকর রায় তাঁহাকে নানা বিষয়ে প্রশ্ন করিয়া পরীক্ষা লইলেন। তাঁহারা দেখিলেন লালা রামদয়াল গোকুলের সুযোগ্য পুত্র বটে। তখন মহারাজ সন্তুষ্ট হইয়া রামদয়ালকে "রায়" উপাধি সহ এক প্রস্থ পোষাক দিলেন এবং মাসিক ১০১৲ টাকা বেতনে চাকলে ভাতুড়িয়ার* নায়েবী কর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন। তাহার পর মহারাজ, রামনাথ ও লক্ষ্মীকান্তকে কুলজ্ঞ সহকারে দামনাশে পাঠাইলেন এবং তাঁহাদিগকে বলিয়া দিলেন, যে কোন পণেই হউক কাশীদাসের সহ রঘুনন্দনের কন্যা বিশ্বেশ্বরীর সম্বন্ধ ধার্য্য করিবে। যাত্রীরা গোকুলকে সঙ্গে যাইতে অনুরোধ করিলেন। জীবনরক্ষয়িত্রী সর্ব্বমঙ্গলার সহ সাক্ষাৎ করা গোকুলের নিতান্ত প্রয়োজনীয় ছিল। অধিকন্তু রাণী জগদম্বা

---

* সান্যাল রাজ্য ও ভাদুড়ী রাজ্য একত্রে চাকলে ভাতুড়িয়া নামে খ্যাত।

সন্তানগণ সহ দামনাশে ছিলেন এবং গোকুলের পত্নী দক্ষিণাও দামনাশে ছিলেন সুতরাং গোকুল সাগ্রহে অনুযাত্রী হইলেন।

কুলজ্ঞ প্রমুখ যাত্রীগণ দামনাশে উপস্থিত হইলে, সর্ব্বমঙ্গলা তাঁহাদের যথোচিত সৎকার করিলেন। গোকুল সর্ব্বমঙ্গলাকে ও রাণী জগদম্বাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। মঙ্গলা পিতৃকুলের অধঃপতন জন্য কাঁদিয়া উঠিলেন। রাণী জগদম্বা ভূমিতে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কিন্তু দেশাচারের এমনি প্রাবল্য যে, সকল লোকের সাক্ষাতে গোকুল ও দক্ষিণা পরস্পর কোন কথাই বলিতে পারিলেন না। কিছু কাল কাঁদাকাটির পর মঙ্গলা কতক শান্ত হইয়া আগন্তুকগণের স্নান, আহ্নিক ও ভোজনের জন্য যোগাড় করিতে লাগিলেন। গোকুল নিজে শান্ত হইয়া রাণী জগদম্বাকে নানারূপ সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। তিনি কহিলেন, "জগতে কাহার অবস্থা চিরদিন সমান থাকে না। যাহা হইয়াছে তাহা চিন্তা করিয়া ব্যাকুল হওয়া কেবল বৃথা কষ্ট ভোগ মাত্র। এখন যাহা কর্ত্তব্য তাহাই চিন্তা করুন। আমি সংসার ত্যাগ করিব কিন্তু আমার পুত্রগণকে বলিয়া যাইব যে, আমরা একটাকিয়ার চিরপ্রতিপালিত ক্রীত-দাস। যাহাতে রাণীদের ও রাজকুমারদের কষ্ট না হয় তদ্বিষয়ে তাহারা যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে।" মঙ্গলা কহিলেন, "ভাই রূপেন্দ্র আমাকে এক তালুক দিয়াছিল এখন আমি তাহার স্ত্রীপুত্রদিগের প্রতিপালনের উপায় করিয়া দিব। আমি মনস্থ করিয়াছি যে আমার হাতে যা কিছু সম্পত্তি আছে অর্থাৎ যা বাপ ভাইয়ের কাছে পাইয়াছি, যা আমার শ্বশুর কুলের ছিল, আর যা কিছু চেষ্টা করিয়া বাড়াইয়াছি সে সমস্ত সমান তিন ভাগ করিয়া এক ভাগ ভাইপোদিগকে দিব। ইহাতে কেহ বড় মানুষ না হউক অন্ন বস্ত্রের কষ্ট কেহই পাইবে না। কেমন গোকুলদা! এই ঠিক কি না?" গোকুল কহিলেন, "ঠাকুরাণ দিদি! আমাদের বাচস্পতি ঠাকুর দুনিয়া খুঁজে তোমার নাম সর্ব্বমঙ্গলা রাখিয়াছিলেন। তোমার আকৃতি-প্রকৃতি, কথা, কার্য্য ভাল ছাড়া মন্দ কিছুই নাই, সুতরাং তোমার ব্যবস্থা অবশ্যই ভাল বই মন্দ হইতেই পারে না।" উপস্থিত ব্যক্তিমাত্র সকলেই মঙ্গলাকে ধন্য ধন্য করিল। মঙ্গলা ও দক্ষিণা রাণী জগদম্বাকে ধরিয়া ঘরের ভিতর লইয়া গিয়া খাটের উপর শোয়াইলেন।

কাশীদাসের মাতামহ নরোত্তম লাহিড়ীকে সর্ব্বমঙ্গলা সংবাদ দিয়া আনাইলেন।

দামনাশের সান্যালদিগকে এবং অন্যান্য কুলীন কুলজ্ঞ এবং পণ্ডিতগণকেও মঙ্গলা আমন্ত্রণ করিলেন। রাজপ্রেরিত কুলজ্ঞ বিবাহের প্রসঙ্গ উপস্থিত করিল। পাত্রপক্ষের কুলজ্ঞেরা প্রধানতঃ দুইটি আপত্তি করিলেন যে, "অগ্রে কুলীন কন্যা বিবাহ না করিয়া শ্রোত্রিয়ের ঘরে বিবাহ করা কুলপতি বংশের রীতি বিরুদ্ধ। পূর্ব্বে বাগছি, লাহিড়ী, মৈত্র, ভাদুড়ী ও কালিয়াই গোষ্ঠীর গাঁইকর্ত্তা কুলীনেরা অর্থলোভে বা সৌন্দর্য্যলোভে শ্রোত্রিয়ের দ্বারা আত্মৌরস করায় তাহাদের কুলপতি আখ্যা ও মর্য্যাদা নষ্ট হইয়াছে। কেবল কানাই সান্যালের বংশধরেরা লোভ সম্বরণ করিয়া থাকায় তাঁহারাই কুলপতি হইয়া আছেন। সুতরাং কাশীদাসের প্রথম বিবাহ শ্রোত্রিয়ের ঘরে হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, রায় রঘুনন্দন কষ্ট শ্রোত্রিয়, তিনি কাপ ব্যবধান না দিয়া একবারে কুলীনের কার্য্য করিতে পারেন না। এই উভয় হেতুতে এই বিবাহ অসম্ভব। অর্থব্যয়ে যাহা সাধ্য তাহাই করা যাইতে পারে, অসাধ্য সাধন হইতে পারে না।"

রাজকুলজ্ঞেরা কহিলেন, "যখন কুশকন্যা আদান প্রদান দ্বারা মর্য্যাদা পরিবর্ত্তন হইতে পারে তখন এই আপত্তি দুইটিও খণ্ডন হইতে পারিবে। অগ্রে কোন কুলীনের কুশ নির্ম্মিতা কন্যা কাশীদাসের সহ বিবাহ দিয়া পরে রঘুনন্দনের কন্যার সহ প্রকৃত পরিণয় হইতে পারে। সেইরূপে রঘুনন্দনের কুশকন্যা আগে কাপে প্রদান করিয়া পরে প্রকৃত কন্যা কাশীদাসের সহ বিবাহ হইতে পারে।" রঘুনন্দনের ভয়ে, লোভে সকলেই বাধ্য হইল। কুশকন্যা দ্বারা আপত্তি খণ্ডনান্তে মহাকুলীন কাশীদাসের সহ রাজকুমারী বিশ্বেশ্বরীর বিবাহ মহাধূমধামে সুসম্পন্ন হইল। নাটোর রাজবংশের যেমন ধনগৌরব তেমনই কুলগৌরব হইল। তাঁহাদের উন্নতির পরিসীমা হইল।

* * * *

রামদয়াল মহারাজা রামজীবনের পক্ষে চাকলে ভাতুড়িয়ার নায়েব নিযুক্ত হইলে গোকুল ও রামদয়াল পুনরায় সাতগড়ায় আসিলেন। তথায় একটাকিয়ার ভগ্নপুরী দর্শনে উভয়ে বহুক্ষণ রোদন করিলেন। মৃত রাজা রূপেন্দ্র নারায়ণ, উপেন্দ্র নারায়ণ ও মহেন্দ্র নারায়ণের মূর্ত্তি লালা গোকুলের স্মৃতিপথে উদিত হইয়া শোকাবেগ বর্দ্ধিত করিল। বহুলোক সাতগড়া হইতে পলায়ন করিয়াছিল। যাহারা তখনও নগরে ছিল তাহারা আসিয়া লালা সাহেবকে যথোচিত

অভ্যর্থনা করিল। গোকুল ও রামদয়াল চির অনুগত প্রজাগণকে আশ্বাস দিলেন। কিন্তু সাতগড়ায় বাস করিতে তাঁহার আর ইচ্ছা হইল না। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে তারাস নামক একখানি গ্রাম রাজা জগৎ নারায়ণ স্বরূপ সরকারকে আয়মা দিয়াছিলেন। গোকুল ও রামদয়াল সাতগড়া ত্যাগ করিয়া তারাসে গিয়া বাড়ী করিলেন। তাহার পর ক্রমে ক্রমে সাতগড়া জনশূন্য জঙ্গল হইতে লাগিল।

একটাকিয়ার পতনে গোকুলের মনে যে বৈরাগ্য ভাবের সঞ্চার হইয়াছিল তাহা ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। দক্ষিণা, রামদয়াল এবং প্যারী তাঁহার মতি ফিরাইতে চেষ্টা করিল। গোকুল কহিলেন, "লোকে যত্ন পূর্ব্বক যাহা আহার করে তাহারই কতকাংশ মল মূত্র হয়। তাহা যতক্ষণ পেটের ভিতরে থাকে ততক্ষণ অদূষ্য। কিন্তু তাহা একবার ত্যাগ করিলেই অস্পৃশ্য হয়। সেইরূপ লোকে বহুযত্নে যাহা উপার্জ্জন করে তাহা দ্বারাই সম্পত্তি হয়। তাহা ভোগ করিতেও সুখ বোধ হয়। কিন্তু একবার বৈরাগ্য জন্মিলে আবার বিষয় সম্পত্তি ভোগ করিতে ঘৃণা হয়। আমি বিষয় সম্পত্তি মলমূত্রবৎ ত্যাগ করিয়াছি। মায়ার বন্ধন ছিন্ন করিয়াছি। আমাকে পুনরায় বাঁধিতে চেষ্টা করিও না। আমি ভেক লইয়া বৈরাগী হইব এবং সংসার ত্যাগ করিয়া শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ নাম করিতে করিতে বৃন্দাবন যাইব। তোমরা অর্থ পিপাসায় লোককে কষ্ট দিও না, সর্ব্বদা ধর্ম্মে মতি রাখিও। আর মহারাজ রুদ্রেন্দ্র নারায়ণের স্ত্রীপুত্রগণকে সর্ব্বদা সাহায্য করিও এবং সর্ব্বদা মনে রাখিও যে আমরা একটাকিয়ার ক্রীতদাস।" রামদয়াল পিতার বৈরাগ্যের বাধা দেওয়া উচিত বোধ করিলেন না সুতরাং কিছুই বলিলেন না। দক্ষিণা স্বামীকে নিবৃত্ত করিতে না পারিয়া নিজেই তাঁহার সঙ্গিনী হইতে প্রতিজ্ঞা করিলেন। গোকুলের সাধের জলপাত্র প্যারী কহিল, "আমি তো বাল্যাবধিই বৈষ্ণবী। আমিও লালা সাহেবের সঙ্গে যাইব।" গোকুল তাহাকে নিষেধ করিয়া কহিলেন, "আমি তোমার ভরণপোষণের উত্তম সংস্থা করিয়া যাইব, আমার সঙ্গে যাওয়ার কোন প্রয়োজন নাই। আমি ইন্দ্রিয় সংযত করিয়াছি। আমি বৃদ্ধ, আমার পত্নীও বৃদ্ধা, তুমি এখনও বৃদ্ধা হও নাই। তুমি সঙ্গে থাকিলে অনেক দোষ, তাই বলি তোমার যাইয়া কাজ নাই।" পাতানী গোপিনী এখন বৃদ্ধা ও বিধবা। সে

এই সুযোগে বৈরাগিণী হইয়া বৃন্দাবন যাইতে চাহিল। গোকুল তাহাকে সঙ্গে লইতে স্বীকার করিলেন। তখন প্যারী দক্ষিণার ও পাত্তনীর হাত পা ধরিয়া কান্দিতে লাগিল। তাহাদের অনুরোধে গোকুল প্যারীকেও সঙ্গে লইতে সম্মত হইলেন। বাজুরভাগ হইতে গোস্বামী আনাইয়া গোকুল সঙ্গিনীগণ সহ দীক্ষিত হইলেন এবং তাহিরপুরে রাণী পূর্ণিমার সহ দেখা করিয়া বৃন্দাবন যাইতে মনস্থ করিলেন।

গোকুল সদলে বৈরাগী বেশে তাহিরপুরে উপস্থিত হইলে গ্রামের সমস্ত লোক তাঁহাকে দেখিতে আসিল। তাহিরপুরের রাজারা তাঁহাকে যথেষ্ট সমাদর করিলেন। সকলেই ধন্য ধন্য বলিয়া তাঁহাকে প্রশংসা করিল। কুমার সুরেশ্বর রায় কহিলেন, "লালা গোকুল সাহেব অসাধারণ লোক। তিনি কালের উচিত ব্যবহার করেছেন অর্থাৎ যে কালে যাহা কর্ত্তব্য ঠিক তাহাই করেছেন। বাল্য-কালে প্রচুর বিদ্যা উপার্জ্জন করেছেন, যৌবনে প্রচুর যোগ্যতা প্রকাশ ক'রে যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করেছেন, আর এখন বৃদ্ধকালে বিষয় বাসনা ত্যাগ ক'রে বৈরাগ্য অবলম্বন করেছেন।" গোকুল প্রশংসা শুনিয়া বিনীত ভাবে কহিলেন, "আমাদের পক্ষে ব্রাহ্মণ ও নারায়ণ দুই-ই তুল্য। চির জীবন বিপ্রসেবায় কর্ত্তন করিয়াছি, এখন আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন যাহাতে ৺ বৃন্দাবন ধামে গিয়া শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি দর্শন পাই।" গোকুল একদিন মাত্র তাহিরপুরে থাকিয়া রাণী পূর্ণিমার সহ দেখা করিলেন, তাঁহাকে সান্ত্বনা করিলেন এবং আশ্বাস দিলেন। তাহার পর রাজাকে প্রণাম করিয়া বিদায় লইয়া রাধাকৃষ্ণ নাম গান করিতে করিতে সদলে বৃন্দাবন চলিলেন। তাঁহাদের পরবর্ত্তী বৃত্তান্ত আর কিছুই জানা যায় না।

ত্রিংশ অধ্যায়

কালুকুমারের আত্মহত্যা।—রামজীবনের পোষ্যপুত্রগ্রহণ।—রামজীবনের মৃত্যু।—রামকান্তের রাজ্যলাভ।—দয়ারামের সহ মনান্তর।—রাণী ভবানী।—দয়ারামের সহ সদ্ভাব স্থাপন।

হিজরী ১১১৯ সালে সম্রাট আলমগীরের মৃত্যু হইল। তাঁহার পুত্রদিগের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইল। আজিম ওশ্বান সেই বিবাদে নিজ স্বার্থরক্ষার্থ দিল্লী চলিলেন। রঘুনন্দনকে তিনি সঙ্গে লইয়া চলিলেন। নবাব দেওয়ান মুর্শিদকুলীখাঁ নাজিমের ও দেওয়ানের উভয় কার্য্য করিতে লাগিলেন। পথেই রঘুনন্দনের গঙ্গা প্রাপ্তি হইল। মুর্শিদকুলী ও সৈয়দ রেজাখাঁ রামজীবনকে ভাল বাসিতেন না। নাজিমের ভয়ে তিনি রামজীবনের কোন অনিষ্ট করিয়া উঠিতে পারেন নাই। এখন নাজিমের প্রস্থানে ও রঘুনন্দনের অভাব হেতু নবাব দেওয়ানের সুবিধা হইল। তিনি চাকলে ভাতুড়িয়া বন্দোবস্ত করিয়া সাধারণ জমিদারীর হারে মালগুজারী ধার্য্য করিলেন এবং রামজীবনের অনিষ্ট জন্য নানাপ্রকার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার ভয়ে রামজীবন শশব্যস্ত থাকিতেন।

মুর্শিদকুলী ঢাকা হইতে রাজধানী উঠাইয়া ভাগীরথীতীরে মখসুদাবাদে স্থাপন করিলেন এবং নিজ নামে সেই নগরের নাম মুর্শিদাবাদ রাখিলেন। রাজা রামজীবন এই নূতন রাজধানীতে চারিজন খাস বিশ্বাস নিযুক্ত করিলেন। অধিকন্তু তাঁহার নিজের একমাত্র পুত্র কুমার কালী প্রসাদ রায় নামান্তরে কালু-কুমার বরনগরে থাকিয়া স্বয়ং নবাব দর্বারের গতি বিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। একবার ১৭২৪ খৃষ্টাব্দে চাকলে ভাতুড়িয়ার আষাঢ় কিস্তীর মালগুজারী পৌঁছিতে বিলম্ব হইল, অমনি সৈয়দ রেজাখাঁ কালুকুমারকে আটক করিয়া নরক কুণ্ডে ফেলিতে আদেশ দিলেন। বিশ্বাসেরা কহিলেন, "আগে পরগণা নীলাম হউক

যদি তাহার মূল্যে বাকি শোধ না হয় তবে জমিদারকে দণ্ড করিবেন। কালুকুমার নিজে জমিদার নহেন তাহাকে আটক করা সর্ব্বথা অসঙ্গত।" রাজকুমার টাকা আদায় জন্য চারি দণ্ড সময় চাহিলেন। নবাবের খোন্দকার এবং দরবারের সমস্ত লোক রাজকুমারকে সময় দিতে অনুনয় করিতে লাগিল। কিন্তু রেজাখাঁ কিছুই মানিলেন না, কিছুই শুনিলেন না। নাজিমের একান্ত অনুগ্রহে রামজীবন যে মুর্শিদকুলীকে এবং সৈয়দ রেজাখাঁকে তুচ্ছ জ্ঞান করিতেন এখন তাহারই প্রতিফল দেওয়াই রেজাখাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। নবাব মুর্শিদকুলীর সঙ্গে রেজাখাঁর পূর্ব্বাবধি এইরূপ কার্য্য করিতে পরামর্শ ছিল। সুতরাং নায়েব দেওয়ান কোন কথা না শুনিয়া কেবল জল্লাদদিগকে তাগাদা করিতে লাগিলেন। রাজকুমার নিজ সম্মান রক্ষার উপায়ান্তর না দেখিয়া নিজ হীরকাঙ্গুরী চুষিয়া আত্মহত্যা করিলেন। তাহার দুই দণ্ড পরেই মালগুজারী আসিয়া পৌঁছিল। এরূপ অনুমান হয় যে মালগুজারী পৌঁছিতে যে গৌণ হইয়াছিল তাহাতেও নবাবের চক্রান্ত ছিল।

কালুকুমার আত্মহত্যা করিলে তাঁহার ভৃত্যেরা তাঁহার শব ঘৃত ভাণ্ড মধ্যে রাখিয়া নাটোরে সংবাদ পাঠাইল। সেই দুঃসংবাদ নাটোরে পৌঁছিলে রামজীবন অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। সমস্ত নাটোর দুঃখময় হইল। রাণী তিন দিবারাত্রি প্রায় অজ্ঞান অবস্থাতেই কাটাইলেন। সমস্ত ঐশ্বর্য্য, রাজত্ব, প্রভুত্ব, রামজীবনের নিকট নরক কুণ্ড বলিয়া বোধ হইল। সীতারাম, রূপ খাঁ ও সত্যবতীর হত্যা জনিত ব্রহ্মহত্যা ও স্ত্রী হত্যাদি স্মরণ করিয়া সেই শোক আরো বর্দ্ধিত হইল। তিনি মধ্যে মধ্যে অজ্ঞান অবস্থায় চিৎকার করিয়া বলিতেন, "এই তিন পাতকেতে, যেতে হবে নরকেতে।" এক সপ্তাহ এইরূপ আক্ষেপে ও শোকে অতীত হইল। তাহার পর কালুকুমার সম্বন্ধে কি কর্ত্তব্য তদ্বিষয়ে পণ্ডিতদিগের ব্যবস্থা গৃহীত হইল। পণ্ডিতেরা কহিলেন, "আত্মঘাতীর অগ্নিকার্য্য বা শ্রাদ্ধ নাই বটে কিন্তু মহাকষ্ট বা নিশ্চিত মৃত্যু জানিয়া সেই কষ্ট হইতে পরিত্রাণ জন্য আত্মহত্যা করিলে, আত্মহত্যা করা হয় না। যাহাদের শুশ্রূষা করিবার লোক নাই ঈদৃশ সন্ন্যাসী, বানপ্রস্থ প্রভৃতির অসাধ্য ব্যাধি হইলে তাহাদের পক্ষে আত্মহত্যা কর্ত্তব্য বলিয়া শাস্ত্রে বিধান আছে। তদ্রূপ অবস্থা হেতু মৃত কুমারের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সঙ্গত।" সেই ব্যবস্থামত কালুকুমারের শ্রাদ্ধাদি করা হইল।

অজীম ওশ্মানের পিতা মোয়াজীম তখন বাহাদুর শাহ নাম ধারণ পূর্ব্বক সম্রাট হইয়াছিলেন। রামজীবন সম্রাটের নিকট রেজাখাঁর বিরুদ্ধে অভিবাদ করিলেন এবং শাহজাদা আজীম ওশ্মানকেও সৈয়দের অত্যাচার জানাইলেন। সম্রাট্ নবাবের নিকট কৈফিয়ৎ চাহিলেন। মুর্শিদকুলীর উপদেশ মতেই সৈয়দ সেই অত্যাচার করিয়াছিলেন সুতরাং নবাব যথাসাধ্য সৈয়দের দোষ ঢাকিয়া কৈফিয়ৎ দিলেন। বাহাদুর শাহ গোঁড়া মুসলমান ছিলেন। তিনি সৈয়দকে দণ্ড দিতে নিতান্ত অনিচ্ছুক ছিলেন। তজ্জন্য সৈয়দ রেজাখাঁর অন্য কোন দণ্ড হইল না, তিনি কর্ম্মচ্যুত হইলেন মাত্র। তদ্দারা বাঙ্গালা বেহার একটি ভয়ঙ্কর রাক্ষসের অত্যাচার হইতে মুক্তি পাইল। রামজীবন সৈয়দের বিনাশ জন্য কতকগুলি ঘাতক নিয়োগ করিয়াছিলেন। মুর্শিদকুলী তাহা টের পাইয়া রেজাখাঁকে সুরক্ষিত ভাবে সত্বরে দিল্লী পাঠাইলেন।

শোকাবেগ কম হইলে মহারাজ রামজীবন দত্তক রাখিতে সাব্যস্ত করিলেন। তিনি দৈববাণী শুনিয়াছিলেন যে, 'একটাকিয়ার সন্তান নাটোরের রাজত্ব করিবে।' সেই জন্য তিনি একটাকিয়া ভাদুড়ী বংশের একটি বালককে দত্তক পাইতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু একটাকিয়ারা নিরাবিল পঠীর কুলীন, রামজীবন শ্রোত্রিয়। শ্রোত্রিয়কে পুত্রকন্যা দান করিলে কুলীনের কুলভঙ্গ হইয়া শ্রোত্রিয়ত্ব হয়, সুতরাং রামজীবনকে কোন কুলীন নিজ পুত্র দিল না। রামজীবন পুত্র আহরণ জন্য একদল সেনা সহ দয়ারাম রায়কে পাঠাইলেন। দয়ারাম চৌগাঁয়ে পড়িয়া তথাকার রাজার কনিষ্ঠ পুত্রকে বলপূর্ব্বক লইয়া আসিলেন। রামজীবন সেই বালকের নাম রামকান্ত রায় রাখিলেন এবং পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিয়া তাহাকে পোষ্য-পুত্ররূপে গ্রহণ করিলেন। দান না করা হেতু রামকান্ত দত্তক গণ্য হন নাই, এবং চৌগাঁর রাজার কুল ভঙ্গ হয় নাই।

রাজা রামজীবন পণ্ডিতদিগের মতামত জিজ্ঞাসা করায় তাঁহারা কহিলেন, "যাহাকে প্রতিপালন করিবার লোক না থাকে, তাহাকে পালন করিলে সেই শিশু পালকের পোষ্যপুত্ররূপে গণ্য হয়। এই বালক একজন ক্ষুদ্র রাজার পুত্র। তাহার প্রতিপালনের যথেষ্ট উপায় আছে। তাহাকে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া পালন করিলে সে অপহারকের পুত্র বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। ফলতঃ ভগবান মনু যে দ্বাদশ প্রকার পুত্র নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, এই শিশু তন্মধ্যে কোন

প্রকার পুত্রই নহে। সুতরাং সে আপনকার উত্তরাধিকারী হইবে না। কিন্তু সে যদি সজ্ঞান হইয়া আপনাকে পিতা বলিয়া স্বীকার করে তবে সে কৃত্রিম পুত্রবৎ আপনকার শ্রাদ্ধাদি করিতে পারিবে।"* রামকান্ত বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া রামজীবনকে পিতা বলিয়া সম্বোধন করিতে লাগিলেন। তজ্জন্য তিনি রামজীবনের কৃত্রিম পুত্র হইলেন। রামজীবন নিজের যাবতীয় সম্পত্তি দানপত্র দ্বারা রামকান্তকে দিলেন। সেই দানপত্র দয়ারামের হাতে থাকিল। দয়ারাম রামজীবনের একান্ত বিশ্বাসভাজন ছিলেন। রামকান্তের বিবাহের পাত্রী নিরূপণ এবং সম্বন্ধ-পত্রও দয়ারামই করিয়াছিলেন।

কালুকুমারের মৃত্যুর পর রাজা রামজীবন মুর্শিদাবাদস্থ নিজ পক্ষীয় বিশ্বাস-দিগকে অযোগ্য বিবেচনায় দয়ারামকে বিশ্বাস নিযুক্ত করিয়াছিলেন। দয়ারামের হাতে সর্ব্বদা চারিলক্ষ টাকা আমানত থাকিত এবং তিনি নিজ প্রভুর পক্ষে পঁচিশ লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত ঋণ করিতে পারিতেন। অধিকন্তু লক্ষ টাকা মূল্যের স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি দান বিক্রয় করিবার ক্ষমতা এবং সমস্ত জমিদারীর মাল-গুজারী বন্দোবস্ত করিবার ক্ষমতাও রাজা রামজীবন দয়ারামকে দিয়াছিলেন। ফলতঃ দয়ারামের হাতে এত অধিক ক্ষমতা ছিল যে তিনি ইচ্ছা করিলে নাটোরের সমস্ত রাজ্য এক দিনে নিঃশেষ করিতে পারিতেন। কিন্তু রামজীবনের জীবন কালে দয়ারাম সেই ক্ষমতার কিছুমাত্র অপব্যবহার করেন নাই বরং প্রভুর উপকারার্থ অনেক সময়েই নিজ ক্ষতি স্বীকার করিয়াছেন।

দয়ারামের প্রথমে দাস উপাধি ছিল। তিনি লেখা পড়া শিখিলে সরকার উপাধি হইয়াছিল। রামজীবন রাজোপাধি পাইয়া অতি প্রিয় দয়ারামকে "মজুমদার" উপাধি দিয়াছিলেন। পরে মুর্শিদাবাদে সদর মুক্তিয়ার হইয়া "বিশ্বাস" উপাধি পাইলেন। নবাব দর্বারে কার্য্য পরিচালন জন্য যে সকল

* শ্রীকৃষ্ণ সার্ব্বভৌম নামক বিখ্যাত নৈয়ায়িক রামজীবনের এক জন সভাসদ ছিলেন। ইনি ১৬৪৫ শকে পদাঙ্কদূত রচনা করেন। কবি কাব্যশেষে লিখিয়াছেন,—

> 'শাকে সায়কবেদষোড়শমিতে শ্রীকৃষ্ণশর্ম্মার্পয়ন্
> আনন্দপ্রদনন্দনন্দন-পদদ্বন্দারবিন্দং হৃদি।
> চক্রে কৃষ্ণপদাঙ্কদূতরচনং বিদ্বন্মনোরঞ্জনং
> শ্রীলশ্রীযুতরামজীবনমহারাজাধিরাজাদৃতঃ॥"

ইনিই সম্ভবতঃ উক্ত মত প্রদান করেন।

গুণ আবশ্যক দয়ারামের সে সমস্তই প্রচুর ছিল। দয়ারাম বুদ্ধিমান, কার্য্যদক্ষ, অভিজ্ঞ, পরিশ্রমী, মিষ্টভাষী, চাটুকার এবং প্রচুর উৎকোচদাতা ছিলেন। নবাবের পত্নী, উপপত্নী, দাস, দাসী, কর্ম্মচারী এবং মোল্লা, মৌলবী প্রভৃতি সমস্ত লোকদিগকেই দয়ারাম খোষামোদ এবং উৎকোচ দ্বারা বশীভূত করিয়াছিলেন। তাহাদের কোন প্রয়োজন বা অনাটন জানিতে পারিলে দয়ারাম বিনা প্রার্থনায় তাহা সঙ্কুলন জন্য চেষ্টা করিতেন এবং তাঁহার ভাগ্য গুণে কখন তাঁহার চেষ্টা বিফল হইত না। দয়ারামের গুণে নবাব বশীভূত হইলেন। পূর্ব্বে রামজীবনের প্রতি তাঁহার যে বিদ্বেষ ছিল দয়ারামের গুণে তাহা তিরোহিত হইল। দয়ারামের হাতে রামজীবনের বহু লক্ষ টাকা আমানত থাকিত। দয়ারাম তদ্দ্বারা বহুলোকের উপকার করিতেন। কোন জমিদার বাকি মালগুজারীর জন্য দণ্ডিত হইবার উপক্রম হইলে দয়ারাম টাকা দিয়া তাহাকে মুক্ত করিতেন পরে সে টাকা বিনা সুদে কিম্বা সুদসহ আদায় করিতেন এবং নিজে কিছু পুরস্কারীও পাইতেন। নবাব দর্বারে দয়ারামের এতদূর প্রতিপত্তি হইয়াছিল যে, যদি কোন ব্যক্তির বাকি মালগুজারী, জরিমানা কিম্বা অন্য কোন দেনা সম্বন্ধে দয়ারাম বলিতেন যে, 'এই টাকা আমি দিব' অমনি বাকিদার খালাস পাইত। তাহার মাসাবধি কাল পরে সেই টাকা বাকিদার কিংবা দয়ারাম দাখিল করিলেও কেহ কোন আপত্তি করিত না। সমস্ত বাঙ্গালা ও বেহারের মধ্যে কেবল মাত্র বর্দ্ধমানের রাজা ও গয়াটিকারীর রাজা ব্যতীত সমস্ত জমিদারগণই দয়ারামের নিকট সময়ে সময়ে উপকৃত হইয়াছিলেন। দয়ারাম দয়ার সাগর বলিয়া খ্যাত হইয়াছিলেন। অথচ তাঁহার উপার্জ্জনও যথেষ্ট হইত। স্বয়ং দিল্লীর সম্রাট পর্য্যন্ত তাঁহার সুখ্যাতি শুনিয়া প্রশংসা করিয়াছিলেন।

গঙ্গাতীরে বরনগরে মহারাজ রামজীবনের জীবনান্ত কাল উপস্থিত হইল। রামজীবন ভাবী বিবাদ নিরাকরণ মানসে ভবানী প্রসাদ ও রামকান্তকে ডাকিয়া উভয়ের মধ্যে সম্পত্তির অংশ নিরূপণ করিতে চেষ্টা করিলেন। দয়ারাম কহিলেন, "কুমার ভবানী প্রসাদ রঘুনন্দনের ঔরস পুত্র। তাঁহাকে সমস্ত সম্পত্তির ৷৷৵০ দশ আনা অংশ সহ বরনগরের রাজবাড়ী দিউন। আর নাটোর সহকারে ।৵০ আনা অংশ কুমার রামকান্তকে দিউন।" রামজীবন সেই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া ভবানী প্রসাদকে সম্মতি লিখিয়া দিতে বলিলেন। রামকান্তকে

কিছু না দেওয়াই ভবানী প্রসাদের অভিপ্রায় ছিল। তিনি রামজীবনকে কহিলেন, "জ্যেষ্ঠতাত! আপনি এখন ঈশ্বর চিন্তা করুন। আমরা ভাইভাই আপনাপন অংশ পরে ঠিকানা করিব।" রামজীবন তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিয়া তাহাকে ৷৵৹ আনা পরিশেষে ৷৵৹ আনা অংশ দিতে চাহিলেন। ভবানী রায় তাহাতেও সম্মত হইলেন না। তখন মহারাজ ক্রুদ্ধ হইয়া দয়ারামের প্রতি ইঙ্গিত করিলেন। তখন ইং ১৭৩০ সাল, নবাব সুজাউদ্দীনের রাজত্ব চলিতে-ছিল। নবাব দর্বারে দয়ারামের অসাধারণ প্রতিপত্তি ছিল। রামজীবন না মরিতেই দয়ারাম নবাব সরকারে জানাইলেন যে, "মহারাজ রামজীবনের গঙ্গাপ্রাপ্তি হইয়াছে। তাঁহার একমাত্র পুত্র রামকান্ত রায় বয়ঃপ্রাপ্ত এবং কার্য্যক্ষম বটে। এক্ষণে রাজসাহী বিভাগের ১৪৭ পরগণা জমিদারীতে রাজা রামকান্তের নাম জারী করিয়া তাঁহাকে রাজোপাধি ও খেলাত প্রদানাজ্ঞা হয়।" দয়ারাম নজরের টাকা ও উৎকোচ প্রদানান্তর সনদ ও খেলাত লইয়া আসিলেন। তাহার দ্বিতীয় দিনে রামজীবনের জীবন শেষ হইল।

ভবানী প্রসাদ মনে করিয়াছিলেন যে রামজীবনের জীবনান্তেই রামকান্তকে দূর করিয়া দিবেন। তাঁহাদের জ্ঞাতি, কুটুম্ব, কর্ম্মচারী, সৈন্যগণ প্রায় সমস্তই তাঁহার সপক্ষ ছিল। কিন্তু একমাত্র দয়ারাম রামকান্তের পক্ষে থাকিয়া সুকৌশলে রামকান্তকে সমস্ত রাজত্ব দিলেন। বৃদ্ধ মহারাজের লোকান্তর মাত্র দয়ারাম নবাবী ফর্ম্মান বাহির করিয়া রামকান্তকে গদীতে বসাইলেন এবং "মহারাজ রামকান্ত কি জয়" বলিয়া জয়ধ্বনি করিতে এবং ডঙ্কা পিটিতে হুকুম দিলেন। কি উপায়ে রামকান্তকে দূরীকৃত করিবেন, এই বিষয়ে পরামর্শ জন্য ভবানী প্রসাদ অন্দর মহলে পারিষদগণ সহ সভা করিয়াছিলেন, তিনি সহসা ডঙ্কাধ্বনি শুনিয়া বাহির বাড়ীতে দূত পাঠাইলেন। দূত মুখে রামকান্তের নবাবী সনন্দ প্রাপ্তি শুনিয়া ভবানী প্রসাদ পাছ দুয়ার দিয়া পলায়ন করিলেন। অমনি সমস্ত জ্ঞাতি, কুটুম্ব, অমাত্য, ভৃত্য, রামকান্তের অনুগত হইল। রামকান্ত পিতার অন্তেষ্টিক্রিয়া করিয়া নাটোরে আসিয়া সিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন। ভবানী প্রসাদ নামান্তরে দেবী প্রসাদ কুঞ্জঘাটার রাজা নন্দ কুমারের সহায়তা প্রার্থনা করিলেন। নন্দ কুমার ভবানী প্রসাদের সহায় হইয়া আরো কতিপয় রাজাকে ভবানী প্রসাদের সাহায্য করিতে অনুরোধ করিলেন। রামদয়াল

রায় এখন রামকান্তের দেওয়ান হইয়াছিলেন। তিনি ভবানী প্রসাদকে বার্ষিক বারো হাজার টাকা পুরুষানুক্রমিক বৃত্তি লইয়া সন্ধি করিতে প্রস্তাব করিলেন। ভবানী প্রসাদ সম্মত হইলেন। সুতরাং সমস্ত গোলযোগ মিটিয়া গেল।

দেওয়ান রামদয়াল রায় যখন দর্বারে বসিতেন তখন ব্রাহ্মণেরা হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেন। ক্ষত্রিয় ও মুসলমানেরা সেলাম করিত। বৈদ্যেরা নমস্কার বলিত এবং সমস্ত শূদ্রেরা প্রণাম করিত। কিন্তু দয়ারামের পুত্র প্রাণনাথ রায় কেবল দক্ষিণ হস্ত উঠাইয়া সেলাম করিত। রামদয়াল তাহাকে সেলাম করিতে নিষেধ করায় সে পরদিন নমস্কার করিল। তিনি তাঁর মুখে নমস্কার শব্দ শুনিয়া রামদয়াল বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইলেন। তদ্দৃষ্টে প্রাণনাথ রায় পরদিন নমস্কার, সেলাম বা প্রণাম কিছুই করিল না। রামদয়াল তখন অতিমাত্র ক্রোধে চাপরাশীকে হুকুম দিলেন, "এই তেলের পেচীকে ঘাড় ধরিয়া বাহির করিয়া দেও।" সেই কথা শুনিবামাত্র প্রাণনাথ রায় দেওয়ানখানা হইতে উঠিয়া গিয়া মহারাজ রামকান্তের নিকট নালিশ করিলেন। রামকান্ত দেওয়ানের কৈফিয়ত তলপ করিলেন। সন্ধ্যার পর খাস দর্বারে রামদয়াল ও প্রাণনাথ উভয়েই উপস্থিত হইলেন। মহারাজ তখনও অন্দর মহল হইতে বাহির হন নাই। সেই সময়ে উভয়ের মধ্যে খুব রাগারাগি ও গালাগালি হইল। ইতিমধ্যে রামকান্ত আসিলেন। তিনি উভয়ের বিবাদ শুনিয়া প্রাণনাথ রায়কে (পরাণ রায়) কহিলেন, "শূদ্রের মধ্যে কায়স্থই সকলের বড়, তাহার উপর রামদয়াল তোমার অপেক্ষা বয়সে বড়, বিদ্যায় বড়, ধনে বড় এবং পদমর্য্যাদায় বড়। অতএব তাহাকে প্রণাম করা তোমার উচিত। নতুবা সে তোমাকে অপমান করিলে আমি কোন প্রতীকার করিব না।" পরাণ রায় রাজার বিচার শুনিয়া ম্রিয়মান হইলেন। সেখানে কিছু বলিলেন না। তিনি বাড়ী আসিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত লিখিয়া মুর্শিদাবাদে দয়ারামের নিকট দূত পাঠাইলেন। নিজে তদবধি রাজবাড়ীতে যাওয়া বন্ধ করিলেন।

দয়ারাম পুত্রের পত্র পাইয়া ক্রোধে অধীর হইলেন। তিনি চিন্তা করিলেন, "রাজা রামকান্তকে আমি ধরিয়া আনিয়া রাজা করিয়াছি। লালা গোকুলকে কুমার ভবানী প্রসাদ জয় কালীর সম্মুখে বলি দিতে হুকুম দিয়াছিলেন, আমি তাহাকে তখন রক্ষা করিয়াছি। তাহার পর সর্ব্বমঙ্গলা ঠাকুরঝি তাহাকে মুক্ত

করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু আমি যদি আগে রক্ষা না করিতাম তবে ঠাকুরঝির আসিবার আগেই গোকুলের জীবন শেষ হইত। আমি ইচ্ছা করিলে তখন রামদয়াল সহ গোকুলের সমস্ত বংশ ধ্বংশ করিতে পারিতাম। এখন সেই রাজা রামকান্ত বিচার করিলেন যে, 'কায়েত জাতি বড় তিলী জাতি ছোট', রামদয়াল ধনে মানে বড়, আর দয়ারামের সন্তান তার কাছে তুচ্ছ; আমি ইহার প্রতিফল অবশ্য দিব।" দয়ারাম সুকৌশলে ভবানী প্রসাদকে মুর্শিদাবাদে আনাইয়া নিজ ব্যয়ে রামকান্তের নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করাইলেন। রামকান্ত যে বৈধ দত্তক নহেন তাহা সহজেই প্রমাণ হইল। মৃত রাজা রামজীবনের ওয়ারিস সূত্রে ভবানীপ্রসাদ রাজসাহীদিগর ১৪৭ পরগণার রাজা বলিয়া ধার্য্য হইলেন। দয়ারাম ও রাজা নন্দকুমারের সাহায্যে তিনি রাজোপাধি প্রাপ্ত হইলেন।

সেই সংবাদ নাটোরে পৌঁছিলে রামকান্ত বিষাদসাগরে মগ্ন হইলেন। তিনি রামদয়াল ও নায়েব প্রাণকৃষ্ণ চৌধুরী (ইনি গুণাকর রায়ের পুত্র) এই দুই জনকে ইতিকর্ত্তব্যতা বিষয়ে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। রামদয়াল রায় কহিলেন, "স্বর্গীয় মহারাজা রামজীবন আপনাকে যে দানপত্র দ্বারা নিজের সমস্ত সম্পত্তি দান করিয়াছিলেন, সে দলীল দয়ারামের হাতে, আপনকার সনন্দখানিও দয়ারামের হাতে, এ অবস্থায় দয়ারাম বিপক্ষ হইলে মামলা মোকদ্দমায় কোন সুফল হইবে না। যদি আপনি বাহুবলে রাজপদ রক্ষা করিতে চাহেন তবে আমি সাহায্যের উপায় করিতে পারি। আমার বিহাই হরিরাম কায়েত কোচবেহারের মহারাজার সেনাপতি। আমি তাঁহার সাহায্য পাইতে পারি। আমার মামা দিনাজপুরের মহারাজের দেওয়ান, তাঁহার নিকটও সাহায্য পাইতে পারি। মহারাঠী ও পাঠানদিগেরও সাহায্য পাইতে পারি। এই সমস্ত সাহায্য লইয়া বাহুবলে রাজ্য রক্ষা করুন। নতুবা সমস্ত বহুমূল্য দ্রব্য ও টাকা হস্তগত করিয়া স্থানান্তর গমন করুন। ইহা ভিন্ন অন্য উপায় দেখা যায় না।"

প্রাণকৃষ্ণ কহিলেন, "বাহুবলে আত্মরক্ষা করা এখন সহজ নহে। সীতারাম এবং একটাকিয়ার অবস্থা উত্তমরূপেই জানেন। বরং সম্রাটের নিকট অতিবাদ করা এবং ভবানী প্রসাদ সহ আপোষে বন্দোবস্ত করিতে চেষ্টা করাই আমার বিবেচনায় সুসঙ্গত।" রামকান্ত কহিলেন, "তিন বৎসর কাল যাবৎ অর্দ্ধ বাঙ্গালার অধীশ্বর থাকিয়া এখন নীচত্ব স্বীকার করিতে

পারিব না। বাহুবলে আত্মরক্ষা করিব তাহাতে ভাগ্যে যাহা হয় তাহাই উত্তম।" এই পরামর্শ স্থির হইলে, ইহাও ধার্য্য হইল যে প্রাণকৃষ্ণ গিয়া উড়িষ্যার পাঠান এবং নাগপুরিয়া বর্গীদের সহায়তা পাইবার চেষ্টা করিবেন। আর রামদয়াল নাটোরে থাকিয়া স্থানীয় সমস্ত লোক বশীভূত করিতে এবং চিঠি দ্বারা কোচবেহার, দিনাজপুর হইতে সাহায্য আনাইতে সদুপায় করিবেন।

রাজা রামকান্তের পত্নী রাণী ভবানী এই সকল পরামর্শ শুনিয়া তাহা একবারেই অকর্ম্মণ্য বিবেচনা করিলেন। তিনি রাজাকে কহিলেন, "বাহুবলে রাজ্য রক্ষা অসম্ভব। একটাকিয়ার পাঠান, সান্যালের কায়েত এবং সীতারামের চণ্ডাল সেনা তাহাদের একান্ত অনুগত ছিল। তথাপি তাহারা বাহুবলে আত্মরক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়া নষ্ট হইয়াছে। তোমার তাদৃশ কোন একান্ত অনুগত ভৃত্য নাই। বর্গী ও পাঠান সহায় করিবার আশা দুরাশা মাত্র। যদি তাহারা সহায় হয়, যদি তাহারা কৃতকার্য্য হয়, তবে রাজত্ব তাহারাই লইবে তোমাকে কদাচ দিবে না। সুতরাং ঐ সকল আশা ছাড়। কোচবেহারের মহারাজার সেনাপতি তোমার দেওয়ানের কুটুম্ব। তাহার সাধ্য কি যে সে মহারাজার সেনা লইয়া নবাবের রাজ্য মধ্যে আসিয়া যুদ্ধ করে। মহারাজ কদাচ এরূপ অকারণ নবাবের সহ বিবাদ করিতে তাঁহার সৈন্য ও সেনাপতিকে অনুমতি দিবেন না। দিনাজপুরের রাজার দেওয়ান সম্বন্ধেও সেই কথা। এ সকল পাগলামি কথায় সায় দিয়া পাগল হইও না। যে মাটীতে লোক আছাড় খাইয়া পড়ে আবার সেই মাটী ধরিয়াই খাড়া হয়। তাই বলি, দয়ারামের কাছে চল। তাহার কৃত অনিষ্টের ঔষধ তাহার কাছেই পাওয়া যাইবে।" রাজা রামকান্ত কোন মতেই দয়ারামের শরণাগত হইতে সম্মত হইলেন না। তখন রাণী ভবানী রাজগুরু চাঁদঠাকুর, মন্ত্রী প্রাণকৃষ্ণ চৌধুরী এবং সেনাপতি জবরদস্ত খাঁকে নিজ মতের পোষকতা করিতে অনুরোধ করিলেন।

চাঁদঠাকুর রাজা রামকান্তকে কহিলেন, "বৎস! তুমি দয়ারামকে ছোট লোক বলিয়া মনে করিও না। স্বর্গীয় মহারাজা রামজীবনের তুমি যেমন এক পোষ্য পুত্র দয়ারামও তদ্রূপ আর এক পোষ্য পুত্র। সেই সম্পর্কে দয়ারাম তোমার বড় ভাই। মৃত রাজার সমস্ত দলীল-দস্তাবেজ, সমস্ত গুপ্তকথা

দয়ারামের হস্তগত। দয়ারাম ইচ্ছা করিলে নাটোরের সমস্ত রাজত্ব একদিনে নষ্ট করিতে পারে। দয়ারাম কুটিল কিন্তু অধার্ম্মিক নহে। আমরা দয়ারামকে বাধ্য করিব। তাহা দ্বারা তোমার যত উপকার হইবে তত অন্য কাহারও দ্বারা হইতে পারে না। অতএব তুমি আমার ও রাণীর কথা রাখ, দয়ারামের নিকট চল।" প্রাণকৃষ্ণ চৌধুরী কহিলেন, "ভূতপূর্ব্ব মহারাজা আপনার সমস্ত সম্পত্তি দানপত্র দ্বারা হুজুরকে দিয়াছিলেন, সেই দানপত্র দয়ারামের হাতে আছে। যে কোনরূপে হউক সেই দলীলখানি হস্তগত করা আবশ্যক। অতএব দয়ারামের সহিত সদ্ভাব করা নিতান্ত আবশ্যক।" জবরদস্ত খাঁ কহিলেন, "বাহুবলে নবাবের সহ যুদ্ধ করিয়া রাজ্য রক্ষা করা অসম্ভব। হুজুর দয়ারামের নিকট চলুন। যদি সে ভাল কথায় বাধ্য না হয় তবে আমি তাহাকে খুন করিব এবং সমস্ত দলীল লুঠ করিব। তাহার মধ্য হইতে দানপত্র বাছিয়া লইয়া তাহা দ্বারা রাজত্বের জন্য মোকদ্দমা চালাইবেন। ইহা ভিন্ন অন্য সদুপায় নাই।" চাঁদঠাকুর ও প্রাণকৃষ্ণ সেনাপতির কথা শুনিয়া কহিলেন, "ইহাই ঠিক। যদি দয়ারাম ভাল হালে মহারাজের সহায় না হয় তবে তাহাকে খুন করিয়া দলীল-দস্তাবেজ হাত করা যাইবে। অতএব দয়ারামের কাছে যাওয়াই আবশ্যক।" সকলের পরামর্শ একই হইল দেখিয়া রাজা রামকান্ত অগত্যা সম্মত হইলেন। ভবানী প্রসাদ রায় রাজত্বের সনন্দ লইয়া নাটোরে আসিতেছেন শুনিয়া রাজা রামকান্ত, রাণী ভবানী, চাঁদঠাকুর, প্রাণকৃষ্ণ চৌধুরী এবং জবরদস্ত খাঁ যথাসাধ্য ধনরাশি সহ সঙ্গোপনে মুর্শিদাবাদে চলিলেন।

মুর্শিদাবাদে দয়ারাম নিজ বাসা হইতে যে পথে নবাব বাড়ী যাইতেন সেই পথের ধারে একটি বাড়ী ভাড়া করিয়া রাজা রামকান্ত সেখানে বাসা করিলেন। এদিকে ভবানী প্রসাদ রায় নাটোরে আসিয়া রাজা হইলেন। একদিন দয়ারাম ঘোড়ায় চড়িয়া নবাব বাড়ী যাইতেছিলেন, পথিমধ্যে রাজা রামকান্ত ও জবরদস্ত খাঁ তাঁহার ঘোড়ার লাগাম ধরিলেন। দয়ারাম ঘোড়া হইতে নামিয়া রাজা রামকান্তকে প্রণাম করিলেন এবং জবরদস্তকে সেলাম করিলেন। রাজা দয়ারামের হাত ধরিয়া কহিলেন, "দাদা! এখন আমার উপায় কি?" দয়ারাম ব্যঙ্গভাবে কহিলেন, "এ সব বড় ঘরের বড় কথা,

ইহার পরামর্শ দিতে তেলের পেচীর সাধ্য কি? কায়স্থ মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করুন, যে বিদ্যায় বড়, বুদ্ধিতে বড়, জাতিতে বড়, ধনে মানে কুলে শীলে সকল বিষয়েই বড়।" এই বলিয়া হাত ছাড়াইতে চেষ্টা করিলেন কিন্তু পারিলেন না। জবরদস্ত খাঁ কহিলেন, "চলুন মুক্তার সাহেব! মহারাজার এই বাসায় চলুন।" দয়ারাম দুদিকেই মুস্কিল দেখিলেন। তিনি বুঝিলেন যে মহারাজা রামকান্তের বাসায় ঢুকিলেই তাঁহার বাধ্য হইতে হইবে, অথচ না যাইলেও রাজা রামকান্তের এবং উজবকের (জবরদস্ত খাঁ জাতিতে উজবক) হাত ছাড়াইতে পারিবেন না। জবরদস্তের কোমরে যে কিরীচ ঝুলিতেছে তাহাও বিনা প্রয়োজনে সঙ্গে আনা হয় নাই। অগত্যা তিনি বাসায় যাইতে স্বীকার করিলেন। রাজা তাঁহার হাত ধরিয়া সঙ্গে লইয়া চলিলেন। জবরদস্ত পশ্চাতে চলিলেন। দয়ারামের ঘোড়া ও সহিস বাহিরে থাকিল। তিনি বাসাবাড়ীর উপর তালায় গিয়া চাঁদ ঠাকুরকে দেখিয়া ভূমিষ্ট হইয়া প্রণিপাত করিলেন। চাঁদঠাকুর ও প্রাণকৃষ্ণ চৌধুরী নানা প্রকার বুঝাইয়া অতি মিষ্ট বাক্যে রামকান্তের সহায়তা করিতে তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন। রাণী ভবানী পর্দার আড়াল হইতে অনেক অনুনয় বাক্য বলিলেন। জবরদস্ত কিরীচখানি খাপ হইতে খুলিয়া তাহা ঝাঁকিতে ঝাঁকিতে অতি নম্রভাবে কহিলেন, "মুক্তার সাহেব! প্রভু যদি একদিন একটা অনিষ্টও করেন তথাপি ভৃত্যের তাহা সহ্য করা কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের অনিষ্ট করা হিন্দুর মহা পাপ। সেইজন্য আমি বন্ধুভাবে বলি যে আপনি মহারাজার সহায়তা করুন। আমি আপনকার অনুগত লোক কিন্তু আমি দশ দিন মহারাজার নিমক খাইয়াছি। এখন তাঁহার বিপদ দেখিয়া কি আমি তাঁহাকে অমান্য করিতে পারি। তিনি হুকুম দিলে আমি এই কিরীচ খানি অবশ্যই আপনকার শ্রীচরণ সেবায় প্রয়োগ করিব। তাহাতে খোদা তালা আমার ভাগ্যে যা করেন তাই হবে।" এই বক্তৃতার অর্থ দয়ারাম স্পষ্টই বুঝিলেন যে সহজে বাধ্য না হইলে, বল প্রকাশ করা হইবে। সেইখানে চাঁদঠাকুরের সম্মুখে গঙ্গাজল স্পর্শ করিয়া রামকান্ত ও দয়ারাম সন্ধি করিলেন যে—

(১) রামকান্তের পুনরায় রাজত্ব লাভের জন্য দয়ারাম যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন।

(২) রামকান্ত রাজ্য পাইলে দয়ারামের কোন অনিষ্ট করিবেন না। বরং দয়ারামকে দেওয়ান এবং তৎপুত্র প্রাণনাথ রায়কে খাস-বিশ্বাস নিযুক্ত করিবেন।

(৩) কুমার ভবানী প্রসাদ রায়ের পূর্ব্বে যে সমস্ত সম্পত্তি ও তন্‌খা ছিল তাহা স্থির রাখিবেন। তাঁহার কোন অনিষ্ট করিবেন না, কোন ওয়াশীলতের দাবী করিবেন না এবং তৎপক্ষীয় কোন লোকের কোন অনিষ্ট করিবেন না।

(৪) দয়ারামের সম্মতি ব্যতীত রাজা রামকান্ত কোন কায়স্থ চাকর রাখিতে পারিবেন না।

পরদিন দয়ারাম মহারাজা রামজীবনের কৃত দানপত্রখানি রাণী ভবানীকে দিয়া কহিলেন, "আমি নিজে ভবানী প্রসাদের বিরুদ্ধে নাগিশ করিতে পারিব না, প্রাণকৃষ্ণের দ্বারা মোকদ্দমা দায়ের করুন। আমি পরোক্ষে সাহায্য করিব।" সেই পরামর্শ মতেই মোকদ্দমা দায়ের করা হইল। দয়ারাম পণ্ডিতদিগের ব্যবস্থা লইলেন। পণ্ডিতেরা ব্যবস্থা দিলেন যে, "পুত্রপৌত্রপ্রপৌত্রবিহীন ব্যক্তি সমস্ত স্বোপার্জ্জিত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি কোন ব্রাহ্মণকে অথবা স্বজাতীয় কোন ব্যক্তিকে দান করিতে পারে। অপর দায়াদগণ তাহাতে কোন প্রতিবন্ধক হইতে পারে না। কিন্তু তাদৃশ দান পৈত্রিক স্থাবর সম্পত্তি সম্বন্ধে ব্যর্থ। সুতরাং রামজীবনের পৈত্রিক যে ৮ বিঘা ব্রহ্মত্র ছিল তৎসম্বন্ধে ঐ দানপত্র নিষ্ফল, অন্যান্য যাবতীয় সম্পত্তি দানপত্র মতে রামকান্তের প্রাপ্য।" ভবানীপ্রসাদ আপত্তি করিলেন যে, "দানপত্রের লিখিত সম্পত্তি প্রায় সমস্তই তাঁহার পিতা রঘুনন্দনের কৃত; রামজীবন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়া তাঁহারই নামজারী ছিল মাত্র।" নবাব সুজাউদ্দীন নাটোর সরকারের প্রকাণ্ড সম্পত্তি রামকান্ত ও ভবানী-প্রসাদকে সমান ভাগে দিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে নবাবের মৃত্যু হইল। তৎপুত্র সরফরাজ খাঁ নবাব হইলেন। নূতন নবাব অনভিজ্ঞ বালক। দয়ারাম নবাবের দাস দাসী ও কর্ম্মচারীদিগকে উৎকোচ দিয়া বাধ্য করিলেন। তাহারা সকলে ভবানী প্রসাদকে কম্‌বখ্‌ত অর্থাৎ হতভাগ্য বলিয়া অজ্ঞ নবাবের নিকট ব্যাখ্যা করিল। এই মোকদ্দমার গোলযোগে তহশীলদারগণ খাজনা পাঠাইতে ক্রটি করিল। ভবানীপ্রসাদের মালগুজারী বাকি পড়িল। দয়ারাম নবাবকে জানাইলেন যে, "ভবানী প্রসাদ অকর্ম্মণ্য ও হতভাগ্য জন্য মালগুজারী বাকি পড়িতেছে, রামকান্তের আমলে কোন বাকি পড়িত না।" কর্ম্মচারীদের

পরামর্শ মতে নবাব রামকান্তের অনুকূলে ওয়াক্কা দিলেন। রামকান্ত পুনরায় রাজা হইলেন এবং দয়ারাম তাঁহার দেওয়ান হইলেন। তদবধি দয়ারামের "রায়" উপাধি হইল এবং মাসিক বেতন ৫০০৲ পাঁচ শত টাকা হইল। এই অবধি তিনি অতিশয় কায়স্থ বিদ্বেষী হইয়াছিলেন।

ভবানী প্রসাদ পুনরায় বৃত্তিভোগী হইয়া অল্পদিন মধ্যে লীলা সম্বরণ করিলেন। তিনি দত্তক রাখিতে অনুমতি দিয়াছিলেন কিন্তু রামকান্ত ভবানীপ্রসাদের পত্নীকে দত্তক রাখিতে দিলেন না। তাহাতেই রঘুনন্দন নির্ব্বংশ হইলেন। রামজীবন পূর্ব্বেই নির্ব্বংশ হইয়াছিলেন। দত্তক অসিদ্ধ হইলে সে শাস্ত্র ও যুক্তিমতে পুনরায় তাহার জনকের সন্তান বলিয়া গণ্য হয়। ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানে তদ্রূপই হইয়া থাকে। কিন্তু বাঙ্গালা দেশে সেই রীতি না থাকায় রামকান্ত স্পষ্ট অসিদ্ধ হইয়াও রামজীবনের পুত্র বলিয়াই গণ্য থাকিলেন।

এতদিনে দৈববাণী সম্পূর্ণ সিদ্ধ হইল। রামজীবন ও রঘুনন্দন নির্ব্বংশ হইলেন। একটাকিয়ার সন্তান রামকান্ত রায় নাটোরে রাজা হইলেন। তাঁহারই সন্তান এখনও নাটোরে রাজা আছেন। কিন্তু তাঁহাদের একটাকিয়া উপাধি নাই। একটাকিয়ার রাজ্য নাটোর রাজ্যভুক্ত হইয়াছে। একটাকিয়ার নাম বিলুপ্ত হইয়াছে। চৌ গাঁয়ের রাজারা প্রকৃত একটাকিয়া বংশসম্ভূত বটে, কিন্তু তাঁহাদেরও একটাকিয়া উপাধি নাই। একটাকিয়ার বাদশাহী সিংহাসন কিছুদিন নাটোরে ছিল। পরে রাণী ভবানী তাঁহার দত্তক মহারাজা রামকৃষ্ণের সহ বিবাদ করিয়া সেই সিংহাসন খণ্ড খণ্ড করিয়া কাশীধামে ব্রাহ্মণদিগকে বিতরণ করিয়াছিলেন। দৈববাণী প্রায়শঃ অতি কুটিল ভাবে প্রকাশ হয়। লোকে তাহার যেরূপ অর্থ বিবেচনা করে কার্য্যকালে তাহার প্রচুর বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। নাটোর ও সাতগড়ায় যেরূপ দৈববাণী হইয়াছিল, লোকে তাহা পরস্পরের বিরুদ্ধ মনে করিয়াছিল, অথচ তাহা সমস্তই অচিন্ত্যপূর্ব্ব ভাবে সফল হইল। একটাকিয়ার নাম ও রাজপাট বিলুপ্ত হইয়াছে এবং একটাকিয়ার সন্তান নাটোরে রাজত্ব করিতেছে।

"ধর্ম্ম ও বিধর্ম্মের কথা অবশেষে একদিকেই লইয়া যায়।
স্বপ্ন এক, কিন্তু ব্যাখ্যা বিভিন্ন।"

পরিশিষ্ট।

অতিরিক্ত টীকা।

১। সামাজিক ব্যবহার।

হিন্দুদের মধ্যে ইতিহাস লিখিবার রীতি প্রকৃষ্টরূপ ছিল না বটে কিন্তু আর্য্য ঋষিগণ জাতীয় ইতিহাস রক্ষার একটি উৎকৃষ্ট উপায় করিয়াছিলেন যাহা আর কোন দেশেই নাই। হিন্দুশাস্ত্রে প্রত্যেক ব্যক্তির অথবা মহৎ ব্যক্তির নিজ বংশ রক্ষা করা অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। বংশ রক্ষা না করিলে নরকগামী হইতে হয়। এজন্য অঙ্গজ পুত্র না হইলে দত্তকাদি কৃত্রিম পুত্র দ্বারা বংশ রক্ষা করিতে হয়। এইজন্য আর্য্যজাতির কোন মহাবংশ বিলুপ্ত হয় নাই। আবার প্রত্যেক আর্য্যসন্তানের বিবাহে এবং বিদ্ধি শ্রাদ্ধে সেই ব্যক্তি কোন্ প্রজাপতির সন্তান এবং তাহার কোন শাখা সম্ভূত তাহা পাঠ করিতে হয়। আবার সেই গোত্রে কোন্ কোন্ প্রবর (বড় লোক) ছিল তাহাও বলিতে হয়। সুতরাং তদ্দ্বারাই সেই বংশের পরিচয় এবং প্রয়োজনীয় ইতিহাস সংরক্ষিত হয়। প্রত্যেক আর্য্যসন্তান সেই বংশের এক টুকরা জীবন্ত ইতিহাস। একজন ভারদ্বাজ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ দেখিলেই বুঝা যায় যে তিনি প্রজাপতি অঙ্গিরার সন্তান এবং ভরদ্বাজ মুনির শাখা সম্ভূত। ঐরূপ একজন বাৎস্য গোত্রীয় ব্রাহ্মণ দেখিলেই জানা যায় যে তিনি ভৃগু প্রজাপতির সন্তান এবং বৎস মুনির শাখা সম্ভূত। প্রত্যেক গোত্রীয় প্রবরদিগের নাম পাঠ করিতেই জানা যায় যে সেই গোষ্ঠীতে কোন্ কোন্ মহাপুরুষ জন্মিয়াছিলেন। সুতরাং এই উপায়ে ইতিহাস রক্ষিত হইয়াছে। অন্যান্য জাতির ইতিহাসে যেমন মিথ্যা কথা মিশ্রিত থাকে আর্য্যদিগের বংশমালায় তেমন কোন মিথ্যা মিশিতে পারে না।

অধিকাংশ য়ুরোপীয় ঐতিহাসিকগণ বলেন যে হিন্দুরা তার্ত্তার জাতির শাখা। তাঁহাদের এই সিদ্ধান্তের পোষক কোন প্রমাণ কোন দেশের কোন ইতিহাসেই নাই। অধিকন্তু আর্য্যজাতির এক বিশেষ লক্ষণ এই যে তাঁহাদের প্রথমাবস্থা হইতেই দাড়ী গোঁফ ছিল এবং আছে। তার্ত্তার জাতির (Mongolian Race) দাড়ী গোঁফ হয় না। দাড়ী গোঁফ কাফরী জাতির (Negro Race) নাই; রাক্ষস জাতিরও (Malayan Race) নাই। উহা জলবায়ু বা খাদ্য দ্রব্যের গুণে হয় না। কিন্তু রক্তের মিশ্রণ দ্বারা এই লক্ষণ উৎপন্ন বা রহিত হইতে পারে। তুরুষ্ক জাতীয় লোক পুনঃ পুনঃ আর্য্যরমণী বিবাহ করায় তাহাদের শ্মশ্রু উঠিতেছে। পক্ষান্তরে শাক্য ক্ষত্রিয়-গণ ব্রহ্মদেশে বাস করিয়া মগরমণী গর্ভে যে সন্তান উৎপাদন করে তাহাদের শ্মশ্রু হয় না। প্রাচীন প্রজাপতিদের সময়াবধি অমিশ্রিত অবস্থায় যখন আর্য্যদের দাড়ী গোঁফ থাকা জানা যায় তখন আর্য্যগণ যে তার্ত্তার জাতি হইতে বিভিন্ন তাহা নিশ্চিত।

মনুষ্যের আদিম অবস্থায় পরদ্রব্য গ্রহণ এবং পর পীড়ন পাপকার্য্য বলিয়া জ্ঞান ছিল না। প্রজাপতিদিগের আধিপত্য প্রথম স্থাপিত হইলে, উপরি উক্ত অপরাধের অভিযোগ বারংবার তাঁহাদের নিকট হইত। সেই অপকার্য্য শান্তির জন্যই প্রজাপতিরা আপনাদের মধ্যে ব্রহ্মাবর্ত্ত ভূমি চিহ্নিত বণ্টক করিয়া লইয়াছিলেন এবং নিজ নিজ প্রজামধ্যে ভূমি চিহ্নিত বিভাগ করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু সেই সকল ভাগ সমান ছিল না। দক্ষ প্রজাপতির ভাগ সর্ব্বাপেক্ষা বড় ছিল। ইহা স্পষ্ট বুঝা যায় যে সেই বণ্টক সময়ে ভূমি মাপ করিবার উপযুক্ত বিদ্যা কাহার ছিল না। বোধ হয় নদী, বৃক্ষ প্রভৃতি নৈসর্গিক চিহ্ন দ্বারাই প্রত্যেক প্রজা এবং প্রজাপতির প্রাপ্য অংশ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল।

ব্রহ্মাবর্ত্তের দৈর্ঘ্য ১৬ ক্রোশ এবং প্রস্থ গড়ে ৭ ক্রোশ মাত্র। ইহারই মধ্যে প্রথমতঃ একাদশ প্রজাপতির সমগ্র রাজত্ব ছিল। সুতরাং প্রত্যেক প্রজাপতির সমস্ত রাজ্যের পরিমাণ গড়ে ১০ বর্গক্রোশ মাত্র ছিল। তখন কৃষি কার্য্যাদি কিছু ছিল না। লোকে কেবল স্বভাবজাত ফলমূল পত্রাদি দ্বারা উদর পূর্ত্তি করিত। এরূপ খাদ্য একবর্গ ক্রোশে চারি পাঁচ জনের অধিক লোকের সঙ্কুলন হয় না। তজ্জন্য অনুমান হয় যে প্রথম প্রজাপতিদের প্রত্যেকের প্রজা সংখ্যা গড়ে ৫০

জনের অধিক ছিল না। প্রজাপতিদের বিচারে যে কেহ অপরাধী হইত তাঁহারা তাহাকে দণ্ড (লাঠি) দ্বারা কয়েকটি আঘাত করিতেন; তজ্জন্যই শাস্তি করাকে দণ্ড বলে।

স্ত্রীপুরুষ সংযোগে স্ত্রীর রক্ত পুরুষের শরীরের ভিতরে প্রবেশ করে না। তজ্জন্য নীচ জাতীয়া রমণী সংযোগে পুরুষের পাতিত্য হয় না। পুরুষের রক্ত স্ত্রীজাতির শরীর মধ্যে প্রবিষ্ট হয় তাহা ধৌত হয় না। এজন্য নীচ জাতি সংযোগে রমণীর পাতিত্য হয়। সেই হেতু অনুলোম বিবাহ সিদ্ধ এবং প্রতিলোম বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল।

জাতি নির্ণয় সম্বন্ধে পুরুষ বীজ এবং স্ত্রী ক্ষেত্র বলিয়া গণ্য ছিল। উৎপন্ন বৃক্ষ বীজানুযায়ী হয়। অর্থাৎ একই ক্ষেত্রে আম্র বীজে আম্র বৃক্ষ হয়, কাঁঠালের বীজে কাঁঠাল বৃক্ষ হয়। ক্ষেত্রের গুণে একপ্রকার বীজ হইলে অন্য প্রকার বৃক্ষ হইতে পারে না। কিন্তু ক্ষেত্রের দোষে বৃক্ষের গুণের হ্রাস হইতে পারে। এজন্য অনুলোম সংযোগে সন্তান গুণবান হইলে পিতৃজাতি প্রাপ্ত হইত। গুণবান না হইলে মাতৃজাতীয় অথবা মধ্যবর্ত্তী জাতীয় হইত।

বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ মধ্যে কুলীনদের যেমন নামের পর কেবল গাঁই যোগ করিয়া বলিবার রীতি আছে, রাঢ়ীয় কুলীনদিগেরও ঠিক সেইরূপ রীতিই ছিল। যেমন সান্যাল, মৈত্র, বাগছি, ভাদুড়ী, লাহিড়ী ও কালিয়াই উপাধি শুনিলেই সেই উপাধিধারী যে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ এবং কোন্ গোত্র তাহা জানা যায়। তেমনি বন্দ্য, চট্ট, মুখটি, গাঙ্গুলি, ঘোষাল ও কাঞ্জিলাল বলিলে তাহারা যে রাঢ়ী ব্রাহ্মণ এবং কোন গোত্রীয় তাহা জানা যায়। সেই সুবিধার জন্যই বাঙ্গালী শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণেরা নামের সঙ্গে সঙ্গেই গাঁই উল্লেখ করিয়া থাকেন।

নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর শাসন সময়ে নবদ্বীপের রাজা রঘুনাথ রায় রাঢ়ীয় কুলীন ব্রাহ্মণ বাঁড়ুলি, গাঙ্গুলী, চট্ট এবং মুখটিদিগের সম্মান বৃদ্ধির জন্য তাঁহাদের উপাধি সহ "উপাধ্যায়" শব্দ যোগ করিয়া দিয়াছিলেন। সেই বর্দ্ধিত উপাধি কেবল লিখন পঠনে ব্যবহৃত হয়, কথোপকথনে তাহা সংক্ষিপ্ত করিয়া বাঁড়ুর্য্যে, চাটুর্য্যে, মুখুর্য্যে এবং গাঙ্গুলি বলা হয়। হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণেরা নামের সঙ্গে উপাধি বলে না। তজ্জন্য তাহাদের নাম শুনিয়া কোন্ জাতি তাহা জানা যায় না। তাহাদের জাতি এবং উপাধি পৃথক্ প্রশ্ন করিয়া জানিতে হয়।

পুরাতন কুলশাস্ত্রে দেখা যায় যে নামের সঙ্গে গাঁই এবং পশ্চিমা উপাধি উভয়ই বলা হইত ; যেমন, বৈষ্ণব মিশ্র সান্ন্যাল, উদয়ন আচার্য্য ভাদুড়ী, ত্রিপুরারি বন্দ্য ওঝা, এড় চট্ট মিশ্র ইত্যাদি। তাহার পর পশ্চিমা উপাধি পরিত্যক্ত হইয়াছে।

সম্পত্তি বা চাকরী দ্বারা যে সকল উপাধি হয়, তাদৃশ উপাধি নানা জাতীয় লোকের হইতে পারে। তাদৃশ উপাধি বলিবার ও লিখিবার পূর্ব্বে জাতি জ্ঞাপক উপাধি লেখা ও বলা পূর্ব্বে রীতি ছিল এবং এখনও সেই রীতি কিছু কিছু আছে। যথা, অমুক শর্ম্ম রায়, অমুক গুপ্ত মজুমদার, অমুক দাস বিশ্বাস ইত্যাদি। ঈদৃশ রীতি প্রচলিত থাকাই উচিত।

আধুনিক ভারতবর্ষীয় হিন্দু মুসলমান নামগুলি প্রায় সমস্তই আরবী নামের অনুকরণ। দুই তিন শব্দ একত্র করিয়া একজনের নাম রাখিবার রীতি ভারতে, পারস্যে বা তুরানে প্রায় ছিল না। যদি কখন দুই শব্দ যোগে কাহার নাম হইত, তাহা এত ক্ষুদ্র যে একত্র সম্পূর্ণ নাম বলিতে কষ্ট হইত না। সুতরাং লোকে সম্পূর্ণ নাম ধরিয়া ডাকিতে পারিত। যেমন দশরথ, জয়চাঁদ, রাজারাম, গদাধর ইত্যাদি। তাহার পর আরবী নামের অনুকরণ আরম্ভ হইয়াছিল। বোধ হয় পারসী শিক্ষিত লোকেরাই প্রথম সেই অনুকরণ আরম্ভ করিয়াছিল। কেননা প্রথম প্রথম যোড়াতালি দেওয়া নামের কতক অংশ যাবনিক শব্দ ছিল। যেমন, রাম গোলাম, হরি বক্শ, শিউ (শিব) গোলাম, কালী বক্শ ইত্যাদি। তাহার পর উক্ত নামের সমস্ত অংশই সংস্কৃত মূলক হইয়াছে। যেমন রামদাস, হরিপ্রসাদ, শিবদাস, কালীপ্রসাদ বা কালীপ্রসন্ন ইত্যাদি। এই সকল দীর্ঘীকৃত নামের উপর তদ্ধিত প্রত্যয় হয় না। আবার সম্পূর্ণ নাম ধরিয়া ডাকিতে না পারায় সচরাচর পুরুষের নাম স্ত্রীলিঙ্গ শব্দে ডাকিতে হয় এবং স্ত্রীলোকের নাম পুংলিঙ্গ শব্দে ডাকিতে হয়। যেমন কালীপ্রসন্ন, ভবানী-প্রসাদ বাবুকে ডাকিতে কালী বাবু ও ভবানী বাবু বলে এবং শ্যামমোহিনীকে, শ্যাম বলিয়া ডাকিতে হয়। এরূপ নামকরণ মুসলমান রাজত্বকালে আরম্ভ হইয়াছে। ঈদৃশ নামকরণে সুবিধা কিছুই নাই বরং সুদীর্ঘ নাম বলিতে প্রচুর অসুবিধা হইতে থাকে। শাস্ত্রকারেরা কহিয়াছেন যে নামকরণ করিতে মিষ্ট, অনতি দীর্ঘ এবং বিশেষ শব্দ দ্বারা নাম রাখা উচিত। দীর্ঘীকৃত নাম যে

সুমিষ্ট হয় তাহা বোধ হয় না। অনতি দীর্ঘ বলিবার উদ্দেশ্য এই যে সেই সম্পূর্ণ নাম ধরিয়া ডাকিতে কষ্ট না হয়। আর "বিশেষ" শব্দের উদ্দেশ্য এই যে সেই নামে অন্য লোক না থাকে। অধুনা শেষ দুইটি বিধান অতি মাত্র লঙ্ঘিত হইতেছে। তজ্জন্য অসুবিধাও যথেষ্ট হইতেছে। নামের কোন অর্থ থাকা আবশ্যক নহে। অতএব প্রত্যেক শিশুর নামকরণ করিতে মিষ্ট, ক্ষুদ্র এবং সম্পূর্ণ নূতন শব্দ দ্বারা নাম রাখাই উচিত।

মুসলমান রাজত্বকালে যে সকল হিন্দু মান্য গণ্য বড়লোক হইয়াছে তাহারা সকলেই কান্যকুব্জ হইতে সমাগত শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ অথবা কায়স্থ। বর্দ্ধমানের মহারাজার, নদিপুরের মহারাজার, লালগোলার রাজার এবং মহিষাদলের রাজার পূর্ব্বপুরুষগণ আরো পরবর্ত্তী কালে পশ্চিম ভারত হইতে আসিয়া বাঙ্গালা দেশে বড়লোক হইয়াছিলেন। আদিম বাঙ্গালী মধ্যে একমাত্র রাজা রাজবল্লভ ক্ষমতাপন্ন বড় লোক হইয়াছিলেন। ইনি জাতিতে বৈদ্য। বৈদ্যের মধ্যে আরো কতিপয় ব্যক্তি অল্প অল্প প্রতিভা দেখাইয়াছেন। সৌ, তিলী, সুবর্ণবণিক ও কৈবর্ত্ত মধ্যে কেহ কেহ বাণিজ্যাদি নিরীহ উপায়ে ধন সঞ্চয় করিয়া তদ্দ্বারা জমিদারী খরিদ করিয়াছিল বটে কিন্তু তাহাদের বিদ্যাবুদ্ধি বিক্রমাদি কোন প্রতিভা দেখা যায় নাই।

এখন যেমন মাড়োয়ারী ও হিন্দুস্থানী বণিকে বাঙ্গালা দেশ পরিপূর্ণ হইয়াছে, নবাবী আমলে তাহা ছিল না। তখন কেবল মুর্শিদাবাদে এবং বর্দ্ধমানে অত্যল্প পরিমাণ খোট্টা বণিক ছিল। তখন দেশীয় গন্ধবণিক, সোলোক এবং তিলী, তাঁতীরাই দেশের বণিক ছিল। কিন্তু তখন কৃষি বাণিজ্য ও শিল্পে বেশি লাভ ছিল না। জমিদারী তালুকদারীর লাভও নিতান্ত কম হইয়াছিল। সৈয়দ রেজা খাঁর দৌরাত্ম্য কাল ভিন্ন অন্যান্য আমলে জমিদার তালুকদারদের খুব সম্মান ছিল। নবাবী চাকরীতে লাভ এবং সম্ভ্রম সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ছিল। সেই জন্য তখন অবধি স্বাধীন ব্যবসায় অপেক্ষা চাকরীর প্রতি লোকের প্রসক্তি বেশি হইয়াছিল।

বাঙ্গালী বৈদ্যেরাও পারসী পড়িলে লালা উপাধি পাইত। বাঙ্গালী বৈদ্যদের মধ্যেও খাঁ উপাধি ছিল। জেলা পাবনা, থানা শাহজাদপুর, পরগণে ইসুফসাহী, তরফ সায়েস্তাবাদের বৈদ্য জমিদারদের পূর্ব্বে খাঁ উপাধি ছিল।

এখন তৎপরিবর্ত্তে রায় উপাধি হইয়াছে।

ব্রাহ্মণ সমাজের নিয়ম প্রায় সমস্ত বৈশ্যদিগের বিবাহে প্রচলিত ছিল কিন্তু বৈশ্যদের ভোজন মর্য্যাদা ছিল না। সুতরাং তন্নিরূপণার্থ ঝগড়া হইত না। কুলীন কায়স্থদের বিবাহের চুক্তিও ঠিক ব্রাহ্মণের রীতির অনুগামী ছিল। কিন্তু তাহাদের ভোজন মর্য্যাদা লইয়া ঝগড়া কদাচিৎ হইত। কুলীন কায়স্থের নিকট কোন বরযাত্রী ভোজন মর্য্যাদা পাইত না। অকুলীনের নিকট বরযাত্রী কুলীন কায়স্থেরা প্রত্যেকে দুই টাকা পাইত। প্রাপ্তির হার নির্দ্দিষ্ট থাকায় বিবাদের কোন কারণ হইত না।

দক্ষিণ রাঢ়ী কায়স্থ মধ্যে মৌলিক (অকুলীন) মৌলিকে বিবাহ হয় না। মৌলিকেরা পণ দিয়া কুলীন পাত্রে কন্যা দিত এবং পণ দিয়া কুলীন কায়স্থের কন্যা বিবাহ করিত। ইহাতে কুলীনদের উভয়তঃ লাভ হইত। পক্ষান্তরে দরিদ্র মৌলিকদের বিবাহ না হওয়ায় বংশ লোপ হইত। অন্য সকল জাতি সকল শ্রেণী মধ্যেই কুলীন অপেক্ষা অকুলীনের সংখ্যা বেশি। কেবল দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থ মধ্যে উপরি উক্ত কারণে অকুলীন অপেক্ষা কুলীনের সংখ্যা বেশি হইয়াছে।

অন্যান্য তিন শ্রেণীর কায়স্থদের মধ্যে অকুলীনে অকুলীনে বিবাহ হইতে পারে। তাহাদের কন্যা পণ দিয়া বিবাহ করিতে হইত।

ইদানীং কন্যার সংখ্যা বেশি হওয়ায় এবং বহুবিবাহ অপ্রচলিত হওয়ায় দক্ষিণ রাঢ়ী কায়স্থের মধ্যে কন্যা পণ প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। বরং কলিকাতায় মৌলিক কয়স্থেরা পাত্র পণ লইয়া কুলীন কায়স্থের কন্যা বিবাহ করিতেছে। ঠিক উক্ত কারণে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগের মধ্যেও কন্যা পণ প্রায়ই অদৃশ্য হইয়াছে। পক্ষান্তরে পাত্র পণ অতি মাত্র বৃদ্ধি হওয়ায় ঘোরতর সামাজিক অনিষ্টের কারণ হইয়াছে।

যে দেশে যে প্রথা প্রচলিত ছিল অথবা আছে, সেই দেশে তাদৃশ প্রথার কারণ এবং প্রয়োজনও আছে। বিনা কারণে, বিনা প্রয়োজনে কোন কালে কোন দেশে কোন প্রথা প্রচলিত হয় নাই। য়ুরোপে পুত্রাপেক্ষা কন্যার সংখ্যা কম সেই জন্যই তথায় বহুবিবাহ কখনও প্রচলিত হয় নাই এবং বিধবা বিবাহ বরাবর প্রচলিত আছে। য়ুরোপীয়েরা যখন পশুবৎ অসভ্য ছিল তখনও তাহাদের মধ্যে বহু বিবাহ প্রচলিত ছিল না। হিন্দু সমাজে কন্যার সংখ্যা পুত্রাপেক্ষা অধিক সেই জন্য বহু বিবাহ চির প্রচলিত এবং বিধবা বিবাহ নিষিদ্ধ।

অনেকের জাতিকুল কতক পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। দৃষ্টান্ত—

(১) ছত্রপতি শিবজীর পূর্ব্ব পুরুষ জয়ধর সিংহ মিবারের রাণার সন্তান, সুতরাং অতি শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয় ছিলেন। তিনি মহারাষ্ট্র দেশে বাস করিয়া মারাঠী শূদ্র সমাজে মিলিত হইয়াছিলেন। এজন্য শিবজীকে কেহ ক্ষত্রিয় কেহ বা শূদ্র বলিয়াছেন।

(২) গৌড়াধিপতি (আদিশূর) শূরসেন, লাউসেন, নবজসেন ও চন্দ্রসেন প্রকৃত বৈশ্য জাতীয় ছিলেন। বল্লালসেনের পূর্ব্ব পুরুষ সামন্তসেন বৈশ্য ছিলেন না, ব্রহ্মক্ষত্র ছিলেন। বাঙ্গালা দেশে অন্য ব্রহ্মক্ষত্র অথবা ক্ষত্রিয় না থাকায় সামন্তসেন এবং তাঁহাদের বংশধরেরা বৈশ্য সমাজে মিলিত হইয়াছিলেন। এই জন্যই রাঢ়ীয় এবং বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদের কুলশাস্ত্রে বল্লালসেনকে বৈশ্য বলা হইয়াছে। পক্ষান্তরে 'বল্লালচরিত" নামক গ্রন্থে আনন্দভট্ট বল্লালকে ব্রহ্মক্ষত্র বলিয়াছেন।

বিশ্বকোষ অভিধানে ব্রহ্মক্ষত্র শব্দ কায়স্থ বোধক বলা হইয়াছে, তাহা ভুল। ব্রাহ্মণের ঔরসে ক্ষত্রিয়া গর্ভজাত সন্তানই ব্রহ্মক্ষত্র।

(৩) সংগ্রাম সিংহ নামক একজন হিন্দুস্থানী ক্ষত্রিয় মোগল রাজত্ব কালে ফরিদপুর জেলায় কিছু সম্পত্তি পাইয়া তথায় বাস করিয়াছিল। সে দেখিল যে পশ্চিম ভারতে যেমন ব্রাহ্মণের পরেই ক্ষত্রিয় জাতি দ্বিতীয় পদস্থ তেমনি বাঙ্গালা দেশে বৈশ্যেরা দ্বিতীয় পদস্থ। এজন্য সে 'হাম বৈশ্য' (আমি বৈশ্য) পরিচয় দিয়া বৈশ্য সমাজে মিলিত হইয়াছিল। তৎ সংস্থষ্ট বৈশ্যেরা এখনও 'হাম বৈশ্য' নামে পরিচিত।

বাঙ্গালা দেশে স্ত্রীলোকে কোনরূপ অঙ্গবস্ত্র (আল খাল্লা) ব্যবহার করিত না এবং পাদুকা ব্যবহার করিত না। অবস্থানুসারে বেশি বা কম মূল্যের একখানি শাড়ী দ্বারাই সমস্ত দেহ আবরণ করিত। 'অলঙ্কার মধ্যে কটিদেশে এবং পায়ে রূপার বা নিকৃষ্টতর ধাতুর অলঙ্কার পরিত। বিছা ও কোমর-পেটী কোমরের অলঙ্কার ছিল। বাঁক্, আরবেঁকী, পায়জের, নূপুর, চরণপদ্ম ও আঙ্গুটী পায়ের অলঙ্কার ছিল। ধনবতীদের পায়ের অলঙ্কার মধ্যে মধ্যে চারিসের পর্য্যন্ত হইত। সধবাদের হাতে শাঁখা ও লোহার খাড়ু অবশ্য প্রয়োজনীয় ছিল। তদ্ভিন্ন সোণা কিংবা রূপার বলয়, কঙ্কন, চৌদানী,

পয়াল (প্রবাল) মালা হাতে দিত এবং অঙ্গুলিতে অঙ্গুরী দিত বাহুতে সোণার তার, সোণার বাজু, সোণার কাটাবাজু দিত। বাহুতে রূপার অলঙ্কার প্রায়শঃ ব্যবহৃত হইত না। গলায় চন্দ্রহার, হাঁসলী, মোহনমালা দিবার রীতি ছিল। গলা কদাচ খালি থাকিত না। সোণা, রূপা, প্রবাল, মণি, হীরা দ্বারা গলার অলঙ্কার হইত। নিতান্ত দরিদ্রেরা গুঞ্জা দ্বারা মোহনমালা গাঁথিয়া গলায় দিত। নাকে ছিদ্র করিয়া নথ ও বুলাক পরিত। নাকের গহণা সোণা দ্বারাই তৈয়ারী হইত। যাহাদের সোণা না যুটিত তাহারা কেবল একটা বালী নাকে দিত। মাথায় সোণার সিঁথিপাটী দিত তাহাতে যে চন্দ্রিকা ঝুলিত তাহা মোমের আঠা দ্বারা কপালে বসাইত। সেই চন্দ্রিকার উপর মণি, মুক্তা, হীরকাদি কুপ্ত করা থাকিত। কাণে কুণ্ডল, কড়ী, ধেঁড়ী, পাশা, ঝুমকা ও কর্ণফুল দিবার রীতি ছিল। কাণে ছিদ্র করিয়া এই সকল গহণা লাগান হইত। সেই অলঙ্কার ভারে কখন কখন কাণ ছিঁড়িয়া পড়িত। হিন্দুস্থানী কবিগণ ভাগ্যবতী রমণীর বর্ণনা করিতে বলিয়াছেন যে, "জরে সোণা ছিঁড়ে কাণ" অর্থাৎ সোণা রূপার ভারে কাণ ছিঁড়িবার উপক্রম। গাত্রচর্ম্ম অঙ্কিত করিয়া উল্কি বা গোধানি দিবার রীতি খুব ছিল।

পুরুষের মধ্যে যাহারা মুসলমান দর্বারের সংশ্রব রাখিত তাহারা লম্বা কাপড় দ্বারা মাথায় থাকে থাকে জড়াইয়া পাগড়ী বাঁধিত; তাহার উপর টুপী দিত; গায়ে আংরাখা, চাপকাণ, চোগা দিয়া দর্বারে যাইত। তাহারাই নাগরা জুতা পায়ে দিত। পণ্ডিতগণ এবং অপর ব্রাহ্মণেরা চটী জুতা পায়ে দিতেন। সাধারণ লোকে প্রায়শঃ জুতা পায়ে দিত না। খড়ম প্রায় সকল ভদ্রলোকেই পায়ে দিত। দর্বারী লোক ভিন্ন অন্য সকল লোকই ধুতী পরিত এবং চাদর কখন গায়ে দিত কখন বা কাঁধে ফেলিয়া চলিত।

পুরুষেরও অলঙ্কার পরিবার রীতি ছিল। হাতে বলয় ও অঙ্গুরী, বাহুতে বাজু, তাগা, গলায় হার ও মালা, কাণে কুণ্ডল, পায়ে খাড়ুয়া পুরুষেরা ষোল সত্তর বর্ষ বয়স পর্য্যন্ত পরিত। তাহার পরে বলয়, বাজু, খাড়ুয়া ও কুণ্ডল পরিত না। পুরুষের মাথায় শিখা থাকিত। সৌখিন পুরুষেরা বাবড়ী অর্থাৎ স্কন্ধ পর্য্যন্ত লম্বা চুল রাখিত। পণ্ডিতেরা এবং ভক্ত লোকেরা প্রায়শঃ দাড়ী গোঁফ এবং চুল রাখিত না অথবা সমুদায়ই রাখিত। অপর

লোকে গোঁফ রাখিত কিন্তু দাড়ী রাখিত না। সধবা স্ত্রীলোকের কপালে ও সিঁথিতে সিন্দুর দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম ছিল। স্ত্রীলোকেরা চুলে বেণী গাঁথিত অথবা ঠিক মস্তিষ্কের উপর খোপা বাঁধিত। ভক্ত লোকেরা স্ত্রী পুরুষ সকলেই কপালে, কর্ণমূলে এবং কণ্ঠে পূজার অবশিষ্ট চন্দনের ফোঁটা দিত। মন্ত্র শোধিত তাবিজ, কবচ ও পাটা হাতে, গলায় অথবা মাথায় অনেকেই দিত। হিন্দু রমণীরা বিলাতী বিবিদের ন্যায় স্বেচ্ছা মত বিচরণ করিতে পারিত না বটে কিন্তু পরদানসীন ছিল না। তাহার পর মুসলমানের অনুকরণে পরদা প্রথা সম্ভ্রান্ত হিন্দুদের ঘরে কতক চলিত হইয়াছিল। যুবতী হরণ করা মুসলমানদের সর্ব্ব প্রধান অত্যাচার ছিল। সেই ভয়ে ভদ্র লোকেরা যুবতীদিগকে অতি সাবধানে সঙ্গোপণে রাখিত। সহরে অথবা মুসলমান বড় লোকের আড্ডার নিকট কোন ভদ্রলোক সপরিবারে বাস করিত না। অনেক হিন্দু জমিদারেরও তাদৃশ দোষ ছিল। তাহাদিগকে লোকে "ছাগলা রাজা" বলিত। অধিক বয়স্কা ভদ্র মহিলাগণ প্রকাশ্য সভায় যাইত এবং পদব্রজে গঙ্গাস্নানে যাইত।

হিন্দু রাজত্ব কালে কাগজ ছিল কিনা তাহা ঠিক জানা যায় না। তখন সামান্য লেখা পড়া তালপাতে, কলাপাতে, সুপারী ও নারিকেল গাছের খোসা ভূর্জ্জত্বক্ এবং অন্যান্য পত্রে লিখিত হইত। এই জন্য চিঠিকে "পত্র" বলে এবং পণ্ডিতদের ব্যবস্থা পত্রকে "পাতি" বলে। তখন কোন গুরুতর বিষয় লিখিতে তাম্রফলক অথবা অন্য ধাতুফলকে, কদাচিত কাষ্ঠফলকে অঙ্কিত করা হইত। ঈদৃশ অঙ্কিত তাম্রফলককে এখন অনেকে তাম্রশাসন বলেন। কিন্তু শাসন শব্দ প্রয়োগ বিশুদ্ধ নহে।

অনেক বিজ্ঞ পণ্ডিত বলেন যে মুসলমান রাজত্বের পূর্ব্বেও হিন্দুসমাজে কাগজ ছিল। তখন কাগজকে আলেখ্য, পট এবং তুলট বলিত; সেই কাগজে রাজা ও মহাজনদিগের খাতা এবং হিসাব প্রভৃতি লেখা হইত। এই কথা সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য। কেননা বহি, খাতা ও হিসাব কখন গাছের পাতায় বা গাছের ছালে লিখিলে স্থায়ী হয় না। অথচ তাদৃশ লেখা পড়ার কাজ ধাতু-ফলকে বা কাষ্ঠফলকে অঙ্কিত করিয়া রাখা যাইতে পারে না। সুতরাং কোন প্রকার কাগজ ছিল ইহা নিশ্চিত। ভোটানে, নেপালে এবং আসামে যেরূপ কাগজ দেখা যায় তাহা বিদেশীয় কাগজ হইতে বিভিন্ন। সুতরাং ইহা স্পষ্ট

উপলব্ধি হয় যে মুসলমান আমলের পূর্ব্বেও ভারতবর্ষে কাগজ ছিল।

গ্রীক দেশের এবং চীন দেশের ইতিহাস হইতে জানা যায় যে মগধ রাজ চন্দ্রগুপ্ত সর্ব্বদা গ্রীক রাজন্যবর্গকে চিঠি পাঠাইতেন আর রাজা অশোক চীন এবং ব্রহ্মদেশে চিঠি এবং অনুশাসন পত্র পাঠাইতেন। সেই সকল চিঠিপত্র যদি ধাতুফলক, কাষ্ঠফলক কিম্বা গাছের পাতা বা ছালে লিখিত হইত তবে তাহার বিশেষত্ব হেতু তদ্দেশীয় গ্রন্থকারগণ সে কথা স্পষ্ট করিয়া লিখিতেন। যখন তাদৃশ কোন মন্তব্য বিদেশীয় কোন পুস্তকে নাই তদ্দারাই বুঝা যায় যে সেই সকল চিঠির আলেখ্য কোন নূতন প্রকার ছিল না অর্থাৎ গ্রীক ও চীনজাতি যেমন কাগজে লিখিত মগধরাজও তদ্রূপ কাগজেই লিখিতেন। তাহাতে কোন নূতনত্ব না থাকা হেতুই বিদেশীয় ঐতিহাসিকগণ তৎসম্বন্ধে কোন মন্তব্য লেখেন নাই। চীন পরিব্রাজক ফা হিউং ও হিয়াং-সান এবং গ্রীক রাজপ্রতিনিধি মেগাস্থিনিস ভারতবর্ষীয় সমস্ত নূতন দ্রব্যের এবং রীতির উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু কাগজ না থাকা লেখেন নাই। সুতরাং কাগজ তৈয়ারী করা হিন্দু সমাজে নিজ উদ্ভাবিতই হউক অথবা চীন কিম্বা গ্রীক জাতি হইতে অনুকৃতই হউক, তাহা যে মুসলমান আমলের পূর্ব্বাবধি এদেশে ছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

কাগজ শব্দটি আরবী মূলক। ইহার সংস্কৃত প্রতিশব্দ অল্প সংখ্যক পণ্ডিত ভিন্ন অন্য লোকে জানে না। তদ্দৃষ্টেই অনেকে তর্ক করেন যে মুসলমানেরাই এদেশে কাগজের ব্যবহার প্রচলিত করিয়াছে। এ তর্ক ঠিক নহে। কেননা দোয়াৎ, কলম, চাদর এবং মসল্লা শব্দও ঠিক ঐরূপ আরবী শব্দ। এই সকল দ্রব্য বহু লক্ষ বৎসর যাবৎ হিন্দুসমাজে ব্যবহৃত হইতেছে অথচ তাহার সংস্কৃত নাম অত্যল্প লোকে জানে, যাবনিক নামই সর্ব্বত্র প্রচলিত। বিশেষতঃ মসল্লা আরবে, পারস্যে, তুরানে বা য়ুরোপে ছিল না। মুসলমানেরা এবং য়ুরোপীয়েরা হিন্দুদের নিকট হইতেই মসল্লা লইয়াছে এবং তাহা ব্যবহার করিতে শিখিয়াছে। অথচ এখন মসল্লা শব্দই সর্ব্বত্র প্রচলিত। ইহার সংস্কৃত নাম যে রোচনা তাহা পণ্ডিতগণ মধ্যেও অল্প লোকে জানে এবং অপর লোকে জানে না এবং সকলেই মসল্লা শব্দই ব্যবহার করে; রোচনা শব্দ কোন পণ্ডিতও ব্যবহার করেন না। সুতরাং কাগজ শব্দটি যাবনিক জন্য

হিন্দুরাজ্য কালে কাগজ ছিল না ইহা অনুমান করা যাইতে পারে না।

২। বার ভূঁইয়া।

পাঠান রাজত্ব কালে নবাবের রাজধানী হইতে দূরবর্ত্তী স্থানের ভূঁইয়ারা নবাবকে কিছু কিছু রাজস্ব দিয়া অধীনতা স্বীকার করিত। তদ্ভিন্ন তাহারা নিজ নিজ চত্বরে সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে থাকিত এবং পার্শ্ববর্ত্তী ভূঁইয়াদের সহ স্বেচ্ছা মত সন্ধি বিগ্রহ করিতে পারিত। তজ্জন্য ভূঁইয়াদের সচরাচরই ভাগ্য পরিবর্ত্তন ঘটিত। যে ভূঁইয়া যখন পরাক্রান্ত হইত সে তখন পার্শ্ববর্ত্তী অপর ভূঁইয়াদিগকে নিজের অধীন করিয়া অথবা বেদখল করিয়া নিজ সম্পত্তি এবং পরাক্রম বৃদ্ধি করিত। এই উপায়ে যখন যে বারজন ভূঁইয়া সর্ব্ব প্রধান হইতেন তাঁহারাই বাঙ্গালা দেশের বার ভূঁইয়া নামে খ্যাত হইতেন। এক বৎসর যে বারজন প্রধান হইত পর বৎসর হয়তো তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ খর্ব্বীকৃত হইতেন, অন্যান্য দুই চারিজন উন্নতি লাভ করিয়া বার ভূঁইয়া মধ্যে গণ্য হইত। সেই সকল প্রধান ভূঁইয়ার সংখ্যা কখন বা কম হইয়া নয়জন মাত্র থাকিত; কখন বা বৃদ্ধি হইয়া ষোলজন পর্য্যন্ত হইত। শাহ সমসুদ্দীনের সময়ে চারিজন হিন্দু ও আটজন মুসলমান ভূঁইয়া সর্ব্ব প্রধান ছিল। রাজা কংশরামের শাসন সময়ে নয় জন হিন্দু এবং দুইজন মুসলমান প্রধান ভূঁইয়া ছিল। সৈয়দ হোসেন শাহের সময়ে ভাদুড়িয়া, সাঁতোড় এবং চন্দ্রদ্বীপের ভূঁইয়া এই তিনজন মাত্র হিন্দু ছিল অবশিষ্ট নয়জনই মুসলমান ছিল। ভাদুড়ীদিগের রাজত্ব কালে সাতজন হিন্দু এবং সাতজন মুসলমান প্রধান ভূঁইয়া ছিল। সুতরাং বিভিন্ন সময়ের বার ভূঁইয়ার তালিকার অনৈক্য দৃষ্টে পাঠকবর্গ তাহার এক তালিকা অন্যটির বিরুদ্ধ বলিয়া মনে করিবেন না। প্রকৃত পক্ষে তাদৃশ তালিকা সকলগুলিই শুদ্ধ হইতে পারে। গ্রন্থের ১৫০ পৃষ্ঠায় যে পনের জন প্রধান ভূঁইয়ার তালিকা দেওয়া হইয়াছে তাহারা দেওয়ান তোড়রমল্লের কৃত বন্দোবস্ত কালে সর্ব্ব প্রধান ছিল। তখন বিক্রমপুরের কেদার রায় এবং ফরিদপুরের মুকুন্দ রায়ের কোন প্রাধান্য ছিল না। অথচ তাহার ২০ বৎসর পর তাহারা অতিশয় পরাক্রান্ত প্রধান ভূঁইয়া হইয়া উঠিয়াছিল। পাঠকবর্গের ভ্রম

না হয় এই উদ্দেশ্যে এ সকল বৃত্তান্ত প্রকাশ করা হইল।

বাঙ্গালাদেশের প্রচলিত প্রবাদে যে "বার ভুঁইয়া" শব্দটি কথিত হয়, তাহা বোধ হয় "বড় ভুঁইয়া" শব্দের অপভ্রংশ। কেননা পূর্ব্বে জমিদার মাত্রে সকলকেই ভুঁইয়া বলা হইত। সুতরাং শত সহস্র ভুঁইয়া ছিল। আর প্রধান প্রধান ভুঁইয়া যাঁহারা প্রায় স্বাধীন নৃপতির তুল্য ছিলেন, তাঁহাদের সংখ্যা সর্ব্বদা সমান থাকিত না। সময়ে সময়ে নয়জন হইতে ষোলজন পর্য্যন্ত হইত। সুতরাং তাহাদিগকে "বার ভুঁইয়া" না বলিয়া "বড় ভুঁইয়া" বলিলেই ঠিক অর্থ হয়। বিশ্বকোষ অভিধানে এ বিষয়ে আর একটি প্রমাণ আছে—

"কামতাপুরে দুর্ল্লভনারায়ণ রাজার সময়ে ঐ রাজ্যে বিস্তর বিশৃঙ্খলা ও অশাসন হয়। রাজার বন্ধু গৌড়েশ্বর কামতাপুর রাজ্যে সুশাসন সংস্থাপন জন্য সাতটি সুযোগ্য ব্রাহ্মণ এবং সাতটি সুযোগ্য কায়স্থ কর্ম্মচারী পাঠাইয়াছিলেন। সেই চৌদ্দজন বিজ্ঞলোক ঐ রাজ্যে সুশাসন ও শান্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। রাজা তাঁহাদের যোগ্যতা দৃষ্টে তাঁহাদিগকে প্রচুর ভূমি সম্পত্তি দিয়া নিজরাজ্য মধ্যে নিবিষ্ট করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদিগকে "বার ভুঁইয়া" উপাধি দিয়াছিলেন।"

এখন দ্রষ্টব্য এই যে চৌদ্দজন ভুঁইয়ার "বার ভুঁইয়া" উপাধির কোন অর্থ হইতে পারে না। অথচ "বড় ভুইয়া" বলিলে সদর্থ হয়। ইহা হইতে প্রমাণ হয় যে "বার ভুঁইয়া" কথাটি প্রকৃত পক্ষে "বড় ভুঁইয়া" কথার অপভ্রংশ মাত্র। আশা করি সুবিজ্ঞ পাঠকগণ আমাদের এই অনুমান কতদূর যুক্তি সঙ্গত তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

(ক) সাঁতোড় রাজ্য।

মুকুটরায়কে 'প্রদীপ'পত্রিকায় বৈদিক ব্রাহ্মণ বলিয়া লেখা হইয়াছিল এবং গৌড়ের ইতিহাসে তাহাই উদ্ধৃত হইয়াছে। কিন্তু তাহা ভুল। মুকুটরায় সাঁতোড়ে রাজা এবং বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ ছিলেন। তপ্পে সাঁতোড়ের অন্তর্গত চৌদ্দ পরগণা তাঁহার রাজত্ব ছিল। তদ্ভিন্ন দক্ষিণ নদীয়াতে এবং বর্দ্ধমান অঞ্চলে তাঁহার অল্প কিছু জমিদারী ছিল। তিনি প্রথমে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের ঘরে দুই বিবাহ করেন। তাহার পর গঙ্গাস্নানে গিয়া তথায় এক রাঢ়ীয় কুলীন ব্রাহ্মণের এক কন্যাকে পরম সুন্দরী ও মিষ্টভাষিণী দেখিয়া লোভ ও ভয় প্রদর্শন করত তাহার পিতাকে বাধ্য করিয়া তাহাকে বিবাহ করেন। তাহাতে তাঁহার

জ্ঞাতি কুটুম্বগণ অসন্তুষ্ট হইলে তিনি বলেন যে, "রাঢ়ী ব্রাহ্মণসহ বৈবাহিক ক্রিয়া কোন শাস্ত্রমতে দূষ্য নহে।" জ্ঞাতিরা কহিলেন, "শাস্ত্র অপেক্ষা দেশাচার অধিক মান্য, বিশেষতঃ উভয় শ্রেণীর কৌলীন্য প্রথা বিভিন্ন। এরূপ বিবাহ উভয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরাই দূষ্য জ্ঞান করে। এজন্য সমাজিক রীতি মানিয়া চলা কর্ত্তব্য।" রাজা কহিলেন, "শাস্ত্রের বিধান সকলেই মানিতে বাধ্য। কিন্তু সমাজিক রীতি দুর্ব্বলের মান্য মাত্র প্রবলের মান্য নহে। আমি মহারাজা, সামাজিক ব্রাহ্মণেরা আমার অধীন, আমি তাহাদের অধীন নহি। বড়লোকে যাহা করে অন্যে তাহাই অনুসরণ করিবে, ইহাই সামাজিক নিয়ম। আমি রাজা ও কুলীনের নায়ক। আমি যাহার কন্যা বিবাহ করিয়াছি তিনি ও আমি উভয়েই প্রধান কুলীন। সুতরাং এ সম্বন্ধে কাহার কোন আপত্তি করিবার অধিকার নাই।" তাঁহার কথায় গোঁড়া বারেন্দ্র ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে একঘরিয়া করিল। তিনি তাহাদিগকে জব্দ করিবার জন্য পাশ্চাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণের ঘরে চতুর্থ বিবাহ করিলেন। ঠিক এইরূপ জিদ করিয়া সীতারাম রায় চারি শ্রেণী কায়স্থের কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন। তখন রাঢ়ী ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের মধ্যে বিবাহ নিতান্ত অপ্রচলিত ছিল না। কিন্তু বৈদিক ব্রাহ্মণদিগকে শ্রোত্রিয়েরা সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতি জ্ঞান করিত। মুকুটরায় বৈদিকের ঘরে বিবাহ করায় বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ ও বারেন্দ্র কায়স্থেরা সাজস করিয়া মুকুটরায়কে তপ্পে সাঁতোর হইতে বেদখল করিয়া তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা গোপাল রায়কে রাজা করিল। মুকুটরায় কেবলমাত্র দক্ষিণ নদীয়া ও রাঢ়দেশের জমিদারীতে দখলিকার থাকিয়া গঙ্গাতীরে পূর্ব্বস্থলি গ্রামে বাড়ী করিয়াছিলেন।

আটবৎসর পর মুকুট রায়ের কন্যা পদ্মাবতী বিবাহযোগ্য হইল। তিনি প্রথমে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ পরে রাঢ়ী ব্রাহ্মণ পাত্র যোটাইতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তখন আর তিনি প্রবল মহারাজা ছিলেন না। কেহ তাঁহার বাধ্য হইল না। গঙ্গাতীরের দরিদ্র ব্রাহ্মণেরা তাঁহার ঘরে আহার করিত বটে কিন্তু কোন শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ তাঁহার কন্যা বিবাহ করিতে স্বীকার করিল না। তখন তিনি পাশ্চাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণের ঘরে কন্যার বিবাহ দিয়া সেই সমাজে মিলিত হইলেন।

তাঁহার সন্তানেরা পাশ্চাত্য বৈদিক মধ্যেই গণ্য হইয়াছিল। তাহারা কেহ মান্য গণ্য বড় মানুষ হয় নাই। তিনি বৈদিক সমাজে মিলিত হইয়াছিলেন বলিয়াই বোধ হয় প্রদীপ পত্রিকার লেখক তাঁহাকে বৈদিক ব্রাহ্মণ বলিয়া

লিখিয়াছেন। বাস্তবিক তিনি যখন বৈদিকসমাজে মিলিয়াছিলেন তখন তিনি রাজা ছিলেন না, ক্ষুদ্র জমিদারমাত্র ছিলেন। কোন বৈদিক ব্রাহ্মণ কখন রাজা বা বড় জমিদার হয় নাই।

(খ) রঙ্গপুর।

ধ্রুবানন্দ মিশ্র কৃত মহাবংশ নামক পুস্তকে লিখিত আছে যে নবাব সমসুদ্দীন যখন স্বাধীন গৌড় বাদশাহ হন, তখন রাঢ়দেশীয় দুর্য্যোধন চট্টোপাধ্যায় এবং চক্রপাণি পূতিতুণ্ডী তাঁহার সহায়তা করায় নবাব তাঁহাদিগকে যথাক্রমে "বঙ্গভূষণ" এবং "রাজজয়ী" উপাধি দিয়া জাগীর দিয়াছিলেন।

রঙ্গপুরের বর্দ্ধন কুঠীর জমিদারও সেই সময়েই জমিদারী পাইয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায়।

সমসুদ্দীন নিজ দলবল বৃদ্ধির জন্য হিন্দুদিগকে সহায় করিয়াছিলেন। এজন্য ইহা বিশ্বাস যোগ্য যে সান্যাল ও ভাদুড়ীদের সহ আরো অনেক প্রবল হিন্দু তাঁহার সহায় হইয়াছিল এবং তাহারা সকলেই যথাযোগ্য পুরস্কার পাইয়াছিল।

(গ) মালদুয়ারের জমিদারী।

দিনাজপুর জেলায় রাণী সংকৈল গ্রাম নিবাসী ছত্রনাথ চৌধারী এবং টঙ্কনাথ চৌধারী মালদুয়ারের জমিদার। তাঁহারা মৈথিল ব্রাহ্মণ। তাঁহারা উভয় ভ্রাতাই শিক্ষিত লোক। তাঁহাদের নিকট এক পুরাতন তাম্রফলক আছে। তাহার ভাষা সংস্কৃত কিন্তু পালি ভাষার বর্ণমালা দ্বারা লিখিত। সেই ফলক ৩৫ সংবতে লিখিত হইয়াছে। তাহা হইতে নিম্নলিখিত বৃত্তান্ত জানা যায়—

(১) উজ্জয়িনী পতি সম্রাট বিক্রমাদিত্যের সিংহাসন আরোহণ তারিখ হইতে সংবৎ নামক অব্দ প্রচালিত হইয়াছে বিক্রমাদিত্য ৬৫ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। সুতরাং এই তাম্রফলকখানি বিক্রমাদিত্যের সম সাময়িক বটে। সেই সময়ে ধূর্ত্ত ঘোষ নামে পাল উপাধিধারী রাজা রাঢ় দেশে রাজত্ব করিতেন। তিনি গুরুদক্ষিণারূপে এই মালদুয়ার পরগণাটি ৩৫ সংবতে উক্ত টঙ্কনাথ চৌধারীর ও ছত্রনাথ চৌধারীর পূর্ব্ব পুরুষ অরুণ ওঝাকে নিষ্কর ব্রহ্মত্ররূপে দান করিয়াছিলেন। তাহাতে কিরা দেওয়া হইয়াছে যে, "এই সুব্রাহ্মণ অরুণ ওঝার মৎপ্রদত্ত ব্রহ্মত্র যে কেহ হরণ করিবে সে ব্রহ্মহত্যা, গোহত্যাদি পঞ্চ মহাপাতক ভাগী হইবে।" অতএব প্রতিপন্ন হইতেছে যে ধূর্ত্ত

ঘোষ পাল উপাধিধারী হইলেও বৌদ্ধ ছিলেন না হিন্দু ছিলেন। তাঁহার সময়ে দিনাজপুরের উত্তর-পশ্চিম অংশ যাহাতে মালদুয়ার পরগণা অবস্থিত তাহা রাঢ় রাজ্যের অধীন ছিল।

(২) এখন যেমন বাঙ্গালা দেশে সংস্কৃত ভাষা বাঙ্গালা বর্ণমালাদ্বারা লেখা হয় তেমনি ৩৫ সংবতে সংস্কৃত ভাষা পালি বর্ণমালায় লিখিত হইত।

(৩) এই রাজা ধূর্ত্ত ঘোষ এবং বঙ্গরাজ রাম পালের মন্ত্রী দামোদর ঘোষের নামে ঘোষ উপাধি দেখা যায়। বাঙ্গালাদেশের বৈদ্যদের মধ্যে অতি প্রাচীন কাল হইতে দত্ত উপাধি ছিল। বঙ্গীয় গোপদের মধ্যে ঘোষ উপাধি এবং বারুই-দের মধ্যে মিত্র উপাধি বরাবর ছিল বলিয়া জানা যায়। তাহা হইতে অনুমান হয় যে বঙ্গীয় কায়স্থদের ঘোষ, বসু, দত্ত, মিত্র, গুহ প্রভৃতি উপাধি তাহাদের বাঙ্গালাদেশে নিবিষ্ট হওয়ার পরে হইয়াছে। কান্যকুব্জে তাহাদের এই সকল উপাধি ছিল না। কেন না কানোজে অথবা বাঙ্গালাদেশের বহির্ভাগে কায়স্থ-দিগের অথবা অন্য কোন জাতির ঈদৃশ উপাধি নাই। মুন্সী, বখ্শী, সরকার, খাঁ, বিশ্বাস, সর্ব্বাধিকারী প্রভৃতি উপাধিগুলি স্পষ্টই চাকরীর উপাধি। আবার রায়, চৌধারী, মজুমদার, ভূঁইয়া প্রভৃতি উপাধি সম্পত্তি হইতে হইয়াছে। এই সকল উপাধি যেমন কায়স্থের আছে তেমনি অন্যান্য অনেক জাতির মধ্যেই আছে। কিন্তু মূল উপাধি ঘোষ, বসু, গুহ, মিত্র, আইচ, ধর, কর, সোম প্রভৃতি কোন্ সময়ে কেন হইয়াছে, তাহা জানা যায় না।

(৪) বাঙ্গালী শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণেরা যেমন কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণের এক শাখা তেমনি মৈথিল ব্রাহ্মণেরাও আর একটি শাখা। মৈথিল ব্রাহ্মণদের মধ্যে ওঝা উপাধি এখনও বিদ্যমান আছে। রাঢ়ী ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদের পূর্ব্ব পুরুষের নামে ওঝা উপাধি ছিল। কিন্তু সেই উপাধি বংশানুক্রমিক ছিল না। কেন না বাৎস্য গোত্রীয় ব্রাহ্মণদের পূর্ব্ব পুরুষ ধরাধর মিশ্রের পৌত্র বেদ ওঝা। তাঁহার দুই পুত্রের নাম অনিরুদ্ধ বেদান্তাচার্য্য এবং দামোদর আচার্য্য। আবার অনিরুদ্ধের দুই পুত্রের নাম লক্ষ্মীধর মিশ্র (সান্যাল) ও ভীমদেব ওঝা (কালিয়াই)। রাঢ়ীয় কুল শাস্ত্রেও ঐরূপ একই বংশের অন্বয়ে কাহার উপাধি ওঝা, কাহার মিশ্র, কাহার আচার্য্য এবং কাহার উপাধ্যায় উপাধি দেখা যায়। তজ্জন্য অনুমান হয় যে, ওঝা, মিশ্র, ভট্ট, আচার্য্য, উপাধ্যায় প্রভৃতি উপাধি পূর্ব্বে বিদ্যা কিংবা ব্যবসায় জানিত

উপাধি ছিল। তখনকার সেই উপাধি ব্যক্তিগত ছিল পুরুষানুক্রমিক ছিল না। পরে যখন বল্লালসেনের সময়ে বাসগ্রামের নামানুসারে শ্রেত্রিয়দের উপাধি হইয়াছে তদবধি ওঝা উপাধি বিলুপ্ত হইয়াছে। কানোজে ওঝা উপাধি এখন নাই, পূর্ব্বে ছিল কিনা তাহাও কেহ এখন বলিতে পারে না। কিন্তু তথাকার পাঁড়ে, দোবে, তেওয়ারী, চোবে, ত্রিবেদী, সুকুল (শুক্ল), বাজপেয়ী প্রভৃতি উপাধি যে আধুনিক তাহা সকলেই স্বীকার করে। অরুণ ওঝার বংশধরেরা বহুকাল পর্য্যন্ত মালতুয়ার পরগণা নিষ্করক্সপে ভোগ করিয়াছিলেন। নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর আমলে সেই নিষ্করের উপর মালগুজারী ধার্য্য হওয়ায় তাহা জমিদারী শ্রেণীভূক্ত হইয়াছে। দ্বারবঙ্গের মহারাজের পূর্ব্বপুরুষেরাও মহোপাধ্যায় পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহারা গুরুদক্ষিণারূপে যে সকল ব্রহ্মত্র পাইয়াছিলেন, নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ তদুপরি রাজস্ব ধার্য্য করায় তাহাই উক্ত রাজবংশের জমিদারী হইয়াছিল। তাহার পর তাঁহারা বহু জমিদারী অর্থদ্বারা ক্রয় করিয়া বাঙ্গালা প্রদেশে সর্ব্বপ্রধান জমিদার হইয়াছেন। পুরাতন বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণ যেমন চাকরী দ্বারা অথবা বাহুবল দ্বারা জমিদারী লাভ করিতেন, মৈথিল ক্ষত্রিয় ও কায়স্থদিগকেও সেইরূপ জমিদারী অর্জ্জন করিতে দেখা যায়। কিন্তু মৈথিল ব্রাহ্মণদিগকে তদুপায়ে জমিদার হইতে দেখা যায় না।

(৫) অরুণ ওঝা প্রথমে যে বাড়ী করিয়াছিলেন সেই বাড়ী মৃত্তিকা তলে বিলীন হইলে তদ্বংশীয়েরা দ্বিতীয় বাড়ী করিয়াছিলেন। তাহা মৃত্তিকায় প্রোথিত হইলে, তৃতীয় বাড়ী ও গড়খাই তৈয়ারী করা হইয়াছিল। সেই বাড়ী কোন প্রবল মুসলমান কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল। তাহাতে গড় এবং দেবমূর্ত্তি সমূহ ভগ্ন হইয়াছিল। সেই সমস্ত ভগ্নাবশেষগুলিও এখন মাটীরতলে ডুবিয়া পড়িয়াছে। উক্ত জমিদারেরা এখন যে বাড়ীতে বাস করিতেছেন, উহা তাঁহাদের চতুর্থ বাড়ী। এই বৃত্তান্ত হইতেই উক্ত জমিদার বংশের প্রাচীনত্ব প্রমাণ হয়।

(৬) মালতুয়ারের জমিদারের বর্ত্তমান বার্ষিক লভ্য দেড় লক্ষ টাকার অধিক। কিন্তু ইহাঁদের কখন রাজা উপাধি হয় নাই। তাহা হইতে অনুমান হয় যে পূর্ব্বে ইহাঁদের লভ্য কম ছিল। ইহাঁদের ওঝা উপাধি লুপ্ত হইয়া চৌধারী উপাধি কতদিন হইতে হইয়াছে তাহা জানা যায় না।

(৭) ইহাঁদের ৫৩ পুরুষ যাবৎ জমিদার অথচ জমিদারীতে শরীকী বিভাগ

হয় নাই। তাহা হইতে অনুমান হয় যে ইহাঁদের কেবল একজন মাত্র উত্তরাধিকারী হইত। ইহাদের নিকট এখন গত ৩২ বৎসর অপেক্ষা বেশি দিনের দলীল একখানিও নাই।

(ঘ) আনাম দেশ।

আনামের হিন্দুকীর্ত্তি বিশ্বকোষে বর্ণিত আছে। উক্ত গ্রন্থে অনুমিত হইয়াছে যে ভববর্ম্মা, ঈশানবর্ম্মা প্রভৃতি রাজগণ উত্তর-পশ্চিম কাম্বোজ হইতে আসিয়া আনামে বাস করেন এবং চম্পা নগরে রাজধানী করিয়াছিলেন।

কিন্তু ধরণীধর বর্ম্মা, উদয়াকর বর্ম্মা প্রভৃতি নাম শুনিলে তাঁহাদিগকে বাঙ্গালী বলিয়া বোধ হয়। ফরাসী পণ্ডিত কাভেণ্ডিসের মতেও তাঁহারা বাঙ্গালী। ঐ স্থান পূর্ব্বে শ্যামরাজের অধীন ছিল। তজ্জন্য আমাদের অনুমান হয় যে শ্রীহট্টের পলাইত রাজা সুরথের বংশধরগণই শ্যামের পূর্ব্বাংশে নিজ রাজ্য বিস্তার করিয়াছিল। শ্রীহট্টের ক্ষত্র রাজারা আবার উত্তর কাম্বোজ সম্ভূত হইতে পারে। সুতরাং উভয় প্রকার অনুমানও সত্য হইতে পারে। শ্যামের রাজবংশ সূর্য্য-বংশীয় ক্ষত্রিয়ের শাখা, শ্রীহট্টের রাজারাও সূর্য্যবংশীয় ছিলেন।

৩। চাঁদ রায় ও কেদার রায়।

চাঁদ রায় ও কেদার রায় দুই ভাই। কেহ বলে চাঁদ রায় কেদার রায়ের পিতা। তাঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষ কর্ণাট দেশীয় করণ জাতি সম্ভূত। তাঁহারা বঙ্গদেশে আসিয়া বৈদ্য রাজাদের অধীনে সম্ভ্রান্ত চাকরী পাইয়া বিক্রমপুরের অন্তর্গত শ্রীপুর গ্রামে বাস করিয়াছিলেন। এদেশে তাঁহাদের স্বজাতি না থাকায় তাঁহারা বঙ্গজ কায়স্থ সমাজে মিলিত হইয়াছিলেন। কৃত্রিম কায়স্থগণ বরাবরই অকুলীন হয়। সেই জন্য চাঁদ রায়েরা অকুলীন মৌলিক কায়স্থ মধ্যে গণ্য হইয়াছিলেন। তাঁহাদের পিতার নাম জানা যায় না এবং তোড়রমল্লের সময়ে ইহাঁদের কোন উল্লেখ নাই। এজন্য অনুমান হয় যে পূর্ব্বে তাঁহারা কোন উচ্চপদস্থ ছিলেন না। চাঁদ রায় ও কেদার রায় অতিশয় প্রতাপশালী ভূঁইয়া হইয়া উঠিয়াছিলেন। ভাওয়ালের পাঠান জাগীরদার ঈশা খাঁ তাঁহাদের বন্ধু ছিলেন। মোগল রাজত্বের প্রথম ভাগে যখন প্রতাপাদিত্য* স্বাধীন সার্ব্বভৌম হইয়াছিলেন সেই সময়ে চাঁদ রায় এবং ঈশা খাঁও

* রাজা প্রতাপাদিত্যের পূর্ব্বপুরুষগণ কাননগোবিভাগে কার্য্য করিতেন। বলা বাহুল্য

স্বাধীন হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা নিজ নামে মুদ্রা ছাপেন নাই। মোগল শুবাদার তাঁহাদের দমন জন্য সৈন্য পাঠাইয়াছিলেন। চাঁদ রায়ের এবং ঈশা খাঁর সম্মিলিত সেনা সেই মোগল সৈন্যদিগকে জলে স্থলে সম্পূর্ণরূপে পরাজয় করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছিল। সেই যুদ্ধে মানসিংহের পুত্র দুর্জ্জয় সিংহ হত হইয়াছিলেন। যুদ্ধ জয়ের পর ঈশা খাঁ চাঁদ রায়ের বন্ধু ও অতিথিরূপে কিছুদিন শ্রীপুর গ্রামে অবস্থিতি করিয়াছিলেন।

ঈশা খাঁ শুনিলেন যে কেদার রায়ের ভগিনী সোণামণি পরম সুন্দরী। সে বার বৎসর বয়সে বিধবা হইয়াছে। এখন তাহার বয়স চৌদ্দ বৎসর মাত্র। তিনি তাহাকে নিকা করিবার জন্য চাঁদ রায়ের নিকট প্রস্তাব করিলেন। চাঁদ রায় ও কেদার রায় ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। ঈশা খাঁ বিনীতভাবে কহিলেন, "ভাই! এরূপ প্রস্তাব যে তোমাদের ক্রোধের কারণ হইবে, আমি তাহা জানিতাম না। আমি শুনিয়াছি যে রাজপুত রাজারা স্বেচ্ছাক্রমে মুসলমান আমীর সহ কন্যার বিবাহ দিয়া থাকে। তোমাদের হিন্দুর মধ্যে কেহ বিধবাকে বিবাহ করিতে সম্মত হয় না। তাইতে আমি মনে করিয়াছিলাম যে আমি তোমাদের বিধবা ভগিনীকে নিকা করিতে চাহিলে তোমরা সন্তোষপূর্ব্বক সম্মত হইবে। তাহাতে আমাদের বন্ধুত্ব দৃঢ়ীভূত হইবে। তোমরা যদি আমার ভগিনীকে নিকা করিতে চাও তবে আমি খুব খুশী হইয়া নিকা দিতে পারি। পুরুষের পত্নী লাভ করা যেরূপ প্রয়োজনীয় স্ত্রীলোকের স্বামী লাভ করা তদপেক্ষা বেশি প্রয়োজনীয়। সকলেই আহ্লাদপূর্ব্বক কন্যা ও ভগিনীর বিবাহ দিয়া থাকে! তোমরা যেমন আমীর লোক আমিও তেমনি। আমার সহ তোমাদের ভগিনীর নিকা দিতে যে কি দোষ হয় তাহা আমি বুঝি না। আমার মনে কোন মন্দ অভিপ্রায় নাই। যাহা হউক আমি ভ্রমবশতঃ যদি অপরাধ করিয়া থাকি

তাঁহারা রাজা তোড়রমল্লের অনেক পূর্ব্বে। তাঁহাদের আদি পুরুষ রামচন্দ্র রায় প্রথমত সপ্তগ্রামের কাননগো দপ্তরে নিযুক্ত হন। তথা হইতে তিনি গৌড়ে গমন করিলে তথায়ও কাননগো দপ্তরে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র শিবানন্দ স্বীয় কার্য্যদক্ষতা গুণে গৌড়ের বাদশাহ সোলেমানের অনুগ্রহে কাননগো দপ্তরে অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হন। সোলেমানের পুত্র দায়ুদের সময় শিবানন্দের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীহরি ও জানকীবল্লভ প্রধান মন্ত্রী ও রাজস্ববিভাগের সর্ব্বোচ্চ পদ প্রাপ্ত হইয়া বিক্রমাদিত্য ও বসন্তরায় উপাধি লাভ করেন।

তবে ক্ষমা প্রার্থনা করি।" রায়জীরা খাঁ সাহেবের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া শান্ত ভাবে কহিলেন, "বাঙ্গালাদেশে বিধর্ম্মীর সহ কন্যা বিবাহ দেওয়া অতীব দূষণীয়। কায়স্থ দূরে থাকুক, তুমি হাড়ী ডোম চণ্ডালের নিকট এরূপ প্রস্তাব করিলে তাহারাও অপমান বোধ করিত এবং ক্রুদ্ধ হইত। যাহা হউক তোমার মনে কোন পাপ নাই। তুমি নিজ ভ্রমের জন্য ক্ষমা চাহিতেছ। আমরা ক্ষমা করিলাম। কিন্তু ভাই! তোমাকে সতর্ক করিয়া দিতেছি যে আর কখন কোন বাঙ্গালী হিন্দুর নিকট এরূপ প্রস্তাব করিও না।"

বাহ্য বিবাদ শান্তি হইল। ঈশা খাঁ পূর্ব্ববৎ বন্ধুভাবে শ্রীপুরেই থাকিলেন। কিন্তু তাঁহার মনে শান্তি হইল না। তিনি সোণামণিকে লাভের জন্য অধীর হইলেন। শ্রীমন্ত খাঁ (বসু) চাঁদ রায়ের কুটুম্ব ও অমাত্য ছিল। ঈশা খাঁ প্রচুর প্রলোভন দ্বারা তাহাকে হস্তগত করিলেন এবং তাহারই সাহায্যে সোণামণিকে নিদ্রিত অবস্থায় হরণ করিয়া ভাওয়ালে প্রস্থান করিলেন। চাঁদ রায় ঈশা খাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থ ভাওয়ালে উপস্থিত হইলেন। ঈশা খাঁও নিজ সেনা সহ সম্মুখীন হইলেন। যুদ্ধের পূর্ব্বে চাঁদ রায় নির্জ্জনে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া জয় কালীর ধ্যান করিতেছিলেন সেই সময়ে শ্রীমন্তের প্রেরিত ঘাতুকগণ চাঁদ রায়কে হত্যা করিল। কিন্তু তাহারা পলাইবার অবকাশ পাইল না। চাঁদ রায়ের ভৃত্যগণ তাহাদিগকে বন্দী করিল। বন্দীদের নিকট শ্রীমন্তের বিশ্বাস-ঘাতকতা জানিয়া চাঁদের ভৃত্যেরা শ্রীমন্তকে এবং ঘাতুকদিগকে বিবিধ যন্ত্রণা দিয়া হত্যা করিল। কিন্তু সেনাপতির অভাবে তাহারা ঈশা খাঁর সহ যুদ্ধ না করিয়া শ্রীপুরে ফিরিয়া গেল।

সোণামণির অপহরণ এবং চাঁদ রায়ের অপমৃত্যুর প্রতিহিংসার্থী হইয়া কেদার রায় ভাওয়াল আক্রমণ করিলেন। ঈশা খাঁ যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া পলায়ন করিলেন। কেদার সমস্ত ভাওয়াল পরগণা অধিকার করিলেন। সোণামণি বন্দীভাবে আনীতা হইলে, কেদার তাহাকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিতে আদেশ করিলেন। সোণামণি কহিল, "আমার যখন জাতি কুল গিয়াছে তখন তোমাকে দাদা বলিয়া তোমার মানহানি করিতে চাই না এবং বাঁচিয়া থাকিতেও চাই না। কিন্তু তুমি রাজা, তুমি বিচার করিয়া দেখ যে আমার অপরাধ কিছুই নাই। শ্রীমন্ত খাঁ ও ঈশা খাঁ আমাকে অজ্ঞানাবস্থায় হরণ করিয়া ধর্ম্মনাশ

করিয়াছে। তুমি তাহাদের রক্তে অগ্রে কুলকলঙ্ক ধৌত কর আমি তাহা দেখিয়া অগ্নি প্রবেশ করি।” ভগিনীর রোদনে কেদারের হৃদয় নরম হইল। তিনি রোদন করিলেন এবং পণ্ডিত আনাইয়া ভগিনীর প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা চাহিলেন। পণ্ডিতেরা কহিলেন, “চৈতন্য প্রভুর বিধান মত বৈষ্ণবী হওয়াই ইহার মুক্তির একমাত্র উপায়।” কেদার তদনুসারে গোস্বামী আনিয়া সোণা-মণিকে হরিমন্ত্র দিয়া বৈষ্ণবী করিলেন; তাহার বাসের জন্য এক পৃথক বাড়ী করিয়া দিলেন এবং তাহার ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন।

ঈশা খাঁ যশোহরাধিপতি প্রতাপাদিত্যের শরণাপন্ন হইলেন। কেদারের সহ প্রতাপের পূর্ব্বাবধি শত্রুতা ছিল। প্রতাপ চন্দ্রদ্বীপের রাজা রামচন্দ্র রায়ের রাজ্য আত্মসাৎ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু রামচন্দ্রের মামাতো ভাই কেদার রায় রামচন্দ্রের পক্ষ হওয়ায় প্রতাপ কৃতকার্য্য হন নাই। সেই জন্য প্রতাপ ঈশা খাঁর পক্ষ হইয়া কেদারকে অপদস্থ করিতে চেষ্টিত হইলেন। পূর্ব্ব-বঙ্গের অধিকাংশ ভুঁইয়ারা কতক এ পক্ষে কতক অন্য পক্ষে যোগ দিয়াছিল। উভয় পক্ষেই বহুসংখ্যক মুসলমান সর্দার এবং হাব্‌রী (পর্টুগিজ) গোলন্দাজ ছিল। তিন বৎসর কাল ঘোরতর যুদ্ধ চলিয়াছিল। যশোহরের লোকে বলে যে সেই যুদ্ধে প্রতাপাদিত্য জয়ী হইয়াছিলেন। পক্ষান্তরে বিক্রমপুরের লোকে বলে যে, কেদার রায় জয়ী হইয়াছিলেন। অবস্থা দৃষ্টে অনুমান হয় যে, বহুসংখ্যক খণ্ড যুদ্ধ হইয়াছিল তন্মধ্যে কয়েকটিতে এক পক্ষ, অপর কয়েকটিতে অন্যপক্ষ জয়ী হইয়াছিলেন; কোন পক্ষই সম্পূর্ণরূপে জয়ী হন নাই।

এই সময়ে বঙ্গজ কায়স্থদিগের বিলক্ষণ উন্নতি হইয়াছিল। প্রতাপাদিত্য ও কেদার রায় প্রবল মহারাজ ছিলেন। ফরিদপুর অঞ্চলে মুকুন্দরাম রায় এবং বরিশাল অঞ্চলে চন্দ্রদ্বীপের রাজা রামচন্দ্র রায় ইহাঁরাও প্রবল লোক ছিলেন। পাঠান ও অপর মুসলমান সামন্তগণ মোগল বিদ্বেষী ছিল। তাহারা কতক এই সকল কায়স্থ রাজাদের অধীন, অপর কতক তাহাদের অনুগত হইয়াছিল। হাব্‌রী দস্যুদের গোলন্দাজ এবং জাহাজী সেনার উৎকর্ষ দেখিয়া প্রতাপ এবং কেদার উভয়েই কতকগুলি করিয়া হাব্‌রী যোদ্ধা চাকর রাখিয়াছিলেন। উভয়েরই প্রচুর সুশিক্ষিত সেনা ছিল। তাঁহারা প্রত্যেকেই দুই তিন বার মোগল সেনা পরাস্ত করিয়াছিলেন। সেই সময়ে রাজা মানসিংহ বাঙ্গালার শুবাদার হইয়া

আসিয়াছিলেন। উড়িষ্যার পাঠানেরাও মোগলদিগের ঘোর শত্রু ছিল। কোচবিহারের মহারাজ নরনারায়ণ প্রবল হইয়া রঙ্গপুর ও দিনাজপুরের অধিকাংশ দখল করিয়াছিলেন। সেই সময়ে যদি প্রতাপাদিত্যের সহ কেদার রায়ের ঐক্য থাকিত তবে বোধ হয় মানসিংহ তাঁহাদিগকে পরাজয় করিতে পারিতেন না। তাঁহারা পূর্ব্ববঙ্গে স্বাধীন রাজা হইয়া থাকিতে পারিতেন। কিন্তু আত্মবিগ্রহই হিন্দুদিগের অধঃপতনের সর্ব্ব প্রধান কারণ। যেমন কানোজ রাজ জয়চন্দ্রের সহ দিল্লীপতি পৃথ্বীরাজের বিবাদই ভারতে মুসলমান রাজত্ব প্রতিষ্ঠার হেতু হইয়াছিল সেইরূপ প্রতাপ ও কেদারের বিবাদই পূর্ব্ববঙ্গের স্বাধীনতা লোপের প্রধান কারণ। বিপক্ষদের অনৈক্য হেতু মানসিংহ একে একে সকলেরই বিনাশ সাধন করিতে পারিয়াছিলেন। প্রতাপ বন্দী দশায় গতাসু হইলেন। কেদার যুদ্ধক্ষেত্রে হত হইলেন। মুকুন্দরায় পূর্ব্বেই বিনষ্ট হইয়াছিলেন। কোচবেহারের মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণ মোগল সম্রাটকে নালবন্দি দিতে স্বীকার করিলেন। চন্দ্রদ্বীপের রাজা এবং মুসলমান সর্দারগণ মালগুজারী দিতে স্বীকার করিয়া মোগল সম্রাটের অধীন জমিদার হইলেন। সেই অবধি সম্পূর্ণ বাঙ্গালা দেশ পরাধীন হইল। তৎপূর্ব্বে বাঙ্গালার ভূঁইয়ারা প্রায় স্বাধীন ছিলেন।

কেদার রায়ের পতনের পর ঈশা খাঁ পুনরায় সোণামণিকে লইয়া গিয়াছিল। পূর্ব্ব ময়মনসিংহ জেলার সহবংপুরের মিঞারা ঈশা খাঁ ও সোণাবিবির (সোণামণির) সন্তান।

গঙ্গার ধারে রাঢ় দেশে একটি প্রবল পাল রাজ্য ছিল। ত্রিবেণীতে তাহার রাজধানী ছিল। এই রাজ্যে সাতগাঁ বন্দরে গ্রীক, রোমান প্রভৃতি লোক বাণিজ্য করিত। বিদেশীয়েরা বোধ হয় ত্রিবেণী রাজ্য বা দক্ষিণ রাঢ় রাজ্যকেই গঙ্গারাঢ়ী রাজ্য বলিয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালা দেশে "গঙ্গারাঢ়ী" নাম সম্পূর্ণ অজ্ঞাত।

পরিশিষ্ট (খ)।

অপদস্থ জাতি।

অধুনা হিন্দু সমাজের প্রায় প্রত্যেক শ্রেণীর লোকই স্ব স্ব জাতীয় মর্য্যাদা বর্দ্ধন জন্য অথবা উচ্চতর শ্রেণীতে গণ্য হইবার জন্য উৎসুক হইয়া সভা সমিতি স্থাপন পূর্ব্বক দলবদ্ধ ভাবে চেষ্টা করিতেছে। তজ্জন্য সমস্ত দেশ মধ্যে হুলস্থূল গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। সামাজিক ইতিহাসে তদ্বিষয়ে কিছু সমালোচনা একান্ত কর্ত্তব্য।

আদিম হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মণেরা ধর্ম্ম যাজক, ক্ষত্রিয়েরা রাজ্যশাসক এবং শূদ্রেরা পরিচারক ছিল। কৃষি বাণিজ্য শিল্পকার্য্য পশুপালনাদি জীবিকানির্ব্বাহার্থ প্রয়োজনীয় সমস্ত ব্যবসায়ই কেবলমাত্র বৈশ্যেরা করিত। সুতরাং বৈশ্যজাতির সংখ্যা যে অপর তিন বর্ণাপেক্ষা বেশি ছিল তাহা সহজেই উপলব্ধি হয়। মনুসংহিতা গোভিল সূত্র এবং প্রজাপতি সূত্র দৃষ্টেও বুঝা যায় যে বৈশ্যেরাই অধিবাসী প্রজা ছিল। অপর তিন শ্রেণী কেবল উপরিস্থ ও নিম্নস্থ অল্প সংখ্যক লোক ছিল। বিশ্ ধাতুর অর্থ হইতেও তাহাই প্রতিপন্ন হয়। অথচ আধুনিক হিন্দু সমাজের মধ্যে তের আনা লোকই শূদ্র, দেড় আনা ব্রাহ্মণ, এক আনা ক্ষত্রিয় অবশিষ্ট আধ আনা মাত্র বৈশ্য। পরন্তু বাঙ্গালা দেশে বৈশ্যের সংখ্যা শতকরা এক জন হইবে কি না সন্দেহের বিষয়। বৈশ্য সংখ্যা এত কম কেন হইল তদ্বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া জানা যায় যে, বহু সংখ্যক প্রকৃত বৈশ্য সন্তান বাঙ্গালা দেশে সংস্কার বর্জ্জিত শূদ্রবৎ হইয়া রহিয়াছে। সেইজন্য বৈশ্য সংখ্যা এত কম এবং শূদ্র সংখ্যা এত বেশি হইয়াছে।

পাবনা জেলায় কীর্ত্তিখোলা গ্রামে তাম্বুলী সাহাদের একখানি পুরাতন কুল কারিকা আছে, তাহাতে বঙ্গীয় ১১২৫ সালের লেখা বলিয়া প্রকাশ আছে। সেই পুঁথিখানি এখন কলিকাতা হাটখোলা পূর্ব্ববঙ্গ বৈশ্য

সমিতিতে বিদ্যমান আছে। সেই পুঁথিখানি দেখিলে এবং তল্লিখিত কথা গুলি পাঠ করিলেই তাহার প্রাচীনত্ব স্বতঃ প্রমাণ হয়। উক্ত কারিকা উল্লিখিত আছে যে,—

পশ্চিম প্রদেশে মোদের পূর্ব্ব পুরুষগণ
করিত বসতি মুঞী কৈরাছি শ্রবণ।
* * *
বৈশ্য কুলজাত সভাই নানাগুণ ধরি।
* * *
বেসাতি করিতে পরে মগধে চলিলা।
* * *
শ্রীঅগ্রদাস আর অগোর দুই ভাই।
* * *
অগোরের বংশধর হইলা আগরী
সেই হতে আগরবালা বলিত সবাই
* * *
অশোক নৃপতি বড় পরম ধার্ম্মিক
তাঁহার রাজত্ব কালে * * *
* * * শ্রীঅগ্রদাসের সন্তান
পাঠলিপুত্রেতে গোলা করিল স্থাপন।
তথা হৈতে তাম্রলিপ্তে সমুদ্র বন্দরে
বাণিজ্য করিতে যাইত বছরে বছরে।
এই হেতু তাম্বুলি বণিক বলিত সবাই
ক্রেমে এহি বংশ ব্যপ্ত হৈল সর্ব্ব ঠাঞী।
বিশেষতঃ পূর্ব্ব বঙ্গ বরেন্দ্র ভূমিতে
করেন বসতি সবে পরম সুখেতে।

এই কারিকা যে সময়ে লিখিত হইয়াছে সে সময়ে এ দেশের কোন শ্রেণী লোকের মধ্যে জাতীয় সম্মান বৃদ্ধির চেষ্টা ছিল না। পরবর্ত্তী দেড়শত বৎসর মধ্যে কোন তাম্বূলী সাহা নিজ জাতি মর্য্যাদা বৃদ্ধির চেষ্টা করে নাই। সুতরাং উক্ত কারিকাতে মিথ্যা পরিচয় লিখিবার কোন কারণ দেখা যায় না। অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে অর্থাৎ ইংরেজী বিদ্যার চর্চ্চা

বাহুল্য হওয়ার পূর্ব্বে এ দেশের প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ বংশের পরিচয় জানিত। তদ্দ্বারাই আমাদের সামাজিক ইতিহাস রক্ষিত হইত। সেই বংশানুক্রমিক কিংবদন্তী মধ্যে কোন কোন ব্যক্তির গুণ ও সৎকীর্ত্তি অতিরঞ্জিত থাকিতে পারে বটে কিন্তু সম্পূর্ণ মিথ্যা কোন কথা থাকিতে পারে না। বিশেষতঃ বংশের পরিচয় মধ্যে মিথ্যার সংশ্রব মাত্র থাকিতে পারে না। কোন হিন্দু নিজ বাপ পিতামহের অপলাপ করিয়া অন্য অপর ব্যক্তির শ্রাদ্ধ তর্পণ করে না। সেই জন্য বংশানুক্রমিক প্রবাদগুলি লিখিত পুস্তক হইতে বেশি বিশ্বাসযোগ্য।

এই কারিকা হইতে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয় জানা যায়—

(১) বৈশ্য জাতীয় অগ্রদাস এবং অগোর দুই ভাই পশ্চিম প্রদেশে বাস করিত। অগোরের সন্তানেরা আগরওয়ালা। অগুরু চন্দনকে প্রাকৃত ভাষায় আগর বলে। সেই আগর বিক্রেতাদিগকে আগরবালা বা আগরওয়ালা বলে। ইহার সংস্কৃত নাম গন্ধবণিক। সেই নামই বাঙ্গালা দেশে প্রচলিত।

(২) অগোরের ভ্রাতা শ্রীঅগ্রদাস। তাহার সন্তানেরা অশোক রাজার সময়ে পাঠলিপুত্র নগরে গোলা স্থাপন করিয়াছিল। পূর্ব্ব বঙ্গের তাম্বূলী সাহারা সেই অগ্রদাসের বংশধর। অতএব গন্ধবণিকের শাখা।

(৩) তাম্রলিপ্তে যাতায়াত জন্যই হউক অথবা তাম্বূলের কারবার করা হেতুই হউক ইহাদের তাম্বূলী সাহা উপাধি হইয়াছে। ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে সাহা উপাধি কোন জাতি বোধক নহে। উহা কেবল বাণিজ্য ব্যবসায়ী বোধক। বাঙ্গালা দেশের নানা জাতীয় বণিকের সাহা উপাধি আছে। কিন্তু পশ্চিম ভারতে সাহা, সাহু ও সা উপাধি কেবল বৈশ্য জাতিরই হয়। পশ্চিমে শুঁড়ীদিগকে কালোয়ার বলে। তাহাদের কখন সাহা উপাধি হয় না।

পাবনা জেলায় বেলকুচি গ্রাম নিবাসী পরামাণিক উপাধিধারী বারেন্দ্র সাহাদের পুরাতন কুলজিতে দেখা যায় যে "বারেন্দ্র আর্য্যধর্ম্মেব বিশরেব ন শংসয়ং।" লঘুজাতি চন্দ্রিকা নামক গ্রন্থে দেখা যায় যে "শাহজাহান বাদশাহের সময়ে কতগুলি সাধু উপাধিধারী বৈশ্য মুসলমান কর্ত্তৃক উৎপীড়িত

হইয়া দিল্লীর পার্শ্ববর্ত্তী স্থান হইতে নানাদিকে পলায়ন করিয়াছিল। তন্মধ্যে কতকগুলি পরিবার সহ বরেন্দ্র ভূমিতে আসিয়া পূর্ব্বাগত বারেন্দ্র সাহাদের সহ মিলিত হইয়াছিল।

এবম্প্রকার বহুবিধ প্রমাণ দৃষ্টে শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র চন্দ্র শাস্ত্রী ও শ্রীযুক্ত ভাগবত কুমার শাস্ত্রী প্রভৃতি বিজ্ঞ লোকেরা উল্লিখিত তাম্বূলী সমাজ ভুক্ত সাহাদিগকে বৈশ্য সন্তান বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। আমাদেরও সেই সিদ্ধান্তই বিশুদ্ধ বোধ হয় এবং তাহাদিগকে গন্ধবণিকের শাখা বলিয়াই মনে হয়। শুঁড়ী সাহাদের সহ ইহাদের বিবাহ আদান প্রদান নাই। শুঁড়ীদের অন্নজল ইহারা গ্রহণ করে না। এমন কি শুঁড়ীদের হুঁকায় ইহারা তামাক খায় না। সুতরাং ইহারা যে শুঁড়ী সাহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক জাতি তাহা নিশ্চিত। যাহারা ইহাদিগকে শুঁড়ী সাহার সম্প্রদায় ভুক্ত জ্ঞান করে তাহারা অনভিজ্ঞ এবং ভ্রান্ত। বাঙ্গালা দেশে সচরাচর নর্ত্তকীদিগকে "বাই" বলিয়া থাকে। তজ্জন্য অনেক পল্লীগ্রামবাসী লোকের বিশ্বাস এই যে বাই শব্দ নর্ত্তকী বোধক। অহল্যা বাই, তারা বাই, মীরা বাই প্রভৃতি প্রসিদ্ধা রাজরাণীদিগকেও তাহারা নর্ত্তকী বলিয়া মনে করে। তদ্রূপ সাধু বণিকদের সাহা উপাধি দৃষ্টে অনভিজ্ঞ লোকেরা তাহাদিগকে শুঁড়ী জাতি বলিয়া ভ্রমে পতিত হয়। ইহাদের যে কোন পুরুষে কেহ কখন সুরা তৈয়ারী কিংবা বিক্রয় করিয়াছে এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না বাঙ্গালা দেশ বহুকাল মগধ দেশীয় বৌদ্ধ সম্রাটদের অধীন ছিল। সেই সময়ে অনেকেই বৌদ্ধ ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিল। যাহারা স্পষ্টরূপে বৌদ্ধ হয় নাই তাহারাও কতক পরিমাণে আচার ও সংস্কার ভ্রষ্ট হইয়াছিল। তাম্বূলী সাহাদের কারিকা হইতেই স্পষ্ট জানা যায় যে তাহারা অশোক রাজার সময়ে মগধে আসিয়াছিল। অশোক ও তৎপরবর্ত্তী মগধ সম্রাটেরা গোঁড়া বৌদ্ধ ছিলেন। তাঁহাদের সাম্রাজ্যে ক্ষত্রিয় ছিল না। ব্রাহ্মণ ও বৈশ্যেরাও সংস্কৃত বিদ্যাহীন এবং উপনয়নাদি সংস্কার বিহীন হইয়া শূদ্রবৎ ছিলেন। বৈদ্য রাজাদের সময়েই সনাতন ধর্ম্মের বাঙ্গালা দেশে পুনরায় অভ্যুদয় হইতে থাকে বটে কিন্তু অপদস্থ জাতিকে পুনরায় স্বপদস্থ করিতে কেহ কোন চেষ্টা করে নাই।

বহুকাল পরে শঙ্করাচার্য্য মগধে বঙ্গে বহুতর ব্রাত্য ব্রাহ্মণ সন্তানদিগকে প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া উপনয়ন দিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণদের অধিকাংশই সেই সময়ে পুনরায় স্বপদস্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু শঙ্করাচার্য্য ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কোন জাতির পুনরুন্নতির কোন চেষ্টা করেন নাই। তজ্জন্য বৈশ্য সন্তানেরা অপদস্থরূপেই চলিয়া আসিতেছে। শাহ জেহান বাদশাহের সমকালে যে সকল হিন্দুস্থানী বৈশ্য আসিয়া তাম্বূলী সাহাদের সহ মিলিত হইয়াছে, তাহারাও তাম্বূলী বণিকদের রীতিই অনুসরণ করিতেছে। পশ্চিম প্রদেশেও আগরওয়ালাদের কতকগুলির পৈতা হয় আর কতকের হয় না। বাঙ্গালা দেশের বৈশ্যগণ মধ্যে কেবল শঙ্খবণিকের কতকগুলির পৈতা হয়, অন্য কাহার হয় না। ইহা নিতান্ত দূষ্য।

লোকের মঙ্গল সাধন করাই ধর্ম্মশাস্ত্রের উদ্দেশ্য। লোকের উন্নতি প্রদান দ্বারাই জাতীয় উন্নতি হয়। লোকদিগের অযথা অবনত করিলে জাতীয় অধঃপতন হয়। হিন্দু সমাজ বহুকাল যাবৎ অবনতি প্রমুখ হইয়া আছে। তাহাদ্বারা হিন্দু সমাজের অনিষ্টও যথেষ্ট হইয়াছে এবং হইতেছে। এখন অপদস্থ জাতিদিগকে পুনরায় স্বপদস্থ বা উন্নত করা আবশ্যক। এই গ্রন্থের উপক্রমণিকায় এবং নানাস্থানে আমরা স্পষ্টরূপে দেখাইয়াছি যে যাবতীয় সামাজিক ব্যবস্থাই সমাজের সাময়িক প্রয়োজনানুসারে বিধিবদ্ধ হইয়াছে। অবস্থানুসারে ব্যবস্থা করাই সদ্যুক্তি সঙ্গত এবং সকল দেশের সকল জাতির রীতি সিদ্ধ। হিন্দু সমাজেও এখন অবনতি প্রমুখী প্রথা ত্যাগ করিয়া উন্নতি প্রমুখ পদ্ধতি অবলম্বন করা কর্ত্তব্য।

এই অবনতি প্রমুখী প্রথার কারণ কি তাহা নিরূপণ জন্য বোধ হয় এ পর্য্যন্ত কেহই চেষ্টা করেন নাই। অনেকগুলি কুশিক্ষিত লোক আছে, ব্রাহ্মণের নিন্দা করাই তাহাদের জীবনের প্রধান লক্ষ্য। তাহারা বলে যে ব্রাহ্মণদের স্বার্থপরতা ঈর্ষা বিদ্বেষই এই কুপ্রথার কারণ। প্রকৃত পক্ষে উক্ত দোষারোপ সম্পূর্ণ মিথ্যা। উচ্চতর জাতির অধঃপতনে ব্রাহ্মণদের প্রচুর ক্ষতি হয়, লাভ কিছুই নাই। সুব্রাহ্মণেরা কোন শূদ্রের যাজন করেন না। যে সকল ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সন্তানগণ অপদস্থ শূদ্রবৎ হইয়া আছে, তাহারা পুনরায় স্বপদস্থ হইলে তাহাদের যাজন দক্ষিণা,

ভোজন দক্ষিণা এবং প্রতিগ্রহ লাভে ব্রাহ্মণদিগের প্রচুর লাভ হইতে পারে। অথচ তাহাদিগকে অপদস্থ রাখিয়া ব্রাহ্মণদের কোনই লাভ নাই। এই সমস্ত লোকের অবনতি ও পাতিত্য ব্রাহ্মণদের স্বার্থের বিরুদ্ধ। অপদস্থ জাতি ক্ষত্রিয় বৈশ্য হইলে ব্রাহ্মণদের ঈর্ষা বিদ্বেষ হইবারও কোন কারণ নাই। সুতরাং ব্রাহ্মণদের প্রতি দোষারোপ সম্পূর্ণ মিথ্যা আমাদের বোধ হয় ভ্রম, ভয় এবং কর্ত্তার অভাব বশতঃ এই অবনতিমুখী প্রথা উৎপন্ন ও স্থায়ী হইয়াছে। হিন্দু সমাজের অধিকাংশ লোকের মনে ভ্রম আছে যে যাহারা অবনত হইয়া আছে তাহাদিগকে পুনরায় পদস্থ করিলে পাপ হয়। যে অল্প সংখ্যক লোকের মনে তাদৃশ ভ্রম নাই তাহারা সামাজিক অপর লোক কর্ত্তৃক একঘরিয়া বা সমাজচ্যুত হইবার ভয়ে অপদস্থ লোককে পুনরায় পদস্থ করিতে সাহসী হন না। তৃতীয়তঃ, কর্ত্তার অভাবেই কোন উন্নতিকর কার্য্য হয় না। পূর্ব্বে নদিয়ার রাজা, তাহিরপুরের রাজা, নাটোরের রাজা, শুশুঙ্গের রাজা প্রভৃতি কয়েকজন ব্রাহ্মণ রাজার প্রচুর প্রাধান্য বঙ্গীয় হিন্দু সমাজে ছিল। তাঁহারা দেশস্থ প্রধান প্রধান পণ্ডিত সহ পরামর্শ করিয়া সামাজিক আচার ব্যবহার সম্বন্ধে যে নিয়ম করিতেন তাহা সকলেই মান্য করিত। এখন সেই সকল রাজাদিগের তাদৃশ প্রাধান্য নাই এবং পণ্ডিতদিগের তাদৃশ মান্য নাই। সুতরাং কোন সামাজিক নিয়ম স্থাপন বা সংশোধন করা আবশ্যক হইলে তাহা করিবার কর্ত্তা না থাকায় কোন কর্ম্ম সুসম্পন্ন হইতে পারে না। কিন্তু সমাজ সংশোধন করা এখন একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়াছে। আবার সেই উদ্দেশ্য সাধন জন্য বহু পণ্ডিত এবং বহু ধনবান লোক একত্র সমবেত হইয়া পক্ষপাত বিহীন ভাবে কর্ত্তব্য নিরূপণ এবং একখানি বিশেষ পত্রিকা দ্বারা তাহা সর্ব্বসাধারণের গোচর করা উচিত। ঈদৃশ উপায় ভিন্ন এখন কোন সামাজিক উন্নতি হইতে পারে না।

"দোষঃ গুণাঃ সর্ব্বেষু সন্তি তদ্‌বর্জ্জিতঃ কুতো নরঃ" অর্থাৎ সকল ব্যক্তিরই কিছু না কিছু দোষ এবং গুণ আছে, সম্পূর্ণ দোষ শূন্য বা গুণশূন্য কোন লোক নাই। এইজন্যই সকল দেশে সকল জাতি মধ্যে পাপের প্রায়শ্চিত্ত বিধান আছে। প্রায়শ্চিত্ত করিলেই সকল অপরাধ খণ্ডন হয়। যে সকল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সন্তান অপদস্থ হইয়াছে তাহাদের অবশ্যই কোন

অপরাধ বা ত্রুটি হইয়াছিল। এখন যদি তাহাদের সেই সকল দোষ না থাকে এবং তাহারা শাস্ত্রমত প্রায়শ্চিত্ত করে তবে তাহাদিগকে পুনরায় স্বপদস্থ করা একান্ত কর্ত্তব্য। যাহারা উচ্চজাতি সম্ভূত নহে তাহারাও যদি গুণ ও কর্ম্ম দ্বারা শ্রেষ্ঠত্বের যোগ্য হয় তবে তাহার সম্মান বৃদ্ধি করা কর্ত্তব্য। গুণবানের সম্মান বর্দ্ধন দ্বারাই জাতীয় জীবনের উন্নতি হয়। যে সমাজে গুণের পুরস্কার নাই সে সমাজ অচিরে অধঃপতিত হয়।

কৌলিন্য পরিবর্ত্তন।

কৌলীন্য মর্য্যাদা বাঙ্গালীদিগের জীবনাধিক গুরুতর গণ্য ছিল। অনেকে সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া কুলমর্য্যাদা রক্ষা করিত। কেহ বা অশীতি-পর বৃদ্ধের সহ সপ্তবর্ষীয় কন্যা বিবাহ দিয়া কুলমর্য্যাদা রক্ষা করিত। এমন কি রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদের মধ্যে অনেক সময়ে কুলমর্য্যাদা রক্ষার্থ ধর্ম্ম শাস্ত্রের বিধান লঙ্ঘন করা হইত এবং পঞ্চাশ বৎসর বয়স্ক কুমারীকে দশবর্ষীয় বালকের সহ নাম মাত্র বিবাহ দিয়া কুলশাস্ত্রের গৌরব রক্ষা করা হইত। সংক্ষেপতঃ খৃঃ পঞ্চদশ শতাব্দীর আরম্ভ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত সুদীর্ঘ ৪০০ বৎসর বল্লালী কুলমর্য্যাদাই উচ্চ শ্রেণীর বাঙ্গালীদের জীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল। সেই অস্বাভাবিক কুলমানের প্রতি একান্ত অনুরাগ ও আগ্রহ হেতু যে সমস্ত অনিষ্ট এবং অপকর্ম্ম হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ বর্ণনা করা অসম্ভব। বিশ্বকোষ অভিধানে অপেক্ষাকৃত বিস্তীর্ণ বিবরণ আছে। কিন্তু তাহাও সম্পূর্ণ নহে, এবং তাহাতেও ভ্রম রাশি রাশি মিশ্রিত হইয়াছে। অথচ নির্ভুল করিয়া লিখিবার কোন উপায় নাই। এইজন্য যতদূর সত্য নির্দ্ধারণ করা যায় কেবল তাহাই সংক্ষেপে বর্ণিত হইল।

এই গ্রন্থের দশম পৃষ্ঠায় উক্ত হইয়াছে যে বঙ্গরাজ দেবপাল গৌড় নগর হইতে কয়েক ঘর কায়স্থ আনিয়া বঙ্গদেশে স্থাপন করেন। তাহাদিগকে তিনি সম্পত্তি দিয়াছিলেন। তাহাদের সহ তিনি বিবাহ আদান প্রদান করিয়া নিজে তাহাদের সমাজে মিলিত হইয়াছিলেন। অন্যান্য বৌদ্ধ প্রধান লোক যাহারা পুনরায় হিন্দু হইয়াছিল, তাহারাও বোধ হয় রাজার দৃষ্টান্ত মত কায়স্থ সমাজে মিলিত হইয়াছিল। এই কারণে বঙ্গজ কায়স্থ সংখ্যা অত্যন্ত বেশী হইয়াছিল। সেই বঙ্গজ কায়স্থ দুই ভাগ হইয়া বঙ্গজ এবং দক্ষিণ রাঢ়ী হইয়াছে। ইহার প্রত্যেক শ্রেণী মধ্যে যত কায়স্থ আছে, বারেন্দ্র ও উত্তর রাঢ়ী কায়স্থ একত্রেও তদপেক্ষা কম।

উক্ত বঙ্গজ কায়স্থগণ (তখন বঙ্গজ এবং দক্ষিণ রাঢ়ী কায়স্থেরা একত্র বঙ্গজ নামে পরিচিত ছিল) বল্লালসেনের সমকালে স্বাধীন ব্যবসায়ী এবং অনেকে সঙ্গতিপন্ন হইয়াছিল। তাহাদিগকেই বল্লাল কৌলীন্য মর্য্যাদা দিয়াছিলেন।

তৎকালে বারেন্দ্র কায়স্থেরা বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদের পরিচারক ছিল। তাহাদের মধ্যে কেহ বিদ্বান বা সঙ্গতিপন্ন ছিল না। এজন্য বল্লালী কুলমর্য্যাদা তাহাদের হয় নাই। তিন শত বৎসর পরে মুসলমান রাজত্বকালে বারেন্দ্র কায়স্থদের মধ্যে কতক লোক বিদ্বান ও সঙ্গতিপন্ন হইলে ভৃগুনন্দী কর্তৃক বারেন্দ্র কায়স্থদের কুলমর্য্যাদা স্থাপিত হইয়াছিল। ইহাদের কুলশাস্ত্রের নাম ঢাকুর। সেই ঢাকুরমতে চাকী, নন্দী ও দাস উপাধিবিশিষ্টেরা কুলীন হইয়াছিল। আর দে, দত্ত, সিংহ ও নাগ সমাখ্যগণ উত্তম মৌলিক আর ধর, কর, সোম ও গুণ আখ্যাধারীগণ হেয় অর্থাৎ অপকৃষ্ট মৌলিক। পরবর্ত্তীকালে বিবাহের উত্তম অধম আদান প্রদান জন্য মর্য্যাদা হ্রাসবৃদ্ধি হইয়াছে।

বল্লালের সমকালে উত্তর রাঢ়ী কায়স্থেরা রাঢ়ী ব্রাহ্মণদের পরিচারক ছিল। তাহাদের মধ্যে কাহার বিদ্যা বা সঙ্গতি ছিল না। সকলের সমান অবস্থাহেতু তাহাদের কুলমর্য্যাদা হয় নাই। মুসলমান রাজত্বকালে তাহাদের মধ্যে যাহারা সঙ্গতিপন্ন হইয়া ঘটক ব্রাহ্মণদিগকে যে যত বেশি পরিমাণ প্রণামী দিয়াছে সে সেই পরিমাণে উচ্চ কুলীন হইয়াছে। যাহারা ঘটকদিগকে কিছু দিতে পারে নাই তাহারা কায়স্থ মধ্যেই গণ্য হয় নাই। পক্ষান্তরে কোন অকায়স্থ ঘটকদিগকে তুষ্ট করিতে পারিলে সে মান্য গণ্য কায়স্থ হইয়াছে। এইজন্য ইহাদের ঘটকেরা উত্তর রাঢ়ী কায়স্থদিগকে শ্রীকরণ বলে।

রাঢ়ী ঘটকদের মতে লক্ষ্মীর অনুগৃহীত শূদ্রই কায়স্থ। হিন্দুস্থানী পণ্ডিতেরাও ঠিক ঐরূপ বলেন "শূদ্রাঃ সদবস্থাঃ কায়স্থাঃ" অর্থাৎ শূদ্রের মধ্যে যাহার অবস্থা ভাল সেই কায়স্থ। তাঁহারা কায়স্থদিগকে কোন পৃথক জাতিবিশেষ বলিয়া স্বীকার করেন না। আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে উপরি উক্ত সিদ্ধান্ত বিশুদ্ধ নহে। কায়স্থ নামে একশ্রেণী পতিত ক্ষত্রিয় পরশুরামের সময়াবধি বিদ্যমান ছিল। যদিও বিদ্যাবানে ধনবান শূদ্র বহুসংখ্যক কায়স্থ জাতিতে মিলিত হইয়াছে তথাপি সমস্ত কায়স্থ কৃত্রিম জাতি নহে।

দক্ষিণ রাঢ়ী কায়স্থেরা বঙ্গজ কায়স্থের এক বিচ্ছিন্ন শাখা। এই বিচ্ছেদ কোন সময়ে কি কারণে হইয়াছে তাহা এখন নিশ্চয় জানা যায় না। হিন্দুদের দলাদলি জিগীষা বহুকাল যাবৎ প্রবল আছে। ঠিক শ্রোত্রিয়দের রাঢ়ী বারেন্দ্র বিভাগের ন্যায় কায়স্থদেরও বঙ্গজ ও দক্ষিণ রাঢ়ী বিভাগ সম্বন্ধে একদল অন্যদলের প্রতি দোষারোপ করে। কিন্তু তাহা বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া বোধ হয় না। প্রকৃত ঘটনা এই যে কতকগুলি বঙ্গজ কায়স্থ ব্যবসায় উপলক্ষে সপ্তগ্রামে ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে গিয়া বাস করিয়াছিল। তৎকালে দূরবর্ত্তী স্থানের লোক সহ সামাজিক ক্রিয়া রক্ষা করা কঠিন ছিল। এজন্য সপ্তগ্রামবাসী কায়স্থদিগের সহ মূল বঙ্গজ কায়স্থদিগের সামাজিক আদান প্রদান রহিত হইয়াছিল। ক্রমে কৌলীন্য পদ্ধতি উভয়দলের মধ্যে কিছু কিছু বিভিন্ন হইয়াছিল। সেই বিচ্ছিন্ন দল রাঢ় দেশের দক্ষিণে বাস করায়, তাহাদের দক্ষিণ রাঢ়ী উপাধি হইয়াছে। কোন দলের কোন দোষের জন্য অথবা শত্রুতা জন্য যে বঙ্গজ কায়স্থদিগের মধ্যে দুই শ্রেণী বিভাগ হইয়াছে এরূপ বোধ হয় না।

রাজা লক্ষ্মণ সেন কৌলিন্য মর্য্যাদা বংশানুক্রমিক করার পর কুলীন ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে নানারূপ দোষ প্রবেশ করিয়াছিল। তজ্জন্যই বারেন্দ্র ব্রাহ্মণমধ্যে পঠী এবং রাঢ়ী ব্রাহ্মণ মধ্যে মেল সৃষ্ট হইয়াছে। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদের মধ্যে আঘাতে কাপ এবং অবসাদে পঠী হইয়াছে। পিতাকর্ত্তৃক শাপগ্রস্ত হওয়ার নাম আঘাত। আর অন্য প্রকার অপরাধের নাম অবসাদ। কাপের বৃত্তান্ত এই গ্রন্থের ১২৫।১২৬ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে। এক্ষণে বারেন্দ্র কুলীনদিগের আটপঠীর বৃত্তান্ত বলা যাইতেছে।

(১) নিরাবিল—যাহাদের কোন দোষ নাই তাহারাই নিরাবিল কুলীন ছিলেন। তাহিরপুরের রাজা দর্পনারায়ণ রায়ের * রাজ্য মধ্যে এক ব্রহ্মহত্যা হয়। রাজা নিজে তজ্জন্য প্রায়শ্চিত্য না করিয়া গ্রামের তহশীলদারকে প্রায়শ্চিত্ত করাইয়াছিলেন। উক্ত রাজার ঘরে যে সকল নিরাবিল কুলীন বিবাহ করিয়াছিলেন এবং সেইরূপ বিবাহে যাঁহারা বরযাত্রী হইয়াছিলেন, তাঁহাদের দর্পনারায়ণী অবসাদ হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহাদের সেই দোষ তুচ্ছ করিয়া নিরাবিল পঠী কুলীনেরা জানকীবল্লভ রায়ের অনুরোধে তাঁহাদিগকে স্বদলে গ্রহণ করায় এই নাম হইয়াছে।

* এই দর্পনারায়ণ রায় ও পুঁঠিয়ার দর্পনারায়ণ বিভিন্ন ব্যক্তি।

(২) রোহিলা পঠী—প্রচণ্ড খাঁ দ্বারা যেরূপে রোহিলা পঠী সৃষ্ট হয় তাহা ২১৭।২১৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হইয়াছে।

(৩) ভূষণা পঠী—মৈশালাগ্রাম নিবাসী গঙ্গারাম মৈত্রের দ্বারা যেরূপে ভূষণা পঠী সৃষ্ট হয় তাহা এই গ্রন্থের ১৫৪।১৫৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হইয়াছে।

(৪) বেণী পঠী—বেণীমাধব রায় নামান্তরে পণ্ডিত ডাকাইত সহ সংসৃষ্ট কুলীনেরাই বেণী পঠীর কুলীন। তাহার বিস্তারিত বিবরণ ১৩৬।১৩৭ পৃষ্ঠায় বিবৃত হইয়াছে।

এই চারি পঠী কুলীনের পঠী বদ্ধ শ্রোত্রিয় আছে। পরবর্ত্তী চারি পঠীর শ্রোত্রিয় নাই।

(৫) জোনালী পঠী—জোনাইল গ্রামে একজন বিদেশী লোক চাকরী করিত। সে আপনাকে রাঢ়ী ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিত কিন্তু উক্ত গ্রামে অন্য কোন রাঢ়ী ব্রাহ্মণ ছিল না। গ্রামের বারেন্দ্র ব্রাহ্মণেরা উক্ত ব্যক্তির ঠিক পরিচয় জানিত না। ঐ ব্যক্তির মৃত্যু হইলে যে সকল ব্রাহ্মণ তাহার শব দাহন করিয়াছিল, তৎসংসৃষ্ট কুলীনেরাই জোনালী পঠীর কুলীন।

(৬) কুতুবখানী পঠী—কুতুব খাঁ পাঠানের অনুচরেরা মৃত্যুঞ্জয় মৈত্রের পত্নীকে হরণ করিলে সীতারাম রায়ের প্রসিদ্ধ সেনাপতিদ্বয় মেনারাম ধনারাম তাহাকে পথিমধ্যেই উদ্ধার করিয়াছিল। সেই মৃত্যুঞ্জয় মৈত্র সহ সংসৃষ্ট কুলীনেরাই কুতবখানী অবসাদ বিশিষ্ট। ৩৩৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(৭) আলীখানী পঠী—ভাওয়ালের জাগীরদারদের মধ্যে আলী খাঁ এক শরীক ছিলেন। সুবুদ্ধি রায় (ভাদুড়ী) নামক এক কুলীন ব্রাহ্মণ তাঁহার দেওয়ান ছিল। আলীখাঁর জননী সহ সুবুদ্ধি রায়ের গুপ্ত প্রণয় হইয়া সর্দারণীর গর্ভ হইল। আলী খাঁ সুবুদ্ধিকে বন্দী করিয়া তাহার শিরচ্ছেদের আদেশ দিলেন। ভাওয়ালের প্রধান মৌলবী কহিলেন, "এই দেওয়ানকে বধ করিলে সর্দারণীর কলঙ্ক ঘুচিবে না। বরং ইহাকে মুসলমান করিয়া তৎসহ সর্দারণীর নিকা দেও, তাহাতে সকল দোষ চুকিয়া যাইবে।" সেই যুক্তিই সকলের বিবেচনায় উত্তম হইল। সুবুদ্ধিকে জিজ্ঞাসা করায় সে সম্মতি দিল। তাহাকে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে এবং নিকা সম্পাদন করিতে উদ্যোগ হইতে লাগিল। এদিকে সুবুদ্ধি মলত্যাগের উছিলায় জঙ্গলের নিকট গিয়া পলায়ন করিল। এই সুবুদ্ধি রায়ের সংসৃষ্ট কুলীনেরাই আলীখানী পঠী।

(৮) ভবানীপুরিয়া—করতোয়া নদীর তীরবর্ত্তী ভবানীপুর পীঠস্থান। তথায় সাঁতোড়ের রাজা রামকৃষ্ণ প্রভৃতি সুরাপানে মত্ত অবস্থায় গোহত্যা, ব্রহ্মহত্যা, স্ত্রীহত্যা করায় পাঁচুড়িয়া অবসাদ হয়। তৎসংসৃষ্ট কুলীনেরাই ভবানী-পুরিয়া পঠী। ইহারাই সর্ব্বনিকৃষ্ট বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ।

এই অষ্ট পঠী মধ্যে আলিখানী (আলিখাঁই) এবং ভবানীপুরিয়া পঠীর কুলীনেরা কুলীন মধ্যে গণ্য হয় না। পাঁচুড়িয়া দোষ গুরুতর দোষ। আলীখানী দোষ ক্ষুদ্র দোষ বটে। অপরাপর অবসাদগুলি কল্পিত দোষ মাত্র। যে দোষে কাপের সৃষ্টি হয়, তাহাও প্রকৃত পক্ষে কোন দোষ নহে। উদয়ন আচার্য্যের জ্যেষ্ঠা পত্নী চাঁপাফুলের মালা মাথায় দিয়াছিলেন। উদয়ন তজ্জন্য পত্নীকে বিলাসপরায়ণা জ্ঞানে বাড়ী হইতে দূর করিয়া দিতে উদ্যত হইলে তাঁহার পুত্রেরা জননীর পক্ষ হইয়াছিল। এই জন্য উদয়ন প্রথম পক্ষের পুত্রদিগকেও ত্যাগ করিয়া নিস্কুল করিলেন। ইহারই নাম ভট্টাঘাত। ইহা প্রকৃত পক্ষে দোষ নহে বরং সদ্‌গুণ। এইরূপ অকারণে বা ক্ষুদ্র কারণে লোকদিগকে অপদস্থ করিতে করিতেই হিন্দুসমাজের এত দুর্গতি হইয়াছে। তথাপি বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের কুলপতি থাকায় কৌলিন্য জনিত অত্যাচার কতক কম হইয়াছে। বারেন্দ্র কুলীনের চারি বিবাহের বেশি নাই, অতি বৃদ্ধের বিবাহ নাই এবং বয়ো-জ্যেষ্ঠাকে বিবাহ করা নাই; আর কোন কন্যা ১৭।১৮ বৎসর বয়সের অধিক অনূঢ়া থাকিত না। বল্লালের সময় শাণ্ডিল্য গোত্রীয় সাধু বাগছি, রুদ্র বাগছি এবং লোকনাথ লাহিড়ী এই তিনজন, বাৎস্য গোত্রীয় লক্ষ্মীধর সান্যাল এবং ভীমদেব কালিয়াই এই দুই জন, কাশ্যপ গোত্রীয় মতু মৈত্র এবং ক্রতু ভাদুড়ী এই দুইজন, এবং ভরদ্বাজ গোত্রীয় সায়ণাচার্য্য ভাদড় এই আটজন কুলীন হইয়াছিলেন। উক্ত চারি গোত্রীয় আট জন সিদ্ধ শ্রোত্রিয় হইয়াছিলেন। অবশিষ্ট ৮৪ ঘর কষ্ট শ্রোত্রিয়। সাবর্ণি গোত্রীয় কেহ কুলীন বা সিদ্ধ শ্রোত্রিয় হয় নাই। তাহার ফলাফল বারেন্দ্র সমাজে স্পষ্ট দেখা যায়। সাবর্ণি গোত্র লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। বিলকুচ্ছার মজুমদার এবং আলোকদিয়ার ভট্টাচার্য্য ভিন্ন সাবর্ণি গোত্রীয় বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ নাই। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের পাঁচ আনা শাণ্ডিল্য গোত্র, পাঁচ আনা বাৎস্য গোত্র, পাঁচ আনা কাশ্যপ গোত্র, এক আনা ভরদ্বাজ গোত্র। উক্ত আট ঘর কুলীন মধ্যে ভাদড় গাঁই, সাধু বাগছি এবং কালিয়াই গোষ্ঠী এখন কুলীন নাই।

পাঠান রাজত্ব সময়ে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণের অতিশয় দরিদ্র অবস্থা ছিল। তাহারা কুলজ্ঞদিগকে যথোচিত পুরস্কার দিতে পারে নাই। তজ্জন্য তাহাদের কুলশাস্ত্র ধারাবাহিক রূপে রক্ষিত হয় নাই। মোগল রাজ্যারম্ভে নবদ্বীপের রাজারা সম্পত্তিশালী জমিদার হইয়া রাঢ়ীয় কুলশাস্ত্র সংগ্রহের চেষ্টা করিলেন। সেই সময়ে যাহা ঠিক সংগৃহীত হয় নাই তাহা কল্পিত কথা দ্বারা পূরণ করা হইয়াছে। সেই জন্য রাঢ়ীয় কুল শাস্ত্র অসম্পূর্ণ এবং অনৈক্য দোষ পরিপূর্ণ। রাঢ়ী বারেন্দ্র বিভাগ শ্রোত্রিয়দিগের মধ্যে কখন কি কারণে হইল তাহা রাঢ়ীয় কুলশাস্ত্রে নাই। রাঢ়ীয় ঘটকেরা মৌখিক বলেন যে, "পঞ্চশ্রোত্রিয় আদি-শূরের যজ্ঞ সমাধা করিয়া প্রচুর ধন এবং রাঢ় দেশে ব্রহ্মত্র পাইয়া বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের কন্যা বিবাহ করত রাঢ় দেশেই বাস করিয়াছিলেন। তাঁহারা স্বদেশে ফিরিয়া যান নাই। তিন বৎসর পর্য্যন্ত তাঁহাদের কোন সমাচার না পাইয়া ভট্ট নারায়ণের পুত্র আদিগাঁই ওঝা, দক্ষের ভ্রাতা সুষেণ, শ্রীহর্ষের ভ্রাতা পরাশর, বেদগর্ভের ভ্রাতা গৌতম এবং ছান্দড়ের ভ্রাতা ধরাধর তাঁহাদের উদ্দেশার্থ গৌড়ে আসিয়া উপরি উক্ত কার্য্য জানিতে পারিলেন। শেষোক্তেরাও বাঙ্গালা দেশে বাস করিতে উৎসুক হইলে রাজা আদিশূর তাঁহাদিগকে বরেন্দ্র ভূমিতে ব্রহ্মত্র দিয়া তথায় বাস করাইলেন। তাঁহারা স্বদেশ হইতে পরিবার আনিয়া বরেন্দ্র ভূমিতে বাস করিলেন। ইহাতেই রাঢ়ী বারেন্দ্র বিভাগ হইয়াছে। এই জন্যই উভয় শ্রেণীর কুল শাস্ত্রে কেবল (ভট্ট) নারায়ণের নাম ভিন্ন অপরের আদি পুরুষের নাম ঐক্য হয় না।" এই গল্প বিশ্বাসের অযোগ্য। পাঁচ জন সুপণ্ডিতের একবারে নিজ নিজ স্ত্রী পুত্রের মায়া পরিত্যাগ করিয়া এ দেশে বাড়ী করা অসম্ভব। বিশেষতঃ কান্যকুব্জের শ্রোত্রিয়েরা আপনাদিগকে অতি শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ জ্ঞান করিতেন। তাঁহাদের হঠাৎ অপরিচিত বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের কন্যা বিবাহ করা অসম্ভব।

কৌলীন্য প্রথার সৃষ্টি সম্বন্ধেও রাঢ়ীয় ভিন্ন ভিন্ন কুল শাস্ত্রে বিভিন্নমত দেখা যায়। এড়ু মিশ্র, ধ্রুবানন্দ, হরিমিশ্র, নির্দ্দোষ কুলসারাবলী, বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতির কথায় একতা নাই। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রামগতি ন্যায়রত্ন প্রভৃতি বিজ্ঞ রাঢ়ীয় পণ্ডিতেরাও বল্লাল সেনকেই কৌলীন্যের সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়াছেন। অথচ কোন কোন রাঢ়ীয় কুলশাস্ত্রে ধরাশূর কর্ত্তৃক রাঢ়ীয় শ্রোত্রিয়

মধ্যে কুলমর্য্যাদা সৃষ্টি দেখা যায়। বাচস্পতি মিশ্র কৃত কুলশাস্ত্রের সহ বারেন্দ্র কুল শাস্ত্রের কতক ঐক্য আছে।

শাণ্ডিল্য গোত্রীয় বন্দ্যঘাটীগ্রামবাসী, কাশ্যপ গোত্রীয় চট্টগ্রামবাসী, ভারদ্বাজ গোত্রীয় মুখুটিগ্রামী, সাবর্ণি গোত্রীয় গাঙ্গুলি ও কুন্দলাল গ্রামী এবং বাৎস্য গোত্রীয়, ঘোষাল, কাঞ্জিলাল এবং পুতিতুণ্ডগ্রামী এই আট গ্রামীরা রাঢ়ীয় কুলীন ব্রাহ্মণ। ডিণ্ডী, পিপ্পলাই, দীর্ঘাঙ্গী ও কুলভী এই চারি গ্রামীরা সিদ্ধ শ্রোত্রিয়। হড়, গুড়, কেশর, মহিন্তা, পরিহাল, গড়গড়ি, রাই, ঘণ্টেশ্বরী, পীতমুণ্ডী এবং চৌখণ্ডী এই দশ গাঁই সাধ্য শ্রোত্রিয়। অবশিষ্ট ৩৪ গাঁই অরি বা কষ্ট শ্রোত্রিয়।

লক্ষণ সেন কৃত কুলমর্য্যাদা বংশানুক্রমিক হইলে, কুলীনদের মধ্যে অনেকেই নবগুণহীন দোষাশ্রিত হইয়াছিল। তদ্দৃষ্টে বঙ্গের শেষ স্বাধীন রাজা দনুজ মাধব সেন * পুনরায় রাঢ়ী ব্রাহ্মণদের কুল সংস্কার করিয়াছিলেন। বল্লালের সময়ে ১৯ জন রাঢ়ীয় কুলীন ছিলেন। লক্ষণ সেনের সময়ে ১৭ জন, পরে মাধব সেনের সময়ে কেবল ১৩ জন মাত্র কুলীন গণ্য হইয়াছিল। মাধব সেন বঙ্গজ এবং দক্ষিণ রাঢ়ী কায়স্থদিগেরও কুল সংস্কার করেন। কিন্তু বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যদিগের কুলমর্য্যাদায় মাধব সেন হস্তক্ষেপ করেন নাই। তাহা হইতে অনুমান হয় যে, বারেন্দ্র কুলীন ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যদের তখন পর্য্যন্ত কোনরূপ গুণ ব্যত্যয় হয় নাই।

দেবীবর ঘটক চৈতন্য প্রভুর সমকালীন লোক ছিলেন। তিনি খৃঃ ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদের মেল বন্ধন করেন। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদের পঠীগুলি বহু দিনে ক্রমে ক্রমে হইয়াছে। কিন্তু দেবীবর তিন দিনে ছত্রিশ মেল বন্ধন করিয়াছিলেন। এইরূপ শীঘ্র শীঘ্র মেল বন্ধন করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছিল। রাঢ়ীয় সমাজে বংশজেরা নিতান্ত হেয় ছিল। দেবীবর নিজে বংশজ সন্তান। কুলীন যোগেশ্বর পণ্ডিত কর্ত্তৃক দেবীবরের জননী নিতান্ত অপমানিতা হইয়াছিলেন। আর লক্ষী-কান্ত মজুমদার নামক আর একজন বংশজ ব্রাহ্মণ নবাবের চাকরী পাইয়া

* কোন কোন রাঢ়ীয় কুল শাস্ত্রে দনৌজা মাধব সেন লেখা আছে। কিন্তু দনৌজা শব্দটি অশুদ্ধ।

কুলীনের কুলধ্বংশে প্রবৃত্ত ছিলেন। এই সকল গোলযোগ সম্বন্ধে প্রতি-বিধান জন্য দেবীবর "মেল বন্ধন" করিলেন। একই দোষ বা তুল্য দোষাশ্রিত কুলীনদিগকে তিনি এক মেলে ফেলিয়া ছিলেন। এক মেলের বিভিন্ন গোত্রে কুলীন কন্যাদের বিবাহ হয়। সেই পাল্টা ঘর ভিন্ন অন্য কোথাও বিবাহ দিবার উপায় নাই। দেবীবর দোষগুণের তুলনা করিয়া মোট ৩৬ পঠী বা মেল ধার্য্য করিয়াছিলেন—

১। খড়দহ ২। ফুলিয়া ৩। বল্লভী ৪। সর্ব্বানন্দী ৫। সুধাই ৬। আচার্য্য শেখরী ৭। পণ্ডিত রত্নী। ৮। বাঙ্গাল পাশ ৯। গোপাল ঘটকী ১০। ছায়া নরেন্দ্রী ১১। বিজয় পণ্ডিতীক ১২। চান্দাই ১৩। মাধাই ১৪। বিদ্যাধরী ১৫। পরিয়াল ১৬। শ্রীরঙ্গ ভট্টি ১৭। মালাধরখানী ১৮। কাকুস্থী ১৯। হরি মজুমদারী ২০। শ্রীমন্তখানী ২১। প্রমোদিনী ২২। দশরথ ঘটকী ২৩। শুভরাজখানী ২৪। নড়িয়া ২৫। রায়ী ২৬। চট্ট রাঘবী ২৭। দেহাটিয়া ২৮। ছয়ী ২৯। ভৈরব ঘটকী ৩০। আচম্বিতা ৩১। ধরাধরী ৩২। রাঘব ঘোষালী ৩৩। সুঙ্গ সর্ব্বানন্দী ৩৪। শতানন্দখানী ৩৫। চন্দ্রপতী ৩৬। বালী। দেবীবর বংশজদিগকে কুলীন ও সিদ্ধ শ্রোত্রিয়ের মধ্যবর্ত্তী মর্য্যাদা দিয়াছিলেন। দেবীবরের পরবর্ত্তী কালে আর ৪টি শাখা মেল হইয়াছিল; যথা—

১। শ্রীবর্দ্ধনী ২। সিদ্ধান্তী ৩। ঠেকা ৪। নিজ নরেন্দ্রী। এই সকল মেলের মধ্যেও অনেক শাখা প্রশাখা অনুশাখা হইয়াছিল। প্রত্যেক পঠী বা মেলে অতি অল্প সংখ্যক কুলীন ছিল। সেই সব ঘরে পাত্র না যুটিলে কুলীন কন্যার বিবাহ হইত না। বারেন্দ্রদিগের ৮ পঠী বিভাগে যত অনিষ্ট হইয়াছিল রাঢ়ীদের ৪০ পঠী বা মেল হেতু সেই অনুপাতে সমধিক অনিষ্ট হইয়াছিল। এইরূপ অসংখ্য বিভাগ ও দলাদলি হেতু হিন্দুরা ঐক্য বাক্যে জাতীয় হিতের জন্য কোন চেষ্টা করিত না বরং একদল অন্যদলকে অপদস্থ করিতে পারিলে সুখী হইত! সে জন্য কষ্ট সকলেই ভোগ করিত কিন্তু একতা না থাকায় কোন প্রতিকার হইত না।

পাশ্চাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ।

পাশ্চাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণেরা বলেন যে, "১০০১ শকাব্দে শ্যামল বর্ম্মা

নামক গৌড়াধিরাজ কর্ত্তৃক পঞ্চ গোত্রীয় পাঁচজন বৈদিক ব্রাহ্মণ পশ্চিম প্রদেশের কর্ণাবতী নগর হইতে আনীত হইয়া গৌড় দেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।" এই বৃত্তান্ত বিশ্বাসের সম্পূর্ণ অযোগ্য। খৃষ্টীয় সন আরম্ভের অন্যূন তিন শত বৎসর পূর্ব্বে মগধরাজ চন্দ্রগুপ্ত বাঙ্গালা দেশ ক্ষত্রিয় শূন্য করিয়াছিলেন। তদবধি বাঙ্গালা দেশে এ পর্য্যন্ত কোন ক্ষত্রিয় রাজা হয় নাই। সুতরাং শ্যামল বর্ম্মার গল্প যে মিথ্যা তাহা বলা বাহুল্য। ১০০১ শকাব্দে খৃষ্টীয় ১০৭৯ সালে আদিশূরের পুত্র লবসেন (লাউসেন) ভূশূর উপাধি মণ্ডিত হইয়া গৌড়ে রাজত্ব করিতেন। গৌড় শব্দে কখন কেবল গৌড় নগর বুঝায় কখন বা সমস্ত বরেন্দ্র ভূমি বুঝায় আবার কখন বা মিথিলা সহ সমস্ত বাঙ্গালা দেশ বুঝায়। কিন্তু তাহার কোন স্থানেই শ্যামল বর্ম্মা নামক রাজা ছিল না।

শ্রোত্রিয়দিগের বাঙ্গালায় অধিষ্ঠানকালে এ দেশে যে সাত শত ঘর বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ ছিল, তাহারা কি হইল? বারেন্দ্র ব্রাহ্মণেরা বলেন যে, লক্ষণ সেন কৃত ব্যবস্থার পর কষ্ট শ্রোত্রিয়দের বিবাহ করা দুর্ঘট হইয়াছিল। সেই জন্য কষ্ট শ্রোত্রিয়েরা সপ্তশতীর কন্যা বিবাহ করিয়া তাহাদিগকে কষ্ট শ্রোত্রিয় মধ্যে গ্রহণ করিয়াছিল। অধিকাংশ সপ্তশতী রাঢ়ীয় কষ্ট শ্রোত্রিয়ে মিলিত হওয়ায় রাঢ়ী ব্রাহ্মণের সংখ্যা এত বেশী হইয়াছে। বারেন্দ্র কষ্ট শ্রোত্রিয় মধ্যেও অল্প সংখ্যক সপ্তশতী মিশিয়াছে। অবশিষ্ট সপ্তশতীদের কতক পশ্চিম অঞ্চলে গিয়া গৌড় ব্রাহ্মণ নামে খ্যাত হইয়াছে। যাহারা বাঙ্গালা দেশে আছে তাহারাই পাশ্চাত্য বৈদিক নাম ধারণ করিয়াছে। ইহাই বিশ্বাস যোগ্য। তাহারা শ্রোত্রিয়দিগের দেখা দেখি আপনাদের মধ্যে কৌলীন্য মর্য্যাদা স্থাপন করিয়াছে। সেই মর্য্যাদা কোন রাজার দত্ত নহে। শ্যামল বর্ম্মা নামে যদি কোন ক্ষত্রিয় বাঙ্গালা দেশে রাজা হইয়া থাকে তবে সে চন্দ্রগুপ্তের পূর্ব্ববর্ত্তী লোক।

দাক্ষিণাত্য বৈদিক।

বহুসংখ্যক দক্ষিণী ব্রাহ্মণ ভাগীরথীতীরে গঙ্গাবাস করিতে করিতে বাঙ্গালা দেশের অধিবাসী হইয়াছেন। তাঁহারাও শ্রোত্রিয়দিগের দেখাদেখি আপনাদের মধ্যে কৌলিন্য মর্য্যাদা স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহাদের সেই মর্য্যাদা কোন রাজার দত্ত নহে। তাঁহারাই দাক্ষিণাত্য বৈদিক নামে পরিচিত।

আর্য্য হিন্দুসভ্যতা।

উপক্রমণিকার ৪র্থ পৃষ্ঠায় লেখা হইয়াছে যে আর্য্যসভ্যতার সাহায্য ভিন্ন অন্য কোন জাতি সভ্য বা উন্নত হয় নাই। তদ্‌বিষয়ক নিম্নলিখিত আরো কয়েকটী প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

এশিয়াটিক সোসাইটি প্রাচীন বৃত্তান্ত সংগ্রহ জন্য ইং ১৭৮৭।৮৮।৮৯ সালে যে সকল তদন্ত করাইয়াছিলেন তাহারই অনুসন্ধানফল "The Researches of Asiatic Society" নামে পুস্তক আকারে ১৭৯২ সালে মুদ্রিত হইয়াছিল।

তাহাতে নির্ণীত হইয়াছে যে—

১। লোহিত সাগর মধ্যে অবস্থিত ইডুম দ্বীপের এবং মিডিয়া দেশের লোক যাহাদিগকে গ্রীকেরা এরিথিরিয়ান (Erythereans) বলিত তাহারা ভারতবর্ষ-সম্ভূত লোক; তাহাদের ভাষা সংস্কৃতের অপভ্রংশ। তিন নকলে আসল খাস্ত—একটি প্রসিদ্ধ কথা। এক ভাষার শব্দ অন্যভাষায় লিখিত পঠিত হইতে তাহার উচ্চারণ ব্যত্যয় প্রচুর হয়। যতই ভাষান্তরিত হয় তত শব্দের আকৃতি ও উচ্চারণ পার্থক্য অধিকতর হইতে থাকে। অবশেষে এত বিকৃত হইয়া দাঁড়ায় যে তাহার মূলশব্দ নিরূপণ করা অসাধ্য হইয়া উঠে। যেমন সিন্ধুদেশে নগরঠাট্টার রাজা যাঁহার সহ সর্ব্বপ্রথমে মুসলমানদের যুদ্ধ হয় তাঁহার নাম "ধীর রাজ"। সেই নাম আরবীভাষায় "দহির" লেখা হইয়াছিল। তাহাই আবার ইংরেজিতে "ডাহির" লেখা লয়। ঐরূপ "হনুবীর" শব্দ হইতে "হন্‌বীর" তাহা হইতে হম্বির অবশেষে হামীর হয়। তদ্রূপ আর্য্য হইতে এরিয়ান তদপভ্রংশে এরিথিরিয়ান হইয়াছে। চন্দ্রগুপ্ত স্থানে সান্দ্র কোটাস হইয়াছে। অসুরিয়া রাজ্যের নাম আসিরিয়া (Asyria) হইয়াছে। তজ্জন্য আর্য্য শব্দ স্থানে এরিথিরিয়ান হওয়া সম্ভব বটে। (Asiatic Researches—page 2.)

২। এম্, ডি, হর্বেলট লিখিয়াছেন যে সেই এরিথিরিয়ানগণ মধ্য হইতে কতকটি গিয়া গ্রীস্, ইটালী ও স্পেন দেশে বাস করিয়াছিল। তাহাদের দ্বারাই য়ুরোপে বিদ্যা ও সভ্যতা প্রচার আরম্ভ হয়। রোমাণেরা সেই বংশীয় হেতু তাহারা আপনাদিগকে এরিয়ান বলিত।

৩। আবিসিনিয়া ও নিউবিয়ার একত্র নাম ইথিওপিয়া। তাহাতে গুজরাটী বণিকেরা সমুদ্রপথে বাণিজ্য করিতে যাইত। তাহাদের দ্বারাই আর্য্যসভ্যতা এবং লিখিবার রীতি ইথিওপিয়াতে প্রচার হইয়াছিল। যদিও বর্ণমালা পৃথক্ কিন্তু লিখিবার রীতি হিন্দু সদৃশ। বামদিক হইতে দক্ষিণদিকে লিখিতে হইত। সংস্কৃত বাঙ্গালা লেখার মত স্বরবর্ণ আকৃতি পরিবর্ত্তন করিয়া হলবর্ণে যুক্ত হইত। তাহাদের ভাষা মধ্যে ৩৫টি সংস্কৃত শব্দ পার্কার সাহেব পাইয়াছিলেন। বোধ হয় আংশিক বিকৃতভাবে বহু সংস্কৃত শব্দ তাহাদের ভাষায় আছে। আবার ইথিওপিয়ার সভ্যতা মিশরে এবং তথা হইতে গ্রীসে, রোমে, তুরস্কে ও আরবে বিস্তৃত হইয়াছে।

৪। ঈশ্বরজ্ঞান প্রভৃতিও বোধ হয় হিন্দুদের হইতেই উপরিউক্ত কারণে সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে আর্য্য বা হিন্দুজাতি হইতেই ঐ সকল দেশে বিকীর্ণ হইয়াছিল। পৌত্তলিক উপাসনা প্রণালী যাহা ঈজিপ্ট ও গ্রীস দেশে ছিল এবং তথা হইতে নানা দেশে প্রচলিত তাহারও আদিমূল হিন্দুজাতি। যে গেরী ও নাত দেবতার পূজা মিশরে ও আরবে প্রচলিত ছিল, তাহা বোধ হয় গৌরী এবং নাথ শব্দের অপভ্রংশ।

৫। য়ুরোপের প্রাচীন যাদুকর জাতি যাহাদিগকে মিশরদেশসম্ভূতজ্ঞানে য়ুরোপীয়েরা জিপ্সী বলিত তাহারাও বোধ হয় হিন্দুসন্তান। তাহাদের ভাষাদৃষ্টে তাহা প্রমাণ হয়। (Ibid—page 4.)

সমাজ সংস্কার।

(১) পতিত ব্রাহ্মণ—নীচ জাতির যাজন ও দান গ্রহণে ব্রাহ্মণের অপকর্ষ হয় বটে কিন্তু তাহারা একবারে অপজাতি হয় না। বাঙ্গালা দেশে কৈবর্ত্ত যাজক, সোলোক যাজক, ধীবর যাজক, প্রভৃতি ব্রাহ্মণেরা অনাচরণীয়। বিশেষতঃ কৈবর্ত্ত আচরণীয় অথচ তাহাদের পুরোহিত অনাচরণীয়। এরূপ অসঙ্গত ব্যবহার অন্য কোন দেশেই নাই। উক্ত পতিত ব্রাহ্মণদিগকে আচ-ণীয় করিয়া লওয়া উচিত।

(২) পীরালি* ব্রাহ্মণ ও বিলাত ফেরতা ব্রাহ্মণগণ প্রায়শ্চিত্ত করিলে তাহাদিগকে সুব্রাহ্মণরূপে গ্রহণ করা উচিত।

(৩) কায়স্থেরা বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, ধনে, মানে এবং চরিত্রে এখন ক্ষত্রিয় অপেক্ষা অপকৃষ্ট নহে। প্রকৃত কায়স্থেরা ক্ষত্রিয় সন্তান বটে। কায়স্থ মধ্যে যেমন অনেক অন্য জাতীয় লোক মিলিত হইয়াছে, ক্ষত্রিয় মধ্যেও কতক তদ্রূপ হইয়াছে। ক্ষত্রিয়েরা যেমন সময়ে সময়ে বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছে এবং ভবিষ্যতে করিতে পারে; তেমনি মারাঠি শূদ্র, জাঠ এবং বাঙ্গালী কায়স্থেরাও অনেক সময়ে করিয়াছে এবং করিতে পারে। সুতরাং তাহাদিগকে ক্ষত্রবং উন্নত করা উচিত। কিন্তু তজ্জন্য কোন মিথ্যা গল্প সৃষ্টি করা অনুচিত।

(৪) গন্ধবণিক, বারেন্দ্র তাম্বূলী সাহা, সুবর্ণ বণিক, চাঁদ গোয়ালা, সদ্গোপ প্রভৃতি ব্রাত্যবৈশ্যদিগকে পুনরায় বৈশ্য করিয়া লওয়া উচিত।

---

* পীর আলি নামক এক মুসলমান একজন রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণের পত্নীকে বলপূর্ব্বক হরণ করে। সেই ব্রাহ্মণী দ্বিতীয় দিনে পলাইয়া নিজ স্বামীর নিকট আসিলে স্বামী তাহাকে গ্রহণ করেন। ঐ ব্রাহ্মণীর সহ পীর আলির সংস্রব হইয়াছিল ইহা অনুমান করিয়া সামাজিক লোকে তদ্বংশীয়দিগকে পীরালি দোষাশ্রিত বলে। যদি অপবাদ সত্যই হয় তথাপি সেই ব্রাহ্মণীর স্বেচ্ছাকৃত কোন দোষ নাই। শাস্ত্র মতে বলপূর্ব্বক কারিত দোষ শ্রীবিষ্ণু স্মরণ-মাত্রেই খণ্ডন হয়। অপিচ এখন যে সকল লোক পীরালি অপবাদগ্রস্ত তাহারা মূল দোষাশ্রিত বংশ নহে। তাহারা প্রায়শঃ সংসৃষ্টের সংসৃষ্ট। সুতরাং ইহাদিগকে উন্নীত করা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য।

পীর আলির খাদ্য দ্রব্যের ঘ্রাণ গ্রহণ করা হেতু "ঘ্রাণাদর্দ্ধ ভোজনং" বলিয়া পীরালি দোষ ঘটিয়াছে যাহারা বলেন, তাঁহাদের কথা ঠিক নহে।

(৫) বাঙ্গালাদেশে নিম্ন শ্রেণীর শূদ্রেরা কোন ঘরে গেলেই অন্ন জল নষ্ট হয়। ইহা অশাস্ত্রীয় এবং অসঙ্গত। পশ্চিম প্রদেশে সরাইতে একই ঘরে নানা জাতীর হিন্দু মুসলমান ভিন্ন ভিন্ন চৌকায় পাক করিয়া খায়। তাহাতে কোন দোষ হয় না। কাশ্মীরী ব্রাহ্মণেরা এক গামলায় অন্ন রাখিয়া অন্য গামলা দ্বারা ঢাকে। তাহা আবার কাপড় দ্বারা জড়াইয়া বাঁধে। সেই মোট তাহাদের মুসলমান চাকরে বহন করে। কিন্তু তাহাতে তাহাদের অন্ন নষ্ট হয় না। কাশ্মীরী পণ্ডিতেরা বলেন যে অপজাতীয় লোকে অন্ন স্পর্শ করিলেই তাহা নষ্ট হয়, নতুবা অন্নের আবরণ স্পর্শ করিলে অন্ন নষ্ট হয় না। সেই মতটিই শাস্ত্র ও যুক্তি সঙ্গত। বাঙ্গালা দেশে স্পর্শ দোষের মাত্রাটা বড়ই বেশি।

অতএব স্পর্শ দোষের বাড়াবাড়ি ত্যাগ করা, অবনতি-প্রমুখ-কুপ্রথা ত্যাগ করা এবং উন্নতিপ্রমুখ হইয়া গুণবান্ লোকের মর্য্যাদা বৃদ্ধি করা হিন্দু সমাজের একান্ত কর্ত্তব্য।

সতর্কতা।

অতি প্রাচীন কাল হইতে হিন্দুদের মধ্যে চিরস্থায়ী দলীল তাম্র, রৌপ্য এবং পিতলের ফলকে লিখিবার রীতি ছিল। তাম্রপত্রেই উক্ত প্রকার দলীল অধিকাংশ হইত। রৌপ্যপত্রে অঙ্কিত কোন দলীল আমি দেখি নাই। পিত্তলের পত্রে অঙ্কিত দুই খানি দলীল দেখিয়াছি। তাহার এক খানি বাদশাহ ফেরোজ তোগলক প্রদত্ত জাগীরের সনদ। আর এক খানি কাহার প্রদত্ত তাহা পড়া যায় না। উক্ত দলীলখানি পারসী ভাষায় লিখিত জন্য অনুমান হয় যে উহাও কোন মুসলমান বাদশাহ কিংবা নবাবের প্রদত্ত। অন্য কোন দেশে ধাতুপত্রে লিখিয়া দলীল দিবার রীতি জানা যায় না। তজ্জন্য অনুমান হয় যে ভারতবাসী মুসলমানেরা এই হিন্দু রীতি গ্রহণ করিয়াছিল। ঈদৃশ দলীলকে সংস্কৃতে কবচ বলে। বিশ বৎসর পূর্ব্বে "তাম্রশাসন" শব্দ কোন বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী, মহারাষ্ট্রী লোকের মুখে শুনা যায় নাই। তাম্রপত্রে অঙ্কিত দলীলকে ইদানীং "তাম্রশাসন" কেন বলে তাহা জানা যায় না। অধুনা প্রায় প্রত্যেক জাতীয় লোকেই নিজ নিজ জাতীয় মর্য্যাদা বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করিতেছে। তজ্জন্য অনেক "তাম্রশাসন" "কাগজশাসন" "তালপাত-শাসন" কৃত্রিম হইতেছে। সেই সকল শাসনকে পুরাতন করা কঠিন নহে। বিশেষতঃ তাম্রশাসন একখানি পুরাতন করিতে অতি সহজেই পারা যায়। সুতরাং নবাবিষ্কৃত শাসনপত্রগুলিকে বিশ্বাস করিবার পূর্ব্বে সতর্ক হওয়া আবশ্যক।

উপরিউক্ত প্রকার কবচগুলি যদি প্রকৃত হয়, তথাপি তল্লিখিত বিশেষণ-গুলি প্রায় সমস্তই মিথ্যা থাকে। তাহার উপর কিছুমাত্র নির্ভর করা উচিত নহে। যথা—

সর্ব্বগুণালঙ্কৃত পরম ধার্ম্মিক বীরকুল চূড়ামণি দিগ্‌দেশ বিজয়ী গৌড় দেশা-ধিপতি 'ক' যাঁহার সম্মুখে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, দ্রাবিড়, মহারাষ্ট্র, কোশল, কাশ্মীর, পারস্য, পারদ, চীন, হূন, মহাচীনের নৃপতিবর্গ অনুজ্ঞাপ্রেক্ষী হইয়া দণ্ডায়মান থাকেন সেই মহারাজ 'ক' সর্ব্বশাস্ত্র পারদর্শী ত্রিকালজ্ঞ মহর্ষি 'খ' ঠাকুরকে

'গ' গ্রামে অমুক চৌহদ্দীভুক্ত দশ বিঘা ভূমি সংবৎ ৩৫২ সালে ব্রহ্মত্র দিলেন।

এইরূপ কবচের মর্ম্ম মধ্যে কেবল এইটুকু মাত্র বিশ্বাসযোগ্য যে, বরেন্দ্র ভূমি মধ্যে 'ক' নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি ৩৫২ সংবতে 'খ' নামক ব্রাহ্মণকে 'গ' গ্রামে উক্ত চৌহদ্দীভুক্ত দশ বিঘা ভূমি ব্রহ্মত্র দিয়াছিলেন। অবশিষ্ট গৌরবজনক বিশেষণগুলির কোনই মূল্য নাই। সেই সমস্ত বিশেষণের উপর নির্ভর করিলে অনেক দোষ হইবে।

বল্লাল সেনের সময়েই পঞ্চ রাজ্য অধিকৃত হয়। আদিশূর, লাউসেন (ভূশূর), নবজ সেন (নেওয়াজ, নৌজ বা ধরাশূর), চন্দ্র সেন (মহীশূর) ইঁহারা বরেন্দ্র ভূমির দক্ষিণ পশ্চিমাংশ এবং উত্তর রাঢ় দেশের অধিকারী মাত্র ছিলেন। বল্লালের পূর্ব্বে কোন এক ব্যক্তি সমস্ত পঞ্চ গৌড়ের অধিপতি ছিল না। ধর্ম্মপাল, দেবপালের গৌরবাত্মক যে সমস্ত বিশেষণ আছে তাহা প্রকৃত নহে। সেই সময়ে আশে পাশে যে সকল পাল রাজা ছিলেন, তাঁহাদের প্রদত্ত তাম্র কবচে (তাম্রশাসন, কাগজশাসন, তালপাতশাসন, ভূর্জ্জপত্রশাসন ইত্যাদিতে) তাঁহাদের প্রত্যেককেই নিখিল গৌড় দেশাধিপতি আসমুদ্র ক্ষিতীশ্বর বলিয়া উক্তি আছে। তদ্দৃষ্টে অনেকেই ভ্রান্ত হন এবং বিবেচনা করেন যে সেনবংশ ধ্বংস করিয়া পাল বংশীয়েরা পুনরায় গৌড়রাজ্য অধিকার করিয়াছিল। সেই ভ্রান্তি বিশ্বকোষেও গৃহীত হইয়াছে। ধর্ম্মপাল, দেবপাল এবং রামপাল পূর্ব্ববঙ্গের রাজা ছিলেন। বরেন্দ্র ভূমির পূর্ব্বাংশে যৎকিঞ্চিৎ ভূমি তাঁহাদের অধিকৃত থাকাও অসম্ভব নহে। কিন্তু কামরূপ হইতে বিন্ধ্যাচল পর্য্যন্ত তাঁহাদের রাজ্যের কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা। বিশ্বকোষের ৩০৮ পৃষ্ঠায় যে শিলালিপির উক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা কেবল গৌরববর্দ্ধক অলীক উক্তি মাত্র। প্রকৃত পক্ষে সেন রাজবংশ আদিশূর হইতে মাধব সেন পর্য্যন্ত অবিচ্ছিন্ন এগার পুরুষ চলিয়াছে। সেন রাজারা পাঠান কর্ত্তৃক পশ্চিম বাঙ্গালা হইতে বঞ্চিত হইয়া যখন কেবলমাত্র পূর্ব্ববঙ্গে এবং পূর্ব্ব বকদ্বীপে রাজত্ব করিতেছিলেন, তখনও কেশব সেন প্রদত্ত কবচে তাঁহাকে পঞ্চ গৌড়াধিকারী অখণ্ডাধরণীপতি বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। অতএব শিলালিপি ও কবচাদিতে যে সমস্ত গৌরবাত্মক বিশেষণ দেখা যায় তৎপ্রতি কোন আস্থা স্থাপন করা যাইতে পারে না।

শিলালিপি, কবচ ও ভট্ট কবিতা হইতে বংশানুক্রমিক প্রবাদ বেশি বিশ্বাস-

যোগ্য। তাহাদেও দ্যোতক কথা কতক থাকে বটে কিন্তু উপরিউক্ত দলীলে যত মিথ্যা প্রশংসা থাকে প্রবাদে তত থাকে না।

হিন্দুদিগের দিগ্বিজয়ে এক রাজ্য অন্য রাজ্যের শাসনাধীন হইত না। কহ্লণ পণ্ডিত রচিত রাজতরঙ্গিনী মধ্যে কাশ্মীর রাজ কর্ত্তৃক গৌড়দেশ বিজয় কত দূর সত্য বলা যায় না। কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে গৌড়রাজ্য কখন কাশ্মীর রাজ্যের শাসনাধীন হয় নাই। আদিশূর কাশ্মীর রাজের শ্বশুর জয়ন্ত নহেন এবং জাতিতে ক্ষত্রিয় নহেন। রাঢ়ী ও বারেন্দ্র শ্রোত্রিয়দের ঘরে এখনও সেনরাজ বংশের বহু দলীল আছে। কিন্তু কোন দলীলে বা প্রবাদে আদিশূরের সহ কাশ্মীরের কোন সংস্রব দেখা যায় না। তাঁহারা সকলেই ইহাদিগকে বৈদ্য জাতীয় বলিয়াছেন। আর রাজতরঙ্গিনীতে ৭৭১ খৃঃ অব্দে কাশ্মীররাজকর্ত্তৃক গৌড় বিজয় বর্ণিত হইয়াছে। তখন গৌড়ে বৌদ্ধ পালরাজ্য ছিল। আদিশূর ঐ সময়ের প্রায় তিনশত বৎসর পরবর্ত্তী লোক।

লক্ষ্মণসেন আপনাকে চন্দ্রবংশীয় বলিয়াছেন বটে কিন্তু কখন ক্ষত্রিয় বলেন নাই। বরং রাজধর্ম্মাচারী অম্বষ্ঠ বলিয়াছেন। অনেকের ভ্রম আছে যে সূর্য্যবংশ, চন্দ্রবংশ হইলেই তাহারা ক্ষত্রিয় হইবে। প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে (১৩ পৃষ্ঠা দেখ)। ইক্ষাকু বংশ সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয়, সাবর্ণি গোত্রীয় ব্রাহ্মণেরা সূর্য্যবংশীয় ব্রাহ্মণ। কোলাপুরের রাজা সূর্য্যবংশীয় শূদ্র। ঐরূপ চন্দ্রবংশীয় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য আছে। বরং ভরতপুরের রাজা চন্দ্রবংশীয় শূদ্র। সুতরাং চন্দ্রবংশ শুনিয়াই ক্ষত্রিয় জ্ঞান করা অনুচিত।*

চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশ বল্লাল সেনের সন্তান, এই জন্য বিশ্বকোষে বল্লাল সেনকে কায়স্থ বলা হইয়াছে, তাহা বিশুদ্ধ নহে। ইতিহাস ও জীবন চরিত লিখিতে যথা সম্ভব সত্য লেখা উচিত। অপ্রয়োজনীয় অথবা অল্প প্রয়োজনীয় সত্য কথা কটু হইলে তাহা ত্যাগ করা যাইতে পারে। কিন্তু মিথ্যা বলা এবং লেখা অকর্ত্তব্য। পূর্ব্বে অনুলোম সংযোগ ঘৃণিত ছিল না। মহাভারতে

* দ্বিজরাজ শব্দে সুব্রাহ্মণ বুঝায় এবং চন্দ্রও বুঝায়। বল্লাল সেন ওষধি নাথ নামক এক দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণের বংশ জাত। এজন্য সেন রাজাদিগকে "দ্বিজরাজ ওষধি নাথ বংশজ" বলিয়া উল্লেখ দেখা যায়। তাহা হইতে ভ্রমবশতঃ অথবা অভিসন্ধি বশতঃ তাঁহাদিগকে চন্দ্রবংশ বলা হইয়াছে। ওষধি নাথের পত্নী ক্ষত্রিয় জাতীয়া ছিলেন।

ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর জন্ম ব্যাসদেবদ্বারা হওয়ায় কোন নিন্দার কারণ হয় নাই। সেই নিয়ম বরাবর চলিয়া আসিতেছিল (৩২৮ এবং ৩২৯ পৃষ্ঠা)। কালুরায়ের জননী কায়স্থ কন্যা। সে অনূঢ়া অবস্থাতেই সম্রাট বল্লালসেনের রক্ষিতা উপপত্নী হইয়াছিল এবং অতিশয় প্রেয়সী ছিল। কালুরায় যদি বল্লালের বৈধ পুত্র হইতেন তবে তাঁহার নাম "কালুসেন" হইত এবং তিনিই উত্তরাধিকারী হইতেন। কেননা তিনি লক্ষণ সেন অপেক্ষা বয়সে বড় ছিলেন। কালুরায় এবং তাঁহার জননী বল্লালের প্রিয় ছিলেন, পক্ষান্তরে লক্ষণ এবং তাঁহার মাতা বল্লালের অপ্রিয় বিদ্রোহী ছিলেন। বল্লাল চরিতে দেখা যায় যে বল্লাল লক্ষণকে একমাত্র পুত্র বলিয়াছেন। কালুরায়কে কখন পুত্র বলিয়া প্রকাশ্য ভাবে স্বীকার করেন নাই। বল্লাল পদ্মিনীর অনুরোধে নিজের পবিত্রী পদ্মিনীর পায়ে সমর্পণ করিয়াছিলেন। কিন্তু কায়স্থদের কখন পৈতা ছিল না। সমস্ত গ্রন্থেই বল্লালকে অম্বষ্ঠ, বৈদ্য এবং ব্রহ্মক্ষত্র বলিয়া লেখা আছে। বল্লাল কায়স্থ বা শূদ্র ছিলেন না ইহা নিশ্চিত। কালুরায় কায়স্থজাতি মধ্যে প্রথম রাজা। তথাপি তদ্বংশীয়েরা বসু (খাঁ) এবং গুহ (ঠাকুরতা) দিগের নিকট সামাজিক কার্য্যে হাত যোড় করিতেন। তদ্বংশীয়েরা কুলমর্য্যাদায় ছোট ছিল। যখন পরমানন্দ বসু চন্দ্রদ্বীপের রাজা হইলেন তদবধি ধনমর্য্যাদা ও কুলমর্য্যাদায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠহেতু চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশ সমস্ত কায়স্থের শ্রেষ্ঠ হইয়াছিল। কালুরায় কায়স্থ বলিয়া বল্লাল সেনকে কায়স্থ বলিয়া অনুমান করা ভুল।

পাঠকগণের ভ্রম না হয় এজন্য এখানে প্রকাশ করা যাইতেছে যে কেবল তাম্বূলী সমাজভুক্ত বারেন্দ্র সাহারাই বৈশ্য সন্তান বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়। বরেন্দ্রভূমিতে বাস করায় কেবল ইহাদের বারেন্দ্র আখ্যা। নতুবা ইহাদের প্রকৃত উপাধি সাধু বণিক। রাঢ়ী সাহা বা তাহার শাখাভুক্ত বারেন্দ্র সাহারা এই সাধু বণিক তাম্বূলীসাহাগণ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক।

পৌষ-মাঘ JANUARY ১৩৯৮

SUN 5 12 19 26

23 Netaji Birth day

২০ ২৭

Ha